ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

-o———

বর্ষ, ১৩১৪, বৈশাখের।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

-o——

মাঙ্গলিক।

কুঞ্জে তোমার শত সঙ্গীত
বেজেছে শতেক ছন্দে,
কত কবি কত ফুটায়েছে ফুল
অনুপম রূপ গন্ধে!
বরষে বরষে মধু-ঝঙ্কার
মদির, গভীর তানে,
ফুলপরিমলে, বিভোর হৃদয়,
চেয়েছি কুঞ্জপানে!
লুব্ধ-হৃদয়ে এসেছি আজিকে,
নহে মা কুসুম ফুটাতে,—
এনেছি আমার ভক্ত হৃদয়
তোমার চরণে লুটাতে!
শুধু সঁপিবারে বাসনা কামনা,
সকলি তোমার চরণে!
তোমারি সাধনা,—আমার সে সুখ,
শ্রেষ্ঠ, জীবনে মরণে!

ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গ।*

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ আরবথনট কোম্পানি ও অন্য অন্য হৌস্‌গুলির দেউলিয়া হইবার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া, মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের পরিচালক সমিতি, ১৯০৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বরের যাণ্মাসিক কার্য্য-বিবরণীতে বলেন,—'মান্দ্রাজে সম্প্রতি যে আর্থিক বিপত্তি ঘটিয়াছে, তাহার ফলে এ প্রদেশময় নিদারুণ হাহাকার উঠিয়াছে। বাস্তবিক আরবথনট কোম্পানি এবং মান্দ্রাজের অন্যান্য যৌথকারবারগুলির উচ্ছেদ হইতে, প্রভূত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং মান্দ্রাজের বিস্তর পরিবার ও কারবারকে ইহার জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। উক্ত প্রদেশের বহুসংখ্যক অধিবাসীবর্গের কষ্টসঞ্চিত প্রভূত অর্থ, যাহা এই সকল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল, তাহা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গিয়াছে; বহুদিনকার পরিশ্রম, অনাহার ও দুঃখক্লেশে আমাদিগের দরিদ্র স্বদেশবাসী বার্দ্ধক্যের অবলম্বনস্বরূপ যে প্রভূত অর্থরাশি এই সকল ব্যাঙ্ক ও কারবারে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা যেন মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; পরন্তন পুরুষের জন্য আপনাদিগের উপস্থিত সামান্য যাহা কিছু সম্বল, এই সকল ব্যাঙ্ক বা ফারমে সংরক্ষিত ছিল, তাহা চক্ষের নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! যদি

---

* স্বদেশী আন্দোলনের সহিত আজকাল আমাদের বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজে যে স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে, তাহার বহুপূর্ব্বে পঞ্জাববাসীগণ আপনাদিগের মধ্যে ব্যাঙ্কস্থাপন করিয়া, বিশেষ কৃতিত্বের সহিত, তাহার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, পঞ্জাবে সুপরিচিত, আমাদের জনৈক পঞ্জাবী-বন্ধু 'ভারতী'র জন্য ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটি ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। লেখক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হওয়ায়, তাঁহার নাম দেওয়া হইল না।—ভা সং।

গচ্ছিতকারীগণ, (Depositors) এই সকল ব্যাঙ্কের শোচনীয় অবস্থার কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ এরূপ ভাবে গচ্ছিত রাখিতেন না। উক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। যদি কেহ এই সকল কারবারগুলির উচ্ছেদের পূর্ব্বে, তাহাদিগের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, উপযুক্ত সময়ে, সকলের চক্ষু উন্মোচন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণের প্রকৃত উপকার করিতেন!

পঞ্জাব ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশেও, সাধারণে যখন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক সমূহে অর্থাদি গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিতেছেন, তখন এই সকল ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থাদি, এরূপ বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগের বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজ অধিবাসীগণের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইতে হয়।

এ কথা সকলেই বিশেষরূপ বিদিত আছেন, যে, ব্যাঙ্ক, যে হারে সুদ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ইহার নিজের "ইজ্জত" ও লেনদারদিগের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি সাধারণে কোনও ব্যাঙ্ককে সমধিক নিরাপদ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্কের সুদের হার অল্প হইলেও, গচ্ছিতকারীগণ তথায় অর্থ গচ্ছিত রাখিতে স্বভাবতঃই ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু, যদি তাঁহারা ব্যাঙ্কের নিরাপদতা সম্বন্ধে সেরূপ সংশয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর উচ্চহারে সুদ চাহিয়া থাকেন। যে ব্যাঙ্কে সুদের হার অল্প, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যাঙ্কে সুদের হার অধিক, তথায় অর্থাদি গচ্ছিত রাখিয়া, সাধারণে আপনাদিগকে সমধিক বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলেন। ইঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, এতটা দায় সত্ত্বেও, যদি কেহ অধিক সুদের প্রত্যাশা করেন, সে বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিতে পারেন না,

কিন্তু এজন্য তিনি যদি তাঁহার অর্থাদি নষ্ট করিয়া বিপন্ন হইয়া বসেন, তাহা হইলে পশ্চাতে তিনি সাধারণের সহানুভূতির কোনও দাবী করিতে পারেন না।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কতকগুলি মূলসূত্র আছে। অনেকেই সেগুলির সহিত পরিচিত নহেন। কোন্ ব্যাঙ্কে অর্থাদি গচ্ছিত রাখা অধিকতর নিরাপদ তাহা জানিতে হইলে, এই মূলসূত্রগুলির সহিত সবিশেষ পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন,—অথচ এগুলি না জানিয়া, এবং এ বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়াই, তাঁহারা ব্যাঙ্কে অর্থাদি গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন।

নিম্নআলোচিত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন, কোন ব্যাঙ্কে অর্থাদি নিরাপদ স্বচ্ছন্দতার সহিত, গচ্ছিত রাখা যাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক, লোকে নিরাপদ বলিয়া জানেন। তাহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের মতে, ইঁহাদের নিকট অর্থাদি গচ্ছিত রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের অষ্টসপ্ততিতম বিবরণী হইতে দেখিতে পাই, যে, ১৯০৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার (Paid-up capital) প্রাপ্ত মূলধন এক কোটি এবং (Reserve fund) মজুত মূলধন ছিল ৯৪ লক্ষ; একুনে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা; এবং কারবারে যে টাকা খাটিতেছে (Working capital), অর্থাৎ প্রাপ্ত ও মজুত এবং স্থায়ী ও চল্‌তি জমা (Fixed and current deposits), সর্ব্বশুদ্ধ—১১,৪৯,১৬৭৪৮। এই মোট টাকা হইতে Reserve fund ও Paid-up capital বাদ দিলে যে টাকা (৯৫৫১৬৭৪৮৲) বাকী থাকে, তাহাই স্থায়ী ও চল্‌তি জমা। অতএব দেখা যাইতেছে, যাঁহারা উক্ত স্থায়ী ও চল্‌তি হিসাবে, ৯৫৫১৬৭৪৮৲ টাকা জমা রাখিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য ব্যাঙ্কের নিজস্ব

১,৯৪০০০০০৲ টাকা 'জামিন' স্বরূপ রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্কের জমার সমষ্টি, প্রাপ্ত ও মজুত মূলধনের অনুপাতে, প্রায় পাঁচ গুণ। বোম্বাই ব্যাঙ্কে, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ধনাদি রক্ষিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের ১৯০৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বরের ষাণ্মাসিক বিবরণী হইতে আমরা দেখিতে পাই, যে উক্ত ব্যাঙ্কের Paid-up capital (প্রাপ্ত মূলধন), ষাটি লক্ষ মুদ্রা, এবং Reserve fund (মজুত মূলধন), ৩৪ লক্ষ মুদ্রা অর্থাৎ একুনে ৯৪ লক্ষ মুদ্রা। এবং কারবারে সর্ব্বসমেত ৫১০২৮৬২৩৲ টাকা খাটিতেছে। এই মোট টাকা হইতে ৯৪০০০০০৲ টাকা বাদ দিলে ৪১৬২৮৬২৩৲ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এই ব্যাঙ্কের জমার সমষ্টি প্রাপ্ত ও মজুত মূলধনের অনুপাতে ৫½ গুণ। মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কেই মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অর্থাদি রক্ষিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেশীয় প্রবর্ত্তিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পঞ্জাবের 'ক' ব্যাঙ্কের* ষাণ্মাসিক বিবরণী হইতে, আমরা দেখিতে পাই, যে, উক্ত ব্যাঙ্কের Paid-up capital (প্রাপ্ত মূলধন), ৪১৭৩৪৮৲ টাকা এবং Reserve fund মজুত মূলধন ২০০০০০৲ টাকা একুনে ৬১৭৩৪৮৲ টাকা। ৫৩৩৮৯১৬৲ টাকা ব্যাঙ্কের সর্ব্বসমেত মূলধন। এই মোট টাকা হইতে ৬১৭৩৪৮৲ টাকা বাদ দিলে, আমরা সর্ব্ববিধ জমার টাকা ৪৭২১৫৬৮৲ টাকা পাই। এই ব্যাঙ্কের জমার সমষ্টি, ন্যস্ত ও মজুত মূলধনের অনুপাতে ৮½ গুণ।

পঞ্জাবের একটি বিদেশী পরিচালিত ব্যাঙ্কের ১৯০৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত, ষাণ্মাসিক বিবরণী হইতে আমরা দেখি, যে উক্ত ব্যাঙ্কের Paid up capital (প্রাপ্ত মূলধন), ২২৫০০০ টাকা এবং Reserve fund (মজুত মূলধন) ৪০০০০০ টাকা অর্থাৎ একুনে

* ব্যাঙ্কগুলির নাম প্রকাশ না করিয়া, আমরা বর্ণমালার দ্বারা সেগুলির প্রতি ইঙ্গিত করিব। ভা সং।

৬২৫০০০ টাকা। ব্যাঙ্কের Working capital (খাটতি মূলধন), ১২৩৬৬২৪২৲। এই টাকা হইতে ৬২৫০০০৲ টাকা বাদ দিলে, স্থায়ী ও চল্‌তি হিসাবে, ১১৭৪১২৪২ টাকা বক্রী থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে ব্যাঙ্কের জমার সমষ্টি ন্যস্ত ও মজুত মূলধনের অনুপাতে ১৯২/৫ গুণ।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাণসীধামে, শিল্প সভার যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে 'ব্যাঙ্কিং' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, মিঃ রেজিনল্ড্‌ মরো "ভারতবর্ষে মূলধনের ব্যবস্থা" (The Organisation of Capital in India) শীর্ষক, একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে, তিনি বলেন, —"অল্প মূলধনে ব্যাঙ্ক স্থাপনা করা একটি মহাভুল।" পঞ্জাবে অল্প মূলধন লইয়া, সম্প্রতি কয়েকটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এরূপ অল্প মূলধনে ব্যাঙ্ক স্থাপনা করা, প্রতিষ্ঠাতৃগণের পক্ষে উচিত হয় নাই। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে, কয়েকটি ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লাহোরের একটি 'খ' ব্যাঙ্কের ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের ষাণ্মাসিক বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে উক্ত ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত মূলধন ১৬৮৩৪৮৲ টাকা এবং মজুত মূলধন ১৯০০০৲ টাকা একুনে ১৮৭৩৪৮৲ টাকা। ব্যাঙ্কের সর্ব্বসমেত মূলধন ৪৬৯৯৭৬৯৲ টাকা। ব্যাঙ্কের আনুক্রমণিক ব্যয় হইয়াছিল ৪০০০০৲ টাকা। ১৮৭৩৪৮৲ টাকা হইতে ৪০০০০৲ টাকা বাদ দিলে যে ১৪৭৩৪৮ টাকা বাকী থাকে, তাহাই ব্যাঙ্কের নিজস্ব। ৪৬৯৯৭৬৯৲ টাকা হইতে ১৮৭৩৪৮ টাকা বাদ দিলে স্থায়ী ও চলতি হিসাবের দরুণ ৪৫১২৪২১৲ টাকা বাকী থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্কের জমার সমষ্টি, ন্যস্ত ও মজুত মূলধনের অনুপাতে, ৩১২/৩ গুণ।

পঞ্জাবের 'গ' ব্যাঙ্কের ১৯০৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে গৃহীত, ষাণ্মাসিক বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে উক্ত ব্যাঙ্কের

প্রাপ্ত মূলধন ৮৭৪৬২৲ টাকা এবং মজুত মূলধন ২৫০০৲ টাকা একুনে ৮৯৯৪২৲ টাকা। ব্যাঙ্কের আনুক্রমণিক ব্যয়, ৩৬৮৯৪৲ টাকা, বাদ দিলে, ৫৩০৪৮৲ টাকা, আমরা ব্যাঙ্কের প্রকৃত মূলধনস্বরূপ পাই। সুতরাং এই ব্যাঙ্ক, সর্ব্বসমেত ৬৭,৯৩৬৪৲ টাকা কারবারে খাটাইতেছে (Working capital)। মজুত ও ন্যস্ত মূলধনের সমষ্টি ৮৯৯৪২৲ টাকা বাদ দিলে, বাকী ৫৮৯৪২২৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার গচ্ছিত হিসাবে প্রাপ্ত। এই টাকা মূলধনের অনুপাতে ১১ গুণ, অর্থাৎ গচ্ছিত প্রতি ১১ টাকায় জামিন ১ টাকা মাত্র।

পূর্ব্বোল্লিখিত রাশীগুলি হইতে যদি আলোচ্য ব্যাঙ্কগুলির হিসাব, তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই :—

	জামিন প্রতি এক টাকায়	গচ্ছিত টাকা
মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কে	,,	৪'৫
বোম্বাই ব্যাঙ্কে	,,	৫
পঞ্জাব 'ক' ব্যাঙ্কে	,,	৭'৬
পঞ্জাব 'গ' ব্যাঙ্কে	,,	১১'১
পঞ্জাব বিদেশী ব্যাঙ্কে	,,	১৪'৮
এবং 'খ' ব্যাঙ্কে	,,	৩০'২

যে ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত ও মজুত মূলধন যত কম, তাহাতে টাকা গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব, সেই পরিমাণে গুরুতর; অধিকন্তু জামিনের টাকা, যে অনুপাতে কম, দায়িত্ব সেই অনুপাতে আরও গুরুতর।

সহজে বুঝিবার জন্য, আমরা পূর্ব্বলিখিত বিষয় গুলির একটী অঙ্ক-তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

ব্যাঙ্কের নাম	বাকী জমা হিসাবের তারিখ। Date of Balance sheet.	প্রাপ্ত মূলধন। Paid-up capital.	মজুত মূলধন। Reserve fund.	প্রাপ্ত ও মজুত মূলধনের সমষ্টি।	আনুক্রমণিক ব্যয়। Preliminary expenses.	খাঁটি মূলধন। Real capital.	খাটুতি মূলধন। Working capital.	সর্ব্বপ্রকার ডিপজিট।	জামিনের অনুপাত।
বোম্বাই ব্যাঙ্ক	৩১.১২.০৬	১০০০০০০০,	৯৪০০০০০,	১৯৪০০০০০,	নাই	১৯৪০০০০০,	১১৪৯১৬৭৪৮,	৯৫৫১৬৭৪৮,	৫:১
মান্দ্রাজ ব্যাঙ্ক	৩১.১২.০৬	৬০০০০০০,	৩৪০০০০০,	৯৪০০০০০,	নাই	৯৪০০০০০,	৫১০২৮৬২৩,	৪১৬২৮৬২৩,	৪ ২/৫:১
পঞ্জাবের ‘ক’ ব্যাঙ্ক	৩১.১২.০৬	৪১৭৩৪৮,	২০০০০০,	৬১৭৩৪৮,	নাই	৬১৭৩৪৮,	৫৩৩৮৯১৬,	৪৭২১৫৬৮,	৭ ৩/৫:১
বিদেশী ব্যাঙ্ক	৩১.১২.০৬	২২৫০০০০,	৪০০০০০০,	৬২৫০০০০,	নাই	৬২৫০০০০,	১২৩৬৬২৪২,	১১৭৪১২৪২,	১৮ ৪/৫:১
‘খ’ ব্যাঙ্ক	৩১.১২.০৬	১৬৮৩৪৮,	১৯০০০,	১৮৭৩৪৮,	৪০০০০,	১৪৭৩৪৮,	৪৬৯৯৭৬৯,	৪৫১২৪২১,	৩০ ৩/৫:১
‘গ’ ব্যাঙ্ক	৩০.৬.০৬	৮৭৪৪২,	২৫০০,	৮৯৯৪২,	৩৬৮৯৪,	৫৩০৪৮,	৬৭৯৩৬৪,	৫৮৯৪২২,	:১১ ১/৯ ১

এখন দেখা যাক্, যদি কোনও দুর্ব্বৎসরে, "পড়ো" (Bad debts) দেনার জন্য, পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্ককয়টি শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে লোকসান দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে বোম্বাই ব্যাঙ্কের দেনার সমষ্টি হইবে ৫৭,৪৫৮৩৭৲। এই টাকা ঐ ব্যাঙ্কের মজুত-মূলধন ৯৪,০০,০০০৲ হইতে শোধ করা যাইতে পারিবে। মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের ঐ হিসাবে দেনা হইবে—২৫৫১৪৩১৲। ঐ টাকা উক্ত ব্যাঙ্কের মজুত মূলধনের তহবিল হইতে, শোধ হইতে পারিবে।

পঞ্জাব 'ক' ব্যাঙ্কের ঐ হিসাবে দেনা হইবে ২৬৬৯৪৫৲। ঐ টাকার কতক অংশ, ২০০০০০, টাকা মজুত-মূলধন—এবং বাকী ৬৬,৯৪৫৲—প্রাপ্ত মূলধন ৪১৭৩৪৮৲ টাকা হইতে, শোধ করিতে হইবে। পঞ্জাব বিদেশী ব্যাঙ্কের দেনা হইবে, ৬১৮৩১২৲। কিন্তু আমরা উক্ত কোম্পানির "বাকী জমা" balance-sheet আলোচনা করিলে, দেখিতে পাই, তাহাদের জমা বাবদ্, নিম্নলিখিত assets অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

		টা.	আ.	পা.
বাবদ্—ব্যাঙ্কের ইমারত	...	১৪৬৪৪৪	৪	০
বন্দকী সম্পত্তির মুনফা	...	৫৭৬৩৩	১৪	৩
আসবাব, অস্থাবর ইত্যাদি	...	৬৬৩৪৯	৫	১১
ষ্টেসনারি	...	৯৭৬৫	১১	৬
রসিদ টিকিট প্রভৃতি	...	৪৪৫০	৪	৭
মোট	...	২৮৪৬৪৩	৮	৩

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, যে উক্ত ব্যাঙ্কের "প্রাপ্ত মূলধন" অপেক্ষা অধিক অর্থ, ইমারত, আসবাব, ষ্ট্যাম্প, ষ্টেস্নারী প্রভৃতিতে বদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং দেনার দায় প্রথমে ব্যাঙ্কের গচ্ছিতকারীগণের ঘাড়ে পড়ে। হইতে পারে, ঐ সকল ইমারতাদি বিক্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্য

অপেক্ষা অধিক ধনাগমের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইহাও সম্ভব—যে তাহা অপেক্ষা কমও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, লোকসানের ভাগ পরিণামে গচ্ছিতকারীগণকে বহন করিতে হইবে।

যদি 'খ' ব্যাঙ্ক তাহার খাটুতি মূলধনের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিঃ লোকসান দেয়, তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ২৩৪৯৮৮৲ টাকা লোকসানে যায়। তন্মধ্যে ১৪৭৩৪৮ টাকা খাঁটি মূলধনের (Real capital) তহবিল হইতে শোধ যাইবে। বাকী ৮৭৬৪০ টাকা গচ্ছিতকারীগণের ঘাড়ে পড়ে। এই ব্যাঙ্কের জমাখরচের "বাকী হিসাব" আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার সম্পত্তি (assets) মধ্যে

		টা.	আ.	পা.
অস্থাবর, আসবাব্ ইত্যাদি	...	২৩৯০২	২	০
মজুত ষ্টেস্‌নারী	...	১৬৬৩১	৩	৫
মোট	...	৪০৫৩৩	৫	৫

যদি উক্ত আসবাব বিক্রয় করিয়া ৪০,৫৩৩-৫-৫ না উঠে তাহা হইলে লোকসান গচ্ছিতকারীগণকে পূরণ করিতে হইবে।

ঐরূপে, 'গ' ব্যাঙ্ক খাটুতি মূলধনের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে লোকসান দিলে, সর্ব্বসমেত ৩৩৯৬৮ টাকা নষ্ট হয়। ঐ টাকা কোম্পানীর খাঁটি মূলধন ৫৩০৪৮ টাকা হইতে শোধ হইবে। ঐ কোম্পানীর Balance-sheet বাকী জমা হইতে দেখা যায়—

বাবদ——		টা.	আ.	পা.
বন্দকী ও অস্থাবর	...	২৬৪৯	১৩	০
আসবাব	...	২৪০৫	৪	৫
মজুত ষ্টেস্‌নারী	...	৩৩৭৯	৬	৮
মোট	...	৮৪৩৪	৮	১
ডিরেক্টারগণের নিকট হইতে প্রাপ্য		২৭৬৮৮	৫	১
সর্ব্ব সমেত——		৩৬১২২	৫	২

যদি এমন ঘটে, যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নির্দ্ধারিত টাকা ও ডিরেক্টারগণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা, না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, আংশিক দেনা—গচ্ছিতকারীগণের ঘাড়ে পড়ে।

সুতরাং গচ্ছিতকারীগণ বহুশ্রমার্জ্জিত অর্থ, কোনও ব্যাঙ্কে জমা দিবার পূর্ব্বে, ঐ ব্যাঙ্কের খাটতি মূলধনের প্রতি, লক্ষ্য না রাখিয়া অগ্রে জামিনের (security) প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যদি কারবারে খাটতি মূলধন—খাঁটি মূলধনের অনুপাতে, অধিক হয়, তাহা হইলে, সেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে, অতি ধীরভাবে বিচার করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যাঙ্ক উচ্চহারে সুদের প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, অথচ তাহাদের আর্থিক ভিত্তি সঙ্কীর্ণ—সে সকল হইতে দূরে থাকা শ্রেয়।

আবার কতকগুলি ব্যাঙ্ক চল্‌তি জমার বাকীর উপর সুদ দিব, বলিয়া প্রতারণা করিতে উদ্যত; তাহাদের প্রতারণাজালে ধরা দিলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা। যে ব্যাঙ্কের মূলধন অধিক, সে কখনো চল্‌তি হিসাবে সুদ দিতে উদ্যত হইবে না। কেবল যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন অল্প, তাহারাই মূলধন বৃদ্ধি করিতে এইরূপ গর্হিত পন্থা অবলম্বন করে।

কোন স্থলে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন আছে বলিয়া নহে,—কেবল আপনাদের অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই, সাধারণে ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আপনাদের উদরপূর্ত্তি করিতে চান! কেহ বা নিজের কারখানা, ও কোন যৌথ-কারবারের জন্য, সুবিধামত ঋণ গ্রহণে বিফল হইয়া,—তৎক্ষণাৎ একটী নূতন ব্যাঙ্ক খুলিয়া বসেন! ফলে, এই অল্প মূলধন ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণকে রাতারাতি ধনবান করিয়া দেয় বটে, কিন্তু ইহাতে গচ্ছিতকারীদিগকে অতি গুরুতর সঙ্কটে ফেলা হয়। এইরূপ স্বল্পপুঁজি ব্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্য দেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে—বরং

বিপদজনক। যাহা হউক, দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িতে থাকুক, কিন্তু তাহাদের প্রাপ্ত মূলধন (Paid-up capital) অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে মূলধন 'স্বীকৃত,' কিন্তু পাওয়া যায় নাই, তাহা গচ্ছিতকারীদের পক্ষে আদৌ জামিনস্বরূপ নহে, কারণ যদি ব্যাঙ্ক কোন কারণে দেউ-লিয়া হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, সেই অঙ্গীকৃত টাকা আদায় হওয়া দুর্ঘট।

বড়দিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদাসর্ব্বদা একজন লোক থাকা প্রয়োজন,—সে যেন আবশ্যক অনুসারে, খড় যোগাইয়া দেয়।

গৃহস্থ কন্যারা, মাটীর দীপ সাজাইবার সময়, যেমন তৈল এবং শলিতা দেয়, তেমনি তাহার গায়ে একটি কাটি দিয়া দেয়। প্রদীপের শিখা যখন কমিয়া আসিতে থাকে,—এই ক্ষুদ্র কাটিটির তখন বড় প্রয়োজন,—উস্কাইয়া দিতে হয়; এটি না হইলে, তৈল এবং শলিতা সত্বেও, প্রদীপের জ্বলা চলে না।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিটি, কতকটা এইরূপ। বল, বুদ্ধি, ভরসা তাহার সব আছে, তবু সে একা কোন কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে না। খানিকটা কাজ যেমন সে উৎসাহের সহিত করিতে পারে, বাকি কাজটা

সে তেমনি উৎসাহের সহিত ছাড়িয়া দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে,—তখন একজন লোকের প্রয়োজন, সে উঠাইয়া দিবে।

সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন, বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার বেশী একটা সম্পর্ক ছিল না। এই খানেই সুরেন্দ্র বিংশ বর্ষেই এম, এ পাশ করে। কতকটা তার নিজের গুণে, কতকটা তার বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময়ে বুঝিতে পারিত না, যে তাহার নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব কিছু আছে কি না! সুরেন্দ্র বলিয়া, কোন স্বতন্ত্র জীব, এ জগতে বিচরণ করে, না এই বিমাতার ইচ্ছাটি একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম্ম, শোয়া বসা, পড়াশুনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়! এই বিমাতাটি, নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও, সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না। থুতু ফেলাটি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই কর্ত্তব্য-পরায়ণা স্ত্রীলোকটির শাসনে থাকিয়া, সুরেন্দ্র, নামে লেখা পড়া শিখিল, কিন্তু আত্মনির্ভর শিখিল না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। কোন কর্ম্মই যে তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হইতে পারে, ইহা সে বুঝিত না। কখন যে তাহার কি প্রয়োজন হইবে, এবং কখন তাহাকে কি করিতে হইবে, এই কথাটির জন্য সে সম্পূর্ণরূপে আর একজনের উপর নির্ভর করিত। ঘুম পাইতেছে, কি ক্ষুধা বোধ হইতেছে, অনেক সময়, এটাও সে ঠাহর করিতে পারিত না। জ্ঞান হওয়া অবধি, তাহাকে বিমাতার উপর ভর করিয়া, এই পঞ্চদশ বর্ষ কাটাইতে হইয়াছে। বিমাতাকে, তাহার জন্য, অনেক কাজ করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশঘণ্টা, তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখবিকৃতি, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার বৎসর, পূর্ব্ব হইতেই, তাহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ রাখিবার জন্য, নিজের নিদ্রাসুখ বিসর্জ্জন; আহা

সপত্নী পুত্রের জন্য এত কে করিয়া থাকে! পাড়াপ্রতিবাসীরা এক মুখে রায়গৃহিণীর সুখ্যাতি করিয়া উঠিতে পারে না। সুরেন্দ্রের উপর তাঁহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ত্রুটি ছিল না—তিরস্কার লাঞ্ছনার পর মুহূর্ত্তে যদি তাহার চোখ মুখ ছল্‌ছল্‌ করিত, রায়গৃহিণী সেটা জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিনদিনের জন্য তাহার সাগু ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে, তাঁহার আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের অঙ্গে পরিষ্কার কিম্বা আধুনিক রুচি অনুমোদিত বস্ত্রাদি দেখিলেই, তাহার সখ এবং বাবুয়ানা করিবার গুপ্ত ইচ্ছা, তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহূর্ত্তেই, দুই তিন সপ্তাহের জন্য, সুরেন্দ্রের বস্ত্রাদি, রজক ভবনে যাওয়া নিষিদ্ধ হইত। এমনি ভাবে, সুরেন্দ্রের দিন কাটিতে ছিল। এমন স্নেহের পীড়নের মাঝে কখন কখন তাহার মনে হইত, যে এ জীবনটা বাঁচিবার মত নহে;—কখন বা সে মনে ভাবিত বুঝি এমনি করিয়া সকলের জীবনেরই প্রভাতটা অতিবাহিত হয়। কিন্তু এক এক দিন আশপাশের লোকগুলা তাহার মাথায় অন্য ধরণের কল্পনা গুঁজিয়া দিয়া যাইত। একদিন তাহাই হইল,—একজন বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিল, যে তাহার মত বুদ্ধিমান লোক, বিলাত যাইতে পারিলে, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির আশা হয়; স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া, অনেক উপকার করিতে পারে। সুরেনের কথাটা মন্দ লাগিল না। বনের পাখীর চেয়ে, পিঞ্জরের পাখীটা, বেশী ছট্‌ফট্‌ করে; সুরেন্দ্র কল্পনার চক্ষে, যেন একটু মুক্ত বায়ু, একটু স্বাধীনতার আলোক, দেখিতে পাইতেছিল, তাই তাহার পরাধীন প্রাণটা উন্মত্তের মত, প্রবলবেগে, পিঞ্জরের চতুর্দ্দিকে, ঝট্‌পট্‌ করিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে পিতাকে আসিয়া নিবেদন করিল, যে তাহার বিলাত যাইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে, এবং তৎসঙ্গে আনুসঙ্গিক যে সকল উন্নতির আশা ছিল—তাহাও কহিল। পিতা কহিলেন,

'ভাবিয়া দেখিব' ; কিন্তু গৃহিণীর অভিসন্ধি একেবারে প্রতিকূল, তিনি পিতা পুত্রের মাঝখানে, ঝড়ের মত উড়িয়া আসিয়া, এমনি অট্টহাসি হাসিলেন, যে দুই জনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল ! গৃহিণী কহিলেন, "তবে আমাকেও বিলাত পাঠাইয়া দেও—না হইলে সুরোকে সামলাইবে কে ? যে জানে না কখন কি খাইতে হয়, কখন কি পরিতে হয়, তাকে একলা বিলাত পাঠাইতেছ ? বাড়ীর ঘোড়াটাকেও, সেখানে পাঠান যা, ওকে পাঠানও তাই। ঘোড়াগরুতে বুঝতে পারে, যে তার খিদে পেয়েছে, কি ঘুম পেয়েছে—তোমার সুরো তাও পারে না"—তারপর আবার হাসি !

হাস্যের আধিক্য দর্শনে রায় মহাশয়ও বিষম লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্রনাথও মনে করিল, যে এরূপ অকাট্য যুক্তির বিপক্ষে, আর কোনরূপ প্রতিবাদ করা যায় না। বিলাত যাইবার আশা সম্প্রতি আর তাহার আদৌ নাই। তাহার বন্ধু, একথা শুনিয়া, বিশেষ দুঃখিত হইল ; কিন্তু বিলাত যাইবার, আর কোন উপায় আছে, বলিয়া দিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে কহিল, যে এরূপ পরাধীন ভাবে থাকার অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ, এবং ইহাও নিশ্চয় যে, এরূপ সম্মানের সহিত যে এম,এ, পাশ করিতে পারে—উদরান্নের জন্য তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না।

সুরেন্দ্র বাটি আসিয়া একথা ভাবিতে বসিল। যত ভাবিল, তত দেখিতে পাইল, যে বন্ধু ঠিক বলিয়াছিল—ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল। সবাই কিছু বিলাত যাইতে পারে না, কিন্তু এমন জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি হইয়াও সকলকে দিন কাটাইতে হয় না। একদিন গভীর রাত্রে, সে ষ্টেশনে আসিয়া, কলিকাতার টিকিট কিনিয়া, গাড়ীতে বসিল, এবং ডাকযোগে পিতাকে পত্র লিখিয়া দিল, যে, 'কিছুদিনের জন্য সে বাড়ী পরিত্যাগ করিতেছে ; অনর্থক অনুসন্ধান করিয়া, বিশেষ লাভ

হইবে না, এবং সন্ধান পাইলেও, যে সে বাটিতে ফিরিয়া আসিবে, এমন তাহার ইচ্ছা নাই।'

রায় মহাশয়, এ পত্র গৃহিণীকে দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, "সুরো এখন মানুষ হইয়াছে, বিদ্যা শিখিয়াছে—পাখা বাহির হইয়াছে—এখন উড়িয়া পলাইবে না ত কখন পলাইবে।"

তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিলেন—কলিকাতায় যাহারা পরিচিত ছিল, তাহাদিগকে পত্র দিলেন; কিন্তু কোন উপায় হইল না। সুরেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার জনকোলাহলপূর্ণ রাজপথে পড়িয়া, সুরেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিল। এখানে তিরস্কার করিবার জন্যও কেহ নাই, দিবানিশি শাসনে রাখিতেও কেহ চাহে না! মুখ শুকাইলেও কেহ ফিরিয়া দেখে না, মুখ ভারি হইলেও কেহ লক্ষ্য করে না! এখানে নিজেকে নিজে দেখিতে হয়। এখানে ভিক্ষাও জোটে, করুণারও স্থান আছে, আশ্রয়ও মিলে, কিন্তু আপনার চেষ্টা চাই; স্বেচ্ছায় কেহই তোমার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না।

খাইবার চেষ্টা যে আপনাকে করিতে হয়, আশ্রয়ের স্থানটুকু নিজে খুঁজিয়া লইতে হয়; কিম্বা নিদ্রা এবং ক্ষুধার মাঝে, একটু প্রভেদ আছে—এইখানে আসিয়া সে এই প্রথম শিক্ষা পাইল। কতদিন হইল, সে বাড়ী ছাড়িয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শরীরটীও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, অর্থও ফুরাইয়া আসিতেছে—বস্ত্র মলিন এবং জীর্ণ হইতে চলিল, রাত্রে শুইয়া থাকিবার স্থানটুকুর পর্য্যন্ত কোন ঠিকানা নাই—সুরেনের চক্ষে জল আসিল। বাটিতে পত্র লিখিতেও ইচ্ছা হয় না—বড় লজ্জা করে; এবং সকলের উপর যখন তাহার

বিমাতার সেই স্নেহ-কঠিন মুখখানি মনে পড়ে, তখন বাটি যাইবার ইচ্ছা একেবারে আকাশ-কুসুম হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে যে সে কখনও ছিল, একথা ভাবিতেও ভয় হয়।

একদিন, সে তাহারই মত একজন দরিদ্রকে কাছে পাইয়া, বলিল, "বাপু, তোমরা এখানে খাও কি করিয়া?" লোকটা একটু বোকা-ধরণের—না হইলে উপহাস করিত। সে বলিল, "চাকরি করে খাটিয়া খাই; কল্‌কাতায় রোজগারের ভাবনা কি?" সুরেন্দ্র বলিল, "আমাকে একটা চাকরী করিয়া দিতে পার?"

সে কহিল, "তুমি কি কাজ জান?"—সুরেন্দ্রনাথ কোন কাজই জানিত না, তাই ভাবিতে লাগিল।

"তুমি কি ভদ্রলোক?"—সুরেন্দ্র মাথা নাড়িল।

"তবে লেখাপড়া শেখনি কেন?"

"শিখেচি।" সে লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে ঐ বড় বাড়ীতে যাও। ওখানে বড়লোক জমিদার থাকে—একটা কিছু করিয়া দিবেই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ ফটকের কাছে আসিল। একবার দাঁড়াইল, আবার পিছাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল—আবার ফিরিয়া গেল। সেদিন আর কিছু হইল না। পর দিনও ঐরূপে কাটিল। দুই দিন ধরিয়া, সে ফটকের নিকট উমেদারি করিয়া, তৃতীয় দিবসে, অপেক্ষাকৃত সাহস সঞ্চয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চান?"

"বাবুকে"—

"বাবু বাড়ী নেই।" সুরেন্দ্রনাথের বুকখানা আনন্দে ফুলিয়া উঠিল—একটা নিতান্ত শক্ত কাজের হাত হইতে তাহার পরিত্রাণ হইল। বাবু বাড়ী নাই! চাকরির কথা, দুঃখের কাহিনী বলিতে হইল না,

ইহাই তাহার সুখের কারণ। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে, ফিরিয়া গিয়া, দোকানে বসিয়া, পেট ভরিয়া খাবার খাইয়া, খানিকক্ষণ খুব মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, এবং মনে মনে রীতিমত আলোচনা করিতে লাগিল, যে পরদিন কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলে, তাহার নিশ্চিত একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

পরদিন কিন্তু উৎসাহটা তেমন রহিল না। বাটীর যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তত ফিরিয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা হইতে লাগিল। ক্রমে ফটকের নিকট আসিয়া একেবারে দমিয়া পড়িল—পা আর কোন মতেই ভিতরে যাইতে চাহেনা; আজ তাহার কিছুতেই মনে হইতেছে না, যে সে নিজের কাজের জন্যই নিজে আসিয়াছে—ঠিক মনে হইতেছিল যেন জোর করিয়া আর কেহ পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দ্বারের কাছে আর উমেদারি করিবে না, তাই ভিতরে আসিল। সেই ভৃত্যটার সহিত দেখা হইল। সে বলিল, "বাবু বাড়ী আছেন, দেখা করিবেন কি?"

"হাঁ।"

"তবে চলুন।" এটা আরো কঠিন। জমিদার বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী, রীতিমত সাহেবি ধরণে সাজান আসবাব পত্র; কক্ষের পর কক্ষ, মার্‌বেল প্রস্তরের সোপানাবলী, ঝাড়-লণ্ঠন লাল কাপড়ে ঢাকা, প্রতি কক্ষে শোভা পাইতেছে, ভিত্তিসংলগ্ন প্রকাণ্ড মুকুর—কত ছবি, কত ফটোগ্রাফ্। এ সকল অপরের পক্ষে যাহাই হউক, সুরেন্দ্রের নিকট নূতন নহে; কারণ তাহার পিতার বাটিও দরিদ্রের কুটীর নহে; আর যাহাই হউক, সে দরিদ্র পিতার আশ্রয়ে এত বড় হয় নাই। সুরেন্দ্র ভাবিতেছিল,—সেই লোকটির কথা, যাহার সহিত দেখা করিতে, অনুনয় বিনয় করিতে যাইতেছে; তিনি কি প্রশ্ন করিবেন, এবং সে কি উত্তর দিবে।

কিন্তু এত ভাবিবার সময় নাই—কর্ত্তা সম্মুখে বসিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলেন—"কি প্রয়োজন ?"

আজ তিনদিন ধরিয়া, সুরেন্দ্র এই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু এখন সব ভুলিয়া গেল,—বলিল, "আমি—আমি—"

ব্রজরাজ লাহিড়ী, পূর্ব্ব-বঙ্গের জমিদার; মাথার দুই চারিগাছা চুলও পাকিয়াছিল—বাতিকে নহে, ঠিক বয়সেই পাকিয়াছিল; বড়-লোক, অনেককে দেখিয়াছিলেন—তাই চট্ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে অনেকটা বুঝিয়া লইলেন—"হাঁ বাবু কি চাও তুমি ?"

"কোন একটা—"

"কি একটা ?"

"চাকরি—।" ব্রজরাজ বাবু মৃদু হাসিয়া, বলিলেন, "আমি চাকরি দিতে পারি, এ সংবাদ তোমাকে কে দিল ?"

"পথে একজনের সহিত দেখা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, —সেই আপনার কথা—" "ভাল। তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"পশ্চিমে।"

"সেখানে কে আছে ?—" সুরেন্দ্রনাথ সব কথা বলিল।

"তোমার পিতা কি করেন ?" অবস্থাবৈগুণ্যে, সুরেন্দ্র নূতন ধাঁচ শিখিয়া ছিল—একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, "সামান্য চাকুরি করেন।"

"তাতে চলে না, তাই তুমি উপার্জ্জন করিতে চাও ?"

"হাঁ।"

"এখানে কোথায় থাক ?"

"কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—যেখানে সেখানে।"

ব্রজবাবুর দয়া হইল, তিনি কাছে বসাইয়া বলিলেন, 'তুমি এখনও বালক মাত্র, এই বয়সে বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া

দুঃখ হইতেছে। আমি নিজে, যদিও কোন চাকরি করিয়া দিতে পারিনা, কিন্তু যাহাতে কিছু যোগাড় হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।" সুরেন্দ্রনাথ, "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল দেখিয়া, ব্রজবাবু তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা করিবার নাই ?" "না"।

"তাতেই তোমার কাজ হইয়া গেল ? কি উপায় করিতে পারি, কবে করিতে পারি—কিছুই জানিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে না ?"

সুরেন্দ্র, অপ্রতিভ হইয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু সহাস্যে বলিলেন, "এখন কোথায় যাইবে ?"

"কোন একটা দোকানে।"

"সেখানেই আহার করিবে ?"

"প্রতিদিন তাহাই করি।"

"তুমি লেখা পড়া কত দূর শিখিয়াছ ?"

"কিছু শিখিয়াছি।"

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন। মনে হইতেছিল, দুঃখে এবং দারিদ্র্যে মাথার ঠিক নাই ; কেন না কাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে, এবং কি শিক্ষা দিতে হইবে, একথা না জানিয়াই অতটা আনন্দিত হওয়া, তাঁহার নিকট পাগলামি বলিয়া বোধ হইল। বলিলেন, "যদি সে বলে, আমি বি, এ, ক্লাসে পড়ি, তখন তুমি কি করিয়া পড়াইবে ?"

সুরেন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া ভাবিয়া বলিল, "তা এক রকম হইবে—"

ব্রজবাবু আর কোন কথা বলিলেন না। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "বঙ্কু এই বাবুটির থাকবার জায়গা করিয়া দাও, এবং স্নানাহারের যোগাড় দেখ।" পরে সুরেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যার পর আবার ডাকাইয়া পাঠাইব—তুমি আমার বাড়িতেই থাক। যতদিন

কোন চাকরির উপায় না হয়, ততদিন স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পারিবে।"

দ্বিপ্রহরে আহার করিতে গিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "মা একজন দুঃখী লোককে বাড়িতে স্থান দিয়াছি।—"

"কে বাবা?"

"দুঃখী লোক, এ ছাড়া আর কিছু জানি না। লেখাপড়া, বোধ হয়, কিছু জানে, কেন না তোমার দাদার কথা তাঁকে বলাতে, তাহাতেই স্বীকার করিয়া ছিল। বি, এ, ক্লাসের ছেলেকে যে পড়াইতে সাহস করিতে পারে, অন্ততঃ তোমার ছোট বোনটিকে, সে নিশ্চয় পড়াইতে পারিবে। মনে করিতেছি, প্রমীলার সেই মাষ্টার থাকুক।—"

মাধবী আপত্তি করিল না।

সন্ধ্যার পর, ডাকিয়া আনাইয়া, ব্রজবাবু তাহাই বলিয়া দিলেন। পরদিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমীলাকে পড়াইতে লাগিল।

প্রমীলার সাত বৎসর বয়স, বোধোদয় পড়ে; বড়দিদি মাধবীর নিকট ফার্ষ্ট-বুকের ভেকের গল্প পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। সে খাতাপত্র, বই, শ্লেট, পেন্সিল, ছবি, লজেঞ্জস্ প্রভৃতি আনিয়া পড়িতে বসিল। Do not move—সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া দিল—"Do not move—নড়িও না।"

প্রমীলা পড়িতে লাগিল, "Do not move—নড়িও না।"

তাহার পর, সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক হইয়া শ্লেট টানিয়া লইল—পেন্সিল হাতে করিয়া, আঁক পাড়িয়া বসিল। প্রব্লেমের পর প্রব্লেম সল্ভ্ হইতে লাগিল—ঘড়িতে সাতটার পর আটটা, তারপর নয়টা বাজিতে লাগিল; প্রমীলা কখনো এপাশ, কখন ওপাশ ফিরিয়া, ছবির পাতা উল্টাইয়া, শুইয়া, বসিয়া, লজেঞ্জেস মুখে পুরিয়া, নিরীহ ভেকের সর্ব্বাঙ্গে মসীলিপ্ত করিতে করিতে, পড়িতে লাগিল, "Do not move—নড়িও না।"

"মাষ্টার মশাই বাড়ী যাই ?"

"যাও।"

সকাল বেলাটা তাহার এইরূপই কাটে; কিন্তু দুপুরবেলার কাজটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চাকুরির যাহাতে উপায় হয়, এজন্য ব্রজবাবু অনুগ্রহ করিয়া, দুই একজন ভদ্রলোকের নামে, খান কতক পত্র দিয়া ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইগুলিকে পকেটে করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধান করিয়া, তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখে, কত বড় বাড়ী, কটা জানালা, বাহিরে কতগুলি ঘর, দ্বিতল কি ত্রিতল, সম্মুখে কোন ল্যাম্পপোষ্ট আছে কি না! তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই, ফিরিয়া আইসে। কলিকাতায় আসিয়াই, সে কতকগুলা পুস্তক ক্রয় করিয়াছিল, বাড়ি হইতেও কতকগুলা লইয়া আসিয়াছিল, এখন সেইগুলা গ্যাসের আলোকে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ব্রজবাবু কাজ-কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয় বলে, ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ চারি বৎসর হইল, ব্রজরাজ বাবুর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বুড়া বয়সের এ দুঃখ বুড়াতেই বোঝে। কিন্তু সে কথা যাউক,—তাঁহার আদরের কন্যা মাধবী দেবী, যে, এই তার ষোলবর্ষ বয়সেই স্বামী হারাইয়াছে—ইহাই ব্রজরাজের শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত শুষিয়া লইয়াছে। সাধ করিয়া, ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন—নিজের অনেক টাকা, তাই অর্থের প্রতি নজর দেন নাই, ছেলেদের বিষয় আশয় আছে কি না, খোঁজ লন নাই—শুধু দেখিয়া ছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে; রূপবান্ গুণবান্ সৎ সাধুচরিত্র—ইহাই লক্ষ্য করিয়া

হইয়াছিল, তিনবৎসর, সে স্বামীর কাছে ছিল; যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা, সবই পাইয়াছিল; কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ বাঁচিলেন না। মাধবীর এ জীবনের সব সাধ মুছিয়া দিয়া, ব্রজরাজের বক্ষে শেল হানিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মরিবার সময়, মাধবী যখন বড় কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি মৃদু কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "মাধবী, তোমাকে যে ছাড়িয়া যাইতেছি, এইটিই আমার সব চেয়ে দুঃখ। মরি, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি যে, আজীবন ক্লেশ পাইবে, এইটিই আমাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। তোমাকে যে যত্ন করিতে পাইলাম না—"। দরবিগলিত অশ্রুরাশি, যোগেন্দ্রের শীর্ণ বক্ষে বহিয়া পড়িল। মাধবী তাহা মুছিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব, তখন যত্ন করিয়ো—"যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "মাধবি, যে জীবন, তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখে সমর্পণ করিও। যার মুখ ক্লিষ্ট মলিন দেখিবে, তাহারই মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিও—আর কি বলিব মাধবি—" আবার উচ্ছ্বসিত অশ্রু বহিয়া পড়িল—মাধবী তাহা মুছাইয়া দিল।

"সৎ পথে থাকিয়ো—তোমার পুণ্যে আবার তোমাকে পাইব।"

সেই অবধি, মাধবী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার ছিল, স্বামীর চিতাভস্মের সহিত, সবগুলি, সে ইহজন্মের মত, গঙ্গার জলে উড়াইয়া দিয়াছিল। এ জীবনে কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা; বিধবা হইলে, কিছু সে সব যায় না—মাধবী তখন স্বামীর কথা ভাবে। তিনি যখন নাই, তখন আর কেন? কাহার জন্য, আর পরের হিংসা করিব, কাহার জন্য, আর পরের চক্ষে জল বহিবে! আর এ সকল হীন প্রবৃত্তি, তাহার কোন কালেই ছিল না; বড় লোকের মেয়ে—কোন সাধ, কোন আকাঙ্ক্ষাই তাহার অতৃপ্ত থাকিত না—সে হিংসা দ্বেষ শিখে নাই, কিন্তু এখন সে পরের জন্য, প্রাণটি একেবারে পাড়িয়া রাখিয়াছে।

তাহার নিজের হৃদয়ে, অনেক ফুল ফোটে, আগে সে মালা গাঁথিয়া স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া সে ফুলগাছটি কাটিয়া ফেলে নাই; এখনো তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভূয়ে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না, সত্য, কিন্তু গুচ্ছ করিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া, দীন দুঃখীকে বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই, তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই, এতটুকু মুখ ভারি করা নাই।

ব্রজবাবুর গৃহিণী, যে দিন পরলোক গমন করেন, সেই দিন হইতে এ সংসারে আর শৃঙ্খলা ছিল না। সবাই আপনাকে লইয়া, ব্যস্ত থাকিত; কেহ কাহাকে দেখিত না, কেহ কাহার পানে চাহিত না। সকলেরই, এক এক জন ভৃত্য, মোতায়েন ছিল, তাহারা, আপন আপন প্রভুর কাজ করিত। রন্ধনশালায় পাচক রন্ধন করিত, বৃহৎ অন্নসত্রের মত লোকে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাইত। কেহ খাইতে পাইত, কেহ পাইত না। কেহ সে দুঃখ চাহিয়া দেখিত না।

কিন্তু যে দিন হইতে, মাধবী, তাহার ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা লইয়া পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিল, সেই দিন হইতে সমস্ত সংসারে, নবীন বসন্ত ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন সবাই কহে, বড়দিদি, সবাই বলে, মাধবী। বাড়ীর পোষা কুকুরটা পর্য্যন্ত, দিনান্তে একবার, বড়দিদিকে দেখিতে চাহে; এত লোকের মধ্যে, সেও যেন এক জনকে, স্নেহময়ী, সর্ব্বময়ী বলিয়া বাছিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীর প্রভু হইতে সরকার, গোমস্তা, দাস, দাসী সবাই ভাবে বড়দিদির কথা, সবাই তাহার উপর নির্ভর করে; সকলেরই মনে মনে একটা ধারণা যে, যে কারণেই হউক, এই বড়দিদিটির উপর তাহার একটু বিশেষ দাবী আছে।

… দেখি নাই, কবে দেখিব তাহাও জানি না,

তাহার কথা বলিতেও পারি না; কিন্তু এই ব্রজবাবুর সংসারবর্ত্তী লোকগুলা, একটা কল্পতরু পাইয়াছিল; তলায় গিয়া, হাত পাতিত, আর হাসিমুখে ফিরিয়া আসিত।

এরূপ পরিবারের মধ্যে, সুরেন্দ্রনাথ একটা নূতন ধরণের জীবন অতিবাহিত করিবার উপায়, দেখিতে পাইল। সকলে যখন, এক জনেরই উপর, সমস্ত ভার রাখে, তখন সেও তাহাদের মত করিতে লাগিল; কিন্তু অপরের অপেক্ষা তাহার ধারণা, একটু ভিন্ন প্রকারের। সে ভাবিত, বড়দিদি বলিয়া, একটা জীবন্ত পদার্থ বাটীর মধ্যে থাকে, সকলকে দেখে, সব আবদার সহ্য করে, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা তাহারই নিকট পাওয়া যায়। কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নিজের জন্য, নিজে ভাবিবার প্রয়োজনটা, সে কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি, একেবারে ভুলিয়া গেল যে, আপনার জন্য তাহাকে বিগত জীবনের কোন একটি দিনও ভাবিতে হইয়াছিল, কিম্বা ভাবিতে হইবে!

জামা, কাপড়, জুতা, ছাতি, ছড়ি—যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই তাহার কক্ষে প্রচুর আছে; রুমালটি পর্য্যন্ত, তাহার জন্য, সযত্নে কে যেন সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে; প্রথমে কৌতূহল হইত, জিজ্ঞাসা করিত, 'এসব কোথা হইতে আসিল'? উত্তর আইসে, 'বড়দিদি পাঠাইয়া দিয়াছেন'। জলখাবারের থালাটি পর্য্যন্ত দেখিলে, সে আজকাল বুঝিতে পারে—ইহাতে বড়দিদির সযত্ন স্পর্শ ঘটিয়াছিল।

অঙ্ক কসিতে বসিয়া, এক দিন তাহার কম্পাসের কথা মনে পড়িল, —প্রমীলাকে কহিল, "প্রমীলা, বড়দিদির কাছ থেকে, কম্পাস নিয়ে এস।" কম্পাস লইয়া, বড়দিদিকে কাজ করিতে হয় না, ইহা তাহার নিকট ছিল না; কিন্তু বাজারে তখনি লোক পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যায়

প্রার্থিত বস্তু, পড়িয়া আছে। পরদিন সকালে, প্রমীলা কহিল, "মাষ্টার মশায়, কাল দিদি ঐটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তাহার পরে, মধ্যে মধ্যে, সে এমন এক আধটা জিনিস চাহিয়া বসিত, যে মাধবী, সে জন্য বিপদে পড়িয়া যাইত, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তবে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইত। কিন্তু কখন বলে নাই, 'দিতে পারিবনা,' কিম্বা কখন সে প্রফুল্ল মুখে, বিরক্তির ছায়া পড়িত না। এক দিন হঠাৎ হয়ত, প্রমীলাকে কহিল, "বড়দিদির নিকট হইতে ৫ খানা পুরাতন কাপড় লইয়া এস, ভিখারিদের দিতে হবে।" নূতন পুরাতন বাছিবার অবসর, মাধবীর সব সময় থাকিত না। সে আপনার পাঁচ খানা কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, উপরের গবাক্ষ দিয়া দেখিল—চার পাঁচজন দুঃখী লোক, কলরব করিতে করিতে, ফিরিয়া যাইতেছে—তাহারাই বস্ত্রলাভ করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের এই ছোট খাট আবেদন, অত্যাচার, নিত্যই মাধবীকে সহ্য করিতে হইত। ক্রমশঃ, এসকল এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, মাধবীর আর মনে হইত না, যে একটা নূতন জীব, তাহার সংসারে আসিয়া, তাহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মাঝখানটিতে, নূতন রকমের ছোট খাট উপদ্রব তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, এই নূতন জীবটির জন্য, মাধবীকে আজকাল খুব সতর্ক থাকিতে হয়, বড় বেশী খোঁজ লইতে হয়। সে যদি, সব জিনিস চাহিয়া লইত, তাহা হইলে মাধবীর অর্দ্ধেক পরিশ্রম কমিয়া যাইত, সে যে নিজের কোন জিনিসই চাহে না—এইটীই বড় ভাবনার কথা। প্রথমে, সে জানিতে পারে নাই, যে সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অন্যমনস্কপ্রকৃতির লোক; প্রাতঃকালে চা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সে হয়ত' খায়না; জল-খাবার হয়ত স্পর্শ করিতেও মনে থাকে না, হয়ত বা কুকুরের মুখে

রাখেন ; এ পাশে ঠেলিয়া, ও পাশে ঠেলিয়া, নীচে ফেলিয়া, সরাইয়া রাখিয়া যায় ; যেন কোন দ্রব্যই তাহার মনে ধরেনা। ভৃত্যেরা আসিয়া কহে, 'মাষ্টার বাবু পাগলা, কিছু দেখেনা, কিছু জানেনা—বই নিয়ে বসে আছে'।

ব্রজবাবু, মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, চাকরির কোনরূপ সুবিধা হইতেছে কিনা ! সুরেন্দ্র সে কথার ভাসা ভাসা উত্তর দেয়। মাধবী পিতার নিকট সে সব শুনিতে পায়, সেই কেবল বুঝিতে পারে, যে, চাকরির জন্য মাষ্টার বাবুর একতিলও উদ্যোগ নাই, ইচ্ছাও নাই ; যাহা আপাততঃ পাইয়াছে, তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট।

বেলা দশটা বাজিলেই, বড়দিদির নিকট হইতে, স্নানাহারের তাগিদ আইসে। ভাল করিয়া আহার না করিলে, বড়দিদির হইয়া প্রমীলা অনুযোগ করিয়া যায়। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত, বই লইয়া বসিয়া থাকিলে, ভৃত্যেরা গ্যাসের চাবি বন্ধ করিয়া দেয়, বারণ করিলে শুনেনা—বলে, "বড়দিদির হুকুম।"

একদিন মাধবী, পিতার কাছে হাসিয়া বলিল, "বাবা, প্রমীলা যেমন, তার মাষ্টারও ঠিক তেমনি।"

"কেন মা"

"দুজনেই ছেলে মানুষ। প্রমীলা যেমন বুঝেনা, তার কখন কি দরকার, কখন কি খাইতে হয়, কখন শুইতে হয়, কখন কি করা উচিত, তার মাষ্টারও সেইরকম, নিজের কিছুই বোঝে না—অথচ অসময়ে এমনি জিনিষ চেয়ে বসে, যে জ্ঞান হইলে, তাহা আর কেহই চাহেনা।"

ব্রজবাবু বুঝিতে পারিলেন না। মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

মাধবী হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়েটি বোঝে, কখন তার কি দরকার ?"

"তা' বোঝে না।"

"অথচ অসময়ে উৎপাত করেত?"

"তা করে।"

"মাষ্টার বাবু তাই করে—"

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিল, "ছেলেটি বোধ হয়, একটু পাগল।"

"পাগল নয়। উনি বোধ হয় বড়লোকের ছেলে।"

ব্রজবাবু বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া জানিলে?"

মাধবী জানিতনা, কিন্তু এমনি বুঝিত। সুরেন্দ্র যে, নিজের একটি কাজও, নিজে করিতে পারেনা, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, পরে করিয়া দিলে হয়, না করিয়া দিলে হয় না—এই অক্ষমতাই তাহাকে মাধবীর নিকট ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইত—এটা তাহার পূর্ব্বের অভ্যাস। বিশেষ, এই নূতন ধরণের আহার প্রণালীটি, মাধবীকে আরো চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। কোন খাদ্যদ্রব্যই, যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেনা, কিছুই সে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করেনা—কোনটির উপরেই স্পৃহা নাই, এই বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা—খাইতে দিলে খায়, না দিলে খায় না—এসকল তাহার নিকট বড় রহস্যময় বোধ হইত; একটা অজ্ঞাত করুণা চক্ষুও, সেই জন্য এই অজ্ঞাত মাষ্টার বাবুর উপর পড়িয়াছিল। সে যে লজ্জা করিয়া চাহেনা, তাহা নহে, তাহার প্রয়োজন হয় না, তাই চাহে না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কিন্তু আর সময় অসময় থাকেনা—একেবারে বড়দিদির নিকট, আবেদন আসিয়া উপস্থিত হয়। মাধবী মুখ টিপিয়া হাসে, মনে হয় এ লোকটি নিতান্ত বালকের মত সরল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা, মাধবীর বাল্যকালের সখী, তাহাকে বহুদিন পত্র লেখা হয় নাই, উত্তর না পাইয়া সে বিষম চটিয়া গিয়াছিল। আজ দ্বিপ্রহরের পর একটু সময় করিয়া, মাধবী তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল। এমন সময় প্রমীলা আসিয়া ডাকিল, "বড়দিদি।"—মাধবী মুখ তুলিয়া কহিল, "কি?"

"মাষ্টার মশায়ের চষমা কোথায় হারিয়ে গেছে—একটা চষমা দাও।

মাধবী হাসিয়া ফেলিল। "তোমার মাষ্টার মশায়কে বলগে, আমি চষমার দোকান করি?" "যাই" বলিয়া প্রমীলা ছুটিয়া যাইতেছিল। মাধবী তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল, "কোথায় যাচ্চিস?"

"ঐ কথা বল্‌তে।"

"তার চেয়ে সরকার মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।" প্রমীলা, সরকার মশায়কে ডাকিয়া আনিলে, মাধবী বলিয়া দিল—"মাষ্টার বাবু চষমা হারিয়েছে, ভাল দেখে একটা কিনে দাওগে।"

সরকার চলিয়া গেলে, সে মনোরমাকে পত্র লিখিল, শেষে লিখিয়া দিল—

"প্রমীলার জন্য, বাবা একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোট ছেলে বলিলেও হয়। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে সে কখন বাটির বাহির হয় নাই—সংসারের কিছুই জানেনা। তাহাকে না দেখিলে, না তত্ত্ব লইলে তাহার এক দণ্ডও চলেনা—আমার অর্দ্ধেক সময়, সে কাড়িয়া লইয়াছে,—তোমাদের পত্র লিখিব আর কখন? এক্ষণে যদি তোমার শীঘ্র আসা হয়, তাহা হইলে, এই অকর্ম্মণ্য লোকটিকে দেখাইয়া দিব। এমন অকেজো, অন্যমনস্ক লোক, তুমি জন্মে দেখ নাই। খাইতে দিলে খায়, না দিলে চুপ করিয়া, উপবাস করে। হয়ত সমস্ত দিনের মধ্যে, তাহার মনেও

পড়েনা যে, তাহার আহার হইয়াছে কিনা! একদিনের জন্যও, সে আপনাকে, চালাইয়া লইতে পারে না;—তাই ভাবি, এমন লোক, সংসারে বাহির হয় কেন! শুনিতে পাই তাঁর মাতাপিতা আছেন—কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁদের পাথরের মত শক্ত প্রাণ! আমিত বোধ হয়, এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না।"

মনোরমা, তামাসা করিয়া উত্তর লিখিল,—"তোমার পত্রে অন্যান্য সম্বাদের মধ্যে জানিতে পারিলাম, যে তুমি বাড়িতে, একটি বাঁদর পুষিয়াছ,—আর তুমি তার সীতা দেবী হইয়াছ। কিন্তু তবু, একটু সাবধান করিয়া দিতেছি। ইতি মনো—মা।"

পত্র পড়িয়া, মাধবীর মুখ, ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে উত্তর লিখিল—

"তোমার পোড়ামুখ, তাই কাকে কি ঠাট্টা করিতে হয়, জাননা।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রমীলা, তোমার মাষ্টার মশায়ের চষমা কেমন হয়েচে?"

প্রমীলা বলিল "বেশ।"

"কেমন করে জান্‌লে?"

"মাষ্টার মশায়, সেই চষমা চোখে দিয়ে, বেশ বই পড়েন—তাই জানলুম।"

মাধবী কহিল, "তিনি নিজে কিছু বলেননি?"

"কিছুনা।"

"একটি কথাও না? ভাল হয়েচে, কি মন্দ হয়েচে, কিছুনা?"

"না, কিছু না।"

মাধবীর সদাপ্রফুল্ল মুখ, যেন মুহূর্ত্তের জন্য মলিন বোধ হইল;—কিন্তু তখনি, হাসিয়া কহিল, "তোমার মাষ্টারকে বলে দিও, তিনি আর যেন হারিয়ে ফেলেন না।"

"আচ্ছা বলে দেব।"

"দুর পাগলি, তাকি বল্‌তে আছে! তিনি হয়ত, কিছু মনে করবেন।"

"তবে কিছুই বলব না!"

"না।"

শিবচন্দ্র, মাধবীর দাদা। মাধবী একদিন তাহাকে ধরিয়া বলিল, "দাদা প্রমীলার মাষ্টার রাতদিন কি পড়ে, জান?"

শিবচন্দ্র বি,এ, ক্লাশে পড়ে; ক্ষুদ্র প্রমীলার শিক্ষকশ্রেণীর লোকগুলা, তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই নহে। উপেক্ষা করিয়া, বলিল, "নাটক নভেল পড়ে, আর কি পড়িবে"? মাধবীর বিশ্বাস হইল না। প্রমীলাকে দিয়া, একখানা পুস্তক লুকাইয়া আনিয়া, দাদার হাতে, দিয়া বলিল, "নাটক নভেল বলে ত বোধ হয় না।"

শিবচন্দ্র, আগাগোড়া দেখিয়া, কিছু বুঝিল না, শুধু এই টুকু বুঝিল যে ইহার এক বিন্দুও, তাহার জানা নাই, এবং এখানি গণিতের পুস্তক।

ভগিনীর নিকট সম্মান হারাইতে, তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কহিল, "এটা অঙ্কের বই; স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়া হয়।" বিষণ্ণ মুখে মাধবী প্রশ্ন করিল, "কোন পাশের পড়া নয়? কলেজের বই নয়?"

শুষ্ক হইয়া শিবচন্দ্র বলিল, "না ও কিছুই নয়।" কিন্তু সেইদিন হইতে শিবচন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন সুরেন্দ্রের সম্মুখে পড়িত না। মনে মনে ভয় ছিল, পাছে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে—পাছে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং পিতার আদেশে, তাহাকে, প্রাতঃকালটা, প্রমীলার সহিত, এক সঙ্গে এই মাষ্টারটার নিকট, খাতা পেন্‌সিল লইয়া, বসিয়া থাকিতে হয়।

কিছু দিন পরে মাধবী পিতাকে কহিল, "বাবা, আমি দিনকতকের জন্য কাশী যাইব।"

ব্রজবাবু চিন্তিত হইয়া, উঠিলেন, "সে কি মা ? তুমি কাশী গেলে এ সংসারের কি হইবে ?" মাধবী হাসিয়া বলিল, "আমি আবার ত আসিব, একেবারে যাইতেছি না ত !"

মাধবী হাসিল। পিতার চক্ষে, কিন্তু জল আসিতেছিল। মাধবী বুঝিতে পারিল, এরূপ কথা বলা অন্যায় হইয়াছে। সামলাইয়া লইবার জন্য কহিল, "শুধু দিনকতকের জন্য বেড়াইয়া আসিব।"

"তা যাও—কিন্তু মা সংসার চল্‌বে না।"

"আমি ছাড়া সংসার চল্‌বে না ?"

"চল্‌বে না কেন মা, চল্‌বে ! হাল ভাঙ্গিয়া গেলে স্রোতের মুখে নৌকাখানা যেমন ক'রে চলে—এও তেমনি চল্‌বে।"

কিন্তু কাশী যাওয়া, তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। সেখানে তাহার বিধবা ননদিনী, একমাত্র পুত্র লইয়া বাস করেন ; তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে।

কাশী যাইবার দিন, সে প্রত্যেককে ডাকিয়া, সংসারের ভার দিয়া গেল। বুড়ী দাসীকে ডাকিয়া, পিতা, দাদা ও প্রমীলাকে, বিশেষরূপে দেখিবার জন্য, অনুরোধ ও উপদেশ দিয়া দিল ; কিন্তু মাষ্টারের কথা, কাহাকেও কহিল না। ভুলিয়া যায় নাই—ইচ্ছা করিয়াই বলিল না। সম্প্রতি, তাহার উপর একটু রাগ হইয়াছিল। মাধবী তাহার জন্য অনেক করিয়াছে—কিন্তু কখন সে একটা মুখের কথাতেও কৃতজ্ঞতা জানায় নাই। তাই মাধবী, বিদেশে গিয়া, এই অকর্ম্মণ্য সংসারানভিজ্ঞ উদাসীনটিকে, জানাইতে চাহে, যে সে একজন ছিল। একটা কৌতুক করিতে দোষ কি ? সে না থাকিলে ইহার কেমন ভাবে দিন কাটে, দেখি, হানি কি ? তাই সে সুরেন্দ্রের সম্বন্ধে, কিছুই বলিয়া গেল না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রব্লেম্ সল্‌ভ্ করিতেছিল। প্রমীলা কহিল, "কাল রাত্রে, দিদি কাশী গিয়াছেন।" কথাটা, তাহার কাণে গেল না ; কিন্তু

দিন দুই তিন পরে, যখন সে দেখিতে পাইল, দশটার সময় আহারের জন্য আর পীড়াপীড়ি হয় না,—কোন দিন বা একটা দুটা বাজিয়া যায়; স্নানান্তে কাপড় ছাড়িতে গিয়া, বোধ হয়, সেগুলি আর তেমন পরিষ্কার নাই, জলখাবারের থালাটা তেমন সযত্নসজ্জিত নহে; রাত্রে গ্যাসের চাবি, কেহ বন্ধ করিতে আইসে না, পড়ার ঝোঁকে দুইটা তিনটা বাজিয়া যায়; প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না, উঠিতে বেলা হয়, সমস্ত দিন চোখের পাতা ছাড়িয়া ঘুম কিছুতেই যাইতে চাহে না; শরীর যেন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, এ সংসারে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গরম বোধ হইলে, তবে লোকে পাখার সন্ধান করে। সুরেন্দ্রনাথ, পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া, কহিল,—

"প্রমীলা, বড়দিদি এখানে নাই, না?"

সে বলিল, "দিদি কাশী গিয়াছেন।"

"তাইত!"

দিন দুই পরে, হঠাৎ প্রমীলার পানে, চাহিয়া কহিল, "বড়দিদি কবে আসিবেন?"

"একমাস পরে।"

সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকে মনোযোগ করিল। আরও চার পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ, পেন্সিলটা পুস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, "প্রমীলা, এক মাসের আর কত বাকি?" "অনেক দিন।" পেন্সিল তুলিয়া লইয়া, সুরেন্দ্র চসমা খুলিয়া, কাচ দুইটা পরিষ্কার করিল। তাহার পর চক্ষে দিয়া, পুস্তকের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন কহিল, "প্রমীলা, বড়দিদিকে তুমি চিঠি লেখনা?"

"লিখি বইকি!"

"তাড়াতাড়ি আস্‌তে লেখনি?"

"না।" সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে বলিল, —"তাইত।"

প্রমীলা বলিল, "মাষ্টারমশায়, বড়দিদি এলে বেশ হয়, না ?"

"বেশ হয়।"

"আসতে লিখে দোবো ?"

সুরেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "দাও।"

"আপনার কথা লিখে দোবো ?"

"দাও।"

'দাও' বলিতে, তাহার কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইল না। কেননা, জগতের কোন আদব কায়দা সে জানিত না। বড়দিদিকে আসিবার জন্য অনুরোধ করা, যে তাহার মানায় না, ভাল শুনিতে হয় না, এটা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। যে না থাকিলে, তাহার বড় ক্লেশ হয়, যাহার অবর্ত্তমানে তাহার চলিতেছে না,—তাহাকে আসিতে বলা সে নিতান্তই সঙ্গত মনে করিল।

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে সাধারণ মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মিলা চলে না। সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিশ খায় না। কৌতূহলী হওয়া, সুরেন্দ্রের স্বভাব নহে; যতটা তাহার প্রয়োজন, ততটাই সে জানিতে চাহে, তাহার বাহিরে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক পদও যাইতে তাহার ইচ্ছা হইত না; সময়ও পাইত না। তাই, বড়দিদির সম্বন্ধে, সে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। এতদিন, এ সংসারে, তাহার অতিবাহিত হইল, এই তিন মাস ধরিয়া, সে বড়দিদির উপর ভর দিয়া, পরম আরামে কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই, এই জীবটি কেমন! কত বড়, কত বয়স, কেমন দেখিতে, কত গুণ, কিছুই সে জানিত না;

জানিবার বাসনা হয় নাই। একবার মনেও পড়ে নাই। ইহার সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ত লোকের সাধ হয়।

সবাই কহে বড়দিদি, সেও কহে বড়দিদি! সবাই তাহার নিকটে স্নেহ যত্ন পায়, সেও পায়; বিশ্বের ভাণ্ডার তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, যে চাহে সে পায়—সুরেন্দ্রও লইয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা আর কি? মেঘের কাজ, জল বরিষণ করা, বড়দিদির কাজ স্নেহ যত্ন করা। যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন যে হাত পাতে, সেই জল পায়;—বড়দিদির নিকট হাত পাতিলে অভীষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়। মেঘের মতই বুঝি সে অন্ধ, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন! মোটের উপর সে এমনি একটা ধারণা করিয়া রখিয়াছিল। আসিয়া অবধি সে যে ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছিল—আজও তাহাই আছে, শুধু এই কাশী গমন ঘটনাটির পর হইতে এইটুকু বেশী জানিয়াছে, যে এই বড়দিদিটি ভিন্ন তাহার এক দণ্ডও চলিতে পারে না।

সে যখন বাড়ীতে ছিল, তখন পিতাকে জানিত, বিমাতাকে জানিত। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিত, কিন্তু বড়দিদি বলিয়া কাহারো সহিত পরিচয় হয় নাই—যখন পরিচয় হইয়াছে তখন সে এমনিই বুঝিয়াছে। কিন্তু মানুষটিকে সে চিনেনা, জানেনা, শুধু নামটি জানে, নামটি চিনে, লোকটি তাহার কেহ নহে। নামটি সর্ব্বস্ব!

লোকে যেমন ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায় না, শুধু নামটি শিখিয়া রাখে, দুঃখে কষ্টে সেই নামটির সম্মুখে সমস্ত হৃদয় মুক্ত করে, নতজানু হইয়া করুণাভিক্ষা চাহে, চক্ষে জল আসে, মুছিয়া ফেলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে কাহাকে যেন দেখিতে চাহে—কিছুই দেখা যায় না; অস্পষ্ট জিহ্বা শুধু দুটি কথা অস্ফুটে উচ্চারণ করিয়া থামিয়া যায়। দুঃখ পাইয়া তাই সুরেন্দ্রনাথ অস্ফুটে উচ্চারণ করিল,—"বড়দিদি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই, পূর্ব্বদিক রঞ্জিত হইয়াছিল মাত্র! প্রমীলা আসিয়া নিদ্রিত সুরেন্দ্রনাথের গলা জড়াইয়া ধরিল,—"মাষ্টার মশায়।" সুরেন্দ্রনাথের অলস চক্ষু দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত হইল,—"কি প্রমীলা?"

"বড় দিদি এসেছেন।" সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বসিল; প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, "চল দেখে আসি।"

এই দেখিবার বাসনাটি, তাহার মনে কেমন করিয়া উদয় হইল, বলা যায় না, এবং এতদিন পরে কেন সে যে প্রমীলার হাত ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিল, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু সে ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। মাধবীর কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দুই জনেই ডাকিল— "বড়দিদি!"

বড়দিদি অন্যমনস্ক হইয়া কি একটা কাজ করিতেছিল, কহিল, "কি দিদি?"

"মাষ্টার মশাই—"

দুইজনে ততক্ষণে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, মাধবী শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। মাথার উপরে একহাত কাপড় টানিয়া, একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্রনাথ কহিতেছিল, "বড়দিদি তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে—" মাধবী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, বিষম লজ্জায় জিভ্ কাটিয়া মনে মনে বলিল, "ছি ছি!"

"তুমি চ'লে গেলে—"

মাধবী মনে মনে বলিল—"কি লজ্জা!"

"আমার বড় কষ্ট হয়ে ছিল।"

মাধবী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "প্রমীলা, মাষ্টারমহাশয়কে বাহিরে যাইতে বল।"

প্রমীলা ছোট হইলেও, তাহার দিদির আচরণ দেখিয়া বুঝিতেছিল, যে কাজটা ঠিক হয় নাই। বলিল, "চলুন মাষ্টারমশায়—"

অপ্রতিভের মত, কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "চল।" বেশী কথা কহিতে সে জানিত না, বেশী কথা বলিতে সে চায় নাই, তবে সারাদিন, মেঘের পর সূর্য্য উঠিলে, হঠাৎ যেমন লোকে সে দিকে চাহিতে যায়, ক্ষণকালের জন্য যেমন মনে থাকে না যে সূর্য্যের পানে চাহিতে নাই, কিম্বা চাহিলে চক্ষু পীড়িত হয়, তেমনি এই এক মাস মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে থাকিয়া প্রথম সূর্য্যোদয়ের সহিত, সুরেন্দ্রনাথ পরম আহ্লাদে চাহিয়া দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ফল যে এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সে জানিত না। সেই দিন হইতে তাহার যত্নটা একটু কমিয়া আসিল; মাধবীর একটু যেন লজ্জা করিত। বিন্দু দাসী নাকি কথাটা লইয়া একটু হাসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথও একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল; আজকাল সে যেন দেখিতে পায়, তাহার বড়দিদির অসীম ভাণ্ডার সসীম হইয়াছে! ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার আর গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।

একদিন সে প্রমীলাকে কহিল, "বড়দিদি আমার উপর রাগ করেচেন, না?" প্রমীলা বলিল, "হঁা।"

"কেন রে?"

"আপনি অমন ক'রে বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেন কেন?"

"যেতে নেই, না?"

"তা কি যেতে হয়? দিদি খুব রাগ করেছে।"

সুরেন্দ্র পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া বলিল, "তাইত—"।

তার পর একদিন দুপুরবেলা মেঘ করিয়া বড় জল আসিল। ব্রজরাজ বাবু আজ দুইদিন হইল বাড়ী নাই; জমীদারী দেখিতে গিয়াছিলেন। মাধবীর হাতে কিছু কাজ ছিল না; প্রমীলাও বড় উপদ্রব করিতে ছিল, মাধবী তাহাকে ধরিয়া কহিল—"প্রমীলা তোর বই নিয়ে আয়, দেখি কত পড়েচিস্।"

প্রমীলা একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মাধবী বলিল, "নিয়ে আয়।"

"বড়দিদি, রাত্তিরে আন্‌ব—"

"না এখনি আন্।" নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে তখন সে বই আনিতে গেল। আনিয়া বলিল, "মাষ্টারমশাই কিছুই পড়ায়নি—খালি আপনি পড়ে।" মাধবী জিজ্ঞাসা করিতে বসিল। আগাগোড়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল, যে সত্যই মাষ্টারমহাশয় কিছুই পড়ান নাই; অধিকন্তু সে যাহা শিখিয়াছিল, শিক্ষক নিযুক্ত করার পর, এই তিন চারি মাস ধরিয়া, বেশ ধীরে ধীরে, সবটুকু, ভুলিয়া গিয়াছে। মাধবী বিরক্ত হইয়া বিন্দুকে ডাকিয়া কহিল, "বিন্দু, মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে আয়ত, কেন প্রমীলাকে এতদিন একটুও পড়াননি।"

বিন্দু যখন জিজ্ঞাসা করিতে গেল, মাষ্টার তখন "প্রব্‌লেম্" ভাবিতে ছিল। বিন্দু কহিল, "মাষ্টারমশায়, বড়দিদি বলচেন, যে আপনি ছোটদিদিকে কিছু পড়াননি কেন?" মাষ্টারমহাশয় শুনিতে পাইল না। এবার বিন্দু জোরে বলিল, "মাষ্টারমশায়।"

"কি?"

"বড়দিদি বলচেন,"

"হুঁ"

"ছোটদিদিকে পড়াননি কেন?" অন্যমনস্ক হইয়া সে জবাব দিল,

জানাইল। মাধবীর রাগ হইল, সে নীচে আসিয়া দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া বিন্দুকে দিয়া বলাইল, "ছোটদিদিকে একেবারে পড়াননি কেন?" কথাটা বার দুই তিন জিজ্ঞাসা করার পরে, সুরেন্দ্রনাথ কহিল, "আমি পারব না।"

মাধবী ভাবিল, এ কেমন কথা!

বিন্দু বলিল, "তবে আপনি কি জন্য আছেন?"

"না থাক্‌লে কোথা যাব?"

"তবে পড়ান্ না কেন?"

সুরেন্দ্রনাথের এবার চৈতন্য হইল। ফিরিয়া বসিয়া কহিল, "কি বল্‌চ?" বিন্দু এতক্ষণ ধরিয়া কি কহিতেছিল, তাহাই আবার আবৃত্তি করিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন কহিল "সে ত রোজ পড়ে!"

"পড়ে, কিন্তু আপনি দেখেন কি?"

"না। আমার সময় হয় না।"

"তবে এ বাড়ীতে কেন আছেন?" সুরেন্দ্র চুপ করিয়া তাহা ভাবিতে লাগিল।

"আপনি আর পড়াতে পারবেন না?"

"না। আমার পড়াতে ভাল লাগে না।"

মাধবী ভিতর হইতে কহিল, "জিজ্ঞাসা কর, বিন্দু কেন এতদিন তবে মিছা কথা বলে এখানে আছেন?" বিন্দু তাহাই কহিল। শুনিয়া সুরেন্দ্রের "প্রবলেমের" জাল একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল; একটু দুঃখিত হইল, একটু ভাবিয়া বলিল, "তাইত, বড় ভুল হয়েচে।"

"এই চার মাস ধ'রে ক্রমাগত ভুল?"

"হাঁ, তাইত হয়েচে দেখচি,—ত কথাটা আমার তত মনে ছিল না।"

পরদিন প্রমীলা পড়িতে আসিল না। সুরেন্দ্রেরও তত মনে হইল না। তাহার পর দিনও আসিল না—সে দিনও অমনি গেল।

তৃতীয় দিবস প্রমীলাকে না দেখিতে পাইয়া, সুরেন্দ্রনাথ একজন ভৃত্যকে কহিল,—"প্রমীলাকে ডেকে আন।"

ভৃত্য ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ছোটদিদি আর আপনার কাছে পড়বেন না।"

"কার কাছে তবে পড়বে ?"

ভৃত্য বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল, "অন্য মাষ্টার আসবে।"

বেলা তখন নয়টা বাজিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া দুই তিন খানা বই বগলে চাপিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। চসমাটা খাপে পুরিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল ; তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ভৃত্য কহিল, "মাষ্টারবাবু এ সময়ে কোথায় যাচ্চেন ?"

"বড়দিদিকে বলে দিও, আমি চলে যাচ্চি।"

"আর আসবেন না ?"

সুরেন্দ্রনাথ একথা শুনিতে পাইল না। বিনা উত্তরে ফটকের বাহিরে আসিয়া পড়িল। বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তথাপি সুরেন্দ্রনাথ ফিরিল না। ভৃত্য তখন মাধবীকে সম্বাদ দিল, "মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন।

"কোথায় গিয়াছেন ?"

"তা জানি না। বেলা নয়টার সময় চলিয়া যান ; যাইবার সময় আমাকে বলিয়া যান, যে বড়দিদিকে বলো আমি চলে যাচ্চি।"

"সে কিরে ! না খাইয়া চলিয়া গেলেন ?" মাধবী উদ্বিগ্ন হইল।

তাহার পর সে নিজে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে আসিয়া দেখিল—সব জিনিষপত্রই তেমনি আছে, টেবিলের উপর চসমাটি খাপে মোড়া রাখা আছে, শুধু বই কয়খানি নাই।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল,—সুরেন্দ্র আসিল না। পরদিন মাধবী

দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া, কহিয়া দিল, "তোমরা অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া আনিলে দশ টাকা পুরস্কার পাইবে।" পুরস্কারের লোভে তাহারা ছুটিল ; কিন্তু সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিল, কহিল, যে কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রমীলা কাঁদিয়া কহিল, "বড়দিদি তিনি চলে গেলেন কেন ?"

মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল "বাহিরে যা, কাঁদিসনে।"

দুই দিন, তিন দিন করিয়া যত দিন যাইতে লাগিল, মাধবী তত অধিক উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বিন্দু কহিল, "বড়দিদি তা এত খোঁজা-খুঁজি কেন ? কল্‌কাতা সহরে আর কি মাষ্টার পাওয়া যায় না ?"

মাধবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"তুই দূর হ—একটা মানুষ একটি পয়সা হাতে না নিয়ে চলে গেল, আর তুই বলিস্ খোঁজা খুঁজি কেন ?"

"তার কাছে একটিও পয়সা নেই, তা কি ক'রে জান্‌লে ?"

"তা আমি জানি, কিন্তু তোর অত কথায় কাজ কি ?" বিন্দু চুপ করিয়া গেল। ক্রমে যখন সাত দিন কাটিয়া গেল, অথচ কেহ ফিরিয়া আসিল না, তখন মাধবী একরূপ অন্ন জল ত্যাগ করিল। তাহার মনে হইত সুরেন্দ্রনাথ অনাহারে আছে। যে বাড়ীর জিনিষ চাহিয়া খাইতে পারে না, পরের কাছে কি সে চাহিতে পারে ? তাহার দৃঢ় ধারণা, সুরেন্দ্রনাথের কিনিয়া খাইবার পয়সা নাই, ভিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই, ছোট ছেলের মত অসহায় অবস্থায় হয়ত বা কোন ফুটপাথে বসিয়া কাঁদিতেছে, না হয় কোন গাছের তলায় বই মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া আছে।

ব্রজরাজ বাবু ফিরিয়া আসিয়া সব কথা শুনিয়া মাধবীকে কহিলেন, "কাজটা ভাল হয় নাই মা।" মাধবী কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিন দিন অনাহারে কাটিল ; কলের জলে পয়সা লাগে না, তাই ক্ষুধা পাইলে ... জল খাইত।

একদিন রাত্রে অবসন্ন শরীরে সে কালীঘাটে যাইতেছিল, কোথায় নাকি শুনিয়াছিল সেখানে খাইতে পাওয়া যায়। অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আবার মেঘ করিয়াছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে একখানা গাড়ী তাহার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ান্ কোনরূপে অশ্বের বেগ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্র প্রাণে মরিল না বটে, কিন্তু বক্ষে ও পার্শ্বে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল; পুলিশ আসিয়া গাড়ী করিয়া, হাঁসপাতালে লইয়া গেল। চার পাঁচ দিন অজ্ঞান অবস্থায় অতীত হইবার পর, রাত্রে চক্ষু চাহিয়া কহিল, "বড়দিদি!"

কলেজের একজন ছাত্র, যে সে রাত্রে ডিউটিতে ছিল, শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেন্দ্র কহিল, "বড়দিদি এসেচেন?"

"কাল সকালে আসিবেন।"

পরদিন সুরেন্দ্রের বেশ জ্ঞান রহিল, কিন্তু বড়দিদির কথা কহিল না; প্রবল জ্বরে সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিয়া সন্ধ্যার সময় একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি হস্‌পিটালে আছি?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"আপনি গাড়ী চাপা পড়িয়াছিলেন।"

"বাঁচিবার আশা আছে?"

"নিশ্চয়।"

পরদিন সেই ছাত্রটি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আত্মীয় কেহ এখানে আছেন?"

"কেহ না।"

"তবে সে রাত্রে "বড়দিদি" বলিয়া ডাকিতে ছিলেন কাহাকে? তিনি কি এখানে আছেন?"

"আছেন, কিন্তু তিনি আসিতে পারিবেন না। আমার পিতাকে সম্বাদ দিতে পারেন ?"

"পারি।"

সুরেন্দ্রনাথ পিতার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেই ছাত্রটি সেইদিন পত্র লিখিয়া দিল। তাহার পর বড়দিদির সন্ধান লইবার জন্য, জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে আসিতে পারে, আমরা সে বন্দোবস্ত করিতে পারি। আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঠিকানা জানিতে পারিলে, তাঁহাকেও সংবাদ দিতে পারি।—"

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, ব্রজরাজ বাবুর ঠিকানা কহিয়া দিল।

"আমার বাসা ব্রজবাবুর বাড়ীর নিকটেই, আজ তাঁহাকে আপনার অবস্থা কহিয়া দিব। যদি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখিতে আসিতে পারেন।"

সুরেন্দ্র কথা কহিল না। মনে মনে বুঝিয়াছিল—বড়দিদির আসা অসম্ভব। ছাত্রটি কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া, ব্রজবাবুকে সম্বাদ দিল। ব্রজবাবু চমকিত হইলেন, "বাঁচিবে ত ?"

"সম্পূর্ণ আশা আছে।"

বাড়ীর ভিতরে গিয়া, কন্যাকে কহিলেন, "মাধবী, যা ভাবিয়াছিলাম তাই হইয়াছে! সুরেন গাড়ীচাপা পড়িয়া হাঁসপাতালে আছে।"

মাধবীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। "তোমার নাম করিয়া নাকি "বড়দিদি" বলিয়া ডাকিতেছিল। তুমি দেখিতে যাইবে ?" এই সময় পার্শ্বের কক্ষে প্রমীলা ঝন্ ঝন্ করিয়া কি সব, ফেলিয়া দিল। মাধবী সেই দিকে ছুটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আপনি দেখিয়া আসুন, আমি যাইতে

ব্রজবাবু দুঃখিত ভাবে, ঈষৎ হাসিয়া, বলিলেন, "সে বনের পশু—তার উপরে কি রাগ করে?"

মাধবী কথা কহিল না। তখন ব্রজবাবু একাকী সুরেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, কহিলেন, "সুরেন, তোমার পিতা মাতাকে সংবাদ দিলে হয় না?"

"সম্বাদ দিয়াছি।"

"কোন ভয় নাই। তাঁরা আসিলেই একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ব্রজবাবু টাকা কড়ির কথা চিন্তা করিয়া কহিলেন, "বরং আমাকে তাঁহাদের ঠিকানা বলিয়া দাও, যাহাতে তাঁহাদের এখানে আসার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, করিয়া দিব।"

সুরেন্দ্র কথাটা তেমন বুঝিল না। বলিল, "বাবা আসিবেন, অসুবিধা আর কি আছে?"

"তবু"

"কিছু না। তিনি নিশ্চয় আসিবেন।"

ব্রজবাবু বাটি ফিরিয়া মাধবীকে সমস্ত সম্বাদ জ্ঞাত করাইলেন।

সেই অবধি নিত্য তিনি একবার করিয়া সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতেন। তাহার উপর একটা স্নেহ জন্মিয়া ছিল। একদিন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মাধবী, তুমি ঠিক্ বুঝিয়াছিলে, সুরেনের পিতা বেশ অর্থবান্ লোক।"

মাধবী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া জানিলেন?"

"তাহার পিতা একজন বড় উকিল; কাল রাত্রে তিনি আসিয়াছেন।"

"হুঁ"

"সুরেন বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল"

"কেন?"

"তাহার পিতার সহিত আজ আলাপ হইল। তিনি সে কথা সমস্ত বলিলেন। এই বৎসর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের সহিত সুরেন এম, এ, পাশ করিলে, বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া, তাহার পিতা সাহস করিয়া পাঠাইতে চাহেন নাই; তাই রাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। সে ভাল হইলে, তিনি বাটি লইয়া যাইবেন।"

নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া, মাধবী বলিল, "তাই ভাল।"

(ক্রমশঃ।)

পল্লীর একাল ও সেকাল।

কোন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত, একবার কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে ইংরাজ শাসনাধীনে আমাদের একটা পরম লাভ হইয়াছে—আমাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ক্রমশঃই ঘুচিয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি উল্লেখ করেন, যে তাঁহার পিতামহ হয়ত তাঁহার নিজের দেশটি, ও তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর দেশটি লইয়া, সন্তুষ্ট থাকিতেন; তাঁহার পিতা সমগ্র বাঙ্গলাদেশের সুখ দুঃখের সম্বাদ লইতেন; কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতগণ, সমুদয় ভারতবর্ষের তত্ত্ব লওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য, মনে করেন। আজ যদি সুদূর পাঞ্জাবে একটা অত্যাচার হয়, বাঙ্গালীর হৃদয়ে সে আঘাত আসিয়া লাগে; বোম্বে, মান্দ্রাজ সর্ব্বত্রই তাহার একটা প্রতিধ্বনি উঠিয়া থাকে। এইরূপে আমরা এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে শিখিতেছি। আগে কি এই-রূপ হইত? কোথায় পাঞ্জাব, কোথায় বঙ্গদেশ—কোথায় বা বোম্বে,

কথাটি, গম্ভীরভাবে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং এ বিষয়ে, আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। কেবল যে তাঁহার এই কথাটি লইয়া চিন্তা করিয়াছি, তাহা নহে, সাধারণ ভাবে পল্লীর কথা চিন্তা করিয়াছি। সত্য বটে, এ কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়, সমুদয় ভারতবর্ষের সম্বাদ রাখেন, কিন্তু সেকালের লোকেদের স্বপক্ষে বলিবার, কি কিছুই নাই? অবশ্য, সেকালের লোকেরা যে হৃদয়হীন ছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

সেকালের লোকেরা, আপন আপন পল্লীর সুখ দুঃখ লইয়া, সন্তুষ্ট থাকিতেন; কারণ বাহিরের সংবাদ লইবার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল এবং তাহার বিশেষ প্রয়োজনও বোধ হইত না। কিন্তু আজ কাল রেলরোডের বিস্তারে, ইংরাজের আইনে, সংবাদ পত্রাদির প্রচারে ও ইংরাজী শিক্ষায় সে প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে, এবং পূর্ব্বকার অসুবিধাগুলিও ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

আর একটা কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার যোগ্য। এখন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই, সমুদয় ভারতবর্ষের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, এবং কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন। এক ভাষা প্রচলন, এক জাতি গঠন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক বন্ধন স্থাপন প্রভৃতি উৎকট উৎকট দুরূহ চিন্তায় তাঁহারা এতদূর ব্যাপৃত থাকেন, যে সামান্য পল্লীর উন্নতিকল্পে মনঃসংযোগ করিবার জন্য, তাঁহাদের তিলমাত্র অবকাশ নাই। পূর্ব্বে লোকে ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে শিখে নাই, সে কথা যথার্থ বটে; কিন্তু পল্লীকে যে আন্তরিক ভালবাসিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, এক্ষণে পল্লীর প্রতি অনাস্থা বা অনাদরের অবধি নাই, এবং তজ্জন্যই সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি যে অনুরাগ, তাহার গভীরতা বা স্বাভাবিকতার উপর স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়; এবং

মানবহৃদয়ে এরূপ আশঙ্কা উদিত হওয়া যে স্বাভাবিক, তাহা বুঝিবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট আলোচনা করিবার আবশ্যক হয় না।

আজকাল, বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃতির চিরপ্রিয় নিত্যলীলাস্থল, অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যপূর্ণ পল্লী আজ কাল অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। উৎসব ও আনন্দে মুখরিত পল্লী, আজ নীরব, উৎসাহ-ম্লান ও তেজহীন! চারিদিকেই যেন অবসাদের ভাব, নিরাশার ছায়া, বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি! পল্লীলক্ষ্মী যেন পল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন!

আজকাল পল্লীগ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রায় সকল দিকেই অবনতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল সুফলের মধ্যে, জমীদারে জমীদারে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব, পরিমাণে, হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার প্রধান কারণ জমীদারেরা এখন পল্লীগ্রামে থাকিতে ভালবাসেন না; তাঁহারা অধিকাংশ সময়, কলিকাতায়, কখন কখন বা পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে, অবস্থান করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অধিকাংশ কর্ম্ম উপলক্ষে নগরে বাস করেন। ফলে অবশিষ্ট সামর্থ্যহীন দরিদ্র ভদ্রলোক ও ইতর জাতি লইয়াই আধুনিক পল্লী। আবার যাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, পল্লীগ্রাম তাঁহাদের আর সহ্য হয় না। না হইবারই কথা, কেননা এক্ষণে পল্লী ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি, পানীয় জলের একান্ত অভাব, লোকবিরলতা হেতু প্রাচীন গ্রামগুলি, ক্রমশঃই নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া, সরীসৃপ ও বন্য পশুর যোগ্য বাসস্থান হইয়া পড়িতেছে, পাতা পচিয়া ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকায়, বায়ুও দূষিত হইতেছে, খাদ্যাদিও ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হইতেছে; সুতরাং আধুনিক পল্লীগুলি যে রোগের আবাসভূমি ও সর্ব্ববিষয়ে হীনতা প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

পূর্ব্বে যে জমীদারে জমীদারে প্রতিদ্বন্দীর ভাব ছিল বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এক হিসাবে দোষের হইলেও অন্যদিকে বিবেচনা করিলে, ইহার মধ্যেও সুফল দেখা যাইত। প্রতিদ্বন্দী না থাকিলে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নহে। প্রতিদ্বন্দিতা না থাকিলে মানুষের ভাল করিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি হইত না, উদ্যম বাড়িত না, নিশ্চেষ্টতা ও অসাড়তা মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিত। এইরূপ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়াই কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি শিক্ষ সর্ব্ববিভাগেই নুতন নুতন আবিষ্কার হইতেছে, ও মানব সমাজের অশেষবিধ উন্নতির পথ প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু তখনকার জমীদারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতাভাব কখন কখন সামান্য কারণে দেখা যাইত, ইহাই নিন্দনীয়। তখন এক এক জমীদারের গৃহে পাইক-বরকন্দাজ, ঢালী, সড়কিওয়ালা, তলোয়ার খেলোয়াড় ও পালোয়ান প্রভৃতির অভাব ছিল না। এক্ষণে ইংরাজের কঠোর আইনে, জমিদারের ক্ষমতা ক্রমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং বিশালবপু বলবান ঢালী প্রভৃতিকে, আজকাল সুরকি ভাঙ্গিয়া বা রাস্তা বাঁধিয়া দিন-গুজরাণ করিতে হয়।

বিবাদ বিসম্বাদ পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। মানুষ আদর্শ চরিত্র হইতে না পারিলে, চিরশান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তখন জমীদারের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও, বিপদ আপদের সময়, তাঁহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না—তখন শত্রুতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, গুরু পুরোহিত ও অন্যান্য গুণী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদরের অভাব ছিল না। জমীদার তাঁহাদের অভাব পরিপূর্ণ করিতেন, সাধারণেও তাঁহাদিগকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখিত। কিন্তু আজকাল আর সে ভাব নাই—জমীদারই বা কোথায়? আর

থাকিলেও তাঁহাদের আর সে প্রবৃত্তি নাই। অন্যদিকে অন্নচিন্তায় কাতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লোভ বাড়িয়াছে, আতপতণ্ডুল, কদলী, নৈবেদ্য ও বস্ত্রাদির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি। এখনকার লোকেরা তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, তাঁহারাও আপনাদের প্রাপ্য পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দুপক্ষের এইরূপ দর কসাকসির পর একটা রফা হয়; মীমাংসার পর দেখা যায় গৃহস্থ বা পুরোহিত উভয়েরই চিত্ত অপ্রসন্ন।

পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা বা একনিষ্ঠ ভক্তির ভাব ছিল, তাহা আজকাল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন বলিয়া নহে, বয়স্কমাত্রেরই প্রতি তখন একটা সম্ভ্রমের ভাব দেখা যাইত। এমন কি উপরিস্থ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের উপর নানারূপ প্রভুত্ব দেখাইতেন। তাহারাও তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া আপনাদিকে ধন্য মনে করিত।

আজকাল পলিতকেশ বৃদ্ধও যদি কোন নব্যশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবককে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন না করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। যাঁহারা কিছু অতিরিক্ত শিক্ষিত, তাঁহারা ঐরূপ স্থলে শিষ্টাচারের অনভিজ্ঞতার জন্য কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে কালক্ষেপ করেন না। আবার অন্যদিকে আমরা এতদূর উদারমতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছি, যে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে নমস্কার করিয়া থাকি; অবশ্য এরূপস্থলে নমস্কার, হয় কোন বিশেষ গুণের মর্য্যাদা-পরিজ্ঞাপক বা সুহৃদভাবের পরিচায়ক। কিন্তু একদিকে উদার হইলে কি হইবে, অন্যদিকের চিত্র দেখুন। গুরু পুরোহিত, বা পল্লীস্থ সেকেলে বৃদ্ধ কোন আত্মীয় যদি উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা, আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে,—পদধূলি গ্রহণ করা প্রাণান্তকর ব্যাপার!

এখনও বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের আদেশে বা ভয়ে, এ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যে হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি ?

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পর, পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও সঞ্জয় প্রভৃতিকে, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। কেহ ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন,—কেহ বা রাজপরিচর্য্যা, কেহ বা রত্নাদির ভার লইলেন, কেহ বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলেই এক একটা বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন ; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসন্তানের মধ্যে, বোধ হয়, কাহারও অজ্ঞাত নহে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম কার্য্যের ভার স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তখনকার পল্লীবালকের দল, গুরুজনদিগকে যথেষ্ট ভয় ও সম্ভ্রম করিত সত্য বটে, কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্যেরও সীমা ছিল না। তাহারা ক্ষুদ্র পল্লীখানি মাথায় করিয়া তুলিত। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, ঝাঁকাঝাঁকি ও সন্তরণে তাহারা সাতিশয় পটু ছিল। প্রতিবেশীদের আম কাঁঠালের ও অন্যান্য সুমিষ্ট ফলের বাগানে তাহাদের প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। আম ও জাম পাকিবার বহু পূর্ব্ব হইতে, কেহ বা গাছে উঠিয়া, কেহ বা তলায় থাকিয়া, সেগুলির সদ্ব্যবহার করিত। গাছ যাহার হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, ইহা যেন তাহাদের চিরন্তন স্বাধিকার। অতি প্রত্যূষে ছেলেদের মধ্যে আম কুড়াইবার একটা ধূম পড়িয়া যাইত। তখনকার ছেলেদের সুখদুঃখ, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ, এখন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তখন শিক্ষাপ্রণালীও অন্যরূপ ছিল। সেকালের গুরুমহাশয় সে

পাঠশালা, আর নাই। শুভঙ্করের আর্য্যা, নামতা, চাণক্যশ্লোক, পিতৃপিতামহদের নাম, বংশের পরিচয়, সেকালে অবশ্য-শিক্ষণীয় ছিল —এ সকলের অধিকাংশই আবার বাড়ীতে বৃদ্ধদের নিকট বালকেরা শিখিত, এবং এ সকল না জানা অত্যন্ত লজ্জাকর ও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত। আমাদের জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ সেই পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সুনিপুণ চিত্রকর দীনেন্দ্র বাবু তাঁহার "পল্লীচিত্রে", একস্থলে, যথার্থই বলিয়াছেন,—"সেই দোষগুণ-বিজড়িত সেকালে পড়ুয়াদিগকে চঞ্চলা পল্লীজননীর স্বহস্তে মানুষ করা ছেলে বলিয়া মনে হইত। আমাদের একালের ছেলেদের মত একদিকে পাণ্ডিত্য ও অন্যদিকে সভ্যতার অত্যধিক উত্তাপে তাহারা অল্পবয়সেই পরিপক্কতা লাভ করিত না।"

তখনকার দিনে, বালিকারা প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান সমাপন করিয়া, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিত। পৃষ্ঠোপরি নিপতিত আর্দ্র কেশজালে, শুভ্র বস্ত্রে, কোমল মুখমণ্ডলে, তরুণ অরুণ কিরণসম্পাতে, এমন একটি পবিত্র শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, যে তাহাদিগকে দেখিয়া গিরিরাজ দুহিতা পার্ব্বতীর সাদৃশ্য স্বতঃই মনে পড়িত। তাহারা শুদ্ধভাবে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিত; ঠাকুর-পূজার কিছু ফুল রাখিয়া, অবশিষ্ট ফুলগুলি দিয়া তাহারা 'পুণ্যিপুকুর' প্রভৃতি কত ব্রত করিত; তাহাদের সে সকল ব্রতের নামও আজ ভুলিয়া গিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আমাদের দেশের ব্রতকথা ও পুরাতন ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, এজন্য সমুদয় বঙ্গদেশ, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বালিকারা অল্পবয়সে ঐরূপ ব্রতনিয়ম পালন করিয়া সংযম অভ্যাস করিতেন, ও ভবিষ্যৎ-জীবনে পরসুখান্বেষণ ও আত্মসুখবিসর্জ্জন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য-করণীয় হইয়া উঠিত। বালকের ন্যায় বালিকাদিগেরও শিক্ষা দীক্ষা, ভিন্ন প্রকার

হইয়া উঠিতেছে। পরিবর্ত্তনে ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, তাহা অভিজ্ঞেরা বিচার করিবেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চিরকালই গল্প শুনিতে ভালবাসে। সেকালে কিন্তু গল্প বলিবার লোকেরও অপ্রতুল ছিল না। ঠাকুমা দিদিমা, পিসিমা, মাসীমা প্রভৃতি, তখন গল্পের এক একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহাদের মুখে দুয়ো সুয়ো রাণীর কথা, ব্যাঙ্গম ব্যাঙ্গমী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটাল পুত্র ও সওদাগর পুত্রদের adventure, সোনার কাটি রূপার কাটি, সুবিশাল রাক্ষসপুরীর মধ্যে পালঙ্কোপরি নিদ্রিতা রাজকন্যা, কোন্ অজ্ঞাতদেশে পাতালপুরীর মধ্যে সোণার গাছে মণির ডাল মুক্তার ফল প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে শিশুচিত্ত এই পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইত; কখন বা ভয়ে, কখন বা বিস্ময়ে, তাহারা অভিভূত হইত; ইহাতে তাহাদের কল্পনাশক্তির উন্মেষলাভ হইত এবং অজানিত বিস্ময়কর রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিত। সে সকল গল্প ক্রমশঃ বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে, এবং গল্পরক্ষয়িত্রীরাও ক্রমে ক্রমে ইহলোক হইতে অন্তর্ধান হইতেছেন। স্বর্গীয় Rev. Lal Behari De তাঁহার Folk-tales of Bengal নামক গ্রন্থে, কতকগুলি গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু সকলগুলি সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। দে মহাশয়, ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সুলিখিত গ্রন্থখানি, ইংরাজিভাষায় সম্পাদিত হইয়াছে। ইহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই; বিদেশীয় সুধীসমাজে ইহা সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য, আমাদের দেশের রূপকথাগুলি মাতৃভাষাতেই সঙ্কলিত হওয়া উচিত। এই গল্পসংগ্রহকার্য্যে আর কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই। অবিলম্বে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কার্য্যটি

কখনই সুসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। কার্য্যটী যেরূপ গুরুতর ও আয়াসসাধ্য, তাহাতে বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, যদি ও কার্য্যটীর ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, ইহার সফলতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

তখনকার মেয়েদের গৃহকার্য্যে, বিশেষতঃ রন্ধনে, নিপুণতা লাভ করিবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। অতি সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যারাও রন্ধন শালায় যাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন না ; পরন্তু স্বহস্তে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে তাঁহারা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন ; গৃহকর্ত্রী সকলের আহারাদি শেষ না হইলে, কখনই আহার করিতেন না। অতিথিসেবা তখন একটা দৈনন্দিন নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ভৃত্যের সহিত কেবল ভৃত্যের মত সম্বন্ধ ছিলনা, হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। আর আজকাল কলিকাতায় ঘরে ঘরে উড়ে বামুনের প্রচলন, তাহাদের অনুপস্থিতিবশতঃ, কিরূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভুক্তভোগীরা তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

পূর্ব্বে জমীদারদের মধ্যে অনেক সহৃদয় ছিলেন—প্রজাদের নিকটে থাকিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতেন। প্রজারাও তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। গাছের ভাল ফলটি, গরুর প্রথম দুধটুকু, তাহারা মনিবকে দিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিত। জমীদারেরা অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রজাদিগকে কেবল নির্লিপ্তভাবে শাসন করিতেন না, তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, এবং অবস্থা বুঝিয়া তাহাদের কর রেহাই দিতেন।

পূর্ব্বকালে কুটুম্বসমাদরের কিছু আতিশয্য ছিল ; কেননা খাদ্যটা সুলভ ছিল, সুতরাং হৃদয়টাও সুলভ ছিল ; তখন দৈন্যের তিক্তময়

বাড়ী আসিলে, আহার-অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া যাইত; একদিন থাকিতে চাহিলে, দশদিনের কমে নিষ্কৃতি পাইতেন না; আর একালে যদি কেহ দশ দিন থাকিতে চান, তাঁহাকে কোন মতে শীঘ্র বিদায় করিয়া দিতে পারিলেই, যেন স্বচ্ছন্দতা লাভ হয়। আজ কাল সহরে অনেক স্থানেই দেখিয়াছি, অতিথি দেখিলে গৃহস্বামী প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। অমনি তাঁহাদের মনে পৃথিবীর যত চোর ও জুয়াচোরের মূর্ত্তি যেন জাগ্রত হইয়া উঠে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিথিকে গৃহের বাহির করিতে না পারেন, ততক্ষণ কিছুতেই সুস্থির হইতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে বলিবার কথা আছে, স্বীকার করি। আজ কাল প্রবঞ্চকের সংখ্যা বাড়িয়াছে—কিন্তু আমার শঙ্কা হয় তাঁহারা প্রবঞ্চক বাছিতে গিয়া আসল লোকটিকেও বাদ দিয়া বসেন। যাঁহাদের গৃহে লক্ষ্মী অচঞ্চলা, দীনদুঃখীর প্রতি তাঁহাদের আর সেরূপ কৃপাদৃষ্টি করিতে দেখিনা। পল্লীতে এ সকল বিষয়ে অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

পল্লীর জমীদার আজ কাল বিবাহ প্রভৃতি অনেক শুভানুষ্ঠান কলিকাতায় মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। বিস্তর অর্থব্যয় হয়; বৈদ্যুতিকআলোক, আতসবাজী, গোরাবাজনা প্রভৃতির আড়ম্বরে, তাঁহারা এতদূর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যে নিমন্ত্রিত লোকদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা, বা তাঁহাদের আহারাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা তাঁহাদের প্রায় ঘটিয়া উঠে না। যেটী প্রধান কর্ত্তব্য, সেইটি তাঁহারা অবহেলা করেন। আর দীপ্ত মধ্যাহ্নে প্রাণপাত করিয়া যে সকল গরীব প্রজার দল তাঁহাদের এই আড়ম্বরের ব্যয় যোগাইয়াছে, যাহারা অন্নে সন্তুষ্ট, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ও প্রত্যাশী, electric fanএর সুমন্দমারুতহিল্লোলে ও পার্শ্বদগণের স্তুতিবাদে একবারও কি

পল্লী নিরানন্দময় না হইবে কেন ? ধনীরা ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; শিক্ষিতেরাও বিমুখ হইয়াছেন। সমাজবন্ধন আজ শিথিল হইয়াছে, সমাজের সে শক্তি সমাজে আর নাই। সকলেই এখন স্ব-স্ব-প্রধান হইতে চান ; ইহার ফলেই পল্লীতে দলাদলি। এখন পরস্পরের মধ্যে তীব্র বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত—সামান্য কারণেই কলহের সূত্রপাত—কলহ হইতে মিথ্যা মকর্দ্দমার সৃষ্টি, এবং সালিসির পরিবর্ত্তে সর্ব্বস্ববিনিময়ে আদালতে সেই সকলের নিষ্পত্তি! এই সকল কারণে পূর্ব্বের সরল আড়ম্বরশূন্য পল্লীজীবন ক্রমশঃই সুদুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। যাত্রা, কথকতা, গ্রাম্য থিয়েটার, পাঁচালী ও কীর্ত্তনে, এখন পল্লীর প্রাঙ্গণ আর মুখরিত হয় না। কৃষকদের মধ্যে যে মনসার ভাসান, কবি, তরজা প্রভৃতি ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কবি, বা তরজার লড়াইয়ে অশ্লীলতার সমাবেশ হইত, সুতরাং উহা উঠিয়া যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের মত এই যে—যাহা কিছু প্রাচীন, দোষযুক্ত হইলেও, তাহা একেবারে বিনষ্ট করা উচিত নহে—তাহাকে সংস্কৃত করিয়া রক্ষা করাই সমীচীন।

সকলেই আক্ষেপ করেন এখন আর পূজায় আমোদ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেন নাই দোষ কাহার ? তখন পূজায় নূতন কাপড় পড়িয়া যে আমোদ হইত, আজকাল বহুমূল্য পোষাক পরিয়াও ছেলেদের সে আমোদ হয় কিনা সন্দেহ। বয়স্কদের ত কথাই নাই—তাহাদের আমোদআহ্লাদ একেবারে গিয়াছে। এখন পূজার ছুটিতে অনেকে পশ্চিমে যান, কারণ পল্লী তাঁহাদের সহ্য হয় না—শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আর পল্লীর আকর্ষণই বা আছে কি ? প্রকৃত কথা, পল্লীর প্রতি তাঁহাদের আর সে 'টান' নাই। এইস্থলে, কেহ ভুল ... আমি দেশভ্রমণের বিরোধী। পল্লীর সহিত সম্বন্ধ

বিচ্ছিন্ন না করিয়াও দেশভ্রমণ করিতে পারা যায়, ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। মনুষ্যের স্বভাবই এই, নিকটে রত্ন থাকিলেও সে চাহিয়া দেখেনা তাহার সমাদর করিতে জানে না। ঘরে সুখ রহিলেও, দূরে মরীচিকার অন্বেষণে ব্যস্ত রহে। শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা বঙ্গপল্লী তাই আজ উপেক্ষিতা ও অনাদৃতা। অনেকে বলেন ইংরাজ শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর ফল এই, যে আমাদের ধন সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয়, সমাজতত্ত্ববিৎ অভিজ্ঞেরা বলিবেন আমাদের মনঃসম্পত্তির বিনাশেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজকাল আবার বাঙ্গালীর মন ফিরিবার উপক্রম হইতেছে। এতদিন পরে ভাই, ভাইকে চিনিয়াছে, এক বিরাট স্বদেশী যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে। ধনীসম্প্রদায় ইহার হোতা, শিক্ষিতগণ ইহার পুরোহিত। যাহাতে এই মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, সকলেই প্রফুল্ল অন্তরে ইহাতে যোগদান করিতেছেন। এই শুভ অবসরে, আজ আপনাদিগকে অবজ্ঞাত পল্লীর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মনে রাখিবেন, দূরে থাকিয়া ভালবাসা আর নিকটে থাকিয়া ভালবাসা এতদুভয়ের মধ্যে, অনেক প্রভেদ! মনে রাখিবেন, স্বদেশী-বক্তৃতা-শ্রবণ ও দুর্ভিক্ষে চাঁদা-সংগ্রহ প্রভৃতিতেই, আমাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইবে না! যেদিন বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আইসে, নিষ্ঠুর রাজধানী যেদিন দৈত্যের মত, তাহার ধূলিকঙ্করযুক্ত-রাজপথ ও ইষ্টকস্তূপের মধ্য হইতে আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে চাহে, সেদিনও পল্লীজননী, তাঁহার কোমল বাহু প্রসারিত করিয়া, তাঁহার শ্যামল ক্রোড়ে আমাদিগকে আশ্রয় দান করেন। যদিও তাঁহার ভাণ্ডার অপ্রচুর, তথাপি মুক্তহস্তে অন্নপূর্ণার মত তিনি সকলকে অন্নদান করেন!

মাতাকে রত্নৈশ্বর্য্যে মণ্ডিতা করনা কেন, কে তাহাতে বাধা দিবে? কলিকাতার সমৃদ্ধি ও বিচিত্র আড়ম্বরে, আজ আমরা ভুলিয়া রহিয়াছি! কিন্তু পল্লীজননী আজিও তেমনি স্নেহে, তেমনি আগ্রহভরে, চাহিয়া রহিয়াছেন। সন্তান একদিন মার ক্রোড়ে ফিরিবেই ফিরিবে। মাতার সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? অবশ্যই হইবে।

স্বদেশকে প্রকৃত ভালবাসিতে হইলে, কেবল বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া, স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করিলেই চলিবে না। আমাদের দেশবাসীদের প্রতি যথার্থ অনুরাগই স্বদেশপ্রেমের প্রধান লক্ষণ। পল্লীকে যথার্থভাবে ভালবাসিতে শিখিলেই, পল্লীসংস্কারের জন্য আর ভাবিতে হইবে না—উপায় আপনা হইতেই আসিবে। যত অভাব, যত অসুবিধা, যেন যাদুদণ্ডের স্পর্শে মুহূর্ত্তের মধ্যে অপগত হইবে। মানুষের স্বভাবই এই, যাহাকে ভালবাসে, তাহার কোনরূপ অসুবিধা বা কোনরূপ কষ্ট দেখিতে চাহে না। তাহার কষ্ট বা অসুবিধা দূর করিবার ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা জন্মে, এবং এই চেষ্টা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হয়।

স্বদেশের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিলেই, আমরা সোণার বাঙ্লার সকলই সুন্দর দেখিব। তখন বাঙ্লার আকাশ, বাঙ্লার বাতাস, কবির ন্যায়, আমাদের চিত্তকেও উদ্‌ভ্রান্ত করিবে! বেণুকুঞ্জ, সুগন্ধি আম্রমুকুল, নদীর কূলে শ্যামল বটচ্ছায়া আমাদের প্রাণে অভিনব অনুরাগ সঞ্চার করিবে! স্বদেশের ধূলামাটিও তখন আর তুচ্ছ সামান্য বলিয়া বোধ হইবে না! স্বদেশ-প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহাও উজ্জ্বল এবং পবিত্র হইয়া উঠিবে! দূরবিস্তৃত প্রান্তর, সংকীর্ণ গ্রাম্যপথ, বিহঙ্গকলকূজিত তরুশ্রেণী, মৃদুনাদিনী স্রোতস্বতী, আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে গৃহাভিমুখী করিবে! আমরা তখন সত্য সত্যই বুঝিব,

আমার যে ভাই, তারা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী!

তাহাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের সম্বাদ লইবার জন্য ব্যগ্র হইব, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা সচেষ্ট হইব, মুখে মুখে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া তাহাদের মনের অন্ধকার বিনাশ করিব, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি ও অভাবে সাহায্য করিবার জন্য, আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মিবে—তখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমবেদনার সূত্রে এমনই আবদ্ধ হইবে, যে উভয়ের সম্মিলনে দেশে এক বিরাট প্রজাশক্তির উদ্ভব হইবে!*

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

মহেশের দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তি ।

(Spenserian Stanza.)

"কিগো !—আসা হোল ?—বলি, ছিলে কোন্‌খানে
হতভাগা ?—এলে কার ঝাঁটা লাথি খেয়ে ?"
অস্পষ্ট এ কটী কথা মহেশের কাণে
গেল, যখন তিনি ধীরে প্রবেশিলেন গেহে
ঢুলিতে ঢুলিতে, ভয়ে কম্পমান দেহে,
মাথা করি হেঁট যেন নবমীর পাঁটা ;—
দেখিলেন দূরে তাঁর স্ত্রী আসেন ধেয়ে
এলোচুল ; আঁচল ঘুরিয়ে কোমরেতে আঁটা ;
কপালেতে উল্কি ; পায়ে মল ; হাতে রমণীয় ঝাঁটা !

মহেশ আচার্য্য সারাদিন করে' টো টো
এ পাড়া ও পাড়া, খেলে তাস দাবা পাশা,
পরে রাতে পার করে' দুই বোতল ছোট,
একরকম ভুলে গিয়েছিলেন বাড়ী আসা ;
পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে পড়্‌ল বাসা,
এবং তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের মেজাজ মধুর,
ভয়ে তাঁর হয়ে গেল পাংশুবর্ণ নাসা ;
একরকম আশা ক'রেই এলেন তিনি, অদূর
ভবিষ্যতে, বিশেষ একটু উত্তম মধ্যম, হস্তে তাঁর বধূর।

মহেশের স্ত্রীটি ছিলেন একাই একশর সমান ;
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম সেকেন্দর সাহার ;—
অনেকেরই বিশ্বাস তিনি থাকিলে বর্ত্তমান,
পারিত না ইংরেজে করিতে বঙ্গ আহার।

যিনি দেখেছেন বাহু দুইখানি তাঁহার,
শুদ্ধ বপুখানি দৈর্ঘ্যে চারি হাত ছাড়িয়ে,
বক্ষের পরিসর, রঙের মসীময় বাহার
নিশ্চয়ই বলেছেন তিনি "হাঁ বটে নারী এ!"
—অবিশ্বাস যদি, আসুন কাগজ কলম লিখে দিতে পারি এ।

"বলি—ও—ও—পোড়ারমুখো! হাড়হাবাতে হাঁদা!
নিষ্কর্ম্মা!—কি জানা আছে রাত্তির ক'টা বাজে?
বলি—ও—ও—মুদ্দফরাস, হতচ্ছাড়া, গাধা!
এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে কি সব রাজ্যকাযে
বাড়ি রাত্রি দুপর'তকও মনে পড়ে না যে?
বলি—ও—ও—ষণ্ডামার্ক, গণ্ডমূর্খ, পামর!
তোমার জন্য মরব আমি মাথা কুটে আজ। এ
দুপর রাতে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে এলেন স্বামী হা মোর!
থাকতে বাকি রাতটুকু কি জুটলনাক যায়গা তোমার—আ মর!"

মহেশ একেই ক্ষীণবুদ্ধি; তাতে আবার অদ্য
করেছেন এই মাত্র দুইবোতল 'কাবার'
স্ত্রীর গালির কল্লেন তিনি অত্যস্পষ্ট গদ্য;
[স্ত্রীর গালিটাও তাঁর ত প্রাত্যাহিক ব্যাপার
শুধু আশা কচ্ছিলেন যদি এই ব্যাপার
এইখানেই শেষ]—কিন্তু বুঝিলেন যাহা
অতি স্পষ্ট, পরিষ্কার,—একেবারে ছাপার
অক্ষরের মতই—ক্ষণপরে পৃষ্ঠে 'ডাহা'
প্রবল ও প্রচণ্ডভাবে সম্মার্জ্জনী সংঘর্ষণ তাহা।

এখন এমন কিছু নয় যে মহেশের কভু,
হ'ত নাক স্ত্রীর হস্তে এইরূপ ঝাড়ন
মাঝে মাঝে; এরূপ চণ্ডী ভার্য্যা হ'লে প্রভু,
স্বামী হলে দাস, শেষোক্তের বেশী বাড়ন
সতী স্ত্রীরা করে' থাকে এইরূপই তাড়ন
মহেশের ত একরকম ছিলই অভ্যস্ত—
স্ত্রীর হস্তে মধ্যে মধ্যে ঝাঁটা কিম্বা বাড়ন
স্ত্রীর গালিরও অভিধান ত তাঁর সব মুখস্থ;
অদ্য এ ব্যাপারে নূতন ছিলনাক এমন কিছু মস্ত!

কিন্তু অদ্য জানিনা কোন্ প্রকৃতির কি ভ্রমে;
বা কোন্ গ্রহ উপগ্রহের মিলনে বিয়োগে,
মঘা কি অশ্লেষা, কিম্বা অন্য কি নিয়মে,
বৃহস্পতির বারবেলা কি শনির দৃষ্টিযোগে;
কিম্বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপকর্ম্ম ভোগ এ;—
অদ্য প্রহার হল শুরু; মহেশ ঘোর রবে
গেলেন মূর্চ্ছা একেবারে সটাং চিৎ 'হোকে';
মূর্চ্ছাভঙ্গে হ'ল তাঁর দিব্যজ্ঞান; হয়ে,
দেখিলেন জগদম্বায়; করিলেন নিয়মত স্তবে।—

"তুমি আদ্যাশক্তি; বিশ্বে তোমার লীলা সব;
মায়ায় আচ্ছন্ন আমি জ্ঞান কাণ্ড নাহি,
বুঝি না তোমার এ লীলা; জানিনাক স্তব;
কেবল মূর্খেরই মত ফ্যাল ফ্যাল চাহি;

নহি সমুচিত সম্মার্জ্জনীগুণগ্রাহী,—
করে যা' স্বামীরে স্নিগ্ধদেহ শুদ্ধচিত্ত,
কিন্তু সে বিষয়ে নহি আমি পুরো দায়ী,
পায়নি সম্যক বুদ্ধি তোমার এই ভৃত্য ;
তোমারে বুঝিনা তাই যদিও তোমারে দেখি নিত্য।

"তুমি ব্রহ্মা কারণ তুমি সৃষ্টিবিধায়িনী ;
তুমি বিষ্ণু—প্রমাণ তোমার নথ সুদর্শন,
হস্তে শঙ্খ, ঝাঁটারূপ মুষলধারিণী
শুধু পদ্মাভাব। তুমি শিব—পঞ্চানন
আহারে। তুমিই ইন্দ্র—সহস্রলোচন
দেখিতে পরের দোষ। সম বাসুকীর
শতজিহ্বা কুৎসা-গানে। তুমি হুতাশন
যবে ক্রুদ্ধ। তুমি বরুণ পরক্ষণেই। বীর
বায়ু তুমি—বাক্যবলে। তুমি যম—ভৃত্য ব্রাহ্মণীর।

"তুমি দিগম্বরী—প্রমাণ শান্তিপুরে সাড়ী
পোরে,' গঙ্গাস্নান ক'রে হেঁটে আসা তোফা ;
স্বামী চির পদতলে পড়িয়া তোমারই ;
সুদীর্ঘরসনা তুমি—প্রমাণ তোমার চোপা
বিদিত যা চাকর, বামুন, নাপিত, মুদি, ধোপা ;
তুমি ত্রিনয়নী—প্রমাণ স-উল্কি ললাট ;
তুমি দীর্ঘকেশী প্রমাণ বার করা খোপা।
ধরিয়া শাশুড়ী-মূর্ত্তি বিচিত্র বিরাট
গৃহবধূসম্প্রদায়ে ঘটাও তুমি তুমুল বিভ্রাট।

"রূপে তুমি রতিদেবী। সরস্বতী জিনি
বিদ্যায়—যা বোধোদয় পর্য্যন্ত প্রাসার্য্যে।
লক্ষ্মী তুমি—বিনয়ে, বিধবা ননদিনী
দিবে সাক্ষ্য। বিশ্বকর্ম্মা তুমি শিল্পে, আর্য্যে!
প্রমাণ কাঁথাসেলাই এবং আলপনা-কার্য্যে।—
সতীত্বে সাবিত্রী—তুমি—যেরূপ নিরবধি
ঝাঁটাইয়ে দাও ত্রস্ত মহেশ আচার্য্যে
যিনি তব পদতলে। রন্ধনে দ্রৌপদী—
আলুর ঝোল আলুনি হয় হ'ল সিদ্ধ আলুগুলো যদি।

"তুমিই দেবাদিদেব। তোমারেই ধ্যান
করেন বশিষ্ঠ নারদ সনকাদি ঋষি।
করিতে মহর্ষি ব্যাস তোমারই ব্যাখ্যান
লিখেছিলেন মহাভারত—যাহা আমার পিসী
শুনাতেন ছেলেবেলায়। বঙ্গে দশদিশি
তব গুণে ব্যাপ্ত। তব রূপে মুগ্ধ ধরা,—
বিশেষ যখন হাস তুমি দাঁতে দিয়া মিশি,—
নাকে নথ, কপালেতে সিঁদুর—টিপ পরা।
—তখন ও মারাত্মকরূপে হয়ে রই জীয়ন্তেতে মরা।

"তোমার প্রেম টনটনে—সেটি গহনার।
স্বামীর আহারের হয় হোক্ অপ্রতুল
তোমার চাই কোমরে গোট, চন্দ্রহার; মাথায়
সীঁথি, সোনার কাঁটা, সোনার চিরুণ, সোনার ফুল;

নাকে নথ ; কর্ণে কর্ণ চাঁপা, মাছ, দুল ;
গলাতে চিক্-হার ইত্যাদি অলঙ্কার নানা ;
—চোখে ঠোঁটে পরা যায় না সেটি বিধির ভুল—
পায়ে গুজরি পঞ্চম—আরও কি সব, নাইকো জানা
হাতে বালা বাজু চুড়ি, অনন্ত ও মউরি মিছরিদানা।

"তোমার কোকিল-বিনন্দিত সুকোমল স্বর
বিশেষ যখন পাড়ানীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী।
গজেন্দ্রগামিনী তুমি—যেরূপ পরিসর,
অসম্ভবই তোমার পক্ষে অন্য প্রকার গতি।
তুমি চারু চমৎকার চন্দ্রমুখী সতী,
শুধু, সে চাঁদ অমাবস্যার—অর্থাৎ কালো চাকা।
বাহুবল্লী—শুধু তাহা সুমাংসল অতি—
দন্ত মুক্তাপাতি শুধু দোক্তা দিয়ে ঢাকা
নয়ন পদ্মসম—বর্ণে। ভ্রুযুগ ফুলধনু—শুধু নহে বাঁকা।

"তুমি সর্ব্বগতি ;—কভু পিতৃগৃহভাগে
কভু স্বামীগৃহে, কভু পাড়ায় দেও হানা—
এমন খবরটি নেই যে তোমার কাছে আগে
হাজির হয় নি এসে ; যেটি তোমার নাহি জানা
আমার পূর্ব্বে। করি যদি বাইরে বৈঠকখানা—
ক্ষণেক সোয়াস্তি-তরে—পাঁচিল মাচিল ফুঁড়ে
সেথাও তুমি উপস্থিত হও—করা যায় না মানা—
পাহাড় কি সমুদ্রের বেড়ও দাও তুমি তুড়ে
রাখ্‌বে কি বাঙ্গালি তোমায় পাঁচিল ঘিরে বেঁধে আঁস্তাকুড়ে ?

"তোমারে দেখিলেই দুরু দুরু করে হৃদি
কি রকম ! চাই না আর করিতে আলাপ
তোমার সঙ্গে ; থাকি ভাল থাকিলেই দূরে ;—হায় বিধি
বঙ্গবাসী করেছিল এমনই কি পাপ
যার জন্য পাঠায়ে তার ঘরে এঁরে,—বাপ !—
আমার বোধ হয় বিধি মশয় করে তোমায় সৃষ্টি—
পেয়েছিলেন নিজমনে দারুণ মনস্তাপ—
প্রবাদ আছে, যেদিন প্রথম তোমার হয় দৃষ্টি—
ভূমিতলে হয় ভূমিকম্প, আকাশেতে অগ্নিবৃষ্টি ।

"তোমার রূপের গুণের কোথাও নাহি সীমা
পারেনি বর্ণিতে যাহা ন্যায় স্মৃতি শ্রুতি
গাহিতে দস্তুরমত তোমার মহিমা—
অন্ততঃ হয় রামায়ণের মত এক পুঁথি—
অধম ও মূর্খ আমি—কি করিব স্তুতি—
অল্পক্ষণে ?—বিশেষতঃ বিদ্যাবুদ্ধি স্মৃতি—
যাহা ছিল সবই এবে দিয়াছি আহুতি—
অন্য মন্ত্রহোমে হায় !—বাহুল্য বিস্তৃতি
সে ভয়ে মহেশ আচার্য্য এই স্থানে করিলেন ইতি ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

চিত্র-চয়ন।

(১)

চীনে কৃষাণী।

চীন দেশে কৃষাণীর উপর ৪৫০,০০০০০ লোকের জীবনযাত্রা নির্ভর করিতেছে ; অতএব এই প্রাচীন দেশে কিরূপ ভাবে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা অবগত হইতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। পিকিনস্থিত "আমেরিকান লিগেসনের" সম্পাদকীয় রিপোর্টে প্রকাশ, চীনে চাষের প্রথা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেই প্রকারই আছে এবং অন্যান্য সভ্য দেশসমূহে, চাষসম্বন্ধে কৃষিজীবিদিগের যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখা যায়, এখানে তাহার যথেষ্ট অভাব ; কোন্ সময়ে জমীতে কোন্ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ জমীতে কোন্ শস্য ভাল হয়, এসকল বিষয়ে ইহারা দারুণ অজ্ঞ। কৃষিকার্য্যের উন্নতি অনুসারে, কৃষিকর্ম্মোপযোগী অস্ত্রাদিরও উৎকর্ষ সাধিত হয় ; কিন্তু ইহাদের দেশে চিরকালই এক প্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু কৃষিকার্য্যে ইহাদের অসাধারণ যত্ন ; বীজবপন কাল হইতে শস্য পাকা পর্য্যন্ত, ইহারা অতি সাবধানে ক্ষেত্র রক্ষণ করে। শস্য পাকিলে কাটিয়া আনা হয়, তাহার মধ্যে একটি খড় কুটা কি পাতা কিছুই থাকিতে পায় না ; অন্যান্য দেশে যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, চীনে তাহার প্রায় সকলগুলিই জন্মে, তাহাদের মধ্যে যব, গম, ধান, তুলা, তামাক, পোস্ত, ভুট্টা, তৈলখন্দ প্রভৃতিই প্রধান ; এতদ্ভিন্ন রেশম উৎপন্ন করিবার জন্য অনেকে তুঁতের জমীও করে। এখানে শস্যের ফলন বেশ

চীনেরা কখন কখন তাহা প্রস্তরে আছড়াইয়া লয়, কখন বা গাধা দিয়া মর্দ্দন করিয়া থাকে। শস্যাদি মাড়া হইলে, সেগুলি কুলায় তুলিয়া একটু উঁচু করিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ধানের চিটা কিম্বা অন্যান্য শস্যের অব্যবহার্য্য অংশ, বাতাসে উড়িয়া যায় এবং খাঁটি শস্যগুলি নীচে জমা হয়।

ইহাদের কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রগুলি অতি সাদাসিধা; সত্তর আশি টাকা হইলেই, কৃষিকার্য্যোপযোগী সমস্ত সরঞ্জাম অর্থাৎ দুখানি লাঙ্গল, দুইখানি বিদা, মৈ, ক্ষেতে জলশেক করিবার জন্য পম্প বা হুইল, জমী-চাষের জন্য দুই জোড়া গাধা, এতদ্ভিন্ন কোদালী, নিড়ানী, কাস্তে ও ঝোড়া প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। চীনের দক্ষিণ বিভাগে পাঁচ ছয় বিঘা জমী থাকিলেই যে পরিবারে পাঁচ ছয় জন লোক— তাহাদের বেশ চলিয়া যায়; যাহাদের বিশ পঁচিশ বিঘা জমী আছে তাহারাত বড় লোক! উত্তর বিভাগে জমীর 'ফলন' ভাল নহে, এখানে বিশ বিঘা জমী হইলে, একটি গৃহস্থ পরিবার অক্লেশে কাল যাপন করিতে পারে এইমাত্র। ধনবান লোকেরা ত্রিশ হইতে নব্বই বিঘা জমী চাষ করাইয়া থাকে, কিন্তু মানচুরিয়া প্রদেশে দেড়হাজার বিঘা জমী আবাদ করে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

ক্ষেত্রে সার দেওয়া এবং জল সেচন করা চীনের কৃষিকার্য্যে এই দুইটি বিষয়ে বিলক্ষণ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। নানা উপায়ে সার সংগ্রহ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন নগরের রাজপথে যে সকল আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, তাহা কুলির দ্বারা সংগৃহীত হয়, দরিদ্র বালক ও বৃদ্ধগণ ঝোড়ায় করিয়া গোময় কুড়াইয়া আনে এবং আবর্জ্জনার সঙ্গে গোময় ও কর্দ্দম মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, কৃষিজীবিগণ তাহাই সারের জন্য ক্রয় করে। অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ বা অশ্বতর সকল যেখানে আবদ্ধ থাকে, সেই সকল স্থানে অনেক স্ত্রীপুরুষ এবং বালকবালিকাদিগকে

তাহাদের মল কুড়াইয়া ঝোড়ায় বোঝাই পূর্ব্বক বিক্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রেতাগণ ইহা জমীর উপর ছড়াইয়া দেয়; এতদ্ভিন্ন নদী খাল এবং রাস্তার মাটিও এই অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপে জমীর সারসংগ্রহদ্বারা অনেক দীনদরিদ্র এবং অনাথের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিবার জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। শস্যক্ষেত্র কোন জলাশয়ের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে, কৃষকেরা জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রে জল লইয়া যায় এবং সেই জল ক্ষেত্রে পৌঁছিলে ক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট নালা কাটিয়া দেয়—তাহার ভিতর দিয়া জল সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু যদি শস্য-ক্ষেত্রের কাছে কোন জলাশয় না থাকে, তাহা হইলে কূপ খনন করা হয়, সেই সকল কূপের জল তুলিয়া বড় একটি নালামধ্যে ঢালিয়া দিলে সেই জল ক্ষেত্রমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত ক্ষেত্রকে সরল (loose) রাখে।

ক্ষেত্রে যে সকল কুলি কাজ করে, তাহাদের পারিশ্রমিক সর্ব্বত্র একরূপ নহে। চীনের দক্ষিণাঞ্চলে প্রত্যেক কুলির পারিশ্রমিক—আহার ও বাসস্থানসমেত বার্ষিক পঁয়ত্রিশটাকা হইতে চল্লিশ টাকা; কিন্তু উত্তর চীনের কোন কোনস্থানে আহার ও বাসস্থান সমেত একজন কুলি একশত টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। যাহাই হউক, এই সকল কুলির অবস্থা আমাদের দেশের নিরন্ন পদদলিত হতভাগ্য কুলির অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল; ইহাদের গৃহে স্ত্রীলোকেরা সুতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করে, পুরুষেরা প্রভুগৃহে তৃণ-নির্ম্মিত পাদুকা ও বিনি পয়সায় ক্ষৌরী হইতে পায়। ক্ষৌরকার্য্য চীনে একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার এবং চৈনিক লোকাচার অনুসারে মাসের মধ্যে নিতান্ত পক্ষে তিনচারি

চীনে কৃষিকর্ম্মে প্রভূত লাভ হয় না সত্য, কিন্তু যাহা লাভ হয় তাহাতে স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে; দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও এদেশের কৃষি-জীবন সুখী এবং শান্তি-পূর্ণ।

এনার্কিষ্টদলের উৎপত্তি।

রুসিয়ার নিহিলিষ্টদল যেমন যথেচ্ছাচারের প্রবল শত্রু সেইরূপ য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পায় এবং আংশিকরূপে তাহারা যে কৃতকার্য্য হয় না এরূপ বলা যায় না। এইরূপ বিপ্লবকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জর্ম্মনীতে' সোসিয়ালিষ্ট, ফরাসী দেশে 'এনার্কিষ্ট' এবং ঈংলণ্ডে—"ইউনিয়নিষ্ট"গণ প্রধান; কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট মতবৈষম্য আছে এবং সকল সম্প্রদায়ের লোকই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে অল্প-বিস্তর পরিমাণে দেখা যায়।

এনার্কিষ্টদলের কোন্ সময় উৎপত্তি হয় তাহা স্থির করিবার জন্য বার্লিনের ডাক্তার কার্লজিউস্ য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন, তিনি বলেন সে সময়ে যদিও দরিদ্র প্রজাগণ ধনবানের প্রবল ক্ষমতাজাল ছিন্ন করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়াছে, এবং নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তখন এনার্কিষ্ট দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তিনি আরো বলেন, যে জর্ম্মনীতে ধনীগণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবিবর্গের যে ঘোর যুদ্ধ হয় সেই অন্তর্বিপ্লবেই কেবল এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও অধিক দিনের জন্য নহে, এবং এই বিপ্লবে শ্রমজীবিগণ পরাজিত হওয়াতে, য়ুরোপে যথেচ্ছরাজশক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তাহার

কাল ধরিয়া প্রজাশক্তির উন্নতি ব্যহত রাখিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব এই রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল এবং পুনর্ব্বার প্রজাশক্তির অভ্যুত্থান হইল, অতএব নামে "এনার্কিজম্" না থাকিলেও, প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় বহুদিন হইতেই এই শক্তি বর্ত্তমান আছে, এবং সময়ে সময়ে তাহা প্রচলিত হইয়া চতুর্দ্দিক ধ্বংশ করিবার সূত্রপাত করিয়াছে।

কিন্তু এনার্কিজম্ কি?—ডাক্তার কার্লজিউসের মতে ইহা স্বাধীনতালাভের জন্য এক দুর্দ্দমনীয় প্রবল আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দরিদ্রের সঙ্গে প্রবলের বিবাদ উপস্থিত সহজে হয় না, কিন্তু একবার সে বিবাদ আরম্ভ হইলে, সহজে তাহার মীমাংসা হয় না, প্রবল ব্যক্তি একা একদিকে, এবং অগণ্য দরিদ্র অন্যদিকে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে সকল প্রবল ব্যক্তি ধনমদে বা ক্ষমতাদর্পে সাধারণের সুবিধা এবং সত্ত্ব গ্রাস করিতে উন্মুখ হয়, তাহারা 'ইউনিয়নিষ্টগণ' কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডাক্তার বলেন যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে 'এনার্কিজম্' শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল; সেই মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বর্ত্তমানকালের এই "বিপ্লবকারী সম্প্রদায়স্থ দুরাচারগণের" মতলবের কিছুমাত্র মিল দেখা যায় না। জোসেফ পিটর প্রাউড্হন 'এনার্কিজম' নামের সংস্থাপক; কার্গমারম্ নামক একজন সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, মহাজনদিগের দ্বারা শ্রমজীবিগণের অনেক অর্থ অপহৃত হইতেছে, অতএব তাহার একটি প্রতিকার প্রয়োজন। মারম্ সাহেব শ্রমজীবিগণের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের সহিত তাহাদিগের লব্ধ পারিশ্রমিকের তুলনা করিয়া দেখিলেন, উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এদিকে প্রাউড্হন ব্যবসা

ব্যবসা, তাহারা যে লাভ পায়, তাহার তুলনায় যাহারা প্রাণপণ শক্তিতে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সেই লাভ উৎপন্ন করে, তাহাদের প্রাপ্তি অতি সামান্য। তাঁহার "Qu-est-cela propriete ?" নামক গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, যে একজনের নিকট যাহা পাওয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার অতিরিক্ত দ্রব্য প্রদান করে না, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া শ্রমজীবিগণ তাহাদের মজুরীর তুলনায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়; অতএব শ্রমজীবী ও ধনীর মধ্যে যে 'বিনিময়-প্রথা' প্রচলিত, তাহা ন্যায় ও স্বাধীনতার অনুমোদিত নহে, শ্রমজীবীর সত্ব ধনী অপহরণ করিতেছেন এই মাত্র।

অতঃপর দুইজন জার্ম্মান—বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হেজ ও শিক্ষা ব্যবসায়ী স্রুজ, উপরোক্ত মত সমর্থন করিলেন; এই কুপ্রথা দমনের জন্য ক্রমে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল; এবং নানাপ্রকার বিপ্লবের সূত্রপাত হইল; সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী এবং জনসাধারণের মানসিক অসন্তোষও ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রাউড্হনের মতে "এনার্কিজম্" সমাজ-বিদ্রোহ বা রাজ-বিদ্রোহ নহে, ইহাকে তিনি শান্তির সহিত সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মিলন বলিয়া, বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শ্রমবিভাগের এই সংস্কারের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের কাজে লাগিবে, ও সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সম্পন্ন করিবে।

সর্ব্বপ্রথমে মাইকেল বাকনিন্ "ইন্টারনেশনাল এনার্কিজমের" সংস্থাপন করেন। তাঁহার মত প্রাউড্হনের ন্যায়ই উদার ছিল, কিন্তু বাকনিনের মৃত্যুর পর এই সম্প্রদায় অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খল মত অবলম্বন করিল; বাকনিনের শিষ্য বর্ত্তমান এনার্কিজমের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি সমগ্র

অধিক কি, দস্যুদল ডাকিয়া, তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণ করিতে আদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "এই কার্য্য, রুষীয়দিগের মধ্যে একটি অতি সম্মানজনক ব্যবসা।" ক্রমে সমাজনীতির মূলোচ্ছেদ তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত হইয়া দাঁড়াইল; এবং "এনার্কিষ্ট"গণ তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া, শুধু ক্ষমতাপ্রকাশই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল।

জনমোষ্ট, জর্ম্মানীর এনার্কিষ্টগণের পরিচালক ছিলেন। তিনি বার্লিনে "ফ্রেহেট্" পত্র সম্পাদন করিতেন। রুষীয় এনার্কিষ্টগণ রুষ সম্রাট আলেক্জান্দারকে নিহত করিলে, তিনি য়ুরোপের সমগ্র দেশের অধিবাসী-বর্গকে এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য এই পরামর্শদানের জন্য রাজকারাগারে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর জর্ম্মনীর সোসিয়ালিষ্টগণ তাহাদের দল হইতে 'এনার্কিজমে'র সহিত যাহাদের সহানুভূতি ছিল, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এই ব্যক্ত মনান্তরের মধ্যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে কি না কে বলিবে?

(৩)

রুসিয়ার নব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

কিছুকাল হইতে রুসিয়ায় এক নূতনতর ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত হইয়াছে, এই অসাধারণ উৎসাহশীল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নাম "ভূগর্ভবাসী সম্প্রদায়।" ইহাদের প্রধান আড্ডা সারাটক নগরে। অনেক লোক অতি আগ্রহের সহিত ইহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে।

ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ এই, যে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ বা গুপ্তবাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে রাজদণ্ড-ভীত, সাইবিরিয়া হইতে পলায়িত বা [illegible]

প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহাদিগের কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। আত্মার মুক্তিই ইহাদের একমাত্র প্রার্থিত বিষয়, এবং পরকালের সুখসম্ভোগের আশায় জীবন-বিসর্জ্জন করিতে ইহারা কিছুমাত্র কাতর নহে। ইহাদের কার্য্যের যে কৌতুকজনক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

স্ত্রী পুরুষ বা বালকবালিকা পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেই, সম্প্রদায়স্থ প্রধান ব্যক্তিগণ পীড়িত ব্যক্তির শয্যাপ্রান্তে আহূত হয়; ইহাদের অধিকাংশ লোকই বর্ণজ্ঞানহীন,—তাহারা পীড়িতের কুটীরে বসিয়া অল্পক্ষণ উপাসনা করে, তাহার পর পীড়িত ব্যক্তির নূতন নাম-করণ হয়; এই নূতন নামের সঙ্গে "ঈশ্বরের দাস" এইরূপ বিশেষণ যোগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদের বিশ্বাস, রোগীর পূর্ব্বনাম, পাপ ও কলঙ্কে মলিন হইয়া থাকে, সে নাম লইয়া ঈশ্বরের বিচার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তখনই তাহাকে টানিয়া নরকে নিক্ষেপ করা হইবে, কিন্তু যদি তাহাকে নূতন নাম দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার আর কোন ভয় নাই কারণ যমদূতগণ তাহার পূর্ব্বনামের লোক অনুসন্ধান করিয়াই ফিরিবে, নূতন নাম গ্রহণ করাতে তাহাদিগকে চিনিয়া উঠিতে পারিবে না; সুতরাং অতি সহজেই তাহাদিগের স্বর্গ-প্রবেশের পথ পরিষ্কৃত হইবে।

রোগীর নূতন নামকরণ হইলে, সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া তাহার তৃণ-শয্যা হইতে উঠাইয়া, ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় বায়ুপ্রবাহহীন, গৃহকক্ষে রাখিয়া চলিয়া আসে,—সে সুড়ঙ্গ পথ অতি অল্প লোকেরই পরিচিত। এখানে পীড়িত ব্যক্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া স্তব্ধভাবে কালাতিপাত করিতে হয়, অন্ধকারময় নির্জ্জন ভূগর্ভে মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া হতভাগ্যগণ, এমন একটি লোক দেখিতে পায় না যাহার

শুশ্রূষা বা দুইটি সস্নেহ-বচন মৃত্যু-যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব করে। কয়েকদিন অতীত হইলে, পীড়িতের আত্মীয়েরা ও সম্প্রদায়স্থ প্রধান ব্যক্তিগণ সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে; ইতিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে, বাগানে বা মাঠে সেই মৃতদেহ প্রোথিত করে। ইহাদের বিশ্বাস, সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহ প্রোথিত করিলে, মৃতব্যক্তির আত্মার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কিছুমাত্র ফললাভ হয় নাই, কারণ ভূগর্ভে মধুচক্রের ন্যায় শত শত সুড়ঙ্গ করিয়া তাহার মধ্যে ইহারা এমন গোপনে বাস করে, যে তাহাদিগের ধৃত করা দুঃসাধ্য। সুতরাং ভূগর্ভে শত শত পলায়িত অপরাধী নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছে, এবং কত হতভাগ্য পীড়িত ব্যক্তি জীবন্ত-অবস্থাতেই সমাহিত হইতেছে। এই সুড়ঙ্গ পথ এমন কৌশলে নির্ম্মিত, যে অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার পথভ্রষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! সুতরাং এজন্য কেহ দুঃসাহস প্রকাশ করিলে, তাঁহার অদৃষ্টে জীবন্ত-সমাধি অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন চিকিৎসক অতি সাবধানে এবং কৌশলপূর্ব্বক এইরূপ এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন, ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে একজন বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে!

লঘুক্রিয়া।

(১)

পুলিনবিহারীর কথা।

রবিবার। কয়েকবাজি তাসখেলার পর যখন বন্ধুবর্গ একে একে সকলে বিদায় গ্রহণ করিল, তখন দিবসের আলোকও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বন্ধুবর পুলিনবিহারী একটা তাকিয়া টানিয়া আমার পার্শ্বে তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল। আমি শিবুকে তামাক ও আলো আনিতে আদেশ প্রদান করিলাম।

তখন রাস্তায় 'বেলফুল' ও 'কুলপীবরফ' হাঁকিয়া ফিরিওয়ালা চলিয়াছে! উড়িয়া বেহারা মই লইয়া রাস্তার গ্যাস জ্বালিয়া চলিয়াছে! পাশের বাড়ীর একটি ছোকরা নূতন হার্মোনিয়ম শিখিতেছে, তাহার বেসুরা আওয়াজে সকলের প্রাণান্ত হইবার উপক্রম!

পুলিন কহিল, "ওহে তামাক ডাকনা—।" "সবুর কর মিলছে হে।" Bengalee কাগজখানা খানিক নাড়াচাড়া করিয়া পুলিন কহিল,— "ভারী একটা মজার কথা আছে শুন্‌বে?" "কেন শুন্‌বোনা!" শিবু তামাক দিয়া গেল। গুড়গুড়ির নলটা করায়ত্ত করিয়া কহিলাম;— "কিহে বল না—নীরব রয়েচ কেন?" "তবে শোন, বলি।" পুলিন বলিতে আরম্ভ করিল,—"সে প্রায় তিনবৎসরের কথা। তখন আমি কলিকাতার মেসে থাকিয়া এম, এ, পড়ি। বাগবাজারে মামার বাড়ী থাক্‌বার জন্য মামা বিস্তর অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু নানারূপ অসুবিধার জন্য আমি সেখানে থাকতে রাজী হইনি। সেবার আমার একজামিন। পূজার ছুটিতে মেস বন্ধ হলে, বাড়ী না গিয়ে মামার

থাকতেন, জান বোধ হয়—বিরাজদা'! তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, হাল্কা জিনিষগুলোর উপর তিনি যত বেশী মনোযোগ দিয়া থাকেন, গুরুতর বিষয়গুলা তেমনি তাঁর নজরেই পড়ে না। ইহার দৃষ্টান্ত দিবার কোন প্রয়োজন নেই! আমার গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে। তিনি আমাদের সঙ্গে খুব মিশতেন—অর্থাৎ ভারী সরল নিরীহ প্রকৃতির লোক আর কি!

দিনকতক হাস্যপরিহাসের পর আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধির অধিষ্ঠান হল। একদিন সন্ধ্যাবেলা বিরাজদা'র সঙ্গে কাব্যপ্রভৃতির আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ আমি খুব গম্ভীরমুখে বলে উঠলুম—"বিরাজদা' আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা serious কথা আছে!" আমার মুখের দিকে না চেয়েই বিরাজদা' বললেন, "কি কথা?" আমি বললুম, "ঠাট্টা করবেন না বলুন?" "না না"। "কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না বলুন।" "কিকথা পুলিন?" "যদি কারুকে না বলেন তবেই বলবো; আর আপনাকে তার উপায় করতেই হবে বিরাজদা।" এমন কথা ত' বিরাজদা আগে কখনো শোনেননি—কাজেই তিনি খুব গম্ভীর হয়ে উঠলেন। আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "কারুকে বলবোনা—তুমি বল।" আমি মাটির দিকে মুখ নামিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বললুম "আমার Love হয়েছে"! কথাটা বোধ হয়, বিরাজদা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন না—কাণটা এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "কি হয়েছে?" "আমি ভালবেসে ফেলেছি বিরাজদা"! চোখদুটা বিস্ফারিত করে, বিরাজদা বললেন "কাকে?" আমি মুখ না তুলেই বললুম "আমার এক বন্ধুর বোন্‌কে"। বিরাজদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন; পরে বললেন, "তাইত! তা কি রকম করে হল এ সব কাণ্ড?" আমি বললুম, "আমার কিচ্ছু দোষ নাই, বিরাজদা'!" কথাটা শুনে বিরাজদা খুব

আর মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। আমি কম্পিতকণ্ঠে বললুম, "যদি ঠাট্টা মনে না করেন ত বলি। কিন্তু জানবেন আমার জীবনের সুখদুঃখ এর উপর নির্ভর করেছে।" বিরাজদা খুব উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তুমি কি আমাকে পাগল পেলে যে এই সব Delicate matter নিয়ে ঠাট্টা করবো—ছি ছি!—" বিরাজদা খুব গম্ভীরভাবে ঘাড়টা নাড়লেন। আমি কোনমতে হাসি চেপে বললুম, "আপনি কি Love বিশ্বাস করেন?" "একি কথা হলো হে! Love বিশ্বাস করি না? আহা Love, Love—They Sin who tell us Love can die. কবিদের প্রধান সুখ Love—সেই Love মানি না?" আমি ভাবলুম—এ বলে কি! বিরাজদা কি পাগল হোল! আমি বললুম—"তবে শুনুন বিরাজদা—আমার বন্ধুটি আমাদের সঙ্গেই পড়ে। সে আমাকে তাদের বাড়ী পড়তে যেতে বলেছিল—তাই আমি গেছলুম——" "লজ্জা করো না সব খুলে বল। আমার যতদূর সাধ্য!"

আমি কোনমতে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—কহিলাম "বাজে গল্প আরম্ভ করলে দেখছি যে!" পুলিন হাসিয়া বলিল, "না ভাই, সব সত্য কথা বলছি!" "এঁ্যা বল কিহে, বিরাজবাবু আগাগোড়া এসব বিশ্বাস করছিলেন?" পুলিন কহিল, "তবে আর মজাটা কিসের? শোনই না তার পর কি হলো।—"

পুলিন আবার বলিতে লাগিল—"আমি বললুম,—'দেখুন বিরাজদা প্রথম যে দিন অমলদের বাড়ী পড়তে গেলুম, সেদিন গিয়ে অমলকে দেখতে পেলুম না—অমলদের চাকর বললে, 'বাবু বলে গেছেন একটু বসতে হবে।' আমি তখন পড়বার ঘরে বসে রইলুম! টেবিলের উপর একখানা "স্বরলিপির" বই পড়েছিল, সেখানা দেখছি, এমন সময়ে একটি মেয়ে সে ঘরে ঢুকল—মেয়েটি এসেই বললে, 'দাদা, বিনু

কাকার বাড়ী আজ আমাদের—"। কথা শেষ না করেই মেয়েটি হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেল। তোমায় বলব কি বিরাজদা, তেমন সুশ্রী মেয়ে কখনো দেখিনি। কোঁকড়া কোঁকড়া খোলা চুল যেন পিঠের উপর ঢেউ খেলচে—গোলাপ ফুলের মত রঙ আর কি মিষ্ট গলা—! এর বেশী তখন কিছু মনে হয় নি। তারপর অমলদের বাড়ী ঘন যাতায়াতে মেয়েটির সঙ্কোচ দূরে গেল। সে আমার কাছে আসত! ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা থেকে বুঝতে পারা গেল, যে আমরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছি।" বিরাজদা একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "তুমি তাকে ভালবাস, মানলুম, কিন্তু সে যে তোমাকে ভালবাসে তার ঠিক কি?" আমি বললুম, "তার প্রমাণ না পেয়েই কি আর বলছি বিরাজদা? একদিন আমি অমলদের বাড়ী যাইনি, তার পরদিন যখন গেলুম তখন অমল বাড়ী ছিলনা। আমি যেতেই রমা (অমলের বোন) এসে বললে—'কাল আপনি আসেননি কেন? আমি রাত্রি অবধি বাহিরের ঘরে বসেছিলুম।' আমি বললুম, "কাল আমার একটা কাজ ছিল রমা, তাই আসতে পারিনি।" রমা বললে "আপনি এলে আমার কত আহ্লাদ হয়।" আমি সস্নেহে বললুম, "তাহলে তুমি আমাকে ভালবাস!" চারিদিকে চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে, রমা বললে, "আমি আপনাকে খুব ভালবাসি পুলিনবাবু—আপনি বোধ হয়—।" লজ্জায় রমা কিছু বলতে পারলে না—আমি বললুম "আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি রমা—তোমার বাবাকে আমাদের বিয়ের কথা বলব"! রমা লজ্জায় সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম "রাগ করলে রমা?" রমা ঘাড় নাড়িল। আমি বললুম "মুখে বল।" রমা বললে 'না'; সত্যি বল্‌ছি বিরাজদা, সেদিন আমি কত সুখী হয়েছিলুম, তা আর বলতে পারি না। তবু তুমি বলতে চাও সে আমাকে ভালবাসে না—?"

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

পুলিন আবার বলিতে লাগিল—"বিরাজদা গম্ভীরমুখে বললেন, 'হুঁ'। পরে খানিকক্ষণ থেমে আবার বললেন, "দেখ পুলিন, এর ভিতর বিস্তর গোলমাল আছে।" আমি বললুম "গোলমাল কি বিরাজদা?" বিরাজদা' বললেন "হিঁদুর বিয়ে কি দু এক কথায় ঠিক হয় ভাই? বিলাতি courtship নয় ত!" বিরাজদার কণ্ঠস্বরে এমন একটা সকরুণ সমবেদনা মিশ্রিত ছিল, যে আমার ভারী হাসি পাইতেছিল! বিরাজদা বল্লেন, "তারা জাত্যংশে ছোট কি বড় সেটা দেখতে হবে; তারপর ঘর টর সব কেমন তাও দেখতে হবে—" আমি বললুম "খোঁজ নিয়েছি তারা আমাদের পাল্টা ঘর।" বিরাজদা কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন; আমি বললুম "কি ভাবছেন?" বিরাজদা চিন্তাকুলভাবে বললেন, "তাইত হে তুমি বড় মুস্কিল বাধিয়ে বসেছ দেখছি! বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে যে প্রেমে পড়ে এ আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি ভাবতুম Love টাভগুলো নভেলের পাতায় আর ব্রাহ্মদের ঘরেই হয়ে থাকে! হিঁদুর ঘরে ও সব ল্যাঠা নেই। তা তুমি ত এক কাণ্ড পাকিয়ে রেখেছ—" আমি বিষণ্ণভাবে বললুম—"আমার দোষ আমি পাঁচশোবার স্বীকার করছি, কিন্তু বিরাজদা এতে আমার এতটুকু হাত ছিল না!' শেষদিকটায় গলার আওয়াজটা খুব করুণ করে তুলেছিলুম! বিরাজদা বললেন, "আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। যাতে তোমাদের মিলনটা সুসম্পন্ন হয় সে বিষয়ে—" আমি ব্যগ্রভাবে বললুম "কিন্তু দেখবেন বাবা মামা কি অন্য গুরুজন যেন এখন এর বিন্দুবিসর্গও না জানতে পারেন!" "আমাকে কি ছেলে মানুষ পেলে হে" বলে বিরাজদা পাগলের মত খুব ব্যস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন।"

গুড়গুড়ির নলটায় টান দিয়া কহিলাম—"বেশ জমিয়েছিলে ত! তারপর?" পুলিন কহিতে লাগিল, "তারপর দিনকতক চুপচাপ গেল।

এম,এ, একজ্জামিনটার পরে মামার বাড়ী এলুম। তখন ভাবলুম ব্যাপারটাকে নিভোনো হবে না—ফুঁ দিয়ে দিয়ে রীতিমত ঘন করে তোলা যাক্। তাই, সমস্ত ব্যাপার যা যা হয়েছিল, নরেনদাকে খুলে বললুম। নরেনদার সঙ্গে সব রকম পরিহাস রসিকতাই চলে। নরেনদা খুব খুসী হয়ে বললেন, "এইবার আর একটু trick খেল দেখি!" তখন দুজনে পরামর্শ আঁটলুম। যাহাতে আমি একটা চিঠি লিখে ফেললুম। মেয়েলি লেখার মত অক্ষরগুলাও হল—একেবারে হুবহু মেয়েদের হাতের লেখা! নরেনদা তখন চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে বিরাজদাকে দেখালে, বললে, "দেখছ এখানে পুলিন কি কাণ্ড করে বসে আছে।" "কি কাণ্ড?" বলে বিরাজদা চিঠিখানা পড়তে লাগলেন; পড়া শেষ হলে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন "কোথায় সে?" নরেনদা বললেন, "সে আমার ঘরে বসে রয়েছে। বেচারীর চোখদুটা ছলছল করছে!" বিরাজদা নরেনদার সঙ্গে আমার ঘরে এলেন। এসেই বললেন, "আমাকে মাপ কর পুলিন, আমি এতদিন তত গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, পাগলামিটা দুদিনেই সেরে যাবে।" নরেনদা বাধা দিয়ে বলে উঠল, "বল কি বিরাজদা, একি পাগলামি হল—এঁ্যা?" "না না চিঠিখানা যা দেখছি—বিরাজদার মুখখানা খুব ঘোরালো হয়ে উঠল! নরেনদা বললে "তোমাকে এর উপায় দেখতেই হবে বিরাজদা!" সে বিষয়ে কিছু ভাবতে হবে না" বলে বিরাজদা চলে গেলেন। সে চিঠিটা ভারী মজার ছিল; তাতে লেখা ছিল—ধরণটা এই রকম!—

"প্রিয়তম,

অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। হয়ত তুমি আমাকে ভুলে গেছ! কিন্তু আমি ত তোমাকে ভুলিনি—আর কখনো ভুলব না।

তুমিই আমার স্বামী—সে কথা ত তোমার সামনে কতবার বলেছি! আমি আর কারুকে বিয়ে করবো না। তুমি বলেছিলে, তোমার এক

আত্মীয়কে সমস্ত কথা বলেছ, তিনি নাকি সুখের আশা দিয়েছেন! তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, তিনি যেন একটু আন্তরিকভাবে আমাদের বিয়ের চেষ্টা করেন! অনেক জায়গা থেকে আমার সম্বন্ধ আসছে! কিন্তু দাদারও মত শুনেছি তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়! আর আমার যা মত, সে ত তুমি ভালই জান!

যদি আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি থাকে কিম্বা যদি আমাকে ভুলে যেত চাও, তবে দয়া করে আমাকে খানিকটা বিষ পাঠিয়ে দিও তাহলে আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করতে যাবনা—

তোমারি রমা।"

চিঠি দেখানোর সাত আট দিন পরে বিরাজদা এসে বললেন, "পুলিন তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলুম—সে লিখেছে সব ঠিকঠাক করতে! এই মাঘ মাসেই যাতে বিয়েটা হয় তাদের এই ইচ্ছা! ঠিকঠাক হলে তোমার বাবার মত করাবে সে।" আমার মাথায় রক্ত চন্‌চন্ করে উঠল। আমি বললুম "ভারী খারাপ করেছেন বিরাজদা, ভারী খারাপ করেছেন!—" ভয়ে আর কোন কথা আমি বলতে পারলুম না! পৃথিবীটা তখন আমার চোখে ধোঁয়ার মত মনে হচ্ছিল। কি সর্ব্বনাশ! এর তিন চার দিন পরে আবার এক আপদ। দাঁতের বোঝা বার করে বিরাজদা বললেন, "মামাকে আজ সব কথা বলেছি, তাঁর খুব মত আছে!" রাগে দুঃখে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌ল। ভারী কাজ করেছেন—আবার বাহাদুরি করে হাসি হচ্ছে! আমি যেন বজ্রাহত হয়ে পড়লুম, অস্থিরচিত্তে বলে উঠলুম "করেছেন কি বিরাজদা —আমার মাথা খেয়েছেন? আমি যে শুধু তামাসা করেছিলুম!" "সে কি?" বিরাজদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমি বললুম, "হাঁ ওর এতটুকুও সত্যি নয়—আগাগোড়া মিথ্যে!" "চিঠিখানা?" "একদম বানানো—আমি বাঁহাতে লিখেছিলুম যে!" "তা কি করে

বুঝব বল ভাই ?” আমি কোন মতে চোখের জল সামলাতে পারলুম না—কম্পিতস্বরে বললুম, “মামা বাবা, সব কি মনে করবেন বলুন দেখি!” “তা আমি কি করে বুঝব বল ভাই, যে তুমি ঠাট্টা করছ!” “ছি ছি বিরাজদা আপনার একটুখানি কাণ্ডজ্ঞান নেই!” “এখন উপায় ?” আমি বললুম “সে তোমারি হাতে—আপনি বলবেন ও আমার সঙ্গে তামাসা করেছিল!” “আচ্ছা দেখব কিন্তু ভাই এমন তামাসা করতে আছে কি ?”

বলব কি, সেই অবধি এমন একটা লজ্জা আমাকে ঘিরে আছে যে বলতে পারি না। বাড়ীতে কারুকে চুপি চুপি কথা কইতে দেখলেই আমার মনে হয় যে, বুঝি আমারি কেলেঙ্কারীর কথা হচ্ছে! ছি ছি মনের দুর্ব্বলতায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিনি, যে একটুখানি সরল হাস্য কৌতুকের মধ্যে এতখানি tragic eruption প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে!” পুলিন চুপ করিল।

(২)

নরেন্দ্রনাথের কথা।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন ঈডেনগার্ডেনে বেড়াইবার সময়, নরেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। একটা বেঞ্চে বসিয়া আমাদের নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইল। নরেনের স্ত্রী বেশ পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে! নরেন শীঘ্রই একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত করিবে ইত্যাদি! হঠাৎ আমি বললুম “হ্যাঁ হে, তোমার বিরাজদার সঙ্গ পুলিন খুব একটা কৌতুক করেছিল?” নরেন বললে, “কি রকম ?” আমি তখন পুলিনের কাহিনী নরেনের কাছে বিবৃত করিলাম। সব শুনিয়া নরেন একটু হাসিল। পরে কহিল—“ওর আর একটু বাকী আছে যে! সেটা শুধু আমি জানি আর বিরাজদা জানেন, পুলিনও জানে না।” আমি কহিলাম “কি হে, বল ত!” “তবে শোন” বলিয়া নরেন বলিতে

লাগিল,—"এম,এ একজামিনের পর পুলিন এসে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে খুলে বলে! পুলিন বললে 'বিরাজদাকে নিয়ে রীতিমত মজা করা যাক্, এস'; আমিও তাতে সায় দিলুম! তারপর যখন সেই বানানো চিঠিটা বিরাজদাকে একেবারে কাবু করে ফেললে তখন আমি ভাবলুম, একটা নিরীহ লোককে দুজনে মিলে এতখানি কাহিল করাটা ভাল দেখায় না। আমি এক Double fun খেলবার চেষ্টা দেখলুম। আমি সমস্ত ব্যাপার বিরাজদাকে খুলে বল্লুম। অবশ্য পুলিন এ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় কিছু জানতে পারেনি এবং এখনো জানে না। বিরাজদা বললেন, 'এ কখনো হতে পারে হে?' বিস্তর তর্ক যুক্তি করে আমি বললুম যে হ্যাঁ, এটা খুব হতে পারে—তাঁকে নিয়ে Practical joke করাটা খুব স্বাভাবিক। তখন বিরাজদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "আচ্ছা নরেন তাহলে ওকে নিয়ে কিরকম মজাটা করা যায় বল দেখি?" আমি বললুম "আপনি পুলিনকে জব্দ করে ছেড়ে দিন না!" বিরাজদা বললেন, "কি করে জব্দ করব?" আমি বললুম "তাকে বলবেন যে তোমার বাবাকে চিঠি লিখেছি, তাঁর মত আছে তোমার মামারও মত আছে,—দেখবেন পুলিনচন্দর্ একেবারে মুষড়ে যাবে!" কাযেও তাই দেখা গেল। সেই সময় আবার আমার এক খুড়তুতা বোনের বিয়েতে পিশে মহাশয় প্রভৃতি আমাদের বাড়ীতে এলেন। পুলিনবেহারী উপরের ঘরে যেতে সাহস করত না—পাছে কেউ সেই কথা পেড়ে বসে। কেউ চুপি চুপি কথা বললেই পুলিন বলত, "ঐ আমার কথা হচ্ছে নরেনদা!" একদিন পুলিন আমাকে বললে, "মামার ঘরে বসে মামাতে বাবাতে সেই কথা হচ্ছে নরেনদা,—আমার নাম হচ্ছে শুনে এলুম" অনেক কষ্টে হাসি চেপে আমি বললুম, "সে বিরাজদা সব ঠিক করবেন এখন!" পুলিন বললে "উঃ—আর কখনো এমন ঠাট্টা

অবস্থা তখন এমন হয়ে পড়েছিল যে বোধ করি চোরেরও তেমন হয়না। আবার এরূপর বৌদি একদিন পুলিনকে শুনিয়ে আমাকে বললে,—"আজ তোমরা নির্ম্মলবাবুর বাড়ী যাচ্ছ ত ঠাকুরপো!—(নির্ম্মলবাবুটি হচ্ছেন কাল্পনিক রমার কাল্পনিক পিতা)।—পিশিমা বলছিলেন আজই মেয়ে দেখে আসতে! পুলিন ঠাকুরপোকে আর দেখতে হবেনা বোধ হয় শুভদৃষ্টি ত হয়েই আছে—কি বল?—" আর বল! পুলিন ঠাকুরপো ত অজ্ঞান!—এ সব কিন্তু বিরাজদার কাণ্ড! তিনি আবার বৌদির হাত দিয়ে এর জের চালিয়েছেন! পুলিন ঠাকুরপো একছুটে বিরাজদার কাছে হাজির। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, "এই কান মল্‌ছি বিরাজদা, ঘাট হয়েছে—এমন ঠাট্টা আর করবোনা—কখনো না—আমাকে বাঁচান—নইলে বাড়ীতে আর একদণ্ড তিষ্ঠুতে পারছিনা। ছি ছি সবাই ভাবছে, ছোঁড়াটা মেসে থেকে কেবল এই সব বথামি করেছে!" এখনো পর্য্যন্ত পুলিনের সঙ্কোচ ভাঙ্গেনি। কি অশুভক্ষণেই যে বেচারী ঠাট্টার সূত্রপাত করেছিল—স্বপ্নেও ভাবেনি that it draws a scorpion's tail behind."

আমি কহিলাম, "পুলিন এ শেষ ব্যাপারটি জানেনা?" নরেন কহিল, "কিছুনা—সে জানে বিরাজদা সত্যিই বুঝি বাবাকে পিশে মশায়কে সব কথা বলেছে।" আমি কহিলাম "তা হলে বেচারী বড় কষ্ট পাচ্ছে বল"? "তা পাচ্ছে বৈকি—কর্ম্মভোগ!" "এ কথা তাহলে তাকে বলা ভাল—" "বললে তারও উপকার হয় এবং Plot টাও finish হয়।" আমি কহিলাম, "After all a sweet revenge no doubt. মধ্যে পুলিন যেমন বহ্বারম্ভ করে তুলেছিল—"

মুখের কথা লুফিয়া নরেন কহিল, "তেমনি লঘুক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—এর আর কথা আছে!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বারমাসা। *

বৈশাখী।

ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা,
ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে!

বৈশাখী মেলায় বর্ষনাট্য খুলিয়া গেল। বর্ষের নূতন আবর্ত্তনে আশান্বিত নরনারী দেহমনের পুরাতন পঙ্কিলতা রাবীজলে ধৌত করিতে ধাইল। প্রভাতী গাহিতে গাহিতে সুপ্ত অলস নাগরিকগণের তন্দ্রাবিজড়িত দেহে সানন্দ-জাগরণ সঞ্চার করিয়া স্নানযাত্রীগণ মহল্লা মহল্লা হইতে সহরের বিভিন্ন দ্বার দিয়া রাবী অভিমুখে নিষ্ক্রমণ করিল। একক্রোশ ধরিয়া জনপ্রবাহ। কেল্লার প্রাচীর বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, রঞ্জিৎ সিংহের সমাধির সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে, দলে দলে, গুচ্ছে গুচ্ছে, ষ্টেসনবাহী রাজপথে দীর্ঘ সরল রেখায় জঙ্গমলাহোর আজ চিত্রিত। নদীর সন্নিকটে পথের বঙ্কিমতায় ও ঝোপঝাপের আড়ালে জনতা কোথাও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যায়, কোথাও আবার সহসা নয়নপথে জাগিয়া উঠে। ঘাটহীন নদীর ধারে পৌঁছিলে দেখা যায়, জনসঙ্গম স্ফীত-মুখর হইয়া নানাভাবে

---

* পঞ্জাবে 'বারমাসা' নামে একরূপ গীতিকাব্য প্রচলিত আছে তাহা বারভাগে বিভক্ত; প্রতি ভাগে বারমাসের এক একটি মাসের নাম ও বর্ণনা নিবদ্ধ হয়। প্রত্যেক মাসের বিশেষ মাধুর্য্য ও অভাব এবং মানবমনের উপর তাহাদিগের কি প্রভাব তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের 'বারমাসার' অনুসরণ করিয়া ১৩১৪ সালের বৈশাখ হইতে, পঞ্জাবে যে সকল প্রাকৃতিক ও মানবিক ঘটনাপর-

বিরাজ করিতেছে। একস্থানে সতরঞ্চি বিছাইয়া আর্য্যসমাজী ভজনমণ্ডলী ভজন গাহিতেছেন ও উপদেশ করিতেছেন। কোথাও এক পূরবিয়া ঢোলকীও দলবল সঙ্গে লইয়া আদিরসাত্মক গানে নীচশ্রেণীর শ্রোতাদের বিনোদন করিতেছে এবং সপরিবারে উপস্থিত ভদ্রশ্রেণীর জুগুপ্সা উৎপাদন করিতেছে। কোথাও একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া কোন পরিবার তাঁহাদের কোন কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার স্নানসমাপনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পাশ দিয়া মহিলাগণের গা ঘেঁসিয়া কোন পাঠান চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অমনি পার্শ্বরক্ষক পুরুষের সবুট পদাঘাতে টিলার উপর হইতে গড়াইতে গড়াইতে পাঠান সামলাইয়া লইল। কিন্তু উঠিয়া প্রস্থানপর হইবার সময়, পশ্চাতে ফিরিয়া ফিরিয়া ভয়ঙ্কর কপিশ চোখে তাহার পদাঘাতকারীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল;—সে চাহনিতে প্রতিশোধ দৃঢ়বদ্ধ। কোথাও ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চেনালোকের সহিত চারিচক্ষের মিলন ও সম্ভাষণের আদানপ্রদান; কখনও বা দুদণ্ড থামিয়া কদাচিৎ মিলনকে গাঢ় আলিঙ্গনে * সুখকর করিয়া তোলা; কোথাও ছেলেদের জন্য খেলনা নির্ব্বাচন; কোথাও বা বছরের দিনে সমস্ত পরিবারের জন্য—বালক বালিকা, চাকর-চাকরাণী, কর্ত্তা-গৃহিণী, পোষ্য-পোষ্যা সকলেই পরিবার মধ্যে গণ্য—মিষ্টান্নের টুকরি খরিদে, গৃহস্থেরা প্রতিপদক্ষেপে বাধিত পদে প্রভাতের বেলা কাটাইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

* * * * *

বৈশাখের সারাটা মাস সারাদিন মন্দানিলের হিল্লোল চলিতে থাকে, প্রতি সন্ধ্যায় তাহা ঝঞ্ঝাবায়ে পরিণত হয়। ভোরের বেলায় ফুরফুরে হাওয়ায় শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায়। দুয়ার জানলা ছিটকিনি

---

* [illegible]

পরস্পরে ঠুকাঠুকি করিয়া ঠুনঠান শব্দ করে। সে শব্দটিতে পঞ্চনদীর তীরে বসিয়া সোনার বাঙলা মনে পড়ে, মনস্বী মান্দ্রাজ মনে পড়ে, বিচিত্র বম্বে মনে পড়ে ;—সর্ব্বত্রই ঐ বায়ুতাড়িত জড়পদার্থের ঐ একই রকম মধুরালাপ শুনিয়াছি।

কোনদিন দ্বিপ্রহরে 'আঁধেরী'—অর্থাৎ ধূলিবহুল ঝঞ্ঝাবায় আসে। কতদূর হইতে একটা মূর্ত্তিমান্ শব্দ শন্-ন্-ন্, শর্শর ফর্ফর ছর্ছর, শস্—স্—স্ রাগে ভেরী বাজাইতে বাজাইতে, আচম্বিতে নিমেষের মধ্যে উপস্থিত হয়। সূর্য্য তিরোধান করে, দিক্‌সকল আঁধারে ভরিয়া যায়, গৃহে দীপ জ্বালিতে হয় ; বাগানে বেঞ্চি উল্টাইয়া পড়ে, ফুলের টব গড়াগড়ি দেয়, বৃক্ষ নির্ম্মূল হয় ; ধূলা চোখে করকর করে, মাথায় চড় চড় করে, কাপড়ে তৈজসপত্রে ধব্‌ধব্ করিয়া উঠে।

যদি গভীর রাত্রে আন্ধি আসে আরও বিপদ। রাত্রে বহিরঙ্গনে শয়ান পঞ্জাবের মনুষ্যলোকের উপর ঘণ্টাকয়েকব্যাপী বিষম অত্যাচার করিয়া প্রভঞ্জন অন্তর্হিত হন।

কে দিল তরঙ্গে !

চৈত্রের শেষে পঞ্জাবের রাজনৈতিক আকাশে একখানি কৃষ্ণমেঘের মত কি দেখা দিল। লোকে ঠাহরিয়া দেখিল তাহা মেঘ নয়, কৃষকের শত্রু কতকগুলি সরকারী কানুনজপী পঙ্গপাল। এ মারাত্মক পঙ্গপালের ঝাঁক সত্ত্ব সত্ত্ব না তাড়াইলে রক্ষা নাই। আবালবৃদ্ধ জাঠ জমিদারেরা বৃক্ষশাখাহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি নবযুবক বিদ্যুৎবেগে এই গুজরায়, ঐ লায়ালপুরে, আজ তরুণতারণে, কাল অমৃতসরে, এখনি গুরদাসপুরে, পরক্ষণে মুলতানে ছুটিয়া বেড়াইয়া প্রজাপীড়ক কানুনকতিপয় রদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দুইমাস-পূর্ব্বে-অজাতনামধেয়, এই যুবক অজিৎ সিংহের নাম

প্রভৃতির নামে পাঁচ হাজার শ্রোতা জোটে, অজিত সিংহের নামে বিশহাজার দর্শক ভাঙ্গিয়া পড়ে।

প্রথম প্রথম সহরে রব উঠিয়াছিল আশ্চর্য্য বাগ্মী ও আশ্চর্য্য স্বদেশপ্রেমিক দুটী ভাইয়ের অভ্যুদয় হইয়াছে—কিষণসিং ও অজিৎ সিং। পঞ্জাবের গৌরবহারে তাহারা দুটী সদ্যস্ফুট কুসুম। দিন যত বাড়িতে লাগিল তাহাদের সৌরভ তত তীব্র মাদকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রাচীনের দল দূরে রহিলেন, নবীনেরা সে আঘ্রাণে মত্ত হইয়া নিকটে ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধেরা কহিলেন—"সর্ব্বনাশ! ভারত মাতার উপবন কণ্টকে ভরিল"। যুবকেরা গাহিল "আহা এতদিনে বাহার আইল! মরি মরি ভারতমাতার বুকে কি শোভা হইল! বেল চামেলী চম্পা গোলাপ মোতিয়া নর্গেশ কত ফুল ফুটিল! দেখ দেখ আমাদের দেখ, আমরা কি সুন্দর!"

'দেশপ্রীতি'-মদোন্মত্ত বালকেরা, 'আত্মবলিদান'-ধুতুরাপানেউন্মাদ যুবকেরা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইল। বৃদ্ধেরা তাহাদের সুমতিদানে বিরত রহিলেন, তাহাদের সংসর্গ সভয়ে পরিহার করিলেন। তাহারাও নাসা কুঞ্চিত করিয়া দেশবৃদ্ধদের প্রতি অবজ্ঞাবর্ষণ করিতে লাগিল। নিজেদের সভামঞ্চ হইতে অনেকানেক পূর্ব্বনেতাদের ও সঙ্গে সঙ্গে লালা লাজপৎ রায়ের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। বলিল, "লাজপৎ রায়? ফুঃ! সখের নেতা! তার কাগজে দাপট সঙ্কটে ওলটপালট! এই যে 'পঞ্জাবী' কাগজে, সাহেবে দেশ শোষণ করিতেছে বলিয়া এত দিন ধরিয়া পাঁচালী গাহিলে, আজ 'পঞ্জাবী'র মকদ্দমা উপস্থিত হইতে সেই রক্তশোষণকারী ফিরিঙ্গির পায়ে আবার দেশের রক্ত ঢালিলে কেন—ফিরিঙ্গি কৌন্সলি দিলে কেন? ব্রিটিশের বিচার নাই বলিয়া এতদিন যে খেউড় গাহিয়াছ নিজেদের বেলায় সেই বিচারের মুখাপেক্ষা কেন? মকদ্দমাখরচার চাঁদা তোলা কেন? এত উকিল কৌন্সলি

এত সাক্ষীসাবুদ, এত সাজ সরঞ্জাম, এত আত্মদোষক্ষালনের ব্যবস্থা কেন ? কাঠগড়ায় সিধা খাড়া হইয়া যশোবন্ত রায় ও আথবালেকে দিয়া কেন বলাইলেনা—আমরা মাতৃভূমির কল্যাণার্থে যাহা ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি। তোমাদের চোখে অপরাধী হই সাজা দাও !'— এ 'দেমাগ'টুকু, এ 'বরদাস্ত'টুকু, এ 'সাহস'টুকু, ধড়ে নাই—অথচ গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়াইয়া নেতা হওয়ার সখ। ভ্যালারে আমার সখের নেতা !" এইরূপে তাদের সাধের অজিৎ-গর্ব্বে গর্ব্বিত অন্ধ উদ্ধত যুবকেরা ফুৎকার ও কটূকথায় আর সকলকে উড়াইয়া দিয়া সকলের ছিদ্রে আঙ্গুল বসাইয়া সকলের সহিত শত্রুতা আচরণ করিতে লাগিল। পরে তাহার ফলভোগও করিল।

এদিকে একদিন করবৃদ্ধিপ্রপীড়িত দশসহস্রাধিক জাঠ লাহোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অজিৎ সিংহেরই শরণাপন্ন হইল। তাহার গৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাহাদের স্থান হইল। দশসহস্রাধিক জাঠ অজিৎসিংহের নায়কতায় সভা করিয়া সেক্রেটরী-অব্-ষ্টেট ও পঞ্জাবলাটকে তারযোগে সম্বাদ পাঠাইল :—

"আমরা বর্দ্ধিত কর দিতে অক্ষম। প্রার্থনা এই যে, হয় কর হ্রাস হউক, নয় খালের জল তুলিয়া দেওয়া হউক, আমরা বিনাজলে চালাইব। আর যদি প্রার্থনা মঞ্জুর না হয়, যদি সরকার বাহাদুর জলও রাখেন আর টেক্সও না কমান, তবে জানাইয়া রাখিলাম বর্দ্ধিত টেক্স আমরা দিব না"।

কংগ্রেস অনেক আবেদন নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রজার নিকট হইতে সরকার বাহাদুরের কাছে এমন সাফ জবাব এ পর্য্যন্ত কখন পৌঁছায় নাই। বৃদ্ধেরা প্রমাদ গণিলেন। যুবকেরা সগর্ব্বে বলিল—যে জাঠ অজিৎসিংহের নেতৃত্বে জাঠভাইরা এই সন্দেশ সরকারে প্রেরণ করিয়াছে, সে যদি কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিত, এবং ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাতে এই ঘটনাটি ঘটাইত, তবে আজ সে সকল ইংরাজের প্রাতঃস্মরণীয় হইত।"

ঈশানকোণে ঝড় উঠিল। অজিৎকীর্ত্তি বৈশাখীপ্রভাতের মন্দ-

রাওলপিণ্ডির উকীলপঞ্চক বাত্যার প্রথম আঘাত বহন করিলেন। সমগ্র সহর ক্রমে কন্দুকের মত গড়াগড়ি খেলিতে লাগিল। দুয়ারে ডাকহরকরা টোকা দিলে সম্ভ্রান্ত গৃহস্থমাত্রে চমকিয়া উঠেন—মনে করেন "পরোয়ানা আসিল"। প্রতিদিন কর্ম্মক্ষেত্রে নির্গত হইবার সময় গৃহকর্ত্তা স্ত্রীর নিকট চিরকালের মত বিদায় লইয়া যান, কি জানি, যদি আর গৃহে ফিরা না হয়, আর দেখা না হয়, পথেই যদি পরোয়ানা গ্রেপ্তার করিয়া লয়!

গভীর রাত্রে আঁধির ক্রিয়ার মত সুপ্ত বিশ্বস্ত জগতের বুকের উপর হইতে লাজপৎ রায়ের তিরোধান ব্যাপার ঘটিল। ঝড়ের প্রকোপ চলিতে থাকিল!

* * * *

পঞ্জাবীরা ঝড়ে অভ্যস্ত, মুষ্টিযোগও তাহারা জানে। অতি বড় বলিষ্ঠ জাঠও প্রবল মারুতপরাক্রমের বিরুদ্ধে লড়িতে দাঁড়ায় না—বহু অভিজ্ঞতায় জানে, তাহা নিষ্ফল। সে কেবল হঠাৎ জাগ্রত হইয়া গায়ে চাদর মুড়ি দিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়ে, ঝড়ের তীব্র প্রকোপ মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেয়, কখনো বা বিধ্বস্ত বস্তুর সংশোধন ও লুপ্তবস্তুর উদ্ধারকার্য্য প্রভাতের বেলার জন্য রাখিয়া, আপাততঃ দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, উত্তরোত্তর অনর্থবৃদ্ধির পথরোধ করে, নির্ব্বাপিত দীপ আবার জ্বালায়, পরিবার পরিজনকে একস্থানে জড় করিয়া ঝড়শান্তির অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। এবারও তাহাই হইল। পঙ্গপাল খেদাইয়া গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে গৃহস্থেরা যে ভীষণ বাত্যাক্রান্ত হইল, তাহার মুষ্টিযোগস্বরূপ মেমোরিয়ল, ম্যানিফেষ্টো, ডেপুটেশন প্রভৃতির বিধান করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল।

সমালোচনা।

'আরম্ভ—শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি একখানি উপন্যাস, ৩৭৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বাঙলায় এত বড় উপন্যাস ২।৪ খানি ভিন্ন আর নাই। গ্রন্থের আখ্যানবস্তু সামান্য, কিন্তু ইংরাজি নভেলের ছাঁচে ঘটনাপরম্পরায় বহু নূতন নূতন লোকের সহিত পরিচিত হইতে হইতে পুঁথি বাড়িয়া উঠিয়াছে। লেখক পাকা ও হুঁসিয়ার না হইলে এরূপ ক্ষেত্রে গ্রন্থ আবর্জ্জনাপূর্ণ ও বিরক্তিজনক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে আবর্জ্জনা প্রবেশ করিতে পারে নাই; আমরা কেবল সমালোচনার খাতিরে নহে, পুস্তকের নিজের আকর্ষণীতে একনিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিয়াছি; তৃপ্ত হইয়াছি।

সংক্ষেপে বর্ণিত ঘটনা এই—বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী-পিতার ছোট ছেলে। সুশীল, শান্ত; বিংশ বৎসর বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন একদিন বৈকালে তাঁহার বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্রের বাড়ী যাইতে পথে জলঝড় হওয়ায় এক বাড়ীতে যাইয়া অতিথি হয়েন। রোগ-শোক-উপবাসক্লিষ্টা গৃহকর্ত্রীর অতিথিসেবা; আবালবৃদ্ধের আতিথেয়তা হিন্দুর গৌরবের জিনিষ। বিনয়কুমার ধনীর সন্তান হইলেও দরিদ্রের প্রাণময় যত্নে তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে এক বৃদ্ধা, তাঁহার বিধবা কিশোরী কন্যা সুকুমারী ও তাঁহার শিশু ভ্রাতা শরৎ এবং ইহাঁদের অভিভাবক দূরাত্মীয় গোপালচন্দ্র। বিনয়কুমার প্রাতে বন্ধুর নিকট গেলেন। দুই বন্ধুর অকৃত্রিম প্রীতি, বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর প্রগাঢ় প্রণয়ের একখানি মধুময় চিত্র, স্থানাভাবে পাঠককে দেখাইতে পারিলাম না। তৎপরে বিনয়কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ। আজিকালিকার কলেজপ্রত্যাগত নব্য যুবকের রীত্যনুযায়ী বিনয়কুমার বলিলেন "বিবাহ অতি দায়িত্বপুর্ণ ব্যাপার; তৎবিষয়ে আমি প্রস্তুত নহি, আমি বিবাহ করিব না"। বিনয়কুমারের দাদার ও শ্রীশচন্দ্রের, বিবাহের পক্ষে ওকালতিটা বড় শ্রুতিরোচক; বরপণের আলোচনা সাময়িক ও সঙ্গত। বিনয়কুমার পশ্চিমে দাদার নিকট বেড়াইতে যাইয়া সংসারের সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলেন। সংসারের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তাঁহার প্রশস্ত সার্ব্বভৌমিক চিত্ত সঙ্কুচিত, ভীত, বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে সুকুমারীর মাতার মৃত্যু হইয়াছে। গ্রাম্য যুবক-জমিদারের রমণীলালসার ধর্ম্মবুদ্ধিহীন নায়েব যোগেন্দ্র বিশ্বাস সুকুমারীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। স্নেহ-দুর্ব্বল মাতার পুত্র ও ভীতা বালিকা বধূর স্বামী হইয়া খোকাবাবু (জমিদার) নানা অত্যাচারে সুকুমারীকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। সুকুমারীর পুণ্যদৃপ্ত চরিত্রের বলে পাপ সঙ্কুচিত হইল, নিবৃত্ত হইল না। খোকাবাবু ও যোগেন্দ্র বিশ্বাসের মনোমালিন্য ঘটিল। যোগেন্দ্র বিশ্বাস তখন সরলপ্রাণ গোপালচন্দ্রকে ভুলাইয়া তাঁহাদের আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী হইয়া পড়িল। গোপাল জমিদারের কোপ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য হৃদয়হীন পাষণ্ড যোগেন্দ্রের সহিত গ্রাম হইতে পলায়ন করিল; সঙ্গে সুকুমারী ও শরৎ। যোগেন্দ্র গোপালকে ফাঁকি দিয়া সুকুমারী ও শরৎকে লইয়া, নানা স্থান ঘুরিয়া, নানা মিথ্যা ছলনায় ভুলাইয়াও সুকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে পারিল না। অবশেষে সুকুমারী ও শরৎকে কুলিরূপে বেচিয়া ফেলিল।

এদিকে বিনয়কুমার সুকুমারীর বিপদ সংবাদ অবগত হইয়া গোপালচন্দ্র ও বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সাহায্যে বহু পরিশ্রমে উঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

বিনয়কুমার সুকুমারীকে প্রথম যেদিন দেখেন সেদিন তাহার মনে কিরূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা জানি না। একটু বুঝি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট মোহের রেখা পড়িয়াছিল। কুলির আড্ডায় তাহার গর্ব্বোদ্ধত তেজোমূর্ত্তি দেখিয়া বিনয়কুমারের চিত্তের সেই অস্পষ্ট মোহটুকু প্রেমের আকার ধরিয়া নানা ছন্দ ও রাগিণীতে তাঁহার চিত্ত ভরিয়া তুলিল। তিনি সুকুমারীকে বিবাহপ্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিলেন। এইবার সুকুমারীর চরিত্র-মহিমা পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার অবকাশ পাইল। মাস-দুয়ের সধবা-জীবনের মধ্যে সুকুমারী তাহার স্বামীর যে স্নেহভরা পত্রখানি পাইয়াছিল, তাহা সোণার কবচে ভরিয়া আপনার সতীত্ব ও একনিষ্ঠ প্রেমের অক্ষয় কবচ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিল; ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল, "ঠাকুর, ধর্ম্মে অক্ষুণ্ণ মতি দাও"। ইহাতে বিনয়-কুমার নভেলি ছন্দে হা হুতাশ করিলেন না। কেবল বিনয়কুমারের বিবাহবাসনা অপগত হইল। এই সময়ে দমকা বাতাসে দীপশিখার মত সুখোজ্জ্বল ঘরখানিকে নিবিড়, তমসাবৃত করিয়া, শ্রীশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী নর্ম্মসঙ্গিনী ইহলোক ত্যাগ করিল। উভয় বন্ধু এখন সংসারবিরক্ত উদাসী। উভয়ে হরিদ্বারের নিকট গুরুলাভ করিয়া সংসারে কর্ম্ম করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। উভয়ে বিধবাবিবাহের উদ্যোক্তারূপে

অনেক বলিলাম, তবু গ্রন্থের কিছুই পরিচয় দেওয়া হইল না। ইহার মার্জ্জিত ভাষা, উচ্চভাব, যুক্তির শৃঙ্খলা, কার্য্যকারণ ও ঘটনাপরম্পরার গ্রন্থননৈপুণ্য ও সামঞ্জস্যবিধান, বইখানি না পড়িলে বুঝান সহজ নহে। প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমকে মনে পড়িয়াছে। সমাজচিত্র ও পল্লীচিত্র সর্ব্বত্র অতি সুন্দর হইয়াছে। বইখানি ডিটেকটিভের গল্পের মত আগাগোড়া কৌতুহল জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ।

কয়েকটি চরিত্র বেশ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বিনয়, সুকুমারী, শ্রীশের পত্নী, গোপাল ও যোগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রধান। ইহাদের পরিচয় কৌতূহলী পাঠক পাঁচ সিকা খরচ করিয়া মূল পুস্তকেই লইবেন, ভারতীর পৃষ্ঠায় সকল পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য।

বইখানি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে বলিয়া ইহার দুই চারিটা ত্রুটিরও উল্লেখ করিব। বিমলাদিদির প্রগলভতা কিছু অস্বাভাবিক; তাহার উত্তর চরিত্র সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানিতে বর্ণাশুদ্ধি ও প্রাদেশিকতা না থাকিলেই ভাল হইত। দুই চারিটি ভুল দেখিয়াও ব্যথিত হইয়াছি 'কথাবার্ত্তা করিতেছে' ৫।৭ বার লিখিত হইয়াছে। 'স্থানটি তাঁহাকে পবিত্র বোধ হইতে লাগিল,' 'হস্তের নাড়না,' 'সর্ব্বাঙ্গে অবসাদময়,' 'চাঁদিমা,' 'দাঁড়িয়া থাকিয়া,' 'তাঁহাকে ভাল লাগিল না,' 'হৃদয় প্লাবনী প্রেম,' 'সমূর্ত্ত,' প্রভৃতি না থাকিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকর্ত্তা খোকাবাবুর মুখ দিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক বেশ শুদ্ধভাবেই বাহির করিয়াছেন; সেই শ্লোকে একটু যে ভুল তাহা খোকাবাবুর অজ্ঞতার প্রতিই আরোপ করিব কি? যোগেন্দ্রের কোঠা বাড়ীকে ভস্মস্তূপে পরিণত না করাই উচিত ছিল। পাপিষ্ঠা বিনোদিনীকে সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া এক রমণীকে গ্রন্থকার ভিজা কাচা কাপড়ে মাটীতে বসাইয়াছেন, ইহাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ অস্বাভাবিক বোধ হয় পাত্রপাত্রীগণের ঘন ঘন মূর্চ্ছা। বাস্তবজীবনে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রমণীগণকেও ত' কখন কোন উত্তেজনায় মূর্চ্ছা যাইতে দেখি নাই। তবে সমালোচক অপেক্ষা গ্রন্থকারের অদৃষ্ট অনেক সুপ্রসন্ন। বাস্তব লইয়া সমালোচক, আর কবি কল্পনাকুশল।

চিন্তা-নির্ঝরিণী।—শ্রীকুমারবিক্রম মজুমদার প্রণীত। মূল্য ৵৹ বার আনা। যশোহর হিন্দুপত্রিকা প্রেসে শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। লেখক উৎসর্গপত্রে বলিয়াছেন,—"গিরিনিঃসৃত অনেক রজতসুবর্ণমণিমুক্তা প্রবালাদির নির্ঝরিণীতলে বসতি।' তাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেই 'মণিমুক্তাদি সংগ্রহ করিয়া

একটি রত্নদাম রচনা' করেন কিন্তু 'ইচ্ছার পূরণ হয় নাই। হার রচনা করিতে গিয়া মণিগুটিকা দামভ্রষ্ট হইল।' যাহা হউক, 'চেষ্টায় একরূপ রজতহার গ্রথিত।' লেখক পরক্ষণেই বলিয়াছেন, 'এ রজতশিকলী এই স্থানেই যে সম্পূর্ণ তাহা নহে' তথাপি লেখক 'দেবী মাতৃভাষার বিরাট বিশ্ববিজয় সুশোভন গ্রীবাদেশে' তাহা পরাইয়াছেন। কিন্তু আবার সংশয়িতচিত্তে বলিয়াছেন 'পরশমণি সংযোগে' তাঁহার 'দরিদ্র রজতহার কিরূপ ধারণ করিবে তাহা সুধীর ভাববিহ্বল সাহিত্য-সুধাপায়ী পাঠকবর্গের বিবেচনাবর্ত্তারূঢ়।' আমরা নিতান্ত মূঢ়, তাই এই সুললিত পদাবলীর মাধুর্য্যরসউপভোগে বঞ্চিত। ২৫টি 'ভাববিহ্বল' সাড়ম্বর রচনা দ্বারা পুস্তকের ১০২ পৃষ্ঠা পূর্ণ। আড়ম্বরবৃদ্ধিকল্পে লেখক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে প্লেটো, সেক্সপিয়র, সেলি, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি হইতে কোটেশন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোটেশন-গুলি ভিন্ন যে সকল অংশ লেখকের নিজস্ব, তাহা প্রকাশ না করিলেই বোধ হয় লেখক সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। চাউলের মূল্য ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে এমন দিনে এরূপ পুস্তকপ্রচারে অর্থব্যয় করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারি না। তবে যদি ছাপাখানার সুবিধাকল্পে এই পুস্তকের প্রচার হয়, তাহা হইলে কথা নাই।

ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।—তৃতীয় খণ্ড। প্রণেতা শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। মূল্য ১৲ টাকা। মহাভারতী মহাশয় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি তাঁহার অক্লান্ত সাহিত্যসেবার একটি মনোহর ফল। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৬টি নানাবিষয়ক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সকলগুলিই বিভিন্ন মাসিকপত্রে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে মহাভারতী মহাশয় সেগুলি পুস্তকাকারে সংবদ্ধ করিয়াছেন। যে কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে "বাঙ্গালী হিন্দুর পরমায়ু" "বাঙ্গালীর বিদেশিনী বিবাহ," 'অজহর' 'বিবাহের ফলাফল' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে, লেখকের চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির একটি প্রধান গুণ এই যে, লেখক প্রারম্ভেই এমনি একটি কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া দেন যে, একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে প্রবন্ধ শেষ না করিয়া থাকা যায় না। 'রোঁয়াছেড়া পণ্ডিত' শীর্ষক ছেলেভুলান প্রবন্ধটি ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

নিবেদন।

নানাবিধ গোলযোগ ও অসুবিধাবশতঃ "ভারতী" প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য লজ্জিত-হৃদয়ে গ্রাহক ও অনুগ্রাহক-বর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সম্পাদিকা মহাশয়া লাহোর হইতে আসিয়া "ভারতী" প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ সুবন্দোবস্তাদি করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ যদি এই প্রাচীনতম পত্রিকার উপর পূর্ব্ববৎ স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে আশা করা যায় ভারতী শীঘ্রই এই সকল অসুবিধাদি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

'বৈশাখ' সংখ্যা ভারতী সকল গ্রাহককে প্রেরিত হইল। মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন এই যে 'জ্যৈষ্ঠ' সংখ্যা ভারতী শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ভি, পি, পোষ্টে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা লইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৭ই আশ্বিনের মধ্যে পত্রদ্বারা আমাদিগকে যেন স্ব স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, নচেৎ অনর্থক ভি, পি, ফেরৎ আসিলে আমাদিগকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

ম্যানেজার—"ভারতী"।

নারী।

তুমি নারী, বিধাতার অপূর্ব্ব স্বজন!
সংসারমরুভূমাঝে শুভবরিষণ!
শীতলিয়া'রাখ সদা তপনের তাপ,
নীরবে মাথায় বহ ভাগ্য-অভিশাপ
বর্ষিত পুরুষে; তুমি ভগ্নী, তুমি মাতা,
সন্তাপিত অভাগারে সর্ব্বসুখদাতা,—
মর্ত্ত্যে টেনে লয়ে আস স্বরগের সুধা,
তৃপ্ত কর মানবের পিপাসা ও ক্ষুধা!
কর্ম্মশ্রান্ত পুরুষের মস্তকের স্থল—
তোমার কোমল বক্ষ, স্নিগ্ধ সুশীতল!
এ দরিদ্র জগতের ধনরত্নরাশি
তোমার সোহাগবাণী, অধরের হাসি!
অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীরূপে প্রতি ঘরে ঘরে,
সতত বিরাজ' তুমি সুখস্নেহভরে!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্‌লা রঙ্গভূমি।

একটি কথা উঠিয়াছে,—রঙ্গভূমিতে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, সেগুলি সকলই শিক্ষাপ্রদ হওয়া চাই ;—যেন শিক্ষাদানই রঙ্গভূমির প্রধান কর্ত্তব্য। কথাটি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আনন্দ-দানই রঙ্গভূমির মুখ্য উদ্দেশ্য—শিক্ষাদান গৌণ উদ্দেশ্যস্বরূপ ধরা যায়, কিন্তু তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেন নহে,—কথাটি বুঝিয়া দেখা যাউক।

সৌন্দর্য্যের প্রতি মানবের যে একটি চিরন্তন অনুরাগ আছে—মানবের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ আছে, তাহা প্রায়ই সুপ্ত থাকে। প্রতিভাশালী মানব সেই সুপ্ত আদর্শ পরিস্ফুট করিয়া তুলেন। কবি ও চিত্রকর, এই প্রতিভাশালী মানবশ্রেণীভুক্ত। কবি কাব্যে আপনার হৃদয়নিহিত সৌন্দর্য্য বিচিত্রোজ্জ্বল ছায়াপাতে বিন্যস্ত করিয়া যান—চিত্রকর চিত্রতুলিকায় সেই সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট করিয়া তাহা সাধারণের মনোজ্ঞ করিয়া তুলেন। সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার মূলে মানবের অন্তর্নিহিত সেই সৌন্দর্য্যানুরাগ। চিত্র, কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির সার একত্রিত করিয়া অভিনয়কলার উৎপত্তি হইয়াছে। সৌন্দর্য্যানুরাগ, প্রমোদস্পৃহা (Relaxation) অর্থাৎ 'ছুটি'র আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ এই দুইটি হইতে অভিনয়কলার সৃষ্টি। বিচিত্র চিত্রাবলীশোভিত, অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোককিরণপ্রতিভাসিত মায়াপুরীর ন্যায়, রঙ্গভূমির যবনিকা যখন উত্তোলিত হইল, তখন মানবের অন্তর্নিহিত সেই সৌন্দর্য্যভাণ্ডার, বাহির হইতে হর্ষ ও শান্তির একটা উচ্ছ্বসিত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল। শিক্ষার কথাটা তখন বড় মনে হয় নাই।

কবির কাব্যে বা চিত্রকরের চিত্রে আমরা যে আনন্দ পাই, রঙ্গভূমির অভিনয়ে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আনন্দ আমরা লাভ করি। কাব্য বা চিত্রবর্ণিত চরিত্র, যথন সজীবভাবে আমাদের সম্মুখে, রঙ্গভূমিতে, তাহাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ, মানঅভিমান লইয়া দ্রুতগতিতে, তড়িৎ প্রবাহের মত, আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়, তখন যেন আমরা কেমন আবেশবিহ্বল হইয়া পড়ি। এই কর্ম্মক্লান্ত ধরণীর বিপুল স্বার্থসংঘর্ষ, বাদবিসম্বাদ প্রভৃতির মধ্যে যথার্থ কাব্যের আনন্দ রঙ্গভূমিতে যেরূপ পরিস্ফুটভাবে উপভোগ করা যায়, এমন আর কিছুতে নয়।

শিক্ষাদানব্যাপার কি করিয়া আসিল, তাহা দেখা যাউক—রঙ্গভূমি এক্ষণে আমাদের সমাজের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘ-কঠোর জীবনসংগ্রামের পর, অবসরচ্ছলে যদি কর্ম্মক্লান্ত মনকে তাহার "খোরাক"স্বরূপ আমরা কাব্যের আনন্দ দান না করি, তাহা হইলে আমাদের অবসাদমোচনের অভাবে তাহাকে স্ফূর্ত্তিলাভ হইতে বিরত রাখা হয়। অথচ এই স্ফূর্ত্তি মনের প্রাপ্য। মানবহৃদয়ের সুখদুঃখ, বেদনা, আশা, আগ্রহ আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে সজীবভাবে প্রতিফলিত দেখিলে সেই সকল অভাব অনুযোগ প্রভৃতির দিকে আমাদিগের দৃষ্টি উন্মোচিত হইয়া যায়, অভাবটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার আমরা অবসর পাই এবং তাহার সংস্কারকল্পে আমাদিগের যথাযথ শক্তি নিয়োজিত করিতে পারি। দু'একটি সহজ দৃষ্টান্তে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতে পারে।—বিবাহের পবিত্র অনুষ্ঠানে যে পাপ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া, আজ বিবাহের আনন্দে একটা তীব্র শোকের ছায়া বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহার গভীরতা, রঙ্গভূমিতে যখন আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে জ্বলন্তভাবে অভিব্যক্ত হইল, তখন আমরা সমাজের দারুণ ক্ষত মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ঙ্গম ... পরিণাম, হিংসার নিষ্ঠুর ক্রীড়া রঙ্গভূমিই

প্রথমে আমাদিগের মর্ম্মস্থলে তাহার জীবন্ত চিত্রের দ্বারা অনুপ্রবেশ করাইল, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তিবাদের দোষে দোষী হইতে হইবেনা, বা ইহার প্রমাণের জন্য পুরাতন পুঁথিপত্র ও বাক্যাড়ম্বরের দোহাই দিতে হইবে না! সুতরাং শিক্ষাদানব্যাপারটি অপ্রতিহতভাবে আসিয়া পড়িতেছে। বক্তা তাঁহার বক্তৃতামঞ্চ হইতে, ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহার বেদিকা হইতে যে শিক্ষা দান করেন, রঙ্গভূমিতে একটি রজনীর অভিনয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা তদপেক্ষা গভীরতর না হইলেও কোন অংশে ন্যূন নহে। আমাদিগের রঙ্গভূমিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি যে, রঙ্গভূমি আমাদের সমাজের একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে; দোষাদিসত্ত্বেও আজ রঙ্গভূমির আমাদিগের স্নেহের উপর একটি দাবী দাঁড়াইয়াছে; তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করিলে আমাদিগের কর্ত্তব্যহানি হইবে। এক্ষণে আমরা রঙ্গভূমিসম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।—

দৃশ্যপট।—পথ ঘাট কক্ষ প্রভৃতি নিতান্ত সাধারণ দৃশ্যপটের অবস্থা উন্নত সন্দেহ নাই। রঙ্গভূমির দারিদ্র্য প্রভৃতির দোহাই দিয়া, নদীবক্ষে বজরা, পুষ্করিণীর দৃশ্যাদি ছাড়িয়া দিলেও মধ্যে মধ্যে দৃশ্যপট সম্বন্ধে যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তাহা অসহ্য। যথা, নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদের রাজপথ রেলিঙ ও cupid lanternএ সজ্জিত—চীনের তোরণদ্বার (মিনার্ভায় "শিরীফরহাদ") ইলেক্‌ট্রিক্ আলোকদ্বারা বিভূষিত—কিম্বা যখন দেখি, যুধিষ্ঠিরের কক্ষে সোফা কৌচের প্রাচুর্য্য (পাণ্ডবগৌরব); ভট্টাচার্য্যের গৃহান্তরালে তাম্রশীর্ষ কুক্কুটের আবির্ভাব, বারুণী পুষ্করিণীতে গ্যাসালোক (ভ্রমর), মথুরার

অনুরূপ,—তখন অতিশয় গুরুগম্ভীর নাটকও হাস্যজনক প্রহসনে পরিণত হয়। Sir Edwin Arnold এদেশে বুদ্ধদেবের অভিনয় দর্শন করিয়া India Revisited নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"The stage appliances were deficient to a point incredible for a London Manager, and the *mise en scene* some times almost laughable in simplicity." বলা বাহুল্য, আর্নল্ড সাহেবের এই উক্তি এখনও প্রযুজ্য হইতে পারে।

অভিনয়।—গার্হস্থ্যজীবনের সুখদুঃখ বেশ সুন্দরভাবেই অভিনীত হয়। কিন্তু যেখানে একটু বৈচিত্র্য সেখানেই অভিনেতার অক্ষমতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। প্রেম, বীর্য্য, ধর্ম্মালাপ প্রভৃতির অভিনয় স্বাভাবিক হয় না। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১৩০২ সালের মাঘ সংখ্যা "ভারতী"তে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "প্রেমে যে তন্ময়তা ও গদ্গদভাব, অতৃপ্ত সলজ্জচাহনি, ইহা অভিনয়ে প্রায়ই প্রদর্শিত হয় না। প্রেমের আনন্দ, প্রেমের আকাজ্ক্ষা, প্রেমের নৈরাশ্যকাতরতা, এসব মুখের ভাবে যেরূপ প্রদর্শিত হয়, সেরূপ কথায় হয় না"। এবং আমাদের অভিনেতারা মুখের ভাবেও তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন না। সম্প্রতি মিনার্ভায় "দুর্গাদাসের" অভিনয়ে, আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, 'রাজিয়া' যখন নিরাশপ্রেমের সঙ্গীতে দর্শকের হৃদয়ে বেশ একটি করুণ সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তখন তাঁহার নায়ক 'অজিতসিংহ' সে গানের উপলব্ধিসুখ বুঝাইতে গিয়া, দশনকান্তির অপূর্ব্ব বিকাশ এবং উচ্চারণে বর্ণাশুদ্ধির বিশেষ পারদর্শিতা-দ্বারা, সাধারণের ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। 'দুর্গাদাসের' অভিনয় আলোচনায় এ সকল বিষয় বিশেষভাবে বলিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে পুঁথিপাঠ তুল্যাংশে দুইটি গভীর অসামঞ্জস্যের নিদর্শন। এক্ষণে কয়েকটী চরিত্রসম্বন্ধে আমরা দু'একটি কথা বলিব। প্রথম মন্ত্রী।—রঙ্গভূমিতে মন্ত্রীমহাশয়ের সহিত যখনই আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই দেখিয়াছি বিপুল পক্ক গুম্ফশ্মশ্রু ও কেশরাশির মধ্যে তাঁহার মুখখানি যেন জ্যামিতির বিন্দুর মত পরিদৃশ্যমান, এবং সাদা চাপকানমণ্ডিত দেহে ও বিন্দুপরিমিত মুখে তাঁহাকে কখনই সজীব প্রাণী মনে হইত না, যদি তাঁহার কৃত্রিম দ্রুত বাক্যবিন্যাসের সহিত তাঁহার চোগাচাপকানের অংশবিশেষ ঘন-সঞ্চালিত না হইত! কখনো বা দেখা যায়—বক্তৃতাকালে মন্ত্রী মহাশয়ের সমস্ত দেহ 'নিথর নিষ্কম্প' রহিয়াছে, কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্ত, অনবরত তরণীর ক্ষেপনীর ন্যায়, উত্থান-পতনের দ্বারা আপনার সজীবতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে! তাহার পর, প্রহরী। ইহাদিগের মুখে এমন একটি শীর্ণ করুণভাব ফুটিয়া থাকে, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে এমনি নিরীহতা অনুভূত হয় যে, আমাদিগের সন্দেহ হয়, এই সকল হতভাগ্য ক্ষীণজীবিবর্গ কি করিয়া রাজবাটির প্রহরীকার্য্যে নিয়োজিত হইল! তাহারা ভীত-ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, ছোট মুখখানি গুম্ফ ও গালপাট্টার বিপুলভারে নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া মনে হয়! তাহার পর তাহাদিগের বক্তব্য যখন তাহারা একনিশ্বাসে সম্পন্ন করিয়া দেয়, তখন দর্শক মহাশয়গণের মনে হয় নাকি, যে বেচারী এ যাত্রা খুব রক্ষা পাইয়াছে! যেন তাহাদের মস্তকের সম্মুখে উদ্যত খড়্গ ভ্রূকুটি করিতেছিল—মুখস্থ বক্তৃতায় একটু ভুল হইলেই তাহাদিগের শির দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত! সখীগণকে যেন নিতান্ত তোতাপাখী বলিয়া মনে হয়; কেবল নৃত্যগীতের জন্যই যেন তাহাদের প্রয়োজন। তাহাদের গতিতে ও নৃত্যের পাদবিক্ষেপে যেন মুহুর্মুহু সকরুণভাবে ব্যক্ত হয়, "ওগো দর্শক

কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি !" প্রতিহিংসার অভিনয়ে, দন্তে দন্ত চাপিয়া বিসদৃশ মুখভঙ্গীসহকারে যখন অভিনেতা বা অভিনেত্রী একটি ভীষণতার সৃষ্টিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, তখন তাঁহাদিগের নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্যে, দর্শকের 'প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ' হইয়া যায় (মিনার্ভায় ঘসেটি বেগম)। পাগলিনীর অভিনয়ে এমন বিকট কৃত্রিমতা দেখা যায়, যে অভিনয়দর্শন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে !

"জনা" নাটকে জনৈক অভিনেত্রী 'জনা'র অংশ অভিনয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা একদিন জনার অভিনয় দেখিতে যাই। প্রথমাংশে জনা বেশ ভদ্রলোকটির মত শান্ত স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিতেছিল, কিন্তু যেমনি প্রবীরের মৃত্যু হইল, অবশ্য ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই,—কিন্তু আমাদিগের ততোধিক দুর্ভাগ্য বশতঃ জনা আপনার বক্ষের আন্দোলন যথাসাধ্য বর্দ্ধিত করিয়া, চক্ষু দুটিকে যথাসাধ্য গোলাকার করিয়া, হস্তদুইটা সিংহিনীর থাবার ন্যায় করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে টানাটানা গলায়, যখন "জনা চাহে প্রতি-বিধিৎসিতে" বলিয়া বক্তৃতা জুড়িয়া দিল, তখন হা আমাদের দেশের artistic জ্ঞান ! দর্শকবৃন্দ চট্‌পটা করতালিধ্বনিতে রঙ্গভূমির টিনের ছাদ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, এবং গ্যালারি হইতে capital, 'সাবাস' প্রভৃতি ধ্বনিতে একটা বিপর্য্যয় গোলযোগ বাধাইয়া দিল। এমন কৃত্রিম অভিনয় কি করিয়া যে দর্শকের হৃদয় অধিকার করিল, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ! বীরত্বের অভিনয়ে লম্ফঝম্প, বাগ্মিতার অভিনয়ে কর্কশ চিৎকার,—এভাব আমাদিগের অভিনেতাদিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে ; এসকল সহিতে পারিলেও, যখন কোন নায়কের মুখে স্বকীয় নায়িকার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের বর্ণনা শুনিয়া, পরে, বিপুল পরিসরা, লোলকান্তি প্রৌঢ়াকে তদভিষিক্তা দেখা যায়, তখন আপাদ

"Beauty seems a

requisite qualification in an actress * * * I can never conceive a hero dying for love of a lady, totally destitute of beauty. I must think the part unnatural, for I cannot bear to hear him call that face angelic, where even paint cannot hide its wrinkles." অনেক সময় দেখা যায়, কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী পারদর্শিনী হইলেও পাত্রবিশেষের কবিবর্ণিত বয়স ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না—এ অক্ষমার্হ দোষটুকু ষ্টার ও মিনার্ভা উভয়ত্রই সমান। ইহার স্খালনের কি উপায় নাই? 'চন্দ্রশেখরের' অভিনয়ে বৃদ্ধ প্রতাপকে দেখিলে আমরা বিস্মিত হই, যে ইহার জন্য শৈবলিনী কি বলিয়া গৃহত্যাগ করিল!

পরিচ্ছদ।—রঙ্গভূমির পরিচ্ছদাদি শোভন হইলেও, ইহাতে অসামঞ্জস্য-দোষ প্রবল।—আরঙজেব, শুনিয়াছি, কখনো রঙ্গীন পোষাক ব্যবহার করিতেন না, সাদাসিদে-পোষাকই তিনি পরিধান করিতেন। তিনি এ সম্বন্ধে খাঁটি মুসলমান ছিলেন; কিন্তু আমাদিগের রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ, আরঙজেবকে নীল লাল জরির কাজকরা পোষাকে সর্ব্বত্র বাহির করিয়াছেন। জনার পেটিকোট,—শ্রীকৃষ্ণের লেসের কাজকরা পোষাক, উচ্চপদস্থ সাহেব মেমের চুনাগলির 'রোতো' পোষাক,—Martini Henry বন্দুকের স্থলে Daisy air-gun ("সংসার" নাটকে), মানসিংহের অপূর্ব্ব পোষাক ও সৈন্যগণের অঙ্গে ক্লাউনের পোষাক এগুলাতে অতি উৎকৃষ্ট নাটকও হাস্যজনক প্রহসনে পরিণত হয় মাত্র। সামাজিক নাটকের অভিনয়াদিতে দেখা যায়, যে কোন চরিত্র দুই তিনটি দৃশ্যে, একই 'কাপড়ে' দেখা দেন; ইহা যেমনি অসম্ভব, তেমনি হাস্যকর।

এক্ষণে আর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা এ

গীতিনাট্যে আমরা বেশ একটি বিমল কাব্যের আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। গীতিনাট্যের প্রতি বিরাগের একটি কারণ থাকিতে পারে। কয়েকখানি গীতিনাট্যে (শিরীফরহাদ, যাদুকরী) এমন অশ্লীল রসিকতার অবতারণা করা হয় যে, তাহা ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডলাভের উপযুক্ত। এগুলার দোষে, আমাদিগের বাঙ্‌লা রঙ্গভূমির "আবু হোসেন," "আলিবাবা," "মলিনাবিকাশ," প্রভৃতি সুন্দর গীতিনাট্যগুলি, সাধারণের নিকট নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। অভিনেতা বা অভিনেত্রীবর্গের কলুষিত হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গীর জন্য গীতিনাট্যমাত্রই এমন কঠোর দণ্ড পাইতে পারে না। দু'একখানির দোষে যাঁহারা গীতিনাট্যকে একেবারেই আমোল দিনে চাহেন না তাঁহারা সাপ মারিতে যাইয়া লাঠিগাছটি অবধি ভাঙ্গিয়া বসেন। রঙ্গভূমিসম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিলে, ফ্যাশনানুযায়ী 'আলিবাবা,' 'আবুহোসেনের' উপর গালি না পাড়িলে বিদ্যাবত্তা জাহির করা হয় না—কিন্তু নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে হইলে, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, গীতির কাব্যে ও মাধুর্য্যে 'আবুহোসেন,' 'আলিবাবা' উপভোগ্য গীতিনাট্য! যাঁহারা এ দুইখানির উপর খড়্গহস্ত, তাঁহাদিগের বিপুল গাত্রদাহ দেখিয়া কখনো তাঁহাদিগের সাহিত্য-সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না।

রঙ্গভূমির আলোচনাপ্রসঙ্গে সঙ্গীতসম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়া থাকে। 'সাবিত্রী' নাটকে সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রীর সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেকে বলেন, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ। কিন্তু আমরা দেখাইতে চাই, ইহাতে বেশ সুন্দর কাব্য ফুটিয়াছে। মৃত্যু যখন কঠিন হস্তে একবৃন্তে গ্রথিত দুইটি জীবনপুষ্পের মধ্য হইতে, একটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তখন অপরটির হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা তাহা কেবল অনুভব-যোগ্য। এমন ভাষা নাই, যাহাতে সে তীব্র দুঃখ পরিস্ফুট করিয়া

তোলা যায়। গভীর স্তব্ধ নীরবতায় মৃত্যুর ভীষণতা যেমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সহস্র বক্তৃতায় সেরূপ হয় না—সাড়ম্বর বচনবিন্যাস তখন নিতান্ত বিরক্তিকর মনে হয়। একটি প্রাণী মৃত্যুশয্যায় শায়িত,—তাহারি পার্শ্বে সকলে স্তব্ধভাবে, তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে—চিত্রটি মনে করিতেই হৃদয়ে একটি করুণ সহানুভূতির সৃষ্টি হয়! এই সহানুভূতির মধ্যে যে আনন্দ নিহিত আছে, সেটি বিশুদ্ধ নির্ম্মল কাব্যের আনন্দ। অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত হৃদয় হইতে যে হাহাকার উঠে, ঝটিকার মত যে দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হয়, তাহাতেও যে শোকের গভীরতা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটা intellectual জ্ঞানজ-মোহভাব দেখিতে পাই। কিন্তু বাস্তবজীবনে দেখিতে পাই, যাহারা দুর্ব্বল-নারী—তাহারা হৃদয়ে এই গভীর শোক ধরিয়া রাখিতে পারে না —ক্রন্দন ও হা হুতাশের মধ্য দিয়া, তাহাদের শোক ঠিকরিয়া বাহির হইতে থাকে,—এটুকু কাব্যের হিসাবে অশোভন হইলেও (কারণ মন তাহাতে টেঁকে না), তাহাতেও শোকের গভীরতা তেমনি সহানুভূতি আকর্ষণ করে না কি? স্তব্ধ বর্ষারজনীতে যখন ঝিল্লীর স্বরও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন অদূরে বিচ্ছেদশোকার্ত্তা রমণীর করুণ ক্রন্দনের স্বর ঠিক ভৈরবী রাগিণীর ন্যায়ই করুণ ও মধুর মনে হয়। তাহারি অনুকরণে নাট্যকার সাবিত্রীর সঙ্গীতের মধ্যে কাব্যের সার্থকতাটুকু আনিয়া দিয়াছেন। সে সময় "ওগো কি হল গো, এ কি হল!" প্রভৃতি কথা বাহির হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু কবি যদি সেই কথাগুলি সাবিত্রীর মুখে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেন, তাহা হইলে, কাব্যের প্রতি তিনি গুরুতরভাবে অপরাধী হইতেন বলিয়া মনে করি; কারণ 'সাবিত্রী' নাটকে সামাজিক ছবি প্রতিফলিত হইতেছে না,—Idealই তাহার সর্ব্বস্ব। সেস্থলে যদি ঐরূপ শোকের অত্যুচ্ছ্বাসভাবটাকে তিনি

কাব্যরস রক্ষিত হইল, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলাল কি যামিনী যদি গান গাহিত, কিম্বা সরলার মৃত্যুশয্যায় বিধুভূষণ কিম্বা শ্যামা যদি ভৈরবী রাগিণীতে গান ধরে, তবেই কাব্যরস বেচারী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে। এই সহজ কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, রঙ্গভূমিতে আমরা সত্যের ছবি প্রতিফলিত দেখিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কাব্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জড়িত আছে—সে কথাটি ভুলিলে রঙ্গভূমির প্রতি অবিচার করা হয়।

রঙ্গভূমির আর দুইটি দোষ—তিনচারিখানি পুস্তকের অভিনয়ে সারারাত্রি দর্শক ও অভিনেতৃগণকে কষ্ট দেওয়া। অবশ্য, এ ক্ষেত্রে রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষ দর্শককে সারারাত্রি অভিনয়দর্শনে বাধ্য করিতেছেন না। দর্শক তাঁহার ক্লান্তি বুঝিয়া চলিয়া আসিতে পারেন—কিন্তু যে কাণ্ড-জ্ঞানহীন দর্শক স্বাস্থ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সারারাত্রি অভিনয় দর্শন করিবেন, তিনি আপনার পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিবেন। তবে বেচারী অভিনেতৃবর্গের সম্বন্ধে আমরা ইহা ঘটিতে দিব না। সত্বাধিকারীর আর্থিক উদ্দেশ্যে অভিনেতৃবর্গের যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহার জন্য সত্বাধিকারিগণকে দণ্ড দিবার জন্য রাজসরকারে বিল পাশ হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি! আর একটি অত্যাচার—কন্সার্ট!—ইহা যেমনি দীর্ঘ তেমনি বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহারও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এখানে আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি যে বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় ষ্টার থিয়েটার এই দুইটী দোষ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া এখনো স্বগৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন!

রঙ্গভূমির স্বপক্ষে যিনি যাহাই বলুন না কেন, বোধ হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অধুনা রঙ্গভূমিতে শীলতা ও রুচির মর্য্যাদা সেরূপ

বন্ধন যেমন একেবারে ভগ্ন করিয়া অসংযমের পঙ্কিল প্রবাহে রঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিরাম হইয়াছে। ইহার জন্ম রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষকেই আমরা একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করিতে পারি না। রঙ্গভূমির পরিচালনাভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইচারিজন ভিন্ন সকলেই অশিক্ষিত। তাঁহাদের শিক্ষার অভাব এবং শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহানুভূতির অভাব, এ দুইটিকেই আমরা এ বৈষম্যের জন্ম তুল্যরূপ দায়ী করিতে পারি। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত রঙ্গভূমির সম্পর্ক কতটুকু! ক্বচিৎ একটিরাত্রিমাত্র রঙ্গভূমিতে কয়েক ঘণ্টার জন্ম তাঁহারা অভিনয় দর্শন করিয়া আসেন মাত্র। দৃষ্ট অভিনয়ের দোষগুণ-আলোচনা তাঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে একবারও ধরেন না। রঙ্গভূমির অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত পরিচালকবর্গ, যে পাত্র আনন্দের জন্ম তাঁহাদের সম্মুখে ধরেন, তাহা হলাহলমিশ্রিত হউক বা যাহা হউক, দর্শকসম্প্রদায় তাহাই উপভোগ করিয়া বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করেন। ইহাতে যথেচ্ছাচার চলিবে না কেন? কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী, আচার ও শীলতাবর্জ্জিত কথাবার্ত্তা তখনি তাঁহাদের শাণিত সমালোচনার দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গোলযোগ ও অসুবিধার সম্ভাবনা। তাঁহারা যদি অভিনয়দর্শনান্তে সংবাদপত্রদ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে, অভিনয়ের দোষগুণের আলোচনা করেন, তবেই এ দোষ নিরাকৃত হইতে পারে। কুৎসিত রুচির অবতারণা ও শীলতা বর্জ্জন করিয়া, রঙ্গভূমি দর্শককে অধিককাল বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাহা উত্তেজক সুরার ন্যায় কিয়ৎকাল কয়েকজন দর্শকের মোহ আনিয়া দিলেও, রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ এ কথা মনে রাখিবেন যে, সকলেই সুরার অনুরাগী নহেন এবং পূর্ব্বোক্ত মোহের পর অচিরে অবসাদ উপস্থিত হইবেই। একথার যাথার্থ্য সম্প্রতি একটি বিশেষ

এ দোষ আর একটা উপায়ে নিরাকৃত হইতে পারে,—যদি প্রত্যেক রঙ্গভূমির কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির মধ্যে কয়েকজন সাহিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিকে অবৈতনিকভাবে Directors (পরিচালক) স্বরূপ গ্রহণ করা হয়। পুস্তকানির্ব্বাচন সম্বন্ধে, রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অধীনে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে সেরূপ সাহিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি থাকিলে (যেমন গিরীশ বাবু, অমৃত বাবু বা ক্ষীরোদ বাবু)---তিনিও উক্ত সমিতিভুক্ত থাকিবেন। একটা কথা যে শুনা যায়, দর্শকের রুচিঅনুযায়ী, তাঁহারা কুরুচিসম্পন্ন নাটকের অভিনয়ে বাধ্য হইয়া প্রবৃত্ত হন্, নচেৎ দর্শকাভাবে তাঁহারা জীবিকার্জ্জনে সক্ষম হইবেন না—এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। দর্শকের রুচি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অনেকটা তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে। প্রথম যখন “প্রতাপাদিত্যের” অভিনয় হয় তখনই একথা সকলে সম্যক বুঝিতে পারিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা, দুর্গাদাস, মীরকাসিম প্রভৃতির অবতারণায় মিনার্ভা থিয়েটার আমাদিগের জাতীয় ভাবোন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য স্বদেশবাসীমাত্রেই মিনার্ভা থিয়েটারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু ইহার পরই সেই মিনার্ভায় “শিরীফরহাদ,” “লুলিয়া” প্রভৃতি কদর্য্য গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া আমরা প্রকৃতই মর্ম্মাহত ও নিরাশ হইয়াছি। এখানে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য, কি মিনার্ভা থিয়েটার, বেচারী দর্শকের রুচি আক্রমণ করিবেন? তাহা যদি করেন, তবে এটি তাঁহাদিগের পক্ষে অতি নির্লজ্জ কৈফিয়ৎ! নিরক্ষর দর্শকের মুখ চাহিয়া যদি রঙ্গভূমি চালাইতে হয়, তাহা হইলে রঙ্গভূমির আনন্দ “তাড়িখানায়” বসিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক রঙ্গভূমি এক্ষণে আমাদের সমাজে একটি প্রয়োজনীয়

কটূক্তিতে বা মতদ্বৈধে কিছুতেই খণ্ডিত হইতে পারে না। অতএব, আমরা এই অভিনয়মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে মনোজ্ঞ এবং গর্ব্বের সামগ্রী স্বরূপ দেখিবার বাসনা করি।

রঙ্গভূমির উন্নতির আর একটি অন্তরায়, অভিনেতা বা অভিনেত্রী-বর্গের, ক্রমাগত এক রঙ্গভূমির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর রঙ্গভূমিতে যোগদান। যতদিন না এই জীবিকার্জ্জনের সহিত অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মনে অভিনয়কলার প্রতি একটা অনুরাগ দৃঢ়রূপে বিজড়িত হইবে, ততদিন অভিনয় সেরূপ পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না, এবং ক্রমাগত সম্প্রদায়পরিবর্ত্তনে ইঁহাদিগের শিক্ষাও বিকৃত হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমাদের প্রধান বক্তব্য, শিক্ষিতসম্প্রদায় রঙ্গভূমি হইতে নিতান্ত দূরে থাকিলে চলিবে না : সহানুভূতি ও শিক্ষার পবিত্র ধারায় তাঁহারা রঙ্গভূমির পঙ্কিলতা বিমুক্ত করিয়া দিউন। আমাদের সাধারণের এই আনন্দমন্দির, এই কাব্যালোকপ্রতিভাসিত "বিচিত্রস্বপ্নজালের দ্বারা অপূর্ব্ব মায়ামণ্ডিত" আনন্দকেতনের সংস্কারে, মনোযোগ অর্পণ করুন। তাঁহাদের সহানুভূতির অভাবে, যদি এই নাট্যমন্দির অধঃপাতে যায়, তাহা হইলে বিশেষ লজ্জার কথা। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দ প্রভৃতিকে সজীব দেখিয়া, মহাকবিকে আরো দ্বিগুণ আনন্দের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিব—যেখানে রাম, প্রতাপ, শিবাজী, ভীষ্ম প্রভৃতির আদর্শ চরিত্র, স্বকীয় জীবনযাত্রার পথে ধ্রুবতারার ন্যায় রাখিয়া চলিব, সেস্থান সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জ্জিত দেখিতে সকলেরি অধিকার আছে। এই সমবেত সহানুভূতির দ্বারা, আমাদিগের রঙ্গভূমি যে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দের মন্দির হইয়া দাঁড়াইবে—সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বোবার কথা।

ভাব ও ভাষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

আমাদিগের ভাষা কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সহজেই অনুভূত হয় যে, পরস্পরের মনোভাবব্যঞ্জক উপায়ের নাম ভাষা। সমগ্র জীবজগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যাহার মন আছে, তাহারই মনোভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা আছে ; তাহারই আবার তাহা প্রকাশেরও উপায় আছে। সেই মনোগতপ্রকাশক উপায় মনষ্মাণ প্রাণি-নিচয়ের মানসিক উন্নতির পর্য্যায়ক্রমানুসারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মানবেতর প্রাণি-নিচয়ের মনোগত প্রকাশক উপায় বা ভাষা যত সীমাবদ্ধ ও স্বল্পপরিসর, মানবভাষা তদপেক্ষা অনেক প্রশস্ত ও প্রচুর। মানবসমাজের অতি নিম্নস্তরের ভাষা এবং উচ্চ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজের ভাষা পরস্পর তুলনা করিলে, মানব ও মানবেতর প্রাণীর ভাষার যতদূর পার্থক্য অনুভূত হয়, মানবের উচ্চ ও নিম্নতম স্তরেও প্রায় সেইরূপই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কি মানব, কি পশুপক্ষী ইতর প্রাণী সকলেরই মধ্যে একটী সাধারণতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয় ; তাহা এই যে, সকলেই কণ্ঠস্বরকে ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। মানবেতর প্রাণি-নিচয়ের কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতাই বিভিন্ন-ভাবজ্ঞাপক। কিন্তু মানব-সমাজে বিভিন্ন স্বর ও বাক্যের বিভিন্নতা দ্বারা ভাবের পার্থক্যানুভব হইয়া থাকে। সমাজের মানসিক উৎকর্ষ দ্বারা বাক্যের শ্রী ও সম্পন্নতা বৰ্দ্ধিত হয়, সমাস ও অলঙ্কারভূষিত হইয়া ভাষা ক্রমশঃ জটিল হইতে

থাকে। পরস্পরের মনোভাবব্যঞ্জক উপায়কে ভাষা সংজ্ঞাতে অভিহিত করিলে দেখা যায় যে, কথাই আমাদিগের ভাবাভিব্যক্তির একমাত্র উপায় নহে। এবং ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বাক্য-কথন-প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নহে; যেহেতু বাক্যের সহিত বাক্যানুমোদিত বস্তুর কোনও সাদৃশ্য নাই। বাক্য সাধারণতঃ বস্তুর জ্ঞাপকস্বরূপে সর্ব্বানুমোদিত ও পরিগৃহীত। মা ও থা, দুইটি কণ্ঠরব একত্রিত হইলে যে বস্তুর বোধক হয়, সেই বস্তুর সহিত এই শব্দের কোনও সাদৃশ্য নাই, অপিচ "মাথা" কথাটী দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, ইংরাজ বা ফরাসী সেই বস্তু বুঝিবে না; পরন্তু কোনও কথা না বলিয়া মাথায় হাত দিয়া দেখাইয়া দিলে মাথা কি তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কথিত ভাষা মানবসমাজানুমোদিত ভাবব্যঞ্জক কৃত্রিম উপায় মাত্র; অথচ ইহার প্রাধান্য অসীম। ইহাও সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কোনও কথা না বলিয়া কেবল মাত্র ঈঙ্গিতদ্বারা মনোগত ব্যক্ত হইয়া থাকে। হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক ভাববিপর্য্যয়ে স্বতঃই মুখভঙ্গীর বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়। সবিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ঈদৃশ মনোভাববিপর্য্যয়ের আনুসঙ্গিক বদনভঙ্গীর বৈলক্ষণ্য মনো-ভাব-প্রকাশের একটী স্বাভাবিক উপায়; কথা যেমন শিক্ষা না করিলে বলিতে পারা যায় না, ইহা তেমন নহে; ও হৃদয়ে ভাবের আবেশ হইবামাত্রই বদনমণ্ডলে তাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে। মানবের মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। মনোভাবানুক্রমিক পরিবর্ত্তনক্ষমতা মনুষ্যেতর অন্য কোনও জীবের বদনে ঈদৃশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না।

কথিত বাক্য মুখবিনিঃসৃত হইলেই তাহার অস্তিত্ব লোপ হয়। বাক্য বক্তার সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলে স্পন্দিত হইয়া শ্রোতার কর্ণপটাহে প্রতিহত হইতে থাকে, ও সেই প্রতিঘাতানুভূতি, অনুভাবক স্নায়ুনিচয়

উচ্চারিত স্বরের সহিত লিখিত বর্ণনিচয়ের সৌসাদৃশ্য নাই। লিখিত বর্ণ বা অক্ষর উচ্চারিত স্বরের যদৃচ্ছাকল্পিত প্রতিরূপমাত্র। কথিত ভাষাকে স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে, লিপিপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে কথিত বাক্যাদির ন্যায় লিখিত বাক্যেরও স্বাভাবিকতা কিছুই নাই। লিখিত শব্দসমূহের পঠনকালে শ্রুতপূর্ব্ব বাক্যসমূহের স্বর ও বোধ মনোমধ্যে উদ্দীপিত হইয়া তৎ তৎ বাক্যানুমোদিত ভাবের উন্মেষ করাইয়া দেয়। অপিচ লিপিকলার প্রচলনদ্বারা মানবসমাজ যে কতদূর উন্নতি করিতে সক্ষম হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই লিপিকলা প্রচলিত না থাকিলে যুগে যুগে ও দেশে দেশে মানবের উন্নতির সহায়ক বা সহযোগী কেহই হইতে পারিত না। যাহার জ্ঞান তাহারই হৃদয়ে বা তাহার অতিসন্নিহিত দুই একটি মানবহৃদয়ে উন্মেষিত হইয়া তাহা আবার তাহাদিগের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হইত। সমগ্র মানবসমাজ বা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানবকে অনন্য-সাহায্য-সাপেক্ষ হইয়া উন্নতি করিতে হইলে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, কঠোর পরিশ্রম ও প্রযত্নদ্বারাও বর্ব্বরতার সীমা অতিক্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইতে হইত। কথিত হইয়াছে, লিখিত ভাষা কথিতভাষার প্রতিরূপ মাত্র। কথিত ভাষার স্থায়িত্ব নাই। লিখিত ভাষার স্থায়িত্ব দীর্ঘকালব্যাপী। পরন্তু লিখিত ভাষা কথিত ভাষার প্রতিরূপ হইলেও লিখিত-ভাষাদ্বারা মনোগত প্রকাশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন কোনও বাক্য শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষে কথিত ভাষার প্রতিরূপস্বরূপ লিখিত ভাষাকে ভাবপ্রকাশের উপায় করিয়া লওয়া কষ্টসাধ্য হইলেও, একেবারে অসম্ভব নহে।

মানব সামাজিক জীব। পরস্পরে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরস্পর পরস্পরের নিকট মনোভাবের আদান

প্রদান করিতে না পারিলে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়, ও আপনাকে অপরের বোধগম্য করিতে যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করে; কেবলমাত্র কথায় নির্ভর করিতে না পারিয়া নানাবিধ আকারেঙ্গিতের সহায়তা অবলম্বন করে এবং তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়। ঈদৃশ আকারেঙ্গিত কথিত ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইলে. সেই কথিত ভাষা অধিকতর স্পষ্ট হয় ও এই সমুদায় মুদ্রা প্রদর্শনমার্জ্জিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে ভাষাও কিয়ৎপরিমাণে সুদৃশ্য ও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠে।

মানব যখন প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুর আকার ও অবয়বের সহিত বিশেষ পরিচিত হয়—তৎ তৎ বিষয়ের ব্যাখ্যানসময়ে সেই সেই পরিচিত আকৃতি—অঙ্কনদ্বারা তাহার সম্যক বোধ জন্মাইতে চেষ্টা করে। ইহারও মূলে পরস্পরের নিকট সম্যক বোধগম্য হইবার প্রবল ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে। চিত্রলিপিদ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টার ফলে প্রাচীন মৈশরগণ আমাদিগের জন্য চিত্রসাহিত্য রাখিয়া গিয়াছেন; এই চিত্রসাহিত্য হইতে আমরা তাহাদিগের সাময়িক সভ্যতা সামাজিকতা ও আচার নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইতেছি। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার যে সম্বন্ধ, ইঙ্গিত বা সাঙ্কেতিক ভাষার সহিত চিত্রলিপিরও সেই সম্বন্ধ।

উল্লিখিত প্রণালী-নিচয় পর্য্যবেক্ষণ করিল দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহারা প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ বা সাপেক্ষভাবে মনোভাবব্যঞ্জক; সুতরাং ভাষারূপে প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য। বিবর্ত্তনক্রমে কথিত ভাষা ও লিপিপ্রণালী বর্ত্তমানে সর্ব্বোপরি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্যান্য উপায়েরও একেবারে বিলোপ সাধিত হয় নাই। ভাবপ্রকাশক উপায়নিচয়ের নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে

লিপিকলা (৪) ইঙ্গিত (৫) চিত্রলিপি বা চিত্রাঙ্কন। এই পঞ্চবিধ উপায়ের মধ্যে কেবলমাত্র মুখভঙ্গি ও স্বরবিপর্য্যয় ব্যতীত অপর কিছুই স্বাভাবিক নহে; সকল প্রণালীই কৃত্রিম ও অভ্যাসসিদ্ধ।

যাহা স্বভাবদত্ত তাহা কাহাকেও চেষ্টাদ্বারা লাভ করিতে হয় না সত্য, কিন্তু শিক্ষা ও অভ্যাসদ্বারা যে তাহা মার্জ্জিত ও পরিস্কৃত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহ। মানসিক আবেগ মনঃসমন্বিত যাবতীয় জীবের সাধারণ সম্পত্তি হইলেও সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানবে তাহা অধিক সংযত ও পরিস্কৃত ও মানব সমাজের উচ্চতর স্তরে তাহা আরও সুসংযত। যাহার মানসিক গতি বা আবেগ যতদূর সুসংযত ও অনাবিল, তাহার ভঙ্গিও তত পরিস্কৃত, সহজবোধগম্য ও ভাবপ্রাখর্য্যপূর্ণ। মনস্বী সাধুব্যক্তির সামান্যমাত্র ভ্রূভঙ্গির নিকটে অতি কঠিনহৃদয় দুর্বৃত্ত নৃশংস দস্যুও পরাজিত হইয়া থাকে, ইহা একপ্রকার অহরহ-প্রত্যক্ষ ঘটনা। এবম্বিধ ক্ষেত্রে একমাত্র ভ্রূভঙ্গির অন্তরালে কত তীব্র ভর্ৎসনা, মধুর সান্ত্বনা, সহানুভূতি, প্রেম ও ক্ষমা যুগপৎ বিরাজিত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? সদালাপ, সৎচিন্তা ও সৎসংসর্গদ্বারা মানবের যতই মানসিক পূর্ণতা সম্পন্ন হইতে থাকে, ততই তাহার আবেগ নিচয়ের দৃঢ়তা ও অনাবিলতা সাধিত হয়, ও ভঙ্গির প্রাখর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এস্থলে প্রসঙ্গাধীন একটী নিত্য প্রত্যক্ষ সত্যকথার উল্লেখ না করা নিতান্ত অবৈধ। বিশেষ অনুধাবন করিলে স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, মানবের মুখভঙ্গির এমন কি ক্ষমতা আছে যে অপরের চিত্তে স্বীয় ভাব অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়? কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তরে নিহিত অতি গোপনীয় ভাবকণাও যে অপর চিত্তগ্রাহ্য তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণের অভাব নাই। কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন যে গোপালকের নির্দ্দয় কষাঘাত অপেক্ষা কস্‌সবের* কোমল

ব্যবহারে গবাদি পশুসকল নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও অদম্য হইয়া উঠে! সকলেই জানেন শিশু ও পশু মন বুঝে! সকলেরই প্রায় কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত প্রথম পরিচয় হইতেই সম বা বি-সম একপ্রকার ধারণা জন্মিয়া থাকে ও বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগদ্বারাও সেই ধারণার বিপর্য্যয় সম্ভব হইয়া উঠে না! এই প্রকার ভাবানুভূতির কারণ কি? যদিও মানবজ্ঞান বা বিজ্ঞান ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে এ পর্য্যন্ত অক্ষম থাকুক বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মনোবৈজ্ঞানিকের মতে ইহার কোনও কারণ নির্দ্দিষ্ট থাকুক বা না থাকুক তদ্বিষয়ের বিচার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কার্য্যকারণসমন্বিত বিশাল বিশ্বরাজ্যে ঈদৃশ ঘটনা অকারণসম্ভূত হইলেও এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও আপত্তির কারণ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু কথাদ্বারাই হউক, ইঙ্গিতদ্বারাই হউক বা ভঙ্গিতেই হউক একে অপরের ভাব বুঝে কেন? কথা, ইঙ্গিত ও ভঙ্গির এমন কি ক্ষমতা আছে যে একের নিকট অপরের ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে? পরন্তু নিজের কথা, ইঙ্গিত বা ভঙ্গির বিস্তার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে নিজেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় ও মনে হয় 'যাহা নিজেই বুঝি না অপরে তাহাদ্বারা কি প্রকারে বুঝিবে?' কিন্তু সকলেই বুঝে। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, মনপ্রাণ জীবসমূহের মধ্যে ভাবজ্ঞাপিনী ও ভাবগ্রাহিনী একপ্রকার ক্ষমতা আছে। এই শক্তি প্রভাবে একের মনোভাব অপরের বোধগম্য হইয়া থাকে। মানব সমাজের নিম্নতম ও উচ্চতম পর্য্যায়ের ভাব ও ভাষাগত পার্থক্য অনুশীলন করিলে স্বতঃই এই ভাব মনোমধ্যে উদিত হয় যে, যদি ক্রমোন্নতিপন্থাবলম্বনপূর্ব্বক নিম্নতম স্তর হইতে মানব বর্ত্তমান যুগের উচ্চতম সীমাতে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে কে বলিতে

মানবের বা জীবের মনোগত ভাবপ্রকাশের জন্য কেবলমাত্র মনোভাব ব্যতীত অন্য কোনও উপায় অবলম্বন না করিলেও চলিতে পারিবে? সেই দূরাকাঙ্ক্ষিত, স্বপ্নদৃষ্ট—প্রলোভনবৎ অনিশ্চিত ও সত্যবৎ-প্রতীত উন্নতির সেই দূরস্থিত সোপান আরোহণের জন্য মানবসমাজ চেষ্টিত হইবে কি? ফলতঃ বর্ত্তমান মানবসমাজের প্রবল উন্নতি-আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাহার সীমা পরিলক্ষিত হয় না, এবং মনে হয়, তাহার লক্ষ্য সুদূরদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধগণেরও দৃষ্টিব্যাপিকা সীমার অতিদূরে অবস্থিত, বা অসীম স্বপ্নদৃষ্ট-প্রলোভনের মত অনিশ্চিত!

বর্ত্তমান সময়ে কথিত ভাষাই আমাদিগের ভাবাভিব্যক্তির প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। ইহারই সাহায্যে আমরা সুখেদুঃখে, সম্পদে বিপদে, পরস্পরের মনোভাবের আদানপ্রদান করতঃ চরিতার্থ হই। লিপিকলা সাহায্যে গ্রন্থিত ইহাই আমাদিগের দেশ ও কালগত দূরত্বের লাঘবকরতঃ সুদূর অতীতকে বর্ত্তমানে পরিণত করিতেছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। যুগে যুগে মনস্বীগণ সময়ের ভিত্তির উপরে ভাষাসাহায্যে যে সমুদয় জ্ঞানস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, কত লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক তদ্দর্শনে স্বীয় উন্নতি পথের পথিক হইয়াছে, ও কত মহামনস্বী ভাস্কর সেই সমুদয় স্তম্ভে, স্বীয় জ্ঞানবলে নূতনতর চারুকারুকার্য্য অঙ্কিত করিয়া ভবিষ্যৎ পর্য্যটকদিগের পন্থা সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। সকলেরই মূলে মানবের ভাষা! বিশেষতঃ বাক্যকথন ভাষা ও লিপিকলাসহকারে অতি পুরাকাল হইতে সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার মানবসমাজের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই যথেচ্ছ জ্ঞান সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সে জ্ঞানের লেশ নাই—সীমা নাই। হায়! যাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ জীব,

যে ভাষা ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই জল ও বায়ুর ন্যায় মানবের সাধারণ সম্পদ—তাহাদের অভাব কি নিদারুণ ?

যাহারা আত্মীয়স্বজনপরিবেষ্টিত বহুজনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ সংসারে অবস্থিত থাকিয়াও স্বীয় মর্ম্মের ব্যথা ও প্রাণের আনন্দ জানাইতে পারিল না, সুখেদুঃখে কাহাকেও সঙ্গী করিতে পারিল না—নীরবে আসিয়া নীরবেই চলিয়া গেল, বসুন্ধরার মনোমুগ্ধকর সুমধুর গীতধ্বনিতে যাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও পুলকিত হইতে পারিল না, তাহার কষ্ট কি দুরপনেয়! তাহার মর্ম্মবেদনা কি গভীর! মানব, ভাষা ও লিপিকলাসহায়ে মহামহিমান্বিতা প্রকৃতির যে উদ্বোধিনী মহামন্ত্রশ্রবণে আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই উদ্বোধিনী বাণী—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত—সাদর সম্ভাষণে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে যাহারা প্রকৃতির সেই সুমধুর অভয়বাণী শ্রবণ করিতে পারিল না, তাহাদের অবস্থা কতদূর শোচনীয়—সেই হতভাগ্য মূকবধিরদিগের অবস্থার বিষয় ভাবিলে কোন্ মানবহৃদয় না ক্ষোভাবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে! মানব সমাজের অংশীভূত এই অভাগা মূকবধিরদিগের কি শিক্ষার কোনও উপায় হইতে পারে না? সমাজ তদীয় অঙ্গীভূত মূক-বধিরদিগের শিক্ষায় উদাসীন নহে। দেশদেশান্তরে মনস্বীগণ এই অভাগাদিগের শিক্ষাকল্পে স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ও তাঁহাদের উদ্যমের ফলে বহু চিরবধির শিক্ষিত হইতেছে। দেখা যাউক ভাষাশিক্ষায় ইহাদিগের কি অভাব? ও কি উপায়ে সেই অভাবের কিয়ৎপরিমাণ অপনোদন করা যাইতে পারা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক।

ইতালীর নবজীবন।

ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই এই কথা মনে হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় সুবিশাল সাম্রাজ্য যাহাতে বিভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষা ও আচারব্যবহার বিশিষ্ট জাতির বাসস্থান, এরূপ বৃহৎ দেশ- কখন কোথায়ও একীভূত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারতের বিস্তৃতি সম্বন্ধে দেখা যায় যে, ভারত রুশ-বর্জ্জ য়ুরোপখণ্ড অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। আসীয়ার মধ্যে এক চীনসাম্রাজ্য ভারতের ন্যায় বিস্তীর্ণপরিসর। আমেরিকার মধ্যে কেবল যুক্তরাজ্যের ও কানাডার, ভারতের সহিত তুলনা হইতে পারে, কিন্তু উভয়রাজ্যেরই লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। আজকাল কোন কোন বিষয়ে অষ্ট্রীয়ার সহিত ভারতের তুলনা করা যাইতেছে; কিন্তু বিস্তৃতি কিম্বা জনসংখ্যায় অষ্ট্রীয়া কোনক্রমেই ভারতের সহিত উপমিত হইতে পারে না। রুশ আয়তনে ভারত অপেক্ষা বড়, কিন্তু জনসংখ্যায় অনেক কম। নিম্নলিখিত তালিকাদৃষ্টে বিভিন্ন দেশসমূহের বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার উপলব্ধি হইবে।

দেশের নাম	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা
ভারতবর্ষ	১,৮০০,০০০	২৯০,০০০,০০০
চীন	ঐ	৩২০,০০০,০০০
ইতালী	১১০,০০০	৩২,০০০,০০০
যুক্তরাজ্য	৩,৫০০,০০০	৮০,০০০,০০০
কানাডা	ঐ	৫,০০০,০০০
অষ্ট্রীয়া	২৬৪,২০৪	৪৪,৫০০,০০০
রুশ	২,০৮১,০২২	১০৬,০০০,০০০
[illegible]	১৫৭,০০০	৪৭,০০০,০০০

এইত গেল বর্ত্তমান সময়ের কথা। অতীত ইতিহাসের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে আজকাল যেরূপ ব্রিটীস সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, এরূপ একচ্ছত্রী রাজত্ব, বোধ হয়, পুরাকালে কখনও স্থাপিত হয় নাই। বিশেষতঃ আজকাল ভারত যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর আবাসস্থল, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও এক সময়ে রোমকসাম্রাজ্য কিম্বা ম্যাসিডনসাম্রাজ্য অতিবিস্তৃত ছিল বটে, কিন্তু সে সকল সাম্রাজ্য অন্যরূপ ছিল। সে সকল কেবল একটী নগরের কিম্বা ক্ষুদ্র দেশের লোকের দ্বারা শাসিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ; যেমন অধুনাতন ব্রিটিস সাম্রাজ্য।

আয়তনগত পার্থক্য অপেক্ষা ব্যক্তিগত পার্থক্য আরও অধিক। পুর্ব্বোল্লিখিত কোন বিশাল রাজ্যেই এত বিভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন ভাষা ও আচারব্যবহারবিশিষ্ট ব্যক্তি নাই; এত বেশী জাতিগত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত, ভাষাগত, আচারগত পার্থক্য অন্য কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ভারতে হিন্দু ও মুসলমানে যে পার্থক্য জগতের অন্য কোন স্থানে এত পার্থক্যযুক্ত ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে কিনা সন্দেহ! মুসলমানের সহিত যে হিন্দুর কেবল জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও আচারগত পার্থক্য আছে তাহাই নহে, বিজেতা ও বিজিতভাব উভয়ের মধ্যে এখনও কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান আছে। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে আমরা ইহা দেখিতে পাই যে শ্বেতাঙ্গ বিজেতার সংঘর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ বিজিত জাতি একেবারে লোপ পাইয়াছে। যুক্তরাজ্যের অধুনাতন ইতিহাস—শ্বেতাঙ্গের মধ্যে পরস্পরযুদ্ধ। সুতরাং সেখানে ভারতের ন্যায় এত পার্থক্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। কেনাডার ইতিহাসও প্রায় এইরূপ। চীনসাম্রাজ্যেও এত

যায় বটে, কিন্তু ইহা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। বিশেষতঃ অষ্ট্রীয়া বৈদেশিক-রাজ-শাসিত নহে। ইতালীসম্পর্কেও আয়তনসম্বন্ধীয় আপত্তি খাটে বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ইতালীর তৎকালীন অবস্থার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইতালীর সহিত ভারতের আরও অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথমেই ভারতের সহিত ইতালীর ভৌগোলিক সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় ইতালীও সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা; ভারতের ন্যায় ইতালীও "নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল" এবং "অম্বরচুম্বিত ভাল-হিমাচল"; ভারতের ন্যায় ইতালীরও অতীত ইতিহাস অতিশয় গৌরবান্বিত। ইতালীও ভারতের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজত্বে স্বাতন্ত্র্যভাব বিরাজিত। ইতালীতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টগণের মধ্যে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিভাব দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার সহিত হিন্দুমুসলমানের বিদ্বেষ কতকটা উপমিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সৌসাদৃশ্য, ইতালীর অষ্ট্রীয়ার অধীনতা স্বীকার এবং ভারতের ইংরাজের নিকট অধীনতা। এই সম্পর্কে প্রাতঃস্মরণীয় ম্যাটসিনি সার জেমস্ গ্রাহামকে লম্বার্ডির অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"লম্বার্ডিতে প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ লোক রহিয়াছে যাহাদের আত্মা অমর; যাহাদের প্রভূত শক্তি আছে, যাহাদের হৃদয় উচ্চভাবে পূর্ণ, যাহারা স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী, যাহারা তাহাদের অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছুক, যাহারা তাহাদের একমাত্র প্রভু ঈশ্বরের অধীনত্বে আসিয়া জাতির উন্নতিপ্রয়াসী। কিন্তু তাহাদের দেশ তাহাদের নয়, তাহাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। পরস্পরের

যাহারা তাহাদের মনের ভাব, অভাব এবং ইচ্ছাবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহারা তাহাদের শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের ইতিহাস ও জনশ্রুতি অষ্ট্রীয়ান সৈনিকের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত, তাহাদের অমর-আত্মা অষ্ট্রীয়ারাজ ও তাঁহার টাইরোলস্থ প্রতিনিধিগণের অদম্য স্বেচ্ছাচারিতার অধীন। অথচ আপনারা নিশ্চিন্ত হৃদয়ে প্রশ্ন করিতেছেন যে, তাহাদিগকে কোন্ কোন্ কর দিতে হয়, এবং তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এক আনা কম কিম্বা বেশি! তাহারা যেরূপ করই প্রদান করুকনা কেন, তাহাই অত্যধিক, কারণ সে কর তাহাদের নিজেদের স্থাপিত বা কর্ত্তৃত্বাধীন নয়। তাহাদের খাদ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্য হউক বা না হউক তাহা অশ্রুসিক্ত, কারণ তাহা ক্রীতদাসের খাদ্য। *

---

* "There are over then (in Lombardy) from four to five millions of human creatures gifted with immortal soul, with powerful faculties, with ardent and generous passions ; with aspirations towards free agency, towards the ideal which their fathers had a glimpse of, which nature and tradition point out to them ; towards a national union with other millions of brother souls in order to attain it ; from four to five millions of men desiring only to advance under the eye of God, their Only Master, towards the accomplishment of a social task which they have in common with 16 or 17 millions of other men, speaking the same language, treading the same earth, cradled in their infancy in the same maternal songs, strengthened in their youth by the same Sun, inspried by the same memories, the same sources of literary genius. Country, liberty, brotherhood, all are wrested from them ; their faculties are mutilated, curbed, chained, with a narrow circle traced for them by men who are strangers to their tendencies, to their wants, to their wishes, their tradition is broken under the cane of an Austrian Corporal ; their immortal soul feudatory to the stupid caprices of a man seated on a throne at Vienna, to the caprices of the Tyrolese agents ; and you go on indifferent, coolly inquiring if these men be subject to this or that tariff, if the bread that they eat costs them a half-penny more or less ! That tariff, whatever it is, is too high ; it is not *they* who have had the ordering of it ; that

লম্বার্ডির অধিবাসীগণসম্বন্ধে ম্যাটসিনি যে সকল কথা প্রয়োগ করিয়াছেন সে গুলি অনেকপরিমাণে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রীয়ার অধীনতায় ইতালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, আমরা আজকাল সেইরূপ অবস্থায় রহিয়াছি। সুতরাং যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া, ইতালী নবজীবন লাভ করিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত ; কারণ তাহাতে আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য পথনির্দ্ধারণে অনেক সহায়তা লাভ করিতে পারিব।

ফরাসীবিপ্লব য়ুরোপে এক যুগান্তর উপস্থিত করে। এই বিপ্লবের দুইটী মহৎ শিক্ষা,—প্রথম, মনুষ্যের ব্যক্তিগত অধিকারের অভিব্যক্তি, দ্বিতীয়, জাতিগত অধিকারের অভিব্যক্তি "Rights of man as man and the rights of nationalities as nationalities"। ব্যক্তিগত অধিকারের অভিব্যক্তির ফল ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ; জাতিগত অভিব্যক্তির ফল ইতালীর স্বাধীনতাস্থাপন। তাই জনৈক লেখক বলিয়াছেন "The malarious tranquility of Italy beneath her Austrian and Bourbon despots, was recently shaken by the French Revolution"।

"অষ্ট্রীয়া ও বুরবো রাজগণের কঠোর শাসনে ইতালীতে যে অস্বাভাবিক শান্তি স্থাপিত ছিল, তাহা ফরাসীবিপ্লবে বিদূরিত হইয়া গেল।"

প্রথমতঃ, স্থূলভাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে ইতালীর উদ্ধার কার্য্যে তিনপ্রকার লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল,—Statesman, Prophet and Crusade or Knight-errant অর্থাৎ রাজনীতিজ্ঞ, উপদেষ্টা ও উদ্দীপয়িতা ও কর্ম্মবীর—রাজনীতিজ্ঞ কাভুর, উপদেষ্টা ও দেশভক্ত ম্যাটসিনি, এবং কর্ম্মবীর গ্যারিবল্‌ডী। এই তিনজন মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া, একই উদ্দেশ্যসাধনে কৃতসংকল্প

এই তিনজন মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিলে আমারা দেখিতে পাই যে,কয়েক শতাব্দীর বৈদেশিক রাজত্বে ও অত্যাচারে ইতালীয়গণের নৈতিক চরিত্রের অত্যন্ত অবনতি হইয়াছিল। সংসাহস ও অধ্যবসায় ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না। বিশেষতঃ অষ্ট্রীয়া এরূপ কুট রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিল যে প্রত্যেক ইতালীয়ের কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হইত, এবং বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইলেই তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হইত। এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কবি গাহিয়াছেন :—

"ইতালী! তুমি এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত, এখন তোমার উদ্ধারের আশা দুরাশামাত্র। তোমাকে এখন ভালবাসা উন্মাদের কার্য্য, তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করা এবং প্রাণপাত বৃথা বলিয়া মনে হয়—তোমার এমন দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু এমন দুর্দ্দিনেও তোমার এরূপ সন্তান জন্মিয়াছে, যাঁহারা তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া তোমাকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন।" *

অবশ্য শেষ দুই ছত্রে ম্যাটসিনি, গ্যারিবলডি কাভুর প্রভৃতি মহাত্মার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

Gioberti, Balbo, Guisti, Baron, Ricasoli, Capponi, Dante, Alfieri, Rosetti, D'Azeglio এবং Mauzoni প্রভৃতি

---

* "Italia ! when thy name was but a name.
When to desire thee was a vain desire.
When to achieve thee was impossible.
When to love thee was madness, when to live
For thee was the extravagavance of fools,
When to die for thee was to fling away
Life for a shadow—in those darkest days
Were some who never swerved, who lived, and strove

কবি ও লেখকগণ দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া ও দেশের লোককে উদ্দীপিত করিয়া, তাহাদের মনে দেশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কাহারও কিছু করিবার উপায় ছিল না। এইজন্যই এই সময়ে ইতালীতে Carboniari নামক গুপ্ত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সদস্যগণ দেশের প্রতি অত্যাচারনিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন ; ছলে বলে কৌশলে নিজের কার্য্য সিদ্ধ করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত ইতালীর তদানীন্তন অবস্থার কথঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রীয়ার শাসন এরূপ কঠোর ও সন্দিগ্ধ ছিল, যে কবি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "It is death to speak the very name of Italy to these Italian people" অর্থাৎ ইতালীয়দের নিকট ইতালীর নাম করিলেও মৃত্যু। সুতরাং এরূপস্থলে যে বৈধ আন্দোলন (constitutional agitation) এর পরিবর্ত্তে গুপ্তসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ম্যাটসিনির পিতা সে সময়ের শাসনসম্বন্ধে এইরূপ অবগত হন—"The government were not fond of young men of talents, the subject of whose musings were unknown to them."

"সরকার বাহাদুর প্রতিভাশালী যুবকগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, বিশেষতঃ যখন তাহাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপসম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ ছিলেন।"

এইজন্যই ম্যাটসিনিকে একটী ছল উপলক্ষ করিয়া বন্দী করা হয়। যদিও ছয় মাস পরে তাঁহাকে মুক্ত করা হয় বটে, কিন্তু ইতালি হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তারা আমাদিগকে এরূপ চক্ষে দেখেন না, সুতরাং আমাদের মধ্যে বৈধ আন্দোলন রহিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকারবাহাদুরের ব্যবহার

কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেটী আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজকাল আমাদের শাসনকর্ত্তারা বৈধ আন্দোলনে যদিও কোনরূপ বাধা দিতেছেন না বটে, কিন্তু সাধারণের মতের উপর যেরূপ তাচ্ছল্যভাব প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বৈধ আন্দোলনের সফলতাসম্বন্ধে লোকে ক্রমশঃ সন্দিগ্ধচিত্ত হইতেছে। কিন্তু সে কথা যাক্।

নির্ব্বাসিত অবস্থায় ম্যাটসিনি Sardiviaর রাজা Charles Albert কে যে প্রসিদ্ধ পত্রখানি লেখেন তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা :—

"লোকে আর আজকাল সামান্য দুই একটী অধিকার পাইলে সন্তুষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তিগত অধিকার হইতে, তাহাদিগকে বহুকাল বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, তাহারা এখন সেই সমস্ত অধিকার চায়—বিধিবদ্ধ নিয়ম, ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতা এবং ঐক্য। পরস্পর বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া ও অত্যাচারপ্রপীড়িত হইয়া তাহাদের নাম লোপ হইয়াছে, তাহারা দেশ হারাইয়াছে। বিদেশীয়গণ তাহাদের জাতিকে দাসের জাতি বলিয়া কলঙ্কিত করিতেছে। স্বাধীন লোক আসিয়া তাহাদের দেশের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের দেশকে মৃতের দেশ বলিয়া আখ্যাত করিতেছে। তাহারা দাসের জীবনের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর সহ্য করিতে পারিবে না। সমস্ত ইতালী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আপনি তাহাদের নেতা হউন এবং আপন পতাকার উপর লিখিয়া দিউন "ঐক্য ও স্বাধীনতা"! স্বাধীনচিন্তা প্রশ্রয় দিন, ব্যক্তিগত অধিকারের অভিব্যক্তির সহায় হউন এবং ইতালীর পুনর্জ্জন্ম দান করুন। অসভ্যদিগের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করুন। ইতালীর ভবিষ্যজ্জীবন গঠন করুন। আপনার রাজত্ব হইতে এক নূতন শকের সৃষ্টি করুন। যে উপায়

দেশের লোকের অনুমোদিত হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া অবিচলিত-ভাবে অগ্রসর হউন, সময়ের অপেক্ষা করুন,—অবশেষে বিজয়শ্রী আপনার করায়ত্ত হইবে। প্রভু, এই সকল সর্ত্তে আমরা আপনার অধীন হইয়া দেশের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছি, আমরা আমাদের ভ্রাতৃগণকে ঐক্যবন্ধনের সুফল বুঝাইয়া দিব ; আমরা জাতীয় দান সংগ্রহ করিব ; যাহাতে লোকে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়, আমরা সেইরূপ উদ্দীপনা প্রচার করিব। প্রভু, আমাদিগকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করুন, আমরা নিশ্চয় জয়লাভ করিব। *

ম্যাটসিনি প্রথমতঃ Carboniari সভার সদস্য ছিলেন কিন্তু ইঁহাদের অবলম্বিত উপায় তাঁহার অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি "নব্য ইতালী (Young Italy) নামক সভা স্থাপন করেন। Carboniariর উদ্দেশ্য উচ্ছেদমূলক ছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

* "The people are no longer to be quieted by a few concessions. They seek the recognition of those rights of humanity which have been withheld from them for ages. They demand laws and liberty, independence and union. Divided, dismembered and oppressed, they have neither name nor country. They have heard themselves stigmatised by the foreigner as a helot nation They have seen free men visit their country and declare it the land of the dead. They have drained the cup of slavery to the dregs, but they have sworn never to fill it again." Let the king champion the cause not merely of Piedmont but of Italy. "All Italy waits for one word—one only—to make herself yours. Proffer this word to her Place yourself at the head of the nation and 'write on your banner: 'Union, Liberty, Independence proclaim the liberty of thought. Declare' yourself the Vindicator, the interpreter of popular rights, the regenerator of all Italy. Liberate her from the barbaians. Build up the future ; give your name to a century ; begin a new era from your day......Select the way that accords with the desire of the nation ; maintain it unalterably ; be firm and await your time ; you have the victory in your hands. Sire, on this condition we bind ourselves round you, we proffer you our lives, we will lead to your banner the little state of Italy. We will paint to our brothers the advantages that are born of union ; we will promote national subscriptions, patriotic gifts ; we will preach the word that creates

অত্যাচার উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে কি সংস্থাপন করিতে হইবে Carboniari সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির সংকল্প রাখেন নাই। এই জন্যই "নব্য ইতালীয়" সংস্থাপন। ম্যাটসিনি বলিতেন কেবল শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নির্ভর করিলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। ঘোরতর পরিবর্ত্তন করিতে গেলে সাধারণ প্রজার উপর নির্ভর করিতে হইবে ; "Revolutions must be made by the people for the people. Carboniariর আর একটী দোষ ছিল—তাহারা মিলিত ভাবে যুগপৎ কার্য্য করিবার কোনরূপ প্রণালী অবলম্বন করে নাই। অথচ মিলিতভাবে যুগপৎ কার্য্য করা ব্যতীত কখন কোনরূপ যুগবিপ্লব কার্য্যকর হইতে পারে না। "নব্য ইতালী" প্রথমতঃ সকলকে এই মহৎ শিক্ষায় দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিল যে আত্মত্যাগ ব্যতীত জয়লাভ অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে—ইহা "নব্য ইতালীর" দ্বিতীয় শিক্ষা। "নব্য ইতালী" সম্বন্ধে ম্যাটসিনি এইরূপ উদ্দেশ্য ও নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন—"Young Italy is a brotherhood of Italians, who believe in a law of Progress and Duty, and are convinced that Italy is destined to become one nation. They join this association in the firm intent of consecrating both thought and action, to the great aim of reconstructing Italy as one independent sovereign nation of free men and equals. The means, by which the end is to be attained, are education and insurrection, to be adopted simultaneously.

"যে সকল ইতালীয়গণ বিশ্বাস করেন যে, উন্নতি ও কর্ত্তব্য সুনিয়মে

সেই সমস্ত ইতালীয়গণের সমাবেশই "নব্য ইতালী" ; যাঁহারা এই সভায় যোগদান করেন তাঁহাদের এই স্থির সঙ্কল্প যে, ইতালীকে পুনরায় স্বাধীন জাতি করিয়া তুলিবার মহৎ উদ্দেশ্যে, তাঁহারা আপন আপন চিন্তা ও কার্য্য উৎসর্গ করিবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্রোহ এই দুই পথ যুগপৎ অবলম্বন করিতে হইবে।"

আমার মনে হয়, ম্যাটসিনির এইরূপ কার্য্য ভগবৎপ্রেরিত ; নতুবা "নব্য ইতালী," প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে সমগ্র ইতালীতে এরূপ বিস্তার লাভ করিত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নির্ব্বাসিত অবস্থায় ম্যাটসিনি 'নব্য ইতালী' স্থাপিত করেন। তাঁহার সহকারী যে কয়েকটী উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের শিক্ষা সমগ্র ইতালীতে অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। ছাত্র হইতে ছাত্রান্তরে, যুবক হইতে যুবকান্তরে বিদ্যুৎবেগে প্রচারিত হইয়া "নব্য ইতালী" ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই সময়ে ইতালীতে তৎকালপ্রতিষ্ঠিত অষ্ট্রীয়া ফরাসী প্রভৃতি সাতটী রাজসরকার সকলেই ইহার সম্যক প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ম্যাটসিনি ইতালী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া প্রথমে ফরাসীদেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে ফরাসী দেশ হইতেও নির্ব্বাসিত করা হইল। তিনি সুইসরাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন কিন্তু সেখান হইতেও তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইল। পরিশেষে তিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনেকদিন বাস করেন। ম্যাটসিনি যে মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজীবন তাহারই উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টা ও শিক্ষায় ইতালীয়গণের মনে প্রথমে ঐক্য ও স্বাধীনতার ভাব উদয় হয়। ক্রমে অনেকেই এই

আবেশে লোকে যেরূপভাবে কার্য্য করে ম্যাটসিনির শিক্ষাপ্রভাবে সকলে সেইরূপ করিতে লাগিল।

এই সময়ে মহাত্মা গ্যারিবলডি আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার চেষ্টায় ও দৃষ্টান্তে দেশে ক্রমশঃ স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহারা গ্যারিবলডির ইঙ্গিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। গ্যারিবলডি নিজে একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ও তত্ত্বাবধানে অনেকেই যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজে এই সমস্ত সৈন্য লইয়া দেশের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। প্রাণ অতি তুচ্ছ জিনিস! দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে,—এই মহৎ দৃষ্টান্ত গ্যারিবলডি ও তাঁহার সমভিব্যাহারী স্বেচ্ছাসেবকগণ সমগ্র ইতালীয়গণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

যদিও ম্যাটসিনির শিক্ষার ফলে, গ্যারিবলডির দীক্ষার গুণে, দেশে অনেকেই স্বাধীনতার জন্য ও দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে ও প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তথাপি সকলের একীভূত হইয়া সমগ্র ইতালীতে এক স্বাধীন রাজ্যস্থাপন, প্রকৃতপক্ষে কাভুরের চেষ্টায় সুসাধিত হয়। আমি এরূপ বলিতে চাহি না যে, ম্যাটসিনি কিম্বা গ্যারিবলডি এই মহৎ কার্য্যে বিশেষরূপ সহায়তা করেন নাই। আমার মনে হয় ভগবান এই মহৎ কার্য্য সাধনজন্য তিনজনকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভার দিয়া ইতালীতে প্রেরণ করেন। একের কার্য্য অন্যের দ্বারা সাধিত হইতে পারিত না এবং তিনজনের একত্র সমাবেশ না হইলে ইতালীর স্বাধীনতারূপ মাহাত্ম্যও অদ্যাপিও হইত না। ম্যাটসিনির উন্মাদিনী শিক্ষা, গারিবলডির উদ্দীপনাপূর্ণ দৃষ্টান্ত এবং কাভুরের সূক্ষ্মদর্শিতা

সমাবেশেই ইতালীর উদ্ধারকার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল,—"নূতন ধর্ম্মের আবেগের ন্যায় যে আবেগ ম্যাটসিনি লোকের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, যে সমস্ত লোক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে গ্যারিবলডির ন্যায় নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর যে প্রবল উত্তেজনা উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই সকলের সমাবেশ ব্যতীত ইতালীর উদ্ধার অসম্ভব। *

ইতালীর স্বাধীনতাপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ এই সময়ে আর একটী নূতন উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা "Scientific Congress" বৈজ্ঞানিক সভা নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকাশ্যতঃ, এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিস্তার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার লক্ষ্য ছিল উদারনৈতিক ভাববিস্তার এবং বিভিন্ন প্রদেশের দেশহিতৈষী ও দেশ ভক্তের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও সম্বন্ধস্থাপন। এইরূপে অলক্ষিতভাবে কার্য্য করার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের দেশে "বৈজ্ঞানিক সভার" পরিবর্ত্তে ভারতের জাতীয় মহাসভা ও প্রাদেশিক সম্মিলনী।

ইতালীতে এই সময়ে প্রধানতঃ দুইটী দল দেখিতে পাওয়া যায় Extremist (চরমপন্থী) Moderates (মিতবাদী) মিতবাদীগণের বিশ্বাস ছিল যে, তৎকাল প্রতিষ্ঠিত রাজসরকারকে আন্দোলনদ্বারা ক্রমশঃ দোষশূন্য করিয়া ইতালীর উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। অপর পক্ষে অতিশয়বাদীগণ বলিতেন, ইতালীর উদ্ধার ইতালীয়গণদ্বারাই সাধিত হইবে। বৈদেশিক রাজা যতই উদার হউক না কেন, কখনই তাঁহার দ্বারা দেশের উদ্ধার হইতে পারে না।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

---

* Without the enthusiasm amounting to the passion of a new religion which Mazzini inspired, without Garibaldi's brilliant achievements and the idolatry excited by this pure-hearted hero in the breasts of all who fought with him and felt his sacred

বিড়ালের স্বর্গ।*

মৃত্যুকালে মাসী একটি বিলাতি বিড়ালের ভার দিয়ে আমাকে বিড়ম্বিত করে গেছেন। এমন নির্ব্বোধ জানোয়ার আমি দু'টো দেখিনি! এক শীতের রাত্রে আগুনের পাশে ব'সে বিড়ালটি এইরূপে আত্মকাহিনী বর্ণনা করেছিল।

(১)

আমার বয়স দুই বছর না হ'তে-হ'তেই আমি বিপুল মোটা হ'য়ে পড়ি। সৌভাগ্য, এবং তার চেয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, ঠিক সেই সময়েই তোমার মাসীর হস্তগত হই। আমিই হ'লাম তাঁর সংসার-ধর্ম্ম সব। আমার শোবার ঘর ছিল ফিট্‌ফাট্,—রীতিমত পালঙ্‌, তার উপরে পালকের মত নরম বিছানা—আর তিনপুরু লেপ। ভাত ব্যঞ্জনে আমার মোটেই রুচি ছিল না। যা একটু আধটু খেতাম রুই-কাৎলার ঘৃত-পক্ক মুড়ো।

এত সুখেও কিন্তু আমার মন বস্‌ত না। জান্‌লার মধ্যে দিয়ে রৌদ্রময় খোলা ছাতে পালাবার জন্য আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ কর্‌ত। আদর আমার ভাল লাগ্‌ত না; নরম বিছানা কণ্টক-শয়ন হয়েছিল। শরীরের দুর্ব্বহ ভারই আমার ব্যাধি ছিল। সমস্ত দিন সুখের আতিশয্যে আমার মন একটা গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন থাক্‌ত।

একদিন ঘাড় উঁচু ক'রে পাশের বাড়ীর ছাতের উপর—আহা, সে কি দেখ্‌লুম্। চারটে বেরাল রোঁয়া খাড়া করে, ল্যাজ ফুলিয়ে লড়াই করচে। কি তাদের আনন্দ! জন্মে এমন দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি। বাস্! আমি মন স্থির করে ফেল্‌লুম্। আসল সুখ সেই

ছাদের উপর—আমার নাকের ডগায়। হায় তা থেকে আমি বঞ্চিত! ধারণা অভ্রান্ত ব'লে ঠাহর হ'ল। তা' না হ'লে তা' থেকে আমাকে আটকে রাখবার, লোকের কেন এত আগ্রহ?

পালাবার অবসর খুঁজতে লাগলুম্। তর্কবিতর্কের পর স্থির করলুম,—কাৎলার মুড়োর চেয়ে পৃথিবীতে উপভোগের আরো জিনিষ আছে। অবশেষে দোর খোলা পেয়ে একদিন লম্বা দিলুম্।

(২)

আহা! কি সুন্দর সেই ছাদের উপরটি! উঁচু আল্‌সের মধ্যে মধ্যে জল নিকাশের নালীগুলো কি চমৎকার! তার ভিতর দিয়ে আনাগোনা করতে কি আরাম! কাদা জ'মে ছিল, পা দিয়ে বোধ হ'ল যেন মখ্‌মল। শীতরোদ্রে স্নিগ্ধ-মধুর উত্তপ্ত।

কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, আমি কাঁপছিলুম্। যত ভয়, তত আনন্দ আমাকে দেখেই তিনটে বেরাল চীৎকার করে তেড়ে এল। আমি প্রথমটা ভয়ে রাস্তায় পড়ে যাই আর কি—দাঁতকপাটি লাগ্‌বার মত হয়েছিল। আমাকে বেহাল দেখে তারা ঠাট্টা সুরু করে দিলে—হেসে হেসে বল্লে—'তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলুম্'। আমি খেপে গেলুম্; তাদের চীৎকারে যোগ দিয়ে ফেল্‌লুম। সে কি আমোদ! তারা আমার মত জড়ভরত নয়। একজন তাদের মধ্যে প্রাচীন ছিল—সকলে তাকে 'হুলো দাদা' বল্‌ত। দাদা আমার প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে পড়লেন। তাঁর উপদেশ আমি মেনে চল্‌তে লাগ্‌লুম। একপাশে একটু জল দাঁড়িয়ে ছিল—পান করলাম—বাহবা, কোথায় লাগে ক্ষীর পায়েস! জগতটা আমার চোখে তখন ভারি সুন্দর বোধ হল। এমন সময় একটি মহিলার আগমন হল। অভ্যর্থনার জন্য আমরা এগিয়ে গেলাম—আবার আগে যাচ্ছি আমি। প্রাণে এক

এমন সময় হঠাৎ কে একজন আমার কাঁধ কাম্‌ড়ে ধরলে। সঙ্গীতের বদলে আমি আর্ত্তনাদ কর্‌তে লাগ্‌লুম।

দাদা হুলো আহ্বান করে উপদেশ দিলেন। তার সার মর্ম্ম যে এটা কিছুই নয়—এর চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেতে হবে।

(৩)

ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ভারা খিদে পেয়ে গেল। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম,—'ছাদের উপর খাও কি'?

"যা' পাই।"

উত্তরটা কেমন কেমন ঠেক্‌ল। কত খুঁজ্‌লাম—ছাতে ত কিছুই পেলাম না। অবশেষে দেখ্‌লাম যে পাশের বাড়ীর তেতালার উপর রান্নাঘরে একটি মেয়ে খাবার তৈরী করচে। থালের উপর লাল লাল তপ্‌সেমাছ ভাজা। মনে মনে বল্লাম, ধন্য জনার্দ্দন—এইত চাই!

যেমন মুখটি দেওয়া—আঃ—পিঠে এক প্রবল চড়! গালি পাড়তে পাড়তে ত' পালিয়ে বাঁচি।

দাদা বড়ই ভৎ‌র্সনা করলে, "তোর আস্পর্দ্ধা ত খুব—প্রাণে বেঁচেচিস্ এই ভাগ্যি জানিস্।"

আমি বুদ্ধির চেয়ে পেট্‌টার উপরেই বেশী চটে গেলুম্। অবশেষে দাদা বল্লে—'দেখ্ এই নর্দ্দমার ভেতর মাছের একখানা কাঁটা আছে বোধ হয়'। কৃতজ্ঞচিত্তে কাঁটা খুঁজে বিফলমনোরথ হলাম।

পেটের জ্বালা বিষম জ্বালা। রাত নইলে কোন উপায় হবে না—তখন আবর্জ্জনা খুঁজে খাবার বার কত্তে হবে।

"অপেক্ষা কর।" তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ দার্শনিকের মত হুলো মহারাজ এই উপদেশবাক্যটি দিলেন।

দীর্ঘ উপবাসের কথা মনে করেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাবার মত

(৪)

ক্রমে চিরবাঞ্ছিত রাত এল। কি শীত! কুয়াসাচ্ছন্ন সে কাল রাত! হাড় পর্য্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে গেল। সোনায় সোহাগা—তার উপর বেশ একটু বৃষ্টিও সুরু হয়ে গেল। আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলুম্। এই রাস্তা? কি ভীষণ কুৎসিৎ! পেছলে, পা পিছলে যেতে লাগল। হায় রে—কোথায় সেই সব সুখের স্বপ্ন!

পথে নেমেই ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে হুলো বল্লে,—"পালা—পালা।"

গুটি মেরে মেরে একটা ময়লার বাক্সের পিছনে আশ্রয় নিয়ে আমরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাওয়াতে, সে বল্লে;—

"ঐ যে লোকটা—ঝুড়ি কাঁধে, হাতে লোহার সিক, তাকে দেখনি?"

"হঁা।"

"আমাদের দেখ্‌লেই পেটে সিক বিঁধে মেরে ফেল্‌ত।"

"মেরে ফেলত?"

হায়! পথও তাহলে স্বচ্ছন্দবিচরণের স্থান নয়? যাই কোথা?

(৫)

সমস্ত রাত রান্নাঘরের আবর্জ্জনা হাতড়াতে লাগলুম। হায় ব্যর্থ চেষ্টা! মাছের কান্‌কো যে পেলে, তার শুভগ্রহ। কর্ত্রীর দানশীলতা ভেবে আমি কেঁদে ফেল্লাম্। দাদা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত স্তূপান্বেষণ করে কিছু কিছু রত্ন উদ্ধার করে আমাকে তার অংশ দিল। অবশেষে সকাল হয়ে গেল। দশঘণ্টা জলে ভিজে আমি কাতর হয়ে পড়েছিলাম। থর থর করে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। অভিশপ্ত রাস্তা! অভিশপ্ত স্বাধীনতা! সুখময় কারাগার!

বিপন্ন দেখে হুলো বল্লে "কি হে, আশ মিটেচে?"

বিষণ্নমনে বল্লাম—"তাতে সন্দেহ আছে"?

"বাড়ী ফিরবে?"

"যেতে পেলে বেঁচে যাই—কিন্তু বাড়ী চিনিনে।"

"চল চল, আমি দিয়ে আস্‌চি। সকালেই ভেবেছিলাম, তোমার মত ভুঁড়ো বেরাল স্বাধীনতার মর্ম্ম কি বুঝবে? তোমার বাড়ী আমি জানি।"

আমাকে বাড়ীর দোরে পৌঁছে দিয়ে বন্ধুবর বিদায় গ্রহণ করবার ইচ্ছা জানালেন।

আমি ব্যগ্রতার সহিত হাতে ধরে বল্লাম—

"তাও কি হয়? তুমি এস, রাজার হালে তোমায় রাখব। কর্ত্রী আমার—"

আমাকে বাধা দিয়ে হুলো বল্লে, রাগে তার দেহ কাঁপছিল—গোঁপ খাড়া করে, ল্যাজ উঁচু করে, সে বল্লে;—

"চোপ্, শুয়ার হারামজাদা—তুই বেদম গাধা। তোর মত থাকলে আমি এক মিনিটে মরে যাব। বেজন্মা পাজী।—দেহের সুখের জন্ম স্বাধীনতা দেব?"

রাগে গস্ গস্ করতে করতে সে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, আমি দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। নবোদিত সূর্য্যের সোণার আলোর মধ্যে সে আবার মহানন্দে খেলা আরম্ভ করে দিলে।

বাড়ী প্রবেশ করতেই—আহ্বানসূচক সম্ভাষণ হল। সপাসপ্ কয়েকগাছা ঝাঁটা পিঠের উপর নির্ম্মমভাবে পড়ে গেল। সেগুলো আমার মোটেই অপ্রীতিকর বোধ হয় নি;—কেন না জানা ছিল—তার অব্যবহিত পরেই মাছের মুড়ো পাওয়া যাবে!

(৬)

আগুনের পাশে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে উপসংহারে বিড়াল বলিল;—

"স্বর্গ আর কোথাও নেই—প্রকৃত সুখও সব জায়গায় পাওয়া যায় না; তা' এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে প্রহার এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যেই আছে।"

প্রভেদ।

(১)

রণঘর্ম্ম-সিক্তভালে বিদ্ধবর্ম্ম শত্রুরক্ত দিয়া,
ত্রিপুণ্ড্রক যতনে অঙ্কিয়া,
শ্লথ গ্রন্থি উরস্ত্রাণতলে বক্ষে করি স্ফীততর,
বিজয়ের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সহস্র মন্থর *
সুন্দরী পুরন্ধ্রীদত্ত সচন্দন জয়মাল্যলোভী
সানন্দে সদর্পে চলে বাজাইয়া বিজয়দুন্দুভি।
বঙ্গসুত! এচিত্রটী তোমাদের কাব্য-অলঙ্কার,—
অপরের চির-অহঙ্কার!

(২)

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, নরলুব্ধ, সর্ব্বগ্রাসী দূরসিন্ধুনীরে
সূচিভেদ্য অমার তিমিরে;
উড়ায়ে বিতান শত বাণিজ্যের সুসজ্জিত পোত,
দলিয়া চলিয়া যায় হুহুঙ্কারী অহঙ্কারী স্রোত!
সানন্দ মঙ্গলজ্ঞাপী, আগ্নেয়াস্ত্রে চমকিয়া দিক
ফিরে আসে পুনঃ, নিজ উপকূলে পাইয়া অধিক,—
তোমার সংবাদপত্রে এ চিত্রটী বিস্ময়আধার,
অপরের প্রতিদিনকার!

(৩)

প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ডদাপ, রাজদণ্ড করিয়া ধারণ
ন্যায়ধর্ম্মে প্রজার পালন,
তাপিতের প্রতিকার, দুর্বৃত্তের শাস্তির বিধান,
ধার্ম্মিকের পুরস্কার, দুঃখীজন-দুঃখ-অবধান,
পরাভূত পররাষ্ট্রসনে সখ্য সন্ধির বন্ধন,
আপনি আপন গেহ চিনে লওয়া, হে বঙ্গনন্দন,
তোমাদের চিরপাঠা, কল্পনার অনন্ত-অধিক,—
অপরের তাহা স্বাভাবিক !

(৪)

প্রেমিকার পাণ্ডুগণ্ডে তাড়াতাড়ি লুটিয়া চুম্বন,
লম্ফ দিয়ে অশ্ব আরোহণ,
ভেরীর মাদক তানে, রক্ত উৎস, অস্ত্রের ঝঞ্ঝন,
প্রাণ লয়ে ধূলিখেলা, ব্যথাহীন শোণিতরঞ্জন,
ক্লায় জন্মভূমিতরে, অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন।
পুরা মন্বন্তর স্মরি' তব শুধু হীন আস্ফালন,—
বঙ্গসুত ! শুনে এবে কর তুমি মূর্চ্ছার উদ্গম,—
অপরের বাড়ে রণোদ্যম ! .

(৫)

সেবকত্ব পদে ঠেলি, ভিক্ষাবৃত্তি চরণেতে দলা,
স্বাধীনজীবিকা শিরে তোলা,
পরস্কন্ধ, যষ্টি ত্যজি উঠে পড়া নিজ পদভরে,

মায়াবীর ইন্দ্রজালে আপনায় প্রকৃতিস্থ রাখা,
মিষ্টবাক্য শুনি, পরে ধরে' নাহি লওয়া প্রাণসখা—
বঙ্গসুত ! তুমি ভাবো ইহা বিনা মানুষ কি বাঁচে ?
প্রহসন-অপরের কাছে !

(৬)

স্বার্থময় বাক্যপ্রাণ, এই তব নব আন্দোলন,
ভাব তুমি কি ভীম ভীষণ !
একসূত্রে বদ্ধ হওয়া ত্যজি হীন বিদ্বেষ জল্পনা
তোমার সমাজশাস্ত্রে বলে তারে বাতুল কল্পনা।
সামান্য স্বার্থের ত্যাগে লাগে চোখে বিস্ময় চমক—
একবিন্দু সকর্দ্দম বারি তব পিপাসাশমক।
অপরের স্বার্থধূলি, দ্বেষহেয়, একত্ব-জীবন,
প্রতিপলে নব আন্দোলন !

(৭)

সকল যাত্রীর সাথে কর্ম্মপথে সহযাত্রী সাজো
ত্যজ ত্যজ রমণীত্ব ত্যজ।
তুমি যে রে মদমত্ত কাননের বারণ সবল,—
ভুলে গেছ, কেন পদে সূত্রবৎ বন্ধনশৃঙ্খল ?
তুমিত বাতুল নও, জোর করি বলেছে বাতুল,
দেখ নিজে পরীক্ষিয়া বুদ্ধি তব রয়েছে প্রতুল।
আহা, বড় দুঃখ পায়, মায়াবীর কি মোহন জালে

(৮)

ওগো পান্থ মুছে দাও অভাগার নেত্রের অঞ্জন,
ধুয়ে দাও ভ্রান্তির নয়ন।
সব যাদু দূরে যাক আহা ও যে সবল নবীন,
খাটিয়া খাইতে হ'বে, ও যে বড় শ্রমজীবী দীন
কর্ণে ও'র বলে দাও—বলে দাও বজ্রমন্দ্রস্বরে,
যা দেখিছ, স্বপন তা নয়, সত্য, অক্ষরে অক্ষরে ;
যা হেরিছ সব স্বাভাবিক সবই পুরাতন
তোমার ত এ নহে নূতন!

হতবুদ্ধি! ভুলে যাও বিস্ময়-চমক-ব্যাকুলতা
বলিবে যে সত্য বাতুলতা!
আপনি দেখাও পুনঃ নব নব বিস্ময়ের কাজ,—
সমগ্র জগৎ হোক্ নতশির, পেয়ে যাক লাজ।
জগতের নিত্যকৃত্য যে দিন লাগিবে স্বাভাবিক,
সরল, সহজ, সাধা। দিবে যবে অবাকেরে ধিক্,—
সে দিন জানিব তবে পূর্ণরূপে সেরে গেছে রোগ,
জগতের মহাযজ্ঞে তাই, মহানন্দে দিয়াছ রে যোগ!

শ্রীকালিদাস রায় দাসগুপ্ত।

চিত্র-চয়ন।

অসভ্যজাতির অনুষ্ঠান।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ কেনারায় বুণ্ড নামক ভূস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ইহারা কন্যার দক্ষিণ হস্তখানি বরের দক্ষিণ হস্তের উপর তুলিয়া একটি রৌপ্যনির্ম্মিত ঘটের উপর স্থাপন করে। করস্থাপনের পূর্ব্বে এই ঘটটি জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি নারিকেল রাখিয়া তাহার উপর তালজাতীয় বৃক্ষের ফুল সাজাইয়া দেয়; অবশেষে আশীর্ব্বাদস্বরূপে পিতামাতা এবং অন্যান্য গুরুজন এই ঘট স্পর্শ করে, অনন্তর ইহা তিনবার আন্দোলিত করা হয়, সকলে বাঞ্ছা করে যেন নবদম্পতী দ্বাদশটি পুত্র এবং তৎসংখ্যক কন্যারত্ন লাভে কৃতকার্য্য হয়।

উক্ত প্রদেশের হেগাভিস নামক পশুপালক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে, বিবাহের পর দিন বর কন্যার গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া অপসৃত হইয়াছে, তখন কন্যার আত্মীয়েরা সেই চোরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। একটি বালককে পূর্ব্ব হইতেই বরের বেশে সাজাইয়া লুকাইয়া রাখা হয়, কন্যার আত্মীয়েরা তাহাকে ধরিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করে। অবশেষে বরপক্ষীয় লোকেরা নানাপ্রকার বাক্যব্যয় করিরা প্রমাণ করিতে চাহে যে, এই বালক ঐ নববিবাহিতা যুবতীর মন কিম্বা অলঙ্কার অপহারক নহে, এবং কথার প্রমাণ গ্রাহ্য না হইলে তাহারা প্রকৃত বরকে পোষাকে সজ্জিত করিয়া কন্যার সম্মুখে আনয়ন করে। তখন বর কন্যার মিলন হয়।

কেনারার হীনতম অসভ্যজাতির (হোলিয়াসম্প্রদায়ের মধ্যে) বিবাহের আয়োজন আরও কিছু বিস্ময়কর। বরযাত্রীগণ কোন নির্দ্দিষ্ট

কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে না। ঘরের বাহিরে অনাবৃত আকাশ-তলে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে, কেবল বর বেচারী একটু বসিবার আসন পায়; সমস্তরাত্রি যাপনের পর প্রভাতে কন্যা আসিয়া বরের সম্মুখে সেই আসনের উপর বসে; এই সময় কন্যার হাতে একখানি পাখা এবং পান থাকে। উপস্থিত সকলেই বরকন্যার মস্তকে ধান ছড়াইয়া দেয়, চারিদিন ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলে, এই চারিদিনের মধ্যে বরকন্যার কেহই এককালে সেই আসন পরিত্যাগ করিতে পারে না। উৎসবের শেষ দিন দম্পতিযুগল আসনখানি ধরিয়া সমারোহ-পূর্ব্বক নদীজলে কিম্বা পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে যায়, আসনছাঁকা দিয়া দুই একটি মাছ উঠিলে তাহারা স্বামীস্ত্রীতে তাহা চুম্বন করিয়া সেই মাছ সজীব অবস্থাতেই জলে ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর একত্র ভোজনাদি দ্বারা বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নীলগিরি অঞ্চলের অধিবাসী বাদসাগণের মধ্যে বিবাহে পূর্ব্বরাগের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; প্রণয়িনী গর্ভবতী হইবার পূর্ব্বে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন সম্বদ্ধ হয় না। বিবাহ হওয়ার পর রমণীগণের গলদেশ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করা হয়। আমাদের দেশের লোহার কড় ও সিন্দুরবিন্দুর মত ইহাই এদেশের এয়োস্ত্রীর লক্ষণ।

গোদাবরী প্রদেশের কই জাতির মধ্যে এক বিচিত্র প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বরের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে সে কন্যাকে চুরী করিয়া লইয়া যায়; অনেকে অনেকসময় বিবাহিত রমণীকেও এইরূপে স্বামী-গৃহ হইতে চুরী করিয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহের মধ্যে কোন প্রকার জটিল সমাজনিয়ম প্রচলিত নাই; কন্যা নতমস্তকে দাঁড়াইলে বর তাহার গাত্রে ঠেস দিয়া দাঁড়ায়; তখন আত্মীয়বন্ধুগণ বরের মাথায় জল ঢালিয়া দেয়, সেই জল গড়াইয়া কন্যার মস্তক সিক্ত করে; ইহাতেই

কুচবেহারের চেঞ্চু নামক আরণ্যজাতির মধ্যে পলায়নই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। একদিন রাত্রে বরকন্যা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গেল; তাহার পরদিন হঠাৎ আবার আসিয়া উপস্থিত! অনন্তর তীর-ধনু মাটিতে পুঁতিয়া তাহা প্রদক্ষিণ করার পর, গুরুজন তাহাদের গাত্রে ধান্য নিক্ষেপপূর্ব্বক নবদম্পতীর শুভকামনা করিয়া তাহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লয়।

মান্দ্রাজের পূর্ব্বভাগে একজাতীয় অসভ্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে কুরুম্বা বলে; প্রধানতঃ পশুপালনের দ্বারা তাহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। বিবাহের মজলিসে বরকন্যা একত্র হইলে ইহারা জাফ্রানপূর্ণ ছোট কৌটা হইতে একটি স্বর্ণপুত্তলি বাহির করে। কুরুম্বাগণ এই পুত্তলিকাকে আপনাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া সম্মান করে; বরকন্যা এই পুতুলের নাম ধরিয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; তাহার পর তাহাদিগের পরামাণিকের মাথায় পুরোহিত নারিকেল ভাঙ্গিয়া (বোধহয় আছাড় দিয়া নহে) এক টুকরা জাফ্রান কনের দক্ষিণ হস্তে বাঁধিয়া দেয়। অনন্তর কনের মাথায় ধান্য নিক্ষেপ করার পর বর কনের গলায় 'টালি' বাঁধিয়া বিবাহকার্য্য শেষ করে; কোন কোন সম্প্রদায়ে জাফ্রানব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ত্রিচিনোপলির কালান নামক জাতির মধ্যে খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো ভাইভগিনীর মধ্যে বিবাহ অত্যন্ত গৌরবজনক এবং সমধিক প্রসিদ্ধ। সেরূপ বিবাহ না হইলে পিসি কিম্বা ভাইঝিকেও বিবাহ করা যাইতে পারে; এইজন্য বর ছোট হইলে সে অনেক সময় গলিতচর্ম্মা পলিত কেশা বৃদ্ধাকেও বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরের ভগিনী কনের পিতামাতার সঙ্গে দেখা করিতে তাহাদিগের বাড়ী যায় এবং তাহাদিগকে স পাঁচ গণ্ডা পয়সা ও একখানি কাপড় উপহার দিয়া তাহাদিগের সম্মতিক্রমে কনের গলদেশে কয়েক গাছা "

গোকালি" বাঁধিয়া দেয়। বিবাহের ভোজ শেষ হইলে কনে লইয়া বর বাড়ী ফিরিয়া আসে ; সেখানে আর একটি ভোজের আয়োজন হয়। বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় কনে একটা মুরগী ও অন্যান্য জিনিষ উপহার পায় ; ইহাই তাহার গৃহস্থালী পাতিবার উপকরণ।

তিনেবেলীর মারাবেও নামক তাকরজাতির বিবাহপ্রণালীও অত্যন্ত বিচিত্র। কোন গৃহস্থের কর্ত্তাব্যক্তি পরিবারস্থ কাহারো বিবাহ উপলক্ষে অন্যান্য ব্যক্তির সম্মতির কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া কনের গলদেশে বিবাহসূচক 'টালি' বাঁধিয়া দিয়া আসে ; সে সময় কনের বাপের বাড়ী অত্যন্ত উৎসবমুখর হইয়া উঠে, জোরে জোরে শাঁখ বাজিতে থাকে, স্ত্রীপুরুষ সকলে আপনাদিগের উৎকৃষ্ট বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দলে দলে উৎসবভবনে সমবেত হয়, ভোজের ধুম লাগিয়া যায়, দেবতার সম্মুখে নারিকেল ভাঙ্গা হয় এবং তাহার পর ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলে। নেলোরের বেতি নামক কৃষজীবিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বিবাহের সময় কতকগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট পূজা করিয়া থাকে।

গঞ্জামের উড়িয়াগণ অতি শৈশবকালে স্ব স্ব কন্যার বিবাহ দেয়, সে সময় উপযুক্ত বর না জুটিলে, তীরের সহিত বিবাহ দিয়া কন্যার আইবুড়া নাম ঘুচাইয়া রাখে।

মালবারে পানিয়ান নামক শ্রমজীবিগণের মধ্যে যদি কোন পুরুষ কোন বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই বিবাহেচ্ছু পুরুষটিকে ছয়মাসকাল প্রত্যহ সেই বালিকার পিতৃগৃহে এক আঁটি করিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়।

কুর্দীস্তানে প্রেতোপাসনা।

আসিয়া তুরস্কের অন্তর্গত মোসলের আট নয়ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে

উপত্যকার নাম সেখ আদির উপত্যকা। এখানে চল্লিশ ফিট দীর্ঘ এবং বিশ ফিট প্রস্থ একটি দোড়ঘর আছে, গৃহের মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ। এদেশের অধিবাসীগণ এই স্থানটিকে ভূস্বর্গ বলিয়া মনে করে, কিন্তু দেশবাসীগণ ইহাকে অত্যন্ত বিভীষিকার চক্ষে দেখিয়া থাকে; ইহা কুর্দ্দীস্তানের যেজিদী নামক প্রেতোপাসকজাতির বৈঠকখানা বলিয়া মুসলমান, খৃষ্টান এবং হুহুদাগণ এখানে কদাচ পাদচারণ করে না। যেজিদীজাতি বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে সয়তানের উপাসক; উপত্যকার অন্তর্ব্বর্ত্তী গৃহটি যেজিদীগণের প্রথিতনামা পূর্ব্বপুরুষ পুণ্যাত্মা সেখ আদির সমাধি মন্দির। অল্পদিন পূর্ব্বে একজন মার্কিন পরিব্রাজক এই অদ্ভুত জাতির উৎসবসমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,"মধ্যরাত্রের পূর্ব্বে ইহাদিগের উৎসব আরম্ভ হয় না, উৎসবে যোগদানের পূর্ব্বে সকলেই সময়োচিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে থাকে; যে সকল নক্ষত্র ঊর্দ্ধাকাশে উঠিলে মধ্যরাত্র সূচিত হয় সেই সকল তারকাকে মস্তকের উপর দেখিবামাত্র ইহারা উক্ত সমাধি-মন্দিরের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং সমাধিরক্ষক 'করাল' ও তাহার দুই সহচর এক একটী দীপ হস্তে গৃহের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বারপ্রান্তে তাহা সংরক্ষিত করে, তাহাই উৎসবারম্ভের সূচনা। অনন্তর শ্বেত গম্বুজাকৃতি গৃহের অভ্যন্তর হইতে এই সম্প্রদায়ভুক্ত চারিজন দরবেশ বাহির হইয়া আসে, তাহাদিগকে আপাদমস্তক কৃষ্ণপরিচ্ছদ-মণ্ডিত; প্রত্যেকের হস্তে প্রজ্জ্বলিত মশাল। এই গভীর রাত্রে এইরূপ ভয়ানক স্থানে চারিজন নির্ব্বাক লোককে ঘোরকৃষ্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত-মশাল-হস্তে বিচরণ করিতে দেখিলে সহজেই তাহাদিগকে প্রেতলোকের রহস্যপূর্ণ অধিবাসী বলিয়া মনে হয়, এবং তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে কৃষ্ণযামিনীর গভীর স্তব্ধ ভীষণতা আরো অধিক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলে।"

উপস্থিত হয়। তাহাদিগের মধ্যে চারিজন সানাই এবং অবশিষ্ট চারিজন করতাল ও ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করে। ইহাদিগের পশ্চাতে ছয়জন অল্পবয়স্ক পুরোহিত পীত পরিচ্ছদ এবং কৃষ্ণবর্ণ শিরস্ত্রাণে মণ্ডিত হইয়া মশালহস্তে দর্শন দেয়, তাহাদিগের পশ্চাতে চারিজন সর্দ্দার শ্বেতবস্ত্রে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া একটী চতুষ্কোণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত আধার বহন করিয়া আনে; এই আধারের উপর 'মালিকান' অর্থাৎ পক্ষীরাজ ময়ূর অবস্থিতি করে। এই প্রেতোপাসক জাতির ময়ূর অতি পবিত্র সামগ্রী। ইহাদিগের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, নন্দনকাননে 'প্রথমা প্রমদা' ইভাকে সয়তান সর্পের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া প্রতারণা করে নাই; একটি অতি সুদৃশ্য ময়ূরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াই সে সেই অলোকসুন্দরী লোকমাতাকে জগৎপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল। বারজন বয়োবৃদ্ধ পুরোহিত ময়ূরের পশ্চাতে এই উৎসবপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করে; উৎসবমগ্ন উপাসকমণ্ডলীকে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সমাগত ভক্তবৃন্দ তাহাদিগকে দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে; দ্রুত বাজনা বাজিতে থাকে। পুরোহিতেরা উপত্যকার উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে একটি অনতিদীর্ঘ শ্বেত অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই অট্টালিকার একপার্শ্বে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ কক্ষ আছে, এই কক্ষগুলি কতকটা আস্তাবলের মত দেখিতে; এখানে সাতটি শ্বেতবর্ণ গাভী অতি যত্নের সহিত পালিত হয়, এই সকল গাভী সূর্য্যদেবের নামে উৎসর্গীকৃত! অতএব এই দেশের ধর্ম্মের সহিত সূর্য্যোপাসনার কিঞ্চিৎ নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

উপরে যে ইষ্টকালয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একপ্রান্তে একটি

তাহাদের সকলের হস্তেই এক একটি প্রজ্জ্বলিত মশাল থাকে। উৎসব দল এই পথ দিয়া ক্রমে একটি ভূগর্ভস্থ গৃহে উপস্থিত হয়, এই গৃহস্থ বেদীর সম্মুখে একটি মৃতদেহ সংস্থাপিত থাকে; এখানে উপস্থিত হইলে দলস্থ একজন লোক মৃতের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া সেই মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করে; তখন কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিত দুইজন দরবেশ আসিয়া এক জন মৃতদেহের পার্শ্বে এবং অন্যজন জীবিত ব্যক্তির উপাধানের নিকট উপবেশন করে। অনন্তর সর্দ্দারের ইঙ্গিতমাত্রেই একজন দরবেশ মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি খুলিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভূতলশায়ী জীবিত ব্যক্তিটির গাত্র হইতেও বসন উন্মোচিত করিয়া লওয়া হয়। যে দরবেশ সেগুলি খুলিয়া লয়, সে সেগুলি নিজের গাত্রেই জড়াইতে আরম্ভ করে। তাহার পর আর একজন দরবেশ মৃতদেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া, তাহা একে একে মৃতের প্রতিনিধি-যুবকটির গাত্রে পরাইয়া দেয়। সর্ব্বশেষে সে শ্বেত জামা এবং পায়জামাতে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, সেস্থল হইতে গাত্রোত্থান করে। এই পরিচ্ছদ সবুজ ভিন্ন অন্য যে কোন রঙের হইতে পারে; কেবল সবুজ রঙেরই ব্যবহার নিষিদ্ধ। কারণ সবুজ সয়তানের প্রিয় বর্ণ। ময়ূরের গাত্রে এই বর্ণের বাহুল্য দেখা যায়। বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের এরূপ অনুমান; যাহা হউক ধার্ম্মিক যেজিদীগণ এই বর্ণের কোন পদার্থ ব্যবহার করে না।

এদিকে গাত্রোত্থান করিয়াও মৃতের প্রতিনিধিমহাশয়ের নিস্তার নাই। তাহার আপাদমস্তক আবার কৃষ্ণপরিচ্ছদে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর পুরোহিতেরা তাহার কটিদেশে একগাছি অতি সূক্ষ্ম কিন্তু দৃঢ় রজ্জু বাঁধিয়া দেয়। রজ্জুবদ্ধ হইয়া সে তাহার একজন সহযোগীর হস্ত হইতে একটা কালো টুপী লইয়া মস্তকে পরিধানপূর্ব্বক প্রধান যেজিদীসর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হয়। সে সর্দ্দার আবার তাহার গলদেশে একগাছি সূত বাঁধিয়া দেয়, তাহার অগ্রভাগ সম্মুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত

ঝুলিতে থাকে। সে কখন সেই সুতা পরিত্যাগ করে না। এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, মেষবলিদ্বারা উৎসব সমাপ্ত করা হয়।

নরমুণ্ডসংগ্রহকারী ওয়াজাতি।

সান প্রদেশের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে কতকগুলি অসভ্যজাতি বাস করে; তাহাদিগের ভাষা এবং আচারব্যবহারের সহিত পৃথিবীর কোন জাতির ভাষা এবং রীতিনীতির ঐক্য দেখা যায় না; ইহাদিগের মধ্যে চিংসাও, তাৎসারু, সাথা, লাহুয়াও, কুই, ইয়াংলাম, ইয়াংসেক, ওয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, এবং এই শেষোক্তশ্রেণীই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সানপ্রদেশ যখন ব্রহ্মরাজের শাসনাধীনে ছিল সেই সময় কেহ এই সকল জাতির অস্তিত্বও জ্ঞাত ছিল না; বর্ত্তমানকালে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে এবং শানপ্রদেশের অভ্যন্তরে প্রশস্ত পথ এমন কি লৌহবর্ত্ম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, সুতরাং অনেকে আশঙ্কা করেন যে, এই মুষ্টিমেয় অসভ্যজাতি অনতিবিলম্বেই তাহাদিগের চৈন প্রতিবেশীবর্গের সহিত কুটুম্বিতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত বৈষম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে।

ওয়াজাতি তাহাদিগের অনন্যসাধারণ বর্ব্বরতার জন্য সভ্যজগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত। ওয়ারা নরমাংসভুক্। ইহারা সালউইন নদীর পূর্ব্বতীরস্থ আরণ্য প্রদেশের প্রায় একশত মাইল স্থান অধিকার করিয়া বাস করে, এই একশত মাইলের মধ্যে ওয়া ভিন্ন অন্য কোন জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারা যে কতকাল হইতে এই প্রদেশে বাস করিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। সম্ভবতঃ অতি আদিম কাল হইতেই এখানে ইহাদিগের বাস। ইহাদিগের প্রতিবেশী অন্য কোন অসভ্যজাতিই এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহাদিগের সহিত পরিচিত

ইহাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতেও সাহসী নহে। এই দেশে নদীর জলে যথেষ্টপরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। ব্রহ্ম এবং চীনের লোক সুবর্ণআহরণের জন্য দুই একবার ইহাদিগের দেশে আসিয়াছিল, কিন্তু ওয়াদিগের হস্ত হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন বৃটীশ সৈন্য নিরাপদে এই দেশ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহারা নরমাংসভুক্ বটে, কিন্তু অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় প্রতিবেশীবর্গের গোমেষাদি অপহরণ করে না; ইহাদের মধ্যে যাহারা পর্ব্বতাঞ্চলে বাস করে তাহারা জীবনকে কিছুমাত্র মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করে না। নরহত্যাকারীগণ নির্দ্দিষ্টপরিমাণে অর্থদণ্ড দিলেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু যাহারা গোমেষাদি কিম্বা অন্য সম্পত্তি অপহরণ করে, প্রাণদণ্ডই তাহাদিগের অপরাধের একমাত্র ব্যবস্থা। চুরীকে ইহারা যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে; অপরের মহামূল্য সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় সম্মুখে পতিত থাকিলেও ইহাদের মনে কিছুমাত্র লোভের উদয় হয় না।

ওয়াজাতির উৎপত্তিবিবরণ সংগ্রহ করা দুরূহ। ইহাদের প্রতিবেশী মণ্ডলী হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবারভুক্ত; ব্রহ্মবাসীগণ ইহাদিগকে 'লাওয়া' বলে কিন্তু ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

কিন্তু ইহাদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে; এই সকল জাতির মধ্যে কেহ কেহ কুকুর, বিড়াল কিম্বা সরীসৃপ হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকে; ওয়াগণের বিশ্বাস ভেক্ হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে!

ওয়াদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় নরভুক্ নহে; কিন্তু ইহাদিগের সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস যে মনুষ্য-মস্তক সকলশ্রেণীর উপদেবতার ভয় বিনাশক, সেইজন্য নর-মস্তক-সংগ্রহের জন্য ইহারা

সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে, এবং মস্তক ভিন্ন অপরাংশে ইহাদের কোন কাজই সুসিদ্ধ হয় না। ইহাদিগের বিশ্বাস, ইহাদের অধিকারে নরমস্তক না থাকিলে শস্য উৎপাদনে বহুবিধ বিঘ্ন জন্মিতে পারে, মড়ক লাগিয়া গো মেষাদি পশু মরিয়া যায়, এমন কি পিতামাতার প্রেতাত্মা পর্য্যন্ত পুত্র কন্যাগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। কোন গ্রামে নরমুণ্ডের অভাব হইলে উপদেবতাগণ গ্রামের মধ্যে নানা প্রকার সংক্রামক পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

ওয়াদিগের বাসস্থানের নিকট সুবৃহৎ বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যানী দেখা যায়। এই অরণ্য তাহাদের বাসস্থানকে চতুর্দ্দিক হইতে নিবিড়রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; এই বৃক্ষরাজি ছিন্ন নরমুণ্ড পরিপূর্ণ। নরমুণ্ডসমূহ বহুবৎসর হইতে ইহাদিগের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহাদের মধ্যে অনেক মস্তকই সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ এবং অত্যন্ত পুরাতন; ক্রমাগত রৌদ্রবৃষ্টির আক্রমণে সেগুলি বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

মার্চ্চ মাসের প্রথম হইতেই ইহারা নরমুণ্ড সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সমস্ত এপ্রিলমাস এই কাজে অতিবাহিত হয়। কোনগ্রামে পুরাতন মুণ্ড থাকা সত্ত্বেও যদি সেখানে অহিফেন, ধান্য এবং অন্যান্য শস্য প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে, ইহারা স্থির করে যে, সে সকল মস্তকে আর কোন পদার্থই নাই, সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ একটি মাত্রও নূতন মস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক অভাব পূর্ণ করে।

স্বজাতিদিগকে বধ করিতে ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরাঙ্মুখ। নরমুণ্ড সংগ্রহের জন্য গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে গমন করে, এবং কৃতকার্য্য হইলে পথে কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। প্রাকৃতিক উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করিতে একটি নরমুণ্ডই যথেষ্ট; কিন্তু যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া না যায়, এই ভয়ে ইহারা অনেক মুণ্ড সংগ্রহ করে।

চলৎশক্তিহীন চৈনিক পরিব্রাজক, কেহই ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পায় না।

মনুষ্য-শিকারে যাইবার সময় ইহাদের দলে দশবারজনের অধিক লোক থাকে না, সেই জন্য ইহারা হঠাৎ কোন গ্রামের উপর পড়িয়া গ্রামবাসীদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করে না।

নরমুণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ইহারা উৎসব আরম্ভ করে। কাষ্ঠনির্ম্মিত এক বিরাট ঘণ্টা দ্বারা গ্রামের মধ্যে উৎসব কাহিনী ঘোষিত হয়,—স্ত্রীলোক ও বালকেরা নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠে এবং পুরুষেরা প্রচুরপরিমাণে মদ্যপান করে।

গ্রামের এক অংশে ক্রমনিম্ন উপত্যকার উপর ইহাদিগের উপ-দেবতার গৃহ নির্ম্মিত হয়। গ্রামের সমস্ত লোক উৎসব-উপলক্ষে এই স্থানে সমবেত হইয়া ঢক্কাধ্বনি করে। এই ঢাক অতি প্রকাণ্ড, এমনকি এক একটি চারিহাত দীর্ঘ এবং দুই হাত স্থূল হইয়া থাকে; স্থূল কাষ্ঠ-দণ্ডের দ্বারা এই ঢাক পিটিতে আরম্ভ করিলে তাহার গুরুগম্ভীর নিনাদ বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতকন্দর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। সাধারণ উৎসব ভিন্ন গ্রামের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইলেই এই ঢক্কা নিনাদিত হয়। উপদেবতাদিগের উদ্দেশে ইহারা মহিষ, বরাহ, কুকুর এবং কুক্কুট বলি দিয়া থাকে; উৎসর্গীকৃত পশুপক্ষীর রক্তে ইহারা দেবতার গৃহ রঞ্জিত করিয়া তোলে।

ওয়ারা যে সকল নরমস্তক সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহা কদলীপত্র, ঘাস অথবা খড় দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া উপদেবতার গৃহের এক কোণে ঝুড়িতে করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখে। অনেকে গ্রামের মধ্যে দীর্ঘ বাঁশ পুঁতিয়া তাহার অগ্রভাগেও টাঙ্গাইয়া দেয়। এই সকল মুণ্ড টাঙ্গাইবার সময় প্রচুর নৃত্যগীত হয়।

প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু ইহারা কখন গৃহে মদ রাখে না,—গ্রামের মধ্যে মদ রাখিবার জন্য দুই একটা করিয়া সাধারণ গৃহ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখান হইতে কখন মদ চুরী যায় না। ইহাদিগের উৎপাদিত সমস্ত ধান্য মদপ্রস্তুতেই ব্যয়িত হয়; এই মদ্য অত্যন্ত তীব্র এবং দুর্গন্ধ।

ওয়াদিগের গঠন কিছুমাত্র সুন্দর নহে; পুরুষেরা স্থূলদেহ, খর্ব্বকায়, কিন্তু রমণীগণ অপেক্ষাকৃত রূপবতী। অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতি অপেক্ষা ওয়াদিগের বর্ণ অধিক কৃষ্ণ, ইহাদিগের নাসিকা চেপ্টা, এবং চক্ষু গোল; বর্ত্তুলাকার চক্ষুর উপরে গোলাকার স্থূল ভ্রূযুগল থাকাতে ইহাদিগের মুখ অত্যন্ত কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয়। ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার, কখনো স্নান করে না; মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখে বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত রূক্ষ কখন তাহাতে অঙ্গুলি চালনাও করেনা, সুতরাং যে সকল ওয়া ছোট করিয়া চুল কাটে তাহাদিগের অপেক্ষা ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ানক ও উগ্র বলিয়া বিবেচনা হয়।

গ্রীষ্মকালে ইহারা বস্ত্রাদি পরিধান করে না, সকলেই প্রায় উলঙ্গ থাকে; শীতকালে কিম্বা কোন উৎসব উপলক্ষে পুরুষেরা যে বস্ত্র পরিধান করে তাহার বিস্তৃতি তিন অঙ্গুলির অধিক নহে; ইহাই তাহারা কটিদেশে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া আপনাদিগকে পরম সুসজ্জিত বলিয়া মনে করে। এতদ্ব্যতীত শীতকালে শীতনিবারণের জন্য ইহাদিগকে কাঁথার মত পুরু একপ্রকার গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখা যায়, ইহাই তাহাদিগের বিছানা। রাত্রে এবং প্রভাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রৌদ্র না উঠে, ততক্ষণ ইহাদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখে—রৌদ্র উঠিলেই তাহা পরিত্যাগ করে। স্ত্রীলোকের বস্ত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, কিন্তু তাহাতে জানু কিম্বা বক্ষদেশ আচ্ছাদন করিতে কুলায় না।

ওয়ারা একস্থানেই অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত বাস করে, সুতরাং অধিকাংশ পার্ব্বত্য জাতির ন্যায় ইহারা যত্র-সায়ং-গৃহ নহে। ইহাদিগের মধ্যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। রূপসী কন্যা দেখিলে ইহারা অনেকগুলি বলদ পণ দিয়া তাহাকে ঘরে আনে, কন্যা তেমন সুরূপা না হইলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কয়েকটি কুক্কুর মাত্র উপহার দিতে হয়। কোন রমণীর সন্তান হইলে প্রথমজাত সন্তানটিতে সেই স্ত্রীলোকের পিতামাতার অধিকার জন্মে, তবে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া সন্তানকে গৃহে রাখিতে পারে।

স্বর্ণ-উপকূলের আদিম-অধিবাসী।

গোল্ডকোষ্ট বা স্বর্ণ উপকূল পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত। ইহার কিয়দংশ ইংরেজ-রাজের অধিকার-ভুক্ত; কিন্তু ইহার অধিকাংশ ভূভাগই অরণ্যময়। এই দেশের এক অংশের অধিবাসীবর্গের নাম ফ্যান্‌টি। ফ্যান্‌টিরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং ইহাদিগের রীতিনীতি অত্যন্ত বিস্ময়কর। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বাস করিলেও ফ্যান্‌টিরা এক বংশোদ্ভব; বিশ্বাস এবং কুসংস্কারবিষয়ে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ফ্যান্‌টিদিগের ভাষার নাম চাউই (Tchwi)। ইহাদের শরীর যেরূপ দীর্ঘ ও সবল, মানসিক শক্তি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র এবং হীন, কিন্তু ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও শোণিতপিপাসু।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ফ্যান্‌টিজাতি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। সে সময়ে ইহারা আশান্তিরাজের অধীনে থাকিলেও আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করিত। এমন হীনচরিত্র অধমজাতি আফ্রিকায় আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ! ভিক্ষাকেই ইহারা জীবনোপায়ের প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে; কিন্তু ইহাদিগকে শুধু ভিক্ষুক বলিলেই যথার্থ

সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা "a nation of pettifoggers and beggars who will not only ask for bread, but will also ask for payment for carrying the bread away."

আশান্তিগণ এই প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদিগের সাহস এবং মনুষ্যোচিত অনেক গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত; এদিকে যেমন ইহাদিগের সাহস এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ আছে অন্যদিকে তেমনি ইহাদিগের আকারে সভ্যজাতির সবল এবং উন্নত আদর্শের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ফ্যান্‌টি ও আশান্তি ভিন্নও এই প্রদেশে কতিপয় আদিম অসভ্য-জাতি বাস করে, তন্মধ্যে ডেন্‌কেরা, ওয়াসাও, আহান্তা এবং আওইন জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য এবং শিক্ষাবিস্তারের কোন সুযোগ না থাকাতে এই প্রদেশের অধিবাসীগণের মধ্যে উন্নতির কোন সূচনা দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার অন্ধ ধর্ম্মভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়; কয়েকজাতির মধ্যে সাধারণ দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। আশান্তিগণ তাঙ্গোনামক দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এই দেবতা তাঁহার ভক্তদিগকে শত্রুর দুরভিসন্ধি জ্ঞাপন করেন, এবং শত্রুর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে বসন্ত রোগ ব্যাপ্ত করিয়া দেন। প্রত্যেক গ্রামেরই এক এক গ্রাম্য দেবতা আছে; তাহারা তত্রত্য নদী হ্রদ পর্ব্বত ও উপত্যকা প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ইহাদের পুরোহিতদিগেরও অসীম ক্ষমতা। দলস্থ প্রধান ব্যক্তি হইতে সকলেই পুরোহিতের অত্যন্ত বাধ্য। সাধারণের বিশ্বাস, এই সকল পুরোহিত ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় সুদক্ষ; অগ্নিতে দগ্ধ না হইয়া নির্ব্বিবাদে

উত্তমরূপে জানে বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কখন কখন ইহাদিগের দৈববিদ্যা নিষ্ফল হইয়া যায়; দলস্থ সকলে তখন পুরোহিতকে বেষ্টন করিয়া তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাহে, কিন্তু পুরোহিতের কথার উপর ইহাদিগের এমনই অচল বিশ্বাস যে, তাহার নিকট হইতে কোন একটা উত্তর পাইলেই—তাহা যতই কেন অসম্ভব হউক না—ইহারা সন্তোষ লাভ করে।

কোন বিষয়ে দেবতার উপদেশ লাভ করিতে হইলে, পুরোহিতগণ তাহাদিগের উপর দেবতার ভর হইয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে; তাহারা হঠাৎ আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, মুখে 'গেঁজলা' কাটে এবং তাহার পর উঠিয়া পাগলের মত নৃত্য আরম্ভ করে, ও নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা উচ্চারণ করে। এই কথাগুলিকে দেবতার প্রত্যাদেশ বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। পুরোহিতের পরিচ্ছদ সর্ব্বসাধারণের পরিচ্ছদ হইতে কিছু স্বতন্ত্র; পুরোহিতগণ সাধারণতঃ সাদাসিধে গেরুয়া বসন পরিধান করে। কোন উৎসব উপলক্ষে বা বিশেষ দিনে সকলে শ্বেতবস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং কখন কখন আপাদমস্তক মৃত্তিকানুলিপ্ত করিয়া আসন্ন মহোৎসবের পরিচয় দেয়। ইহারা চক্ষুর চারিদিকে নাকে মুখে ও বক্ষস্থলে সাদা উল্কী পরিতে ভালবাসে, খুব লম্বা চুল রাখে এবং গলদেশে উপবীতের ন্যায় সূত্র ধারণ করে। অনেকের হস্তে তিন চারি ফিট লম্বা ছড়ি প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের স্ত্রীপুরোহিতেরা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়চারিণী এবং সংযমহীনা। ইহারা বিবাহ করিতে পারে না; সুতরাং চরিত্রদোষকে ইহারা বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রশ্রয় বলিয়াই মনে করে। কোন কোন জাতির স্ত্রীলোকের মধ্যে ঔষধ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে। এই প্রকার ক্ষমতাশালিনী স্ত্রীলোককে সাধারণে অত্যন্ত ভয় এবং ভক্তি করে।

করে। আত্মার অস্তিত্বে ইহারা বিশ্বাসবান, আত্মাকে ইহারা 'ক্রা' বলে। ইহাদিগের বিশ্বাস কোন লোক মরিলে পরলোকে তাহার একাকী বাস করিতে কষ্ট এবং অসুবিধা হইতে পারে। সেই জন্য কোন ব্যক্তি মরিলেই তাহার স্ত্রী এবং দাসদাসীগণকে নিহত করা হয়। তাহার পর সকলকে একত্র সমাহিত করিয়া সমাধিগহ্বর পূর্ণ করিয়া ফেলে। এক জন দলপতির মৃত্যু হইলে তাহার সম্মানার্থ পাঁচশত দাস দাসীকে পর্য্যন্ত নিহত করা হয়; কোন রাজা পরলোক গমন করিলে শত শত লোক এমন কি সহস্রাধিক স্ত্রীপুরুষ মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের এক জন রাজার মৃত্যু হইলে, দুই শত ভৃত্যকে সেই মৃতের অনুগমন করিতে হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে একজন রাজ্ঞীর মৃত্যুতে তিন সহস্র ফ্যান্টীর প্রতি সহমরণের আদেশ প্রদত্ত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি যুদ্ধে একশত ছত্রিশজন আশান্তি সর্দ্দার নিহত হইলে পরলোকে তাহাদিগের আজ্ঞা পালন ও সুখস্বচ্ছন্দতাসাধনের জন্য ছয়শতআশিজন লোককে বিনষ্ট করা হইয়াছিল। চল্লিশদিন পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিগণের আত্মীয়বর্গের শোচনীয় ক্রন্দনধ্বনির বিরাম ছিল না, এবং সেই ক্রন্দনোচ্ছ্বাস বিলুপ্ত করিবার জন্য, দিবারাত্রি ঢাক ও শিঙা বাজাইয়া আকাশ পূর্ণ করা হইয়াছিল।

কোন মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ যাহারা নিহত হয়, তাহাদিগের মৃত্যুযাতনাও যৎপরোনাস্তি অধিক; তাহাদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। দুই তিন জন 'অডুমকো' অর্থাৎ হত্যাব্যবসায়ী তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা হস্তে লইয়া সেই সকল আশাহীন মৃতকল্প স্ত্রীপুরুষগণের উপর নিপতিত হয়—এবং তাহাদিগের চক্ষে, মুখে, গালে সর্ব্বত্র অসঙ্কোচে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে তিল তিল করিয়া

চেষ্টা করিতে পারে না; কারণ তাহাদিগের হস্তদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং নাসা, কর্ণ, চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ আঘাতে আঘাতে ছিন্ন হইয়া আসে, মুখমণ্ডলের রক্ত বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া ধরাতল পর্য্যন্ত অভিষিক্ত করে। অবশেষে হতভাগ্যদিগের অস্ত্রাহত ক্ষতবিক্ষত শোণিতপ্লাবিত দেহ হইতে প্রাণবায়ুটুকু বহির্গত হইয়া যায়। যখন তাহারা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, তখন প্রবলবেগে ঢাক বাজিতে থাকে, এবং সেই ঢক্কাধ্বনিতে এই হৃদয়বিদারক লোমহর্ষণ দৃশ্য আরো ভীষণ হইয়া উঠে!

বড়দিদি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাস হইল সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মাধবী একটি বার মাত্র মনোরমাকে পত্র লিখিয়াছিল—আর লেখে নাই।

পূজার সময় মনোরমা পিতৃভবনে আসিয়া মাধবীকে ধরিয়া বসিল,—“তোর বাঁদর দেখা।”

মাধবী হাসিয়া কহিল “বাঁদর কোথায় পাবলো ?”

মনোরমা তাহার চিবুকে হাত দিয়া সুর করিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিল,—

“আমি এলাম ছুটে দেখ্‌ব বলে,
কেমন শোভে পোড়ার বাঁদর—
রাঙা চরণতলে
তোর ঐ রাঙা চরণতলে”।

সেই যে পুষেছিলি ?

"কবে ?"

মনোরমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"মনে নেই ? যে তোকে বই আর জানত না ?"

মাধবী কথাটা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিল, তাই অল্পে অল্পে মুখখানি বিবর্ণ হইতেছিল; তথাপি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ওঃ—তাঁর কথা ? তিনি আপনি চলিয়া গিয়াছেন।"

"অমন রাঙা পা দুটি তার পছন্দ হ'ল না ?"

মাধবী মুখ ফিরাইল—কথা কহিল না। মনোরমা হাত দিয়া আদর করিয়া তাহার মুখ ফিরাইল—কৌতুক করিতে গিয়া দেখিল তাহার দুই চক্ষে একরাশি জল আনিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "একি মাধবী !"

মাধবী আর সাম্‌লাইতে পারিল না—চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মনোরমার বিস্ময়ের সীমা নাই—একটা উপযুক্ত কথাও খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ কাঁদিতে দিল। তাহার পর জোর করিয়া মুখ হইতে অঞ্চল খুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখিত ভাবে বলিল, "একটা সামান্য কৌতুক সহিতে পারিলে না বোন !"

মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, "আমি যে বিধবা দিদি !"

তাহার পর দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। দুইজনেই নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মনোরমা কাঁদিতেছিল—মাধবীর দুঃখে; সে বিধবা তাই বলিয়া—কিন্তু মাধবার অন্য কারণ ছিল। এখনি না জানিয়া মনোরমা যে ঠাট্টা করিয়াছে, "যে তোকে বই আর জান্‌ত না"—মাধবী তাহাই ভাবিতেছিল। একথা যে নিতান্ত সত্য, সে তাহা জানিত।

"কোন কাজটা ?"

"তা'কি ব'লে দিতে হবে বোন ?—আমি সব বুঝেছি।"

এই ছয়মাস ধরিয়া যে কথা মাধবী প্রাণপণে লুকাইয়া আসিতেছিল, মনোরমার কাছে আর তাহা লুকাইতে পারিল না ; ধরা পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বড় ছেলেমানুষের মত কাঁদিল।

শেষকালে মনোরমা বলিল "কিন্তু গেল কেন ?"

"আমি যেতে বলেছিলাম।"

"বেশ করেছিলে—বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছিলে।"

মাধবী বুঝিল, মনোরমা কিছুই বুঝে নাই—তাই একে একে সব কথা বুঝাইয়া কহিল। তাহার পর বলিল, "কিন্তু তিনি যদি না বাঁচিতেন তাহা হইলে বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতাম।" মনোরমা মনে মনে কহিল, এখনই বা তার কম কি ?

সে সেদিন বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। সেই রাত্রেই—কাগজ কলম লইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল—

"তুমি ঠিক বলিতে—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই। আমিও আজ তাহাই বলিতেছি, কেন না মাধবী আমাকে শিখাইয়াছে। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে জানি, তাই তাহাকে দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সাহস হয় না ; সমস্ত স্ত্রীজাতিকে দোষ দিই—বিধাতাকে দোষ দিই—তিনি কি জন্য এত কোমল, এই জলের মত তরল পদার্থ দিয়া নারীর হৃদয় গড়িয়াছিলেন ? এত ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া এ হৃদয় কে গড়িতে সাধিয়াছিল ? তাঁহার চরণে প্রার্থনা যেন এ হৃদয়গুলা একটু শক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় ;—আর তোমার চরণে প্রার্থনা যেন ঐ পায়ে মাথা রাখিয়া ঐ মুখপানে চাহিয়া মরিতে পারি। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। আমাকেও বেশী বিশ্বাস করিও না— শীঘ্র আসিয়া লইয়া যাও—"

তাহার স্বামী উত্তর লিখিলেন—

"যাহার রূপ আছে সে দেখাইবেই, যাহার গুণ আছে সে প্রকাশ করিবেই, যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে ভালবাসিতে জানে—সে ভালবাসিবেই। মাধবীলতা রসাল বৃক্ষ অবলম্বন করে, ইহা জগতের নীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি? তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সেজন্য চিন্তিত হইও না।"

মনোরমা স্বামীর পত্র মাথায় রাখিয়া মনে মনে তাহার চরণ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লিখিল—"মাধবী পোড়ামুখী—বিধবাকে যাহা করিতে নাই সে তাই করিয়াছে। মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে।"

পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী খুব হাসিয়া ফেলিলেন; তাহার পর কৌতুক করিয়া লিখিলেন, "মাধবী পোড়ামুখী তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কেন না বিধবা হইয়া মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে; তোমাদের রাগ হইবার কথা—বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে! আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব তোমার কোন চিন্তা নাই—এমন সুবিধা কিছুতেই ছাড়িও না; এই অবসরটুকুর মধ্যে পরম আরামে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসিয়া লইও। কিন্তু, কি জান মনোরমা, তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিতে পার নাই, আমি একবার একটা লতা দেখিয়াছিলাম, সেটা আধ ক্রোশ-ধরিয়া ভূমিতলে লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী! তুমি যখন এখানে আসিবে, তখন দুজনে সেটিকে দেখিয়া আসিব।"

মনোরমা রাগ করিয়া তাহার উত্তর দিল না।

কিন্তু মাধবীর চোখের কোনে কালী পড়িয়াছে, প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়াছে, কাজকর্ম্মে তেমন বাঁধনি নাই—একটু ঢিলারকমের

বরং বাড়িয়াছে—কিন্তু সব কাজগুলা আর তেমন মনে থাকে না—মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যায়।

এখনো সবাই কহে বড়দিদি! এখনো সবাই সেই কল্পতরুটির পানে চাহিয়া থাকে, হাতে পাতে, অভীষ্ট ফল পায়; কিন্তু গাছ আর তেমন সরস সতেজ নাই। পুরাতন লোকগুলির, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়—পাছে শুকাইয়া যায়।

মনোরমা নিত্য আসে, অন্যান্য কথা হয়—শুধু একথা আর হয় না। মাধবী দুঃখিত হয়, মনোরমা তাহা বুঝিতে পারে। আর এ সকল কথার আলোচনা যত না হয় ততই ভাল; হতভাগী যদি ভুলিতে পারে, মনোরমা এ কথাও ভাবে।

সুরেন্দ্রনাথ আরাম হইয়া পিতার সহিত বাটী চলিয়া গিয়াছে। বিমাতা তাঁহার যত্নটা একটু কম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাই সুরেন্দ্র শরীরে একটু আরাম পাইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ সারিতে পায় নাই—অন্তরে একটু ব্যথা আছে। রূপ যৌবনের আকাঙ্ক্ষা পিপাসা এখনো তাহার মনে উদয় হয় নাই,—এ সব সে জানিত না। পূর্ব্বের মত এখনো সে অন্যমনস্ক, আত্মনির্ভর-শূন্য! কিন্তু কাহার উপর নির্ভর করিতে হইবে, এটাই সে খুঁজিয়া পায় না। খুঁজিয়া পায় না বলিয়াই সেই যে নিজের কাজ নিজে দেখিতে পারে, তাহাও নহে, আজো পরের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বের মত তেমন আর মনে ধরে না, সব কাজেই যেন একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, একটু খুঁত খুঁত করে। তাহার বিমাতা দেখিয়া শুনিয়া কহেন, "সুরো আজকাল বদ্‌লে গেছে।"

মধ্যে একদিন তাহার জ্বর হইয়াছিল। বড় কষ্ট হইয়াছিল, চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; বিমাতা কাছে বসিয়াছিলেন—তিনি একটা নূতন জিনিষ দেখিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহারও চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল; আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া কহিলেন, "সুরো,

কেন বাবা?” সুরেন চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর, একখানা পোষ্টকার্ড চাহিয়া লইয়া, আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিয়া দিল—“বড়দিদি, আমার জ্বর হয়েছে,—বড় কষ্ট হইতেছে।”

পত্রখানা ডাকঘরে পৌঁছিল না। প্রথমে শয্যা হইতে মেজের উপরে পড়িল, তাহার পর যে ঘর ঝাঁটাইতে আসিল সে বেদানার খোবা, বিস্কুটের টুকরা, আঙ্গুরের তুলা এবং সেই চিঠিখানি, সব এক সঙ্গে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ধুলা মাখিয়া, হাওয়ায় উড়িয়া, শিশিরে ভিজিয়া, রোদ খাইয়া, অবশেষে একটা বাব্‌লা গাছের তলায় পড়িয়া রহিল!

প্রথমে সে একখানি মূর্ত্তিমতী উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিল, তাহার পর একখানি হস্তাক্ষর—কিন্তু অনেক দিন কাটিয়া গেল, কিছুই আসিল না। ক্রমে তাহার জ্বর সারিয়া গেল—পথ্য করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর, তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা ঘটিল। ঘটনা যদিও নূতন, কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রের পিতা রায় মহাশয় ইহা বহুদিন হইতে জানিতেন এবং আশা করিতেন। সুরেনের মাতামহ পাবনা জেলার একজন মধ্যবিত্ত জমিদার। ২০।২৫ খানি গ্রামে জমিদারি; বাৎসরিক আয় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে। একে তিনি অপুত্রক, খরচপত্র স্বভাবতঃ কম, তাহাতে তিনি একজন প্রসিদ্ধ কৃপণ ছিলেন। তাই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু অর্থ সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে, সমস্ত বৈভব একমাত্র দৌহিত্র সুরেন্দ্রনাথ পাইবে, রায় মহাশয় ইহা স্থির জানিতেন।

তাহাই হইল। রায় মহাশয় সম্বাদ পাইলেন, শ্বশুর মহাশয় আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন! তাড়াতাড়ি পুত্রকে লইয়া পাবনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, শ্বশুর মহাশয় পরলোক গমন করিলেন।

সমারোহ করিয়া শ্রাদ্ধ-শান্তি হইল। শৃঙ্খলিত জমিদারীতে আরো শৃঙ্খলার ঘটা পড়িয়া গেল। পরিপক্কবুদ্ধি, প্রাচীন উকিল রায় মহাশয়ের কড়া বন্দোবস্তে, প্রজারা সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল।

এখন সুরেন্দ্রের বিবাহ হওয়া আবশ্যক। ঘটকের আনাগোনায় গ্রামময় আন্দোলন পড়িয়া গেল। পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে যে বাটিতে একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, সেই বাটিতেই ঘটকের দল, ঘন ঘন পদধূলি দিয়া, পিতামাতাকে আপ্যায়িত এবং আশান্বিত করিতে লাগিল,—এমন ছমাস ছমাস অতিবাহিত হইল।

অবশেষে বিমাতা আসিলেন; তাঁহার সম্পর্কের যে কেহ ছিল, সেও আসিল—বন্ধুবান্ধবে গৃহ পুরিয়া গেল।

তাহার পর, একদিন প্রভাতে, বাঁশী বাজাইয়া, ঢাকের প্রচণ্ড শব্দ করিয়া, কাঁশীর খন্ খন্ আওয়াজে সমস্ত গ্রাম পরিপূরিত করিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

বাল্যবিবাহ কত দিন ?

(বৈদিক যুগ)

প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখি, এ প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের দোষগুণ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। যে বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে এত মতানৈক্য, সে বিষয়ে সহসা কোন মত ব্যক্ত করিয়া আমি অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিতে চাহি না। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ কতকাল হইতে প্রচলিত, এ প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ প্রবন্ধে আমাদের বাল্য বিবাহের ইতিহাস সঙ্কলন করাই উদ্দেশ্য। ইহার দার্শনিকতাসম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বাল্যবিবাহের অর্থ কি ? পুরুষের ঊর্দ্ধতম কত বৎসর বয়সে এবং স্ত্রীলোকেরই বা ঊর্দ্ধতম কত বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে, সে বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা যায় ? যৌবনের পূর্ব্বে যে বিবাহ, তাহাকে বাল্যবিবাহ বলিলে জটিলতা কিছুমাত্র যে কমিল, এমন মনে হয় না। কেননা দেশভেদে, কালভেদে এবং পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বয়সে যৌবন সূচিত হয়। কাহার কত বৎসর বয়সে যৌবন সূচিত হইবে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সুতরাং কাহার ঊর্দ্ধতম কত বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে, সে বিবাহ বাল্য বিবাহের মধ্যে গণনীয়, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। তবে বাল্যবিবাহ বলি কাহাকে ?

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা পুরুষের ২৪।২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে যে বিবাহ এবং স্ত্রীলোকের

মনে করেন। সাধারণতঃ, য়ুরোপীয়গণ এবং আমাদের দেশের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীগণ এই মতাবলম্বী। অবশ্য তাঁহাদের বৈবাহিক আইন অনুসারে স্ত্রীপুরুষের উল্লিখিত বয়সের পূর্ব্বেও বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু আইন এক কথা, আর মত অন্য কথা। আইনের মূল গরজ, মতের মূল চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। আইনে যাহাই থাকুক, যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধবাদী, তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোল্লিখিত বয়সের পূর্ব্বে যে বিবাহ, তাহা বাল্যবিবাহের মধ্যেই গণনীয়।

বৈদিক সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল কি না, সে কথা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, আর একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। 'বৈদিক সময়' বলিতে দশ কিম্বা বিশ বৎসর-পরিমিত কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বোঝা যায় না। এক সহস্র কিম্বা দ্বিসহস্র অথবা ততোধিক কালকে "বৈদিক সময়" বলা কর্ত্তব্য কি না, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই ; কতটা কালকে যে আমরা 'বৈদিক সময়' বলি, এ যাবৎ তাহাও নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, যাহাকে আমরা "বৈদিক সময়" বলি, তাহা যে অতি সুদীর্ঘ সময়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই সুদীর্ঘ সময়ে বরাবরই যে, কোন একটি বিষয়ে একটি মাত্র নিয়ম প্রচলিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। ঐ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একই বিষয়ে যে কত কত নিয়মের মালা গ্রথিত হইয়াছিল, এবং কত কত নিয়মের মালা স্খলিত হইয়াছিল,—আজ, কালের এ সুদূর প্রান্তে থাকিয়া, কে তাহার মীমাংসা করিবে ? ঐ সময়ের মধ্যে যে কত বৈদিক সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে ? বেদ বলিতে আমরা এখন যতটুকু পাইয়াছি, উহা সম্ভবতঃ সমস্ত বৈদিক রচনার তুলনায়, ক্ষুদ্রতম কণিকামাত্র,—সমুদ্রের তুলনায় কূপ, হিমাদ্রির তুলনায় বল্মীকের স্তূপ ! হায়, কে বলিবে, বেদের আমাদের কতখানি লুপ্ত হইয়াছে, কতটুকু আছে ? যেটুকু আছে তাহার দুই একটি সূক্তের মতামতের

উপর নির্ভর করিয়া, সমগ্র বৈদিক সময়ে তাহার অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা উহা কোন অল্পকালস্থায়ী সাময়িক নিয়ম হইতে পারে, কিম্বা কোন ঋষির ব্যক্তিগত মত হইতে পারে। আজ যদি কেবলমাত্র মানবসংহিতাখানি থাকিত, এবং অন্যান্য সমস্ত স্মৃতিসংহিতাগুলি লুপ্ত হইয়া যাইত, তবে কি আমরা ঐ একখানি মাত্র সংহিতার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারিতাম যে, পূর্ব্বকালে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিই বিধবা-বিবাহের সমর্থন করেন নাই? কিম্বা আজ যদি পরাশর-সংহিতাখানি ব্যতীত অপর স্মৃতিশাস্ত্রগুলি লুপ্ত হইত, তবে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারিতাম যে, পূর্ব্বকালে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিই একবাক্যে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন? কোন একটি মত অভিব্যক্ত দেখা যায় বলিয়া তাহা যে সুদীর্ঘকালব্যাপী সমস্ত বৈদিক সমাজে ধারাবাহিকরূপে প্রচলিত ছিল, এরূপ মনে করা একটি বিষম ভ্রম। তথাপি পণ্ডিতম্মন্য য়ুরোপীয়গণ এবং তাঁহাদের পদাঙ্কানুবর্ত্তী কোন কোন স্বদেশী ব্যক্তি দুই একটি ক্ষুদ্র কথার উপর নির্ভর করিয়া এমনই 'চুলচেরা' বিচার করিতে তৎপর হন যে, তাঁহাদের যত্ন ও আগ্রহ সময়ে সময়ে বিশুদ্ধ হাস্য কিম্বা করুণ রসের সৃষ্টি করে মাত্র!

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়, তাঁহার সুলিখিত "History of Civilisation in Ancient India" নামক গ্রন্থে, বৈদিক সময়ে আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, তৎপ্রসঙ্গে একস্থলে লিখিয়াছেন,—"The first two among the following verses will show that the unnatural custom of child-marriage was unknown, and that girls were married after they had attained their youth :—

21. O Visvavasu! (God of marriage), arise from this place for the marriage of the

Visvavasu with hymns and prostrations. Go to some other maiden, who is still in her father's house and has attained the sign of the age of marriage. She will be your share, know of her.

22. "O Visvavasu! arise from this place. We worship thee bending in adoration. Go to an unmarried maiden, whose person is well-developed. Make her a wife and unite her to a husband." Vol. I.

প্রথম শ্লোকটির "signs of the age of marriage" দেখিয়া রমেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "বৈদিক কালে বাল্যবিবাহরূপ অস্বাভাবিক প্রথা অজ্ঞাত ছিল।" একটি মাত্র সূক্তের একটি মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, রমেশ বাবু উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটির একটি মূল বৈদিক শব্দের, রমেশ বাবু তাঁহার তিন খানি গ্রন্থে, তিনরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন ;—"পূর্ণাবয়বা" (হিন্দুশাস্ত্র), "নিতম্ববতী" (ঋগ্বেদ-সংহিতা), "well-developed" (History of Civilisation in Ancient India.)

আসল কথা, রমেশ বাবু দুইটি শ্লোকের অনুবাদেই কিঞ্চিৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, অথবা সায়ণের ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতদ্বারা চালিত হওয়াতেই, তাঁহার এরূপ ভ্রম বা স্খলন হইয়াছে। রমেশ বাবু যে নিজ মত বিসর্জ্জন দিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুবর্ত্তী হইয়াছেন, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। রমেশ বাবুর উপর য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের পরোক্ষ প্রভাবই, তাঁহার এই ভ্রমের বা স্খলনের কারণ। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার হইতে ঠিক

—চতুর হংস যেমন জল হইতে দুধটুকু ছাঁকিয়া লয়,—তাঁহারাও ঠিক ততটুকু গ্রহণ করেন মাত্র। বাকী যেটুকু লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হয় এদেশীয় আচার্য্যগণ কখনই বুঝিতে পারেন নাই, কিম্বা তাহা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত, অথবা সে সমগ্র গ্রন্থখানিই নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত! ঋষিকল্প সায়ণাচার্য্য বেদের ভাষ্য করিয়াছেন, এবং সেই ভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক অনেক পণ্ডিত বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের অনুবাদে স্থানে স্থানে সায়ণের ভাষ্যকে এরূপ ভাবে অবজ্ঞাত করা হইয়াছে যে, বোধ হয়, সায়ণ আদৌ বেদ বুঝেন নাই,—বেদ বুঝিয়াছেন এই সমস্ত প্রভুপাদ মহোদয়গণ! "তোমারই শিল, তোমারই নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া;"—তোমাদেরই টীকার উপর নির্ভর করিয়া, তোমাদেরই পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, তথাপি যেস্থলে, আমার সহিত তোমাদের মত মিলে না, সেস্থলে, হয় তোমাদের টীকাই ভুল, নচেৎ তোমাদের মূলগ্রন্থের ঐ স্থানটা প্রক্ষিপ্ত! সাধে কি বঙ্কিম বাবু তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বে" বলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করা অপেক্ষা, আর মহাপাপের কাজ কিছুই নাই!

মূল বৈদিক শ্লোকদুইটি, সায়ণের ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতীহ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥"

ঋক্—১০ম—৮৫সূ—২১ শ্লোক।

"আভিঃ নৃণাং বিবাহঃ স্তূয়তে। হে বিশ্বাবসো! অতঃ স্থানাৎ কন্যাসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। এষা কন্যা পতিবতী সংজাতা, অত উদীর্ষ্ব

নমস্কারেণ গীর্ভিঃ স্তুতিভিশ্চ ইলে স্তৌমি। তর্হি এনাং বিহায় কাং স্বীকরোমীতি যদি ব্রূষে, তর্হি অন্যাং পিতৃষদং পিতৃকুলে স্থিতাং ব্যক্তাং অনূঢ়েতি পরিস্ফুটাং বিগতাঞ্জনাং বা স্তনোদ্গমাদিরাহিত্যেন অপ্রৌঢ়াং ইত্যর্থঃ। সঃ তাদৃশঃ পদার্থঃ তে তব ভাগঃ কল্পিতঃ। তস্য তং ভাগং বিদ্ধি জানীহি। জনুষা জন্মনা লভস্ব ইত্যর্থঃ।"—(সায়ণাচার্য্য)

অর্থাৎ, এই শ্লোকটি এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকটিদ্বারা মানুষের বিবাহ স্তূত হইতেছে। হে বিশ্বাবসো! এই কন্যার নিকট হইতে উঠ, কেননা এ এখন পতিবতী হইয়াছে। বিশ্বাবসু নামক যে গন্ধর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা স্তব করি। যদি বল, এ কন্যাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকে গ্রহণ করিব ?—তদুত্তরে বলিতেছি,—অন্য যে কন্যা পিতৃকুলে আছে, যাহাকে দেখিলেই অনূঢ়া বলিয়া বুঝা যায়, কিম্বা যে বিগতাঞ্জনা, যাহার এখনও যৌবন চিহ্ন হয় নাই, সুতরাং অপ্রৌঢ়া,—এমন যে কন্যা, যে তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহাকে তুমি লাভ কর।

"উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥"

ঋক্—১০ম—৮৫সূ—২২ শ্লোক।

অতঃ অস্মাৎ শয়নাৎ, হে বিশ্বাবসো! কন্যাস্বামিন্ গন্ধর্ব্ব! উদীর্ষ্ব উদ্গচ্ছ। ঈর গতৌ, আদাদিকঃত্ত অনুদাত্তেৎ তস্য লটি রূপং। বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যামামধিপতি র্যতঃ "লভামি তেন কন্যাং" ইতি হি মন্ত্রঃ তাদৃশ দেব ত্বাং নমসা নমসকারেণ ঈলামহে স্তুমঃ। স তু অন্যাং প্রফর্ব্যাং বৃহন্নিতম্বাং কন্যাং ইচ্ছ জায়াং তাং পত্যা সহ পুনঃ সংসৃজ।"—

অর্থাৎ, হে কন্যাস্বামিন্ গন্ধর্ব্ব! তুমি শয়ন হইতে উঠ। তোমাকে আমরা নমস্কারদ্বারা স্তব করিতেছি। বৃহন্নিতম্বা অন্য কোন কন্যাকে তুমি ইচ্ছা কর। তাহাকে জায়া করিয়া পতির সহিত মিলিত করিয়া দেও।

দেখা যাইতেছে, প্রথম শ্লোকটীর 'ব্যক্তাং' এবং দ্বিতীয় শ্লোকটির "প্রক্ষর্ব্যাং—এই দুইটি শব্দের অর্থগ্রহসম্বন্ধে সায়ণের সহিত রমেশ বাবুর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। সায়ণ "ব্যক্তাং" অর্থ করিয়াছেন—"অনূঢ়া বলিয়া পরিস্ফুট, অর্থাৎ এখনও যাহার স্তনোদ্‌গমাদি হয় নাই, সুতরাং অপ্রৌঢ় বা অপ্রগল্‌ভ।" রমেশ বাবুর "ব্যক্তাং"এর অর্থ এইরূপ,—"বিবাহ লক্ষণ-যুক্তা," "has attained the signs of the age of marriage." অর্থাৎ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়, "যৌবন মধ্যস্থা।" এই অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই রমেশ বাবু বলিয়াছেন, "the unnatural custom of child-marriage was unknown and that girls were married, after they had attained their youth." "ব্যক্তাং" এর যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহারও গৌণ অর্থ, "বিবাহ-লক্ষণ যুক্তা" বটে। কিন্তু সায়ণ কিরূপ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং রমেশ বাবুই বা কিরূপ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া "বিবাহ-লক্ষণ-যুক্তা" বলিতেছেন, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। রমেশ বাবু "ব্যক্তাং"এর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য, উহার অর্থ লিখিয়াছেন, "পূর্ণাবয়বা," "well-developed," উহার সায়ণের ভাষ্য, "বৃহন্নিতম্বা" অর্থাৎ নিতম্ববতী। নিতম্ববতী হইলেই কেহ "পূর্ণাবয়বা" হয় না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, "প্রক্ষর্ব্যাং" শুধু কবিত্বের খাতিরে বলা হইয়াছে। নচেৎ নিতম্ববতী বলিলেই, "পূর্ণাবয়বা" যুবতী বুঝিতে হইবে, এমন

বয়সের পূর্ব্বে, স্ত্রীলোকদিগের শারীরিক গঠন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং এখন এমন অনুমান করিতে পারি যে, রমেশ বাবুর মতে বৈদিক সময়ে বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণের বিবাহ হইত না। কিন্তু সায়ণের মতে কত বৎসর ?—কখনও বালিকাগণ "স্তনোদ্‌গমাদি রাহিত্যেন অপ্রৌঢ়া," অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বালিকাগণের বিবাহ হইত। কিন্তু আমাদের দেশের বালিকারা কত বৎসর বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে ? অধিকাংশ বালিকাই ১১ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে ঋতুমতী হইয়া থাকে। † কিন্তু রমেশ বাবুর মতে "প্রক্ষর্ব্যাং" বলিতে, কখনই দশ বারো বৎসরের মেয়েকে বুঝায় না। কারণ, তিনি তিন খানি গ্রন্থে "প্রক্ষর্ব্যাং" এর তিনরূপ অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমি তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলাম ; তদুত্তরে রমেশবাবু লিখিয়াছেন, "Whatever the word may be in the original, it can hardly be applied to a girl of ten or twelve."

বৈদিক সময়ে বাল্যবিবাহ ছিল কি না, তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন একটি সূক্তের একটি মাত্র কথার উপর নির্ভর করিয়া, এমন গুরু বিষয়ে একটা স্থির মীমাংসা

---

* Vide Midwifery by Alfred Lewis Galabin, pp. 45, 46.

† The age, at which menstruation commences, is influenced by climate, race, and mode of life. The influence of climate has been exaggerated, but in hot climates the age is, on an average, two or three years earlier than in cold. ...... There may be a difference between different races, living in the same country, and *among the Hindoos*, whose custom is, for marriage, to be computed as soon as menstruation appears, *the age is peculiarly early.*"

Galabin's Midwifery, pp. 45, 46.

See also the essay on "Menstruation" in the "Cyclopædia of

করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, উহা কোন সাময়িক নিয়ম হইতে পারে, অথবা উহা কোন ঋষির ব্যক্তিগত মত হইতে পারে। তথাপি যদি কেহ এখন একটি কথার উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ সূক্ষ্ম বিচার করা অসঙ্গত মনে না করেন, তবে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, সম্ভবতঃ বৈদিক সময়ে স্ত্রীলোকদিগের বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল;—অন্ততঃ আচার্য্য সায়ণ যদি বেদব্যাখ্যায় ভ্রান্ত না হইয়া থাকেন, তবে বৈদিক সময়ে স্ত্রীলোকগণের বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।

এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করিবার জন্য, আজকাল একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আমাদের বিবাহের সময়ে যে বৈদিক মন্ত্রগুলি পঠিত হইয়া থাকে, উহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রাহী মাত্রই বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা প্রাপ্তবয়স্কা হইয়াই বিবাহিত হইতেন। সেদিন মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "If they (the Hindoos) examined the ceremonies and the *mantras* used on such occasions, and understood the real significance of the rituals, it was clear that all that indicated that the girl was fit for conjugal companionship, at the time of the marriage." (The Indian Nation, May 30, 1904). অর্থাৎ, বিবাহের সময়ে যে সমস্ত আচারের অনুষ্ঠান এবং মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে, হিন্দুরা যদি তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন যে, দাম্পত্য সাহচর্য্যের উপযুক্ত হইলেই স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হইত। এখন, এই 'মর্ম্ম-গ্রহণ' কথাটি বড় ভয়ানক জিনিষ। অবশ্য "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ", তথাপি প্রত্যেক পণ্ডিতই মনে করেন * যে একটি বিষয় তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন,

উহাই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় ঐ মন্ত্রগুলির একরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন, আবার পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ওগুলির অন্যরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া, ভূদেব বাবুকে "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত"—জ্ঞানে উড়াইয়া দিবার যো নাই। কারণ ইংরাজি সাহিত্যেও তাঁহার মত অভীজ্ঞ ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে অল্পই আছেন। বিবাহের সময়ে যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে একটি এইরূপ,—

> "সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে।
> রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাং॥"

অর্থাৎ, সোম এই কন্যাটি গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দান করিয়াছিলেন, অগ্নি ইহাকে ধন ও পুত্রসহ আমাকে দান করিয়াছেন,—অর্থাৎ, আমি ইহা হইতে ধন ও পুত্র পাইব।

ভূদেব বাবু এই শ্লোকটির যে চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ইদানীং এই গৃহ্যসূত্রোক্ত মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যগ্রহসম্বন্ধে কিছু মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে একটী পৌরাণিক শ্লোকে ইহার অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে, কাশীখণ্ড হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> "কন্যাং ভুঙ্ক্তে রজঃকালেঽগ্নিঃ শশী চ লোমদর্শনে।
> স্তনোদ্ভেদেতু গন্ধর্ব্ব স্তৎপ্রাগেব প্রদীয়তে॥"

রজঃকালে অগ্নি [অভিলাষরূপে] লোমদর্শনকালে চন্দ্র [সৌন্দর্য্যরূপে] স্তনোদ্ভেদকালে গন্ধর্ব্ব [সুস্বর এবং গতিবৈচিত্র্যরূপে]—কন্যাকে ভোগ করেন। এই জন্য এই সকল ঘটনার পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে। (আচার-প্রবন্ধ, ১৬৬ পৃঃ, পাদটিপ্পনী)।

এবং ভূদেব বাবু যেরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদিক সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার মহোদয় অন্যরূপ বলিতেছেন। ইহার কোন্ পক্ষ ভ্রান্ত কোন পক্ষ অভ্রান্ত, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিয়াছি, বাল্যবিবাহের দার্শনিকতাসম্বন্ধে কিছুই বলিব না। নচেৎ নিম্নোদ্ধৃতবৈবাহিক বৈদিক মন্ত্রটীদ্বারা সম্ভবতঃ কথঞ্চিৎ প্রমাণ করা যায় যে, বৈদিক সময়ে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বর কন্যাকে বলিতেছেন—

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি
অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈর্মাংসানি
ত্বচা ত্বচম্॥"

অর্থাৎ, হে কন্যে! তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস, তোমার ত্বকের সহিত আমার ত্বক মিলিত করিয়া দিলাম।—অর্থাৎ হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মাচরণ নিমিত্ত স্বামীস্ত্রীর পরস্পরকে পরস্পরে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। জলে যেমন জলবিন্দু মিলিয়া যায়, ঐরূপ উভয়ের আত্মা মিশিয়া এক হইবে; স্বামীও পূর্ণ নহে, স্ত্রীও পূর্ণ নহে, উভয়েই অর্দ্ধ,—উভয়ে মিলিয়া পূর্ণ, উভয়ে মিলিয়া এক। আমাদের শাস্ত্রে স্বামী স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ এবং স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। আমরা যখন ধর্ম্মার্থে দেবতার নাম গ্রহণ করি, তখন বলি "হর-গৌরী" "শ্রীবিষ্ণু," কেন না, গৌরীকে ছাড়িয়া হর অপূর্ণ এবং শ্রীকে ছাড়িয়া বিষ্ণুও অপূর্ণ। এইরূপ স্বামীস্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার একীকরণই হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু গাছ যদি বড় হয়, তবে তাহাকে ক্ষেত্র হইতে

হয় না। সেইরূপ বয়ঃস্থা হইয়া বিবাহিত হইলে, স্ত্রী কখনই পিতৃকুল ত্যাগ করিয়া শ্বশুর কুলকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইতে পারে না। এমন কি, তাহার স্বামীকেও সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইতে পারে কি না সন্দেহ। মোটা ডালে কেহ কখনও কলম বাঁধে না; কেন না ডাল বেশী মোটা হইলে জোড়া লাগে না। বালিকা স্ত্রী যেমন সহজে শ্বশুরকুলে মিশিয়া যাইতে পারে, এবং পতিতে একান্ত নির্ভরা হইতে পারে, যুবতী হইয়া বিবাহিত হইলে, সে স্ত্রীর পক্ষে উহা ততদূর সম্ভব নহে। কিছু এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, তাঁহার "হিন্দুবিবাহ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এ বিষয়টী সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

বৈদিক সময়ে ভারতবাসী আর্য্যগণের আচার ব্যবহারসম্বন্ধে বৈদিক সূক্ত হইতে, আমরা যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, তাঁহাদের পারিপার্শ্বিকগণের আচারব্যবহার হইতেও সম্ভবতঃ আমরা ততটুকু অনুমান করিতে পারি। ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ সংখ্যার "বঙ্গভাষায়", পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়,"ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; উহাতে তিনি বলেন, "শ্বেতদ্বীপের বরাভয়দাতা শুক্লচর্ম্মা ইংরাজ, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মান, শাকসন ও কেলটিক প্রভৃতি সমুদায় ইউরোপীয়গণ ও নিত্য পদবিদলিত কর্ব্বুরবর্ণ আমরা একই পদার্থ ও একই জিনিষ। একমাত্র রুশিয়াবাসীগণভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় ভূখণ্ডবাসী, ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান ও পদাহত আমাদিগেরই নেদিষ্ঠ সগন্ধ।" বিদ্যারত্ন মহাশয়, অনেক যুক্তিদ্বারা তাঁহার সেই বাক্য সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, একই স্রোত ত্রিপথগা ভাগীরথীর ন্যায় প্রাগ্-ঐতিহাসিক সময়েই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতদূর জানা যায়, প্রাগ্-ঐতিহাসিক সময় হইতেই চীন, পারস্ত,এসিয়া ও গ্রীস প্রভৃতি দেশবাসীগণের মধ্যে বাল্য-বিবাহ বহুলপরিমাণে প্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় ঐ সকল দেশবাসীগণের তাৎকালিক, কিম্বা কিছু পূর্ব্বের, "নেদিষ্ঠ সগন্ধ" ভারতবাসী বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল,—এরূপ অনুমান কি অসঙ্গত?

বিফল।

আমারে ফিরায়ে দিয়েছ, বলে কি
বিফল, নাথ?
মর্ম্মোত্থিত পূজা, আরাধনা—
জীবন সাথ?
পূজা-মণ্ডপে বায়ু হাহা করে,
দীন মলিনতা রাখিয়াছে ভরে
হৃদি-সঞ্চিত বিফল বেদনা—
দিবস-রাত;
আমারে ফিরায়ে দিয়েছ, বলে কি
বিফল, নাথ!

চিরদিন ধরে জয়-পরাজয়
গিয়াছে চলে,
শ্যামধরণীর অফুরাণ পথে,
কিছু না বলে!
কেহ কেঁদে গেছে, কারো হাসি মুখ,
কাহারো মিলেছে সুখ, কারো দুখ,
সবাই গেয়েছে আপনার গান
আকাশ-তলে;
চিরদিন ধরে জয়-পরাজয়

আজিকার সভা যায় যদি ভেঙে
সন্ধ্যা-আগে,
তেমনি আকাশ উঠিবে রাঙিয়া
গোধূলি-রাগে ;
তেমনি পূরবী গেয়ে যাবে চাষী,
তেমনি থাকিবে ভালবাসাবাসি,
তেমনি ধরায় উঠিবে মাধুরী
প্রভাতে জাগি ;
ভাঙে যদি সভা কারো অভিশাপ
সহসা লাগি'।—

আমি করে যাই আমার যে কাজ,—
হলো বা হীন !
গেয়ে যাব মোর অশ্রু-রাগিণী,—
হলো বা দীন !
ধূলায়-বাতাসে মিশে যাবে তারা,
আমার যে কাজ হয়ে যাবে সারা ;
আমার সাজিতে ফুরাইলে ফুল,
টুটিলে বীণ,
দেবতার কাছে দাঁড়াব রিক্ত
বন্দন-হীন !

স্বরাজ-সমস্যা।

যেদিন জ্ঞানবৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী, 'স্বরাজ' শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ঐ কথাটির অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে—এবং হইতেছে। আমরা সকৌতূহল চিত্তে এবম্প্রকার কোলাহলের অন্তরালে, ইহার রসাস্বাদনে নিযুক্ত থাকিয়া আশা করিতেছিলাম যে, স্বরাজের ভিত্তি এবং আদর্শের সন্ধান পাইব! মহাবাণী আমাদিগকে এমন কৃপা বিতরণ করেন নাই, যে কল্পনার সাহায্যে স্বরাজের একটা আদর্শ ধারণা করিয়া লইব। তাই নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে, কোন্ স্নিগ্ধ আলোকে আমরা স্বরাজের মূর্ত্তি বিভাসিত দেখিব?

নৌরজী চাহেন,—Swaraj like that of the United Kingdom. গোখেল বলেন,—I want our people to be, in their own country, what other people are in theirs. ব্যাখ্যা স্পষ্ট বটে, তবে ভাষায় ঘোর আছে। Moderate এবং Extremist উভয় দলই এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা Moderate, তাঁহারা ধর্ম্ম এবং নীতির দোহাই দিয়া, ইংরাজের নিকট স্বরাজ দাবী (?) করেন। আর Extremistগণ "স্ববীর্য্যলব্ধ স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বরাজ" চাহেন।

কিন্তু হায়!—এই বাদানুবাদে এইটুকু মাত্র বুঝিলাম যে, রাজনৈতিক হিসাবে বিদেশীর নাগপাশমুক্তকে স্বরাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠাকে স্বরাজ আখ্যা দিয়াছি! বেশ! পঞ্চনদ হইতে আসাম ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, বিভিন্ন ভাষায় একই কথা বুঝাইতেছে, কিন্তু যাহা বুঝাইতেছে, এ সবই নভেলিয়ানা। পাশ্চাত্য দেশীয় সাহিত্য এবং ইতিহাস হইতে

সে এক দিন ছিল, যেদিন তাহাতেই তৃপ্ত হইতাম। কিন্তু আজ জানিতে চাহি যে, কেমন করিয়া সেই মহামুক্তি আসিবে; এবং কোন্ মহদুপায়ে সেই মুক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে। আমরা বাস্তবিক স্বদেশহিতৈষণা অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারি নাই। যদি তাহা করিতাম তবে স্বদেশপ্রাণতার উপর এক অটল বিশ্বাস জন্মিত। তবে বিদেশীর উপানৎ-সেবন সম্মান বলিয়া বরণ করিয়া লইতাম না। তবে আজ ভারতীয় বৈতালিকের বন্দনা-গীতি, প্রভাত মারুৎহিল্লোলে গড়াইয়া গড়াইয়া আমাদের প্রত্যেক পেশীকে কর্ম্মস্পন্দনে স্পন্দিত করিত। স্বরাজপন্থী কোন কোন নেতার নিকট শুনিয়াছি যে, স্বরাজের ঠিক আদর্শ এখন বুঝিবার সময় নহে। যদি আদর্শের সন্ধান না পাইলাম, যদি তাহার প্রকৃতি বোধগম্য না হইল, তবে গতি কোথায়! যুক্তি তর্ক খুঁজিয়া পাই না যে, কেন আমাদের শৃঙ্খলান্বিত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইব না! নিয়মাধীন আছে বলিয়াই, আবর্ত্তিত গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষভ্রষ্ট হইয়া পড়ে না। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য জড়ের ন্যায় অন্ধভাবে কর্ম্ম করিতে পারে না।

আজ দ্বিযুগ ধরিয়া যে রাজনৈতিক সাধনা করিয়াছি, তাহারই ফলে স্বরাজ আসিয়া অন্তরের ভিতর আসন অনুসন্ধান করিতেছে। আজ পূর্ণ ধ্যানে, সেই স্বরাজকে দেখিবার বাসনা করিয়া উচ্চ সাধন-মন্ত্রের প্রার্থনা করিতেছি! ব্রাহ্মণবালক উপবীত গ্রহণ করিয়া যখন সন্ধ্যা-প্রাণায়াম আরম্ভ করেন, তখন তাহার মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না; কিন্তু ধ্যান-ধারণায়, নিয়ম-সংযমে, চিত্ত শুদ্ধলাভ করিয়া গুরুদত্ত বীজ-সাধনে এক ভূমানন্দ লাভ করিয়া পরা-মুক্তির অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে মুক্তির কামনা করিতেছি, তাহার সাধন-পন্থা কোন্ চিত্রকর আঁকিয়া দেখাইবে? আমরা উপদেষ্টার উচ্চাসনের

তদন্ত মন্ত্রসাধনে যত্নবান হই। কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া ভ্রমণ করিবার সময় আর নাই! আজ চাহি, এক সুগঠিত নিয়মানুগ কর্ম্মপরম্পরা!

স্বরাজসাধনের প্রথম বীজ,—একতা। বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমন্বিত ভারতে, একতা কতদূর স্থাপিত হইয়াছে—তাহা বিচার্য্য বিষয়। এক রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের ছায়ায়, যদিও আমাদের সকলেরই সুখ দুঃখের গতি, তথাপি সামাজিক বন্ধনের পার্থক্য হেতু পরস্পর হইতে যেন দূর-দূর বোধ হয়। হিন্দুর সমাজ-বিভেদ থাকিলেও হিন্দু হিন্দু। কিন্তু মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন কোথা? বরং হিন্দু মুসলমানের মিলনগণ্ডী প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে।* অনেকে বলেন যে, আমাদের যখন উভয়ের সমান বিপদ উপস্থিত হইবে, তখন এক হইব! কথাটার উপর কতদূর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরও দুইটি দল আছে। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটিও বিস্তর চলিতেছে। মত-বিভেদ থাকিতে পারে; এবং জগতের সৃষ্টি অবধি, এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে একমত কোথাও দেখি নাই। শাক্যসিংহ প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত শঙ্করের মতবিরোধ ছিল। শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় নাই। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার সহিত উপনিষদ্‌কথিত মতের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। এই মতবিভেদ অধিকারী-ভেদে। কিন্তু এই সকল ধর্ম্মমতের এমন অংশ আছে, যাহা নিত্য। স্বরাজপন্থীদিগের ও উদ্দেশ্য এক। যাঁহার যেমন মত, তিনি তেমনি কর্ম্ম করুন; স্ব স্ব শক্তি বিবেচনায় কর্ম্মমার্গে নিজ নিজ স্থান অধিকার করুন।

* পূর্ব্ববঙ্গে রাজনীতি-সুরাপানে ক্ষণিক পথভ্রষ্ট মুসলমান ভ্রাতৃগণের কথা

কিন্তু একে যদি অন্যের উদ্দেশ্য অযথাভাবে আক্রমণ করেন, তাহা যে সুরুচি-বিগর্হিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, এই দুই দল পরস্পরকে যে ভাবে আক্রমণ করিতেছেন—তাহাতে বিশেষ মতবিরোধের লক্ষণ নাই, আছে শুধু ঈর্ষা। যে ঈর্ষায় কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, যে ঈর্ষায় জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন ইহা তাহারই স্ফুলিঙ্গ! কি হিন্দু মুসলমান, কি স্বরাজপন্থী উভয় দল, কাহারও মধ্যে একতার স্পন্দন অনুভব করিতে পারিতেছি না!

পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানগণ হিন্দুর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের নেতা একজন সম্পত্তিশালী এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি; তাঁহাকে ত উপেক্ষা করিতে পারি না। শিক্ষিত অন্যান্য মুসলমানগণের সমবেত সাধু চেষ্টা, এই বিরোধের স্রোত বাধা দিতে পারিতেছেন না।

প্রায় অষ্টশত বর্ষ, মুসলমানের সহিত একত্র বসবাস করিয়া আমাদের বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া আসিতেছিল। হিন্দু, পীরের দরগায় সিন্নি দিতে ইতস্ততঃ করে নাই; মুসলমান হিন্দুধর্ম্মোৎসবে যোগদান করিয়াছে! কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ভ্রান্তি মাত্র! স্বদেশপ্রেমিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানগণ আজি প্রমাদ গণিতেছেন। এক প্রকার শাসনাধীনে থাকিয়া বিদ্বেষবহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত ছিল। সোমনাথের কথা ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। কাশীদর্শনে ক্ষণিক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কথা মনে উঠিত। স্বরাজ্যের মঙ্গলার্থে হিন্দু মুসলমানকৃত সমস্ত অত্যাচার ভুলিতে বসিয়াছিল। কিন্তু কুমিল্লা জামালপুরের কাণ্ডের পর মনকে বুঝানো কঠিন হইবে! যুগান্ত ধরিয়া মনে পড়িবে, দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত, সতী অবমানিত ও লাঞ্ছিত! এই অত্যাচার যে মুসলমান করিয়াছে, তাহা অনেকে মনে করেন না। অপরিণামদর্শী

উত্তেজনা করিত! এই সব মুসলমানও অশিক্ষিত এবং নীচজাতীয়। অনেকে ধারণা করিতেছেন যে, অজ্ঞাত কোথা হইতে এই উত্তেজনার ইঙ্গিত আসিয়াছে। এই কালাপাহাড়ী অভিনয় হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই যে কি বিপজ্জনক, তাহা অবগত হইয়াও বেতন-ভোগী মুসলমান মৌলভীগণ এবং গর্ব্ব-স্ফীত অদূরদর্শী মুসলমান নেতৃগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। মুষ্টিমেয় সুশিক্ষিত মুসলমান ব্যথিত হইয়াও, ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের শ্রম পণ্ড হইয়া পড়িতেছে। এই ব্যবধান দূর না করিতে পারিলে, কি প্রকারে স্বরাষ্ট্র স্থাপিত হইবে? যদি বুঝিতাম, মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দু স্ববীর্য্যবলে স্বরাজ স্থাপন করিতে সমর্থ, তবে এ প্রবন্ধের অবতারণার আবশ্যক ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া, আজ আর ভারতে হিন্দু মুসলমান দাঁড়াইতে পারেন না। হইতে পারে, ভারতবাসীর স্বাধিকারলাভেচ্ছাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে অনুদার শাসক একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োগ করিবে। তবে মুসলমান কেন সে চক্রে পড়িল! ভায়ের গলায় ছুরি বসাইতে মুসলমান কেন আগ্রহান্বিত হইল? তবে কি হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ আজিও প্রবল! মুসলমানের মনে ভারতবিজেতা বলিয়া যে অহঙ্কার, গত দুইশত বৎসর উপানৎ বহিয়াও তাহা তিরোহিত হয় নাই। এখনো মুসলমানের মনে এক অহমিকা আছে যে, ইংরাজ মুসলমানকে যতই অশিক্ষিত মনে করুক না, একটু ভয় করিয়াছেন। ইংরাজের নাকি বিশ্বাস আছে, ইস্‌লামের নামে আজিও মুসলমান একটা কাণ্ড বাধাইতে পারে। হিন্দু নির্বীর্য্য,—পাঁচশত বর্ষ মুসলমান হিন্দুকে পদানত রাখিয়াছিল। এই অহমিকা আজিও মুসলমানের মনে হিন্দুর প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতেছে। মুসলমানকৃত অত্যাচার হিন্দু সব ভুলিয়াছে,—কিন্তু গোহত্যা ভুলিতে পারে নাই।

মুসলমানের সমস্ত অত্যাচার হিন্দু ভুলিবে, কিন্তু ইচ্ছাকৃত গোহত্যার কথা ভুলিবে না। আমরা হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে, স্বদেশের অনুরোধে হিন্দুকে প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ করিতে, মুসলমান না হয় গোহত্যা ত্যাগ করুন! গো হিন্দুর দেবতা! মুসলমানেরই কি নহে? ভারতের সর্ব্বস্ব গো লইয়া। যে দেশের মুখ্য অবলম্বন কৃষিকার্য্য নহে, যে দেশে মুখে স্বাধীনতার দোহাই দিয়া, কলকারখানার ফাঁদে ফেলিয়া শ্রমশিল্পীগণকে, গৃহের সুখশান্তি হইতে দূরে রাখিয়া, কার্য্যতঃ দাসত্বের লৌহনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিতে ইতস্ততঃ করে না, সে দেশের লোক গোমর্ম্ম বুঝিতে না পারে! কিন্তু ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে, গো যেখানে পয়স্বিনী মাতৃরূপিণী অন্নদাত্রী, সেখানে গোহত্যা সমর্থন করিতে পারি না। মুসলমান, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গো-কোরবাণী করিয়া থাকেন। গোবধ বাস্তবিক মুসলমানের ধর্ম্মাঙ্গীভূত কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সর্ব্বধর্ম্মের মূল সত্ত্বগুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্ত্বগুণমূলক ধর্ম্মভিত্তি অহিংসা! কি ঈশা, কি মহম্মদ, কি আর্য্য ঋষিগণ সকলেই এখানে একমত। দ্বিতীয়তঃ, সকল শাস্ত্রেই ইহা উক্ত হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা জনপদ রক্ষা হয়, এমত প্রাণহননে মহাপাপ। আমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—যে গোহত্যা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান, ধর্ম্মাঙ্গে তমসাবরণ প্রদান করিবেন! কিন্তু হায়! একি! আজি যে সব ধারণা চূর্ণিত বোধ হইতেছে। সে দিন, খাঁটী মুসলমান রাজ্যের মুসলমান নৃপতি, আমীর হবিবুল্লা, মুসলমানগণ যাহাতে হিন্দুর সহিত বাহুতে বাহুতে মিশিত হইয়া থাকিতে পারে, এমন উপদেশ ভারতীয় মুসলমানকে দিয়াছেন। তিনি দিল্লীতে গোহত্যা নিষেধ করিয়া, সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন! হায়! তাঁহার উদ্দেশ্য কত দূর সফল হইবে, ইহাই প্রশ্ন!

এ অসন্তোষের বীজ একেবারে তিরোহিত হইবে না। যে দিন দেখিব সমগ্র ভারতে গো-হত্যা নিবারিত হইয়াছে, সেদিন বুঝিব, যুগস্রোত অনুকূলে বহিতেছে,—নতুবা, "কেবলি স্বপন করেছি বপন আকাশে।"

হিন্দুগণ সংযমহীন, সুতরাং দুর্ব্বল। মনে বল সঞ্চয় করিতে হইলে সাধন আবশ্যক। বহুকাল হইতে আমরা সাধনভ্রষ্ট। এই যে দেশটা অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, জলাভাব প্রভৃতি বিপ্লবে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহার কি প্রতিকার করিয়াছি, না করিবার চেষ্টা করিয়াছি! অবশ্য অনেক কার্য্য রাজশক্তির উপর নিহিত আছে। রাজকার্য্যে আমাদের সে প্রকার অধিকার না থাকিলে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি না। এই অধিকারের জন্য আমাদের চেষ্টা হইতেছে! কিন্তু চেষ্টা ওষ্ঠপ্রান্ত ছাড়াইয়া, হৃদয়মধ্যে অগ্রসর হয় নাই। জলে ঝাঁপাইয়া সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বে, সাঁতার কাটিবার প্রবল বাসনাটা নিতান্তই আবশ্যক। এই বাসনাটার অভাব আমরা যথেষ্ট অনুভব করি। টানাপাখার হাওয়ায় বসিয়া, কথা গাঁথিয়া, মাসিকের কলেবর পূর্ণ করা অপেক্ষা, সংসারের ঝঞ্ঝায় প্রবেশ করিয়া, কর্ম্মানুসন্ধান আজিও একান্ত লোভনীয় জ্ঞান করিতে পারি নাই। এ দেশের দায়িত্ব যেমন রাজশক্তির উপর আছে, তদপেক্ষা দায়িত্ব দেশের লোকের উপর। বিদেশী শাসকের ধর্ম্মজ্ঞান উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টার পূর্ব্বে, ক্ষেত্রে স্বহস্তে হলচালনা প্রথম কর্ত্তব্য মনে হয়। প্রতিকূল রাজশক্তিকে সানুকূল করিতে হইলে, সুধু রাজশক্তির উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। কিন্তু দেখাইতে হইবে যে, দেশের লোকের সেই মনের বল যথেষ্ট আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা সম্পদের সহিত বিপদপরম্পরার সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। জামালপুরে যেদিন ভীষণ কাণ্ড হইয়া গেল, সে দিন হিন্দুগণ কেন দৃঢ়ভাবে বিপদকে আলিঙ্গন না করিয়া পলায়ন করিল? তাহাদের অস্ত্র ছিল না?—নাই বা

থাকিল ! মরিতে কেহ বাধা দিত না। যদি সেদিন সমুদয় হিন্দুরক্তে ব্রহ্মপুত্র নদ রাঙিয়া উঠিত, যদি মুসলমানের অস্ত্রাঘাত হিন্দু সে দিন বক্ষ পাতিয়া ধরিতে পারিত, তবে বুঝিতাম আজ যুগ ফিরিয়াছে !

ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠার দিন নিকটবর্ত্তী। সেদিন যদি সমস্ত হিন্দু, আপনাদিগের শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তবে বিনা অস্ত্রে আমরা জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারিতাম। যেদিন রাজা বিশ্বামিত্র নন্দিনী-হরণ উপলক্ষে সসৈন্যে বিরাটপুরুষ বশিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, সেদিন সেই অসাধারণ পুরুষের কি সম্বল ছিল ? কোন্ অস্ত্র ছিল ? কত সৈন্যসামন্ত ছিল ? কিছু না,—তিনি একাকী ! কিন্তু তাঁহার ছিল মনের বল ! ছিল ব্রহ্মশক্তি—তাঁহার সাধনার নিধি ! আমারও চাহি আজ, সেই মনের বল ! নতুবা স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিলে স্বরাজ মিলিবে না। তোমার অন্তরের কোন্ কোণে কুণ্ডলিনী সুপ্ত হইয়া আছেন, অগ্রে তাঁহার অনুসন্ধান কর ;—স্বরাজ আপনি আসিয়া ধরা দিবে !

একটা কথা শুনিতে পাই যে, ভারতে কোন কালে জাতীয় জীবন ছিল না। এ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কেহ বোধ হয়, জাতীয় গৌরব লাঘব করিবেন না। ভারতের জাতীয় জীবনতত্ত্ব বুঝিবার কালে যদি পাশ্চাত্য আদর্শকে মনে করি, তবে নিরপেক্ষ বিচার হইবে না। যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, ভারতীয় জাতিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা হইতে বিলাতী জাতীয়-জীবনের আদর্শ পৃথক। আমরা পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ হইয়া ঘরের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিতর, এদেশের জাতীয় জীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া, হিন্দুসমাজকে এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা বিলাতী আদর্শ

মূল পর্য্যন্ত শিথিল হইবার উপক্রম হইয়াছে। যেদিন সতীপ্রথা ইংরাজ-সহায়ে আমরা উঠাইয়া দিলাম, সে দিন মনে করিতে পারি নাই যে, ইহার পরিণতি কোথায়! সতীদাহের ভাল মন্দ বিচার করিতেছি না। তাহার স্থান ও সময় ইহা নহে। তবে একথা বলিতে পারি, যে, যে মহা-ত্যাগ এবং প্রেমের আদর্শ সতীতত্ত্বে নিহিত ছিল, আজিকার সভ্যতামণ্ডিত কালে, সেই আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছে। যে জীবন্ত-বিশ্বাস-বলে তখনকার নারী, জ্বলন্তবহ্নিতে জীবনাহুতি দিতেন, আজিকার রমণীগণ কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন? তখনকার সন্তান, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, সেই সব মহীয়সী মহিলার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া, ত্যাগ এবং শৌর্য্যের যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা তাহার কি অনুকরণ করিতেছি! বিরাট স্বার্থপর, আত্মদ্রোহী, স্বধর্ম্মবিচ্যুত আমরা, সেই তেজস্বী আর্য্যগণের সন্তান বলিয়া, পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি না! যদি সেই ত্যাগের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে, তবে পূর্ব্ব পরিচয়ে লাভ ছিল; নতুবা অবনতমস্তকে যেমন জুতা বহিতেছ তাহাই বহ—স্বরাজের কথা কহিও না। প্রাচীনকালে যে শাসননীতি প্রচলিত ছিল, তাহা আমাদের দেশে এখনকার Democratic নীতি হইতে অনেক প্রকারে অনুকূল। যে নীতি আমাদের জীবনের মেরুদণ্ড, যাহার আদর্শে গঠিত হিন্দুসমাজ, অদ্যাপি কালের প্রচণ্ড তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া অচল হইয়া আছে, আজ সেই নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কি অন্য আদর্শে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিব? ইহার মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক। এদেশে বিলাতী আত্মশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া, কতটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা মিউনিসিপালিটীর বোর্ড, এবং লাট-সভার নির্ব্বাচনপ্রণালীর আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়। প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিয়া, প্রতিনিধির পদ

সভ্যতাবিগর্হিত হইয়া দাঁড়ায়। নিজের স্বার্থটুকুর জন্য দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিতে সঙ্কোচবোধ করি না ; পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহি। বিলাতী আত্মশাসনের ফলে, আমরা আত্মদ্রোহ রোপণ করিয়াছি। এজন্য, ইহার প্রসার আমাদের হৃদয়াধিকার করিতে পারে নাই।

ইহা যেন স্বতন্ত্র, খাপছাড়া। ইহার সহিত জীবনযাত্রার সম্পর্ক যেন ঘনিষ্ঠ নহে। এই আত্মশাসন পরিত্যাগ করিলেও, আমাদের জীবন-যাত্রার তেমন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষে যে এই প্রণালী কেমন করিয়া স্বরাজের আদর্শ হইবে, তাহা বুঝি না। হিন্দুর, সমাজ পরিত্যাগ করিলে আর চলিবার উপায় নাই। বিলাতি আত্মশাসনের বাঁধনে হিন্দুকে বাঁধা যায় না বলিয়া, স্বদেশীপ্রচারে বাধা পাইতেছি। তাই আজ তাহাকে স্থায়ী করিতে গিয়া সমাজের কথা মনে পড়িয়াছে। আজ ভারত কেবল হিন্দুর দেশ নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতিরও স্বদেশ বলিয়া দাবী চলে। সুতরাং খাঁটি হিন্দু প্রণালীর উপর নির্ভর করা সঙ্গত হইবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জাতীয় জীবনের এমন মেরুদণ্ড গড়িতে হইবে যে তাহাতে যেন বেশ সামঞ্জস্য থাকে। ভারতবীণার জাতীয় জীবননায়কী এমনি করিয়া বাঁধিতে হইবে যে পঞ্চম জুড়ী এবং তরফের বিভিন্ন সুর নায়কীর ঝঙ্কারে মিশিয়া যায়। সমাজ শক্তি ও শাসন-নীতির সম্পর্ক ঘুচাইলে চলিবে না। রাজনীতিকে পৃথক করিলে কোন ফল হইবে না। এদেশ তেমন নহে। তাই ভাবিতেছি যে, বিভিন্ন-জাতি-সেবিত ভারতে কেমন করিয়া কার্য্যের সুবিধা হইবে! আমরা কি ঈশা মহম্মদ প্রভৃতিকে আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারি না? এক দিন এমন সময় ছিল যে, ভগবান বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে ছিলেন। আজ সেই সময় আসিয়াছে, যখন ঈশা এবং মহম্মদকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। নতুবা মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতিকে

প্রভৃতি বহু মতবাদ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গে শোভা পাইতেছে। মহম্মদীয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহার বীজ আর্য্য ধর্ম্মনীতির সহিত নিঃসম্পর্কীয় নহে। তবে এ বিষয়ে মুসলমান এবং খ্রীষ্টানের সহানুভূতি আবশ্যক। ভারতীয় মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহাদিগকে গো বরাহ প্রভৃতি হনন পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং হিন্দুদিগকেও আল্লা এবং যিশু খ্রীষ্টকে হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে সানন্দ-চিত্তে স্থান দিয়া, পবিত্র হইতে হইবে। পরস্পর ক পরস্পরের ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পুরাতন ভারতীয় শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—নতুবা স্বরাজ-আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখিয়া সর্ব্বনাশ এবং নরকের পথ মুক্ত কর! ভারতে ত্যাগ এবং সংযমের আদর্শ পুনরুদিত না হইলে, শৃঙ্খলশূন্য চিরান্ধকারে ভারতবর্ষ ডুবিয়া যাইবে,—তাহাকে কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না।

"সাধু জন" আমাদের জন্য তাঁহার অন্তরে কি প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন কল্পনা করিতেছেন, তাহা অবশ্য আমরা জ্ঞাত নহি। অনুমানে যাহা বুঝি, তাহা মরুভূমের মরীচিকা ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহার জন্য আমাদের ক্ষোভ নাই। প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় আত্মনির্ভরশীল না হইলে, কেবল গলাবাজী করিয়া ইংরাজের নিকট দাবী-প্রতিষ্ঠা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুই একটি ক্ষুদ্র অধিকার যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা কেবল টোপ দেখিয়া বঁড়শি গিলিয়াছি। সারাদিন উদরান্নের জন্য মাথা কুটিয়া, ভিক্ষা করিয়া, এক কড়া কানা কড়ি মিলিয়াছে। প্রতিপদে যে আমাদের মাতা ভগ্নী অবমানিত হইতেছেন, তাহার কি প্রতিকার পাইয়াছি? জলাভাবে যে শুষ্ককণ্ঠ, কৃষিকার্য্য বন্ধ-প্রায়—দুর্ভিক্ষ হাহাকার—ম্যালেরিয়া মহামারী—গ্রাম্য বাণিজ্য সুদূরাপহৃত—শিল্পহীন ভারত, সোনার দেশ আজ শ্মশান! দেশের লুক্কায়িত রত্ন অপহৃত হইতেছে। ভারত ইতিহাসের এই পৃষ্ঠা কি আমরা উল্টাইয়া দেখিতেছি? বোর্ডের এবং মিউনিসিপালিটির সদস্য এবং মন্ত্রণাসভায় মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া কি প্রতিকার করিতে সমর্থ হইয়াছি? দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া ফিরিঙ্গির রাক্ষসী ক্ষুধা দূর করিয়াও কি তাহাদের প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্র

"যে তোমারে দূরে রাখি, নিত্য ঘৃণা করে, হে মোর স্বদেশ!
মোরা তারি পাছে ফিরি সম্মানের তরে,—পরি তারি বেশ!"

যাহা'ক Constitutional Agitation বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ, তাহা এদেশে ভিক্ষা ভিন্ন আর কিছু নহে। ইংলণ্ডে Agitation ভিক্ষা নহে। ইংলণ্ডে রাষ্ট্রশক্তি জাগরিত; এখানকার লাঞ্ছিত রাষ্ট্রশক্তি অসাড় স্পন্দনহীন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক আপনার রাজা। আমরা পরপ্রসাদ-প্রার্থী। ইংলণ্ড নিজের কাছে অধিকারের দাবী করে;— তোমার দাবীর আরজি, হাসির কথা! ভিক্ষা করিয়া তুমি সার কিছু পাইবে না। তোমাকে নিজের কার্য্য সমাধা করিতে নিজের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কেহ সাহায্য করিবে না। ইংরাজ এদেশের স্বার্থরক্ষার্থ, স্বদেশের ক্ষতি করিবে না। ভারতবর্ষের শিল্পসৌভাগ্যে ইংলণ্ডের অর্থহানি। অর্থনীতিশাস্ত্রে ইংলণ্ড এত হীনজ্ঞান নহে যে, তোমার সুবিধা করিয়া, সে স্বদেশের শিল্প নষ্ট করিবে।

বঙ্গবিভাগমূলক আন্দোলনে বঙ্গের কেন্দ্রীভূত মতামত উপেক্ষা করিয়া, ইংরাজ, প্রসাদবিতরণ অস্বীকার করিলেন। দার্শনিক মর্লি বলিতেছেন,—"বেশ করিয়াছি!" তোমার নুন খাইয়া, *Statesman* পর্য্যন্ত হাঁকিয়া বলিতেছে—লাজপত রায়ের জন্য কাঁদিও না, তাহা হইলে, রাজনৈতিক অধিকার গবর্ণমেণ্ট্ দিবেন না।

বঙ্গবিভাগের কথা এখন ছাড়িয়া দাও। আজ বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, এখন আর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় ভিক্ষার ঝুলিস্কন্ধে লইয়া, দাননেত্রে রাজপ্রাসাদের বিরাট তোরণদ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলে, তোমার লাভ নাই! এখন একমাত্র মাতৃচরণ স্মরণ করিয়া মাতৃকার্য্য সাধন কর! সদ্‌গুরুর নিকটে মহামন্ত্র গ্রহণ কর। পরস্পরের মুখ চাহিয়া বিস্ময়ের দৃষ্টি-বিনিময় ছাড়িয়া দাও। চতুর্দ্দিক রুদ্রভাব ধারণ করিয়াছে। তুমি পরিণামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হও।

তবে একটা কথা আসিতেছে, কোথায় সেই আদর্শ পুরুষ, যিনি আজ শতস্বার্থ ত্যাগ করিয়া, মাতৃকার্য্যে প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিবেন? প্রসাদপ্রার্থী লক্ষ নরনারী, যাঁহার মহিমাময় চরণে, মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিবে?

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

সহযোগী।

সাহিত্য। বৈশাখ, ১৩১৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য সুখপাঠ্য আলোচনা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "ঋণপরিশোধ" পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। প্রথমাংশ কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও, শেষাংশ পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। করুণরসের অবতারণায় লেখকের প্রয়াস সফল হয় নাই। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "ভাষা ও আদিরস" নিতান্ত হোমিওপ্যাথি ডোজে চলিতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি' মনোজ্ঞ রচনা। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "প্রাচীন বঙ্গ" সারগর্ভ বটে, তবে সরসতার অভাবে, তেমন হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে নাই। "উপমা" শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত। দ্বিজেন্দ্র বাবু, প্রবন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। মড়াদাহ-গোছ ভাষায় প্রবন্ধটির সৌন্দর্য্য-হানি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বীণা' পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। শেষের অনাবশ্যক দার্শনিক মন্তব্যটুকু বর্জ্জন করিলে গল্পের আর্টটুকু সুরক্ষিত হইত। "শ্রীরাধা" একটি সনেট! শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "টীকা" সুন্দর হইয়াছে। বাঙ্‌লা দেশের আধুনিক সমালোচকগণ মর্ম্মগ্রহ করিলে সাহিত্যের উপকার হইতে পারে। টীকার ন্যায় 'ছি ছি' করা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন গুণপনা বড়-একটা দেখা যায় না। তাই, আমাদের দেশে সমালোচনার মূল্য নাই, এবং সমালোচনার আসন, অন্ধ স্তুতিবাদ ও নিলর্জ্জ গালাগালিতে আজ কলুষিত হইতেছে। "সহযোগী সাহিত্যের" 'বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান' সাহিত্যের বিচিত্র চিত্র-চয়ন! "মাসিক সাহিত্য সমালোচনায়" সুবিজ্ঞ সমালোচক, ছোট গল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক গল্প-লেখকের অবশ্য স্মরণীয়। এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "শিক্ষানবীশ বাঙ্গালী কবি বনপ্রান্তে সঙ্কীর্ণ প্রেমের কাটগোলাপ দেখিয়াই মুগ্ধ হন এবং আর অগ্রসর না হইয়া তাহাই চয়ন করেন! জীবনের প্রকৃত সুখ দুঃখ গভীর গহনে ফুটিয়া ঝরিয়া যায়; বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যমালঞ্চের মালীরা সে সব ফুলের কোন সন্ধান রাখেন না। এইজন্য এখনকার সাধারণ গল্পে আন্তরিকতা ও সমবেদনার এত অভাব। * * * বাল্মীকি মানবচিত্রের

নহে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস ও গল্পের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে, চাষা লেখকগণ কেবল স্থূল লালসারই চাষ করিতেছেন, এবং প্রেম নাম দিয়া তাহাই ভবের হাটে বিক্রয় করিতেছেন। সমাজের কোন উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, স্বদেশী, বয়কট, রাজনিগ্রহ ও লাঞ্ছনা প্রভৃতি সামাজিক বিষম বিপ্লব ও দেশব্যাপী উচ্ছ্বাসে তাঁহারা গল্পের বস্তু দেখিতে পান না। তথাকথিত প্রেমের প্রেত ও লালসার প্রেতিনীই বাঙ্গালা গল্পের নায়ক-নায়িকা"।

প্রবাসী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর "ভারতের স্বরাষ্ট্র" উপাদেয় রচনা। মহেশচন্দ্র ঘোষের "আসুরী ভাষা" বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য হইতে পারে, সাধারণের পক্ষে বিড়ম্বনা। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ" প্রবন্ধে শস্ত্রবিশারদ রাণা সরতান সিংহ ও লঘুভাই কল্যাণজী শাহের অপূর্ব লক্ষ্যবেধের কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল সরকারের "পেকিন রাজপুরী" প্রবন্ধে বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "মণি-মঞ্জীর," 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ে'র (এ অনাবশ্যক mannerism কেন?) গল্প না অত্যাচার কি বলিব? ভাষার উত্তালতরঙ্গে বেচারী পাঠকের যে প্রাণান্ত! সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাবত্তা জাহিরের জন্য লেখক চতুর্দ্দশপৃষ্ঠাব্যাপী উৎকট জুলুমের অবতারণা করিয়াছেন; প্রবাসীর বিচক্ষণ সম্পাদক মহাশয় এই জবরদস্ত জুলুমের প্রশ্রয়দানে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। আশ্চর্য! "বৈকুণ্ঠারোহণ"—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতা। ভক্ত কবির ভক্তি ও সরলতায় ঝলমল করিতেছে! পাণিসমাধিমঙ্গ" সংগ্রহ—চলনসই রকমের! "মনের কথা," "বিধবা" ও "চন্দ্রনাথ" বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত তিনটী কবিতা। "মহারাজা গায়কবাড়" সুন্দর সুখপাঠ্য সন্দর্ভ। এই আদর্শ নৃপতির কাহিনী, পুরাণ কাহিনীর ন্যায়ই পবিত্র ও নির্ম্মল! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর মালিক, হামবড়া, তোষামোদনিপুণ রাজগণ এই মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে অগ্রসর হউন! শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মার "ত্রিপুরার অন্তঃপুর" ভাষাসম্পদে সমুজ্জ্বল না হইলেও পাঠ করিয়া তৃপ্তি হয়।

অর্চ্চনা। বৈশাখ। ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায়ের "মীরকাসিম" গিরিশচন্দ্রের "মীরকাসিম" নাটকের সমালোচনা। লেখক ইহাকে সমালোচনা বলিতে

"মীরকাসিম গিরিশচন্দ্রের অতুল কীর্ত্তি" হইতে পারে কিন্তু সমালোচনাটিতে অসহ্য ধৃষ্টতা ও চপলতার পূর্ণ সমাবেশ।) "অপ্রিয় সত্য"—কৈফিয়ৎ, "একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি"—শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের প্রয়োজনীয় সংগ্রহ। "দস্যু হস্তে" গল্প। মুরুব্বিয়ানা ও টিপ্পনীর জটাজালে নিতান্ত গুরুগম্ভীর! এরূপ অপাঠ্য গল্প লেখার বিড়ম্বনা কেন? "শিল্পাগারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা" শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের মনোজ্ঞ সন্দর্ভ কিন্তু মাত্রা বড় লঘু। "কল্পনার প্রতি" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের কবিতা। কবি ভূমিকা করিতেছেন:—

"হায় কোথা অবসর মোর দেববালা,
একমনে তোমায় সাধিব;
নিঝুম বিরল গেহে লভিয়ে নিরালা,
বসে বসে কবিতা লিখিব।"

তবু দেববালার প্রতি এ নির্য্যাতন কেন? Ettu 'সোমকবি'!

বাণী। বৈশাখ। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দের "জয়দেব ও তদানীন্তন কালের সমাজচিত্র" প্রবন্ধে এখন ভূমিকা চলিতেছে। "১৫১৩ সাল" উপন্যাস, না নবন্যাস, না গল্প, না হেঁয়ালি? "মুসলমানযুগে হিন্দীসাহিত্য" জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ উপাদেয় রচনা। শ্রীযুক্ত ধ্রুবকুমার পালের "রঙীন আলোয় গাছপালা" সকলের পক্ষে চিত্তাকর্ষক না হইলেও, লেখকের নবীন উদ্যম প্রশংসনীয়। বাঙলাসাহিত্যে বিজ্ঞানের আলোচনা যত অধিক হয়, ততই মঙ্গল। "উর্মিচাঁদ" প্রবন্ধে কিছু বিশেষত্ব দেখিলাম না। "প্রতাপাদিত্যের প্রতি রডা" শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। Hero-worshipএর জ্বালায় কবিতাদেবী নিতান্ত বিপন্না হইয়া উঠিলেন! লেখক আর একবার কবিতাটী পাঠ করিলেই বুঝিবেন, তাঁহার কবিতার মূল্য কি? "কামিনী ও কাঞ্চন" রায়সাহেব হারাণচন্দ্রের "কামিনী ও কাঞ্চন" উপন্যাসের সমালোচনা। নিরপেক্ষ সমালোচনার যেটুকু পাওয়া যায়, সেই-টুকুই আমাদের পরম লাভ। সমালোচক মহাশয় উপসংহারে বলিতেছেন, "ভবিষ্যতে আমরা হারাণ বাবুর লেখনী হইতে এরূপ সুবৃহৎ নিষ্ফল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না দেখিলে সুখী হইব।' আমরাও বলি তথাস্তু! "সাহিত্যসংবাদ" সাহিত্যসেবিমাত্রেরই তৃপ্তিকর; বাণীর বিশেষত্ব।

কুণ্ঠিত।

আশা নাই, তাই আশঙ্কা নাই—
নিরাশায়, ভাই, আছি থির !
কাঁদিয়া যে সুখ, তা'ও গেছে, তাই
দুনয়নে আর নাহি নীর !
হালভাঙা তরী, পাল নাই বলে
অসহায়, তাই স্রোতমুখে চলে—
ডুবে বুঝি হায়, ডুবে পলে পলে,
নাহি কূল, ভাই, নাহি তীর !
আশা নাই, তাই আশঙ্কা নাই—
নিরাশায়, ভাই, আছি থির !

ভাষা নাহি, ভাই, নিজ দুখ তাই
আপনারি মনে করি গান—
আপনাই যাহা রচিয়াছি, তাহা
আপনাতে করি অবসান !
সমবেদনার সুখ লভিবারে
মরমের কথা করিনা বাহিরে—
ফুটাইতে যাহা পারিনা, অপরে
করিবে তাহার অপমান !
ভাষা নাহি ভাই, নিজ দুখ তাই

আপনি যাহারে পাইনি নিকটে,
পিছু হতে তারে সাধি নাই!
যে গান আমারে ক্ষুব্ধ করিবে,—
সে গানে ত' সুর বাঁধি নাই!
সহজে স্বল্পে পেয়েছি যাহারে,
সহজে হৃদয়ে লয়েছি তাহারে,
দুর্লভ লাগি', অকূল পাথারে
কখনোত' তাই ভাসি নাই!
আপনি যাহারে পাইনি নিকটে,
কভু তার পাছে আসি নাই!

যে দ্বার দেখেছি বন্ধ, তাহাতে
করিনি কখনো প্রতিঘাত,
শিরোপরে যাহা, লভিবারে তাহা—
উচ্চ করিনি নিজ হাত!
তাই আজি সহি এত অবহেলা,
সকলেরি সাথে শুধু মিছে খেলা,
দিবসের শেষে রজনীর বেলা
পদে পদে লভি পরমাদ!
আজীবন যত দিয়েছি আঘাত,
আজি লভি তার প্রতিঘাত!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাল্মিকীর সীতা।

অনেক দিন হইতে রামায়ণ সম্বন্ধে আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইয়াছে ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার সম্যক উত্তর আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই। প্রশ্ন অতি ক্ষুদ্র,—কিন্তু এই প্রশ্নের উপর রামায়ণের অনেকখানি সৌন্দর্য্য নির্ভর করিতেছে ;—অনেকখানি কেন বলি, আমার বোধ হয়, এই মহাকাব্যের সর্ব্বপ্রধান সৌন্দর্য্যের কথা, শ্রীরামচন্দ্রের বীর-চরিত্র এবং রাজচরিত্রালোচনা, এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটির উপর নির্ভর করিতেছে। প্রশ্নটি এই :—রামচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমা সীতাদেবীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কেন ? যাঁহাকে পাইবার জন্য এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুখের উদয়ে সুখের অংশ-ভাগিনী না করিয়া, অনন্ত দুঃখের মধ্যে ভাসাইয়া দিলেন কেন ? এই প্রশ্নটির উত্তরের মধ্যে, নিরঞ্জন রামচন্দ্রের বীরত্ব এবং রাজভাবটা এত নিগূঢ়ভাবে নিবদ্ধ আছে যে, ইহার যথার্থ উত্তর না দিতে পারিলে, রামচরিত্রে অনেকখানি কলঙ্ক থাকিয়া যায়। তাই এখন আমার প্রশ্ন এই, যে, বাল্মিকী এত বড় অন্যায়টাকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে স্থান দিলেন কেন ?

স্থান দিয়াছেন বলিয়াই, আমার মনে হয়, বাল্মিকী মহাকবি। সংসারে যেটা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া প্রথমেই মনে হয়, তাহাকে যদি আর একটু তলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সেটা হয়তো একেবারেই অন্যায় নয়—অথবা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অন্যায়। কাব্যের পক্ষেও সে কথা বেশ খাটে। যিনি, কাব্যের মধ্যে একটা মহৎ অন্যায়কে অযথা বসাইয়া দিয়া, পাঠকের মনে একটা করুণা-উদ্রেকের চেষ্টা করেন,

অন্যায় যদি কার্য্যকারণসমন্বয়ে কাব্যের মধ্যে স্থান পায়—তখন সেটা ন্যায়ের আকার ধারণ করে।

সীতাদেবী আদর্শ সতী স্ত্রী ; কিন্তু আদর্শ মহিষী নহেন। সীতাদেবীর নারীত্ব, তাঁহার সতীত্বেই পর্য্যবসিত—তাঁহার কোমলতা, তাঁহার কমনীয়তা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার ভক্তি, তাঁহার তেজ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অসীম সহিষ্ণুতা, তাঁহাকে আদর্শ মানবের মানবী করিয়াছিল ; কিন্তু সম্রাটের সম্রাজ্ঞী করিতে পারে নাই। রামচন্দ্র রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যখন বনে গমন করিলেন, তখন আদর্শ-স্ত্রীরূপিণী সীতাদেবী তাঁহার অনুগমন করিয়া, বনজীবনের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন ; কারণ তিনি আদর্শ বনিতা। কিন্তু রামচন্দ্র যখন সসাগরা ধরার সম্রাট হইলেন, তখন বধূ সীতা সম্রাজ্ঞী হইতে পারিলেন না। যিনি বনের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনটাকে সম্পূর্ণ সার্থক এবং সুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সম্মুখে যিনি অকুণ্ঠিতা, নির্ম্মল জলে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এবং সুন্দর, তিনি কিন্তু, অনন্ত কৃত্রিমতার আধার জগৎ হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন মানবের রাজ্যে, সম্রাটের সম্রাজ্ঞী হইতে পারিলেন না! পারিবেনই বা কেন? রজনীর চন্দ্র, নিস্তব্ধ শান্ত রজনীতেই শোভা বিতরণ করিতে পারে, কোলাহলময় সচেতন জগতের উপর সূর্য্যের কার্য্য তাঁহার দ্বারা পোষাইবে কেন? তাই, সীতাদেবীকে রামাভিষেকের পর ধীরে ধীরে সরিয়া বসিতে হইয়াছিল। অভিষেকের পর, কেন বলি, রাম হইতে পাশবিক বলে যখন তিনি বিচ্ছিন্ন হইলেন, তখন হইতেই প্রকৃত বিচ্ছেদ আরম্ভ ; কারণ রাবণ-বধের পর রামচন্দ্র সীতাদেবীকে আর সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাঁহারও অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।—সন্দেহ, ভয়, লোকলজ্জা প্রভৃতি সংসারের ভাবগুলা তাঁহাকে

দেবীকে দেখিতে পান নাই। এই যে সন্দেহ, রামের অজ্ঞাতে তাঁহার মনে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহাতেই সীতাদেবীর বাস্তবিক অগ্নি পরীক্ষা হইতেছিল—সামান্য কাষ্ঠের অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করে নাই।

এই স্থলে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, এমন কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর এবং মহাবীর রামচন্দ্রের সহিত, এইরূপ অতি কোমল বাঙ্গালির ঘরের মেয়েটিকে * কবি সংগত করিলেন কেন? কিন্তু ইহারও বেশ একটি উত্তর আছে। প্রথমতঃ, ইহা প্রায়ই ঘটে যে, একজন বীরের স্ত্রী অতি-কোমলা লজ্জাভয়লীলাঙ্গিনী বালিকামাত্র,—যথা উত্তরা-অভিমন্যু! একজন বড় কবির স্ত্রী, হয়ত একজন সংসারাভিজ্ঞা নিত্যকর্ম্মরতা নিপুণা গৃহিণী! একজন দশটা-ছটার কেরাণীর স্ত্রী একজন কবি! এই বিপরীত-সংযোগ কতকটা স্বভাবের অনুমোদিত বটে। একের অভাব অন্যে পূরণ করিয়া, উভয়ে মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ মানব হইয়া, বিশ্বমানবের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। তাঁহাদের এই সম্মিলিত প্রেম পরস্পরের প্রশংসায় জাগিয়া থাকে। প্রশংসা কথাটা যেন অত্যন্ত ছোট হইল; এই একত্ববিধানকারী বিশাল ভাবটি যাহা হইতে জন্মিয়াছে, তাহা কি শুদ্ধ পরস্পরের প্রশংসা, না প্রশংসিতের নিকট আপনার ক্ষুদ্রত্বানুভব! যাহাই হউক, সেই প্রেমোর্ব্বর ভাবটি, এই বিপরীত ভাবাপন্নের মিলনেই জন্মায়। এক আশা, এক কার্য্য যাহাদের, তাহাদের মিলনে এ মধুরতা জন্মিতে পারে না। যে বীর, সে বীর-রমণীকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারে বটে, কিন্তু অতি ভীরু রমণীর ত্রস্তনেত্রপাতে সে যেমন আত্মবিস্মৃত হইবে, বীর-রমণীর সুদীর্ঘ বক্তৃতায়, ততটা অভিভূত হইবে কি? সেইরূপ কবিকে রক্ষা করিতে, সংসারের সহস্র কোলাহল হইতে তাহার মধুর নির্জ্জনতাকে অব্যাহত রাখিতে, একজন Practical স্ত্রীলোক চাই (কবি Words

জন দশটা-ছটার কেরাণী বেচারী, যদি সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া একটু মধুরতর সঙ্গ, দুটো মিষ্ট কথা না শুনে, যদি আসিয়াই মাছ, ভাত, নুন, তেলের বিশাল সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে বেচারীকে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়; তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাহার জীবনটা নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি,—যুধিষ্ঠিরের মহিষী দ্রৌপদী ধর্ম্মবীরের স্ত্রী কর্ম্ম-বীরা, তাই তিনি আদর্শ সম্রাজ্ঞী। তাই যুধিষ্ঠির রাজা হইবার পর, দ্রৌপদী মহিষীর পদ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী হইবার ক্ষমতা সীতাদেবীর ছিল না—তিনি চিরকালই যেন বধূমাত্র—তাই তিনি নির্ব্বাসিতা! যদি তিনি রামের অন্তঃপুরেই থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি শুদ্ধান্তের অন্তরালে নির্ব্বাসিতাই থাকিতেন। কবি তাঁহাকে এইরূপ অসম্মান হইতে রক্ষা করিয়াছেন—বনে পাঠাইয়া সীতার স্বাতন্ত্র্যটুকু (individuality) রক্ষা করিয়াছেন। সীতা যদিও রামময়-জীবিতা, তথাপি রামকে ছাড়িয়াও তাঁহার অস্তিত্ব আছে, এটাই এই নির্ব্বাসনের মহৎ উদ্দেশ্য। এই মহৎ নির্ব্বাসন, সীতাদেবীকে মরণা-পেক্ষাও ভয়ঙ্কর মৃত্যু হইতে,—অস্তিত্বলোপ হইতে—বাঁচাইয়াছে।

আবার আর এক দিক দিয়া—শুদ্ধ কাব্যের দিক দিয়া—দেখিলে, দেখা যায় যে, রাম এবং সীতা এ উভয় চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও পরিস্ফুটতা-সম্পাদনের জন্য, এই বীর-চরিত্রের পার্শ্বে, এই অতি-কোমলা, অথচ সতীত্ব-তেজে প্রদীপ্তা নারী-চরিত্রটি রাখা হইয়াছে। দ্রৌপদীর, মহিষীর ন্যায় চরিত্র সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান; তিনি হস্তিনাতেও মহিষী—বনেও মহিষী। যুধিষ্ঠিরের বন-গমন—সে এক বিরাট ব্যাপার! সহস্র সহস্র যোগী ঋষি ও ব্রাহ্মণের সমাগমে, তাঁহার বনবাস নগরবাসের মতই হইয়াছিল।

আপন শাসন-হস্ত পরিচালিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রামের বনগমন অতি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াও, এত বড় বিরাট ব্যাপার নহে। তিনটি প্রাণীতে আপনাদের সমস্ত দুঃখ-অংশ ভাগ করিয়া লইয়া, পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া, বন-গমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পঞ্চবটীর কুটীরে সীতাদেবী সুধু স্ত্রী মাত্র; তাঁহার গৃহলক্ষ্মী-মূর্ত্তি এই বন-ভবনে কত সুন্দর—কত মধুর উজ্জ্বল! কিন্তু তথাপি ইহা বনিতা-মূর্ত্তি, মহিষী-মূর্ত্তি নহে! এখানে রাম মহাবীর নহেন, মহারাজ নহেন, তিনি একজন ভাবুক মাত্র। তাঁহার কর্ম্মহীন ক্ষত্রিয়ের বাহু, আজ আর্ত্তত্রাণ করিতে বিরত হইয়া শুদ্ধ প্রিয়ার উপাধানমাত্রে আপন অস্তিত্বের অবসান করিয়াছে! আজ সে আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপায় নহে—আত্ম-নিবেদনের মাল্যস্বরূপ প্রিয়ার কণ্ঠবেষ্টনেই ব্যাপৃত! ভাবমগ্ন রামচন্দ্রের সম্মুখে কবিতারূপিণী সীতাদেবী সহস্র সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; সম্পূর্ণরূপে রামময় হইয়াছেন—রামচন্দ্রের কোন অংশ সীতাদেবীকে ছাড়াইয়া যায় নাই। কিন্তু যখন সীতাদেবীকে সতীত্বতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে হইল, যখন মহাবীর রামচন্দ্র হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আপন মান-রক্ষার্থ, ক্ষত্রিয়তেজে হুহুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তখন হইতেই বিচ্ছেদারম্ভ। রামচন্দ্র এই ক্ষত্রিয়ভাব, এই বীরভাব, আর ত্যাগ করিতে পারিলেন না—সীতাও না! কিন্তু তেজ সীতার স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব (element), তাই তেজস্বিতাই তাঁহাকে জগৎ হইতে অপসৃত করিল। দ্রৌপদীর তেজস্বিতাই element, তাই তিনি মহিষী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এই কারণে আমার মনে হয় যে, প্রভাস-মিলনটা অতি অপকৃষ্ট কবির কল্পনা। বাল্মিকীর হাতে পড়িলে, এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কেন যে এত মধুর, তাহা বোধ হয়, এই কবিটির মাথায় প্রবেশ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাখালমাত্র—'প্রকৃতির ছাওয়াল' তখনই ক্ষুদ্রা রাধার সহিত তাঁহার মিলন

বৃন্দাবনের বনবিহঙ্গ, ধেনু, বৎস, রাখাল, গোষ্ঠ এবং মাতা যশোমতীর নবনীতের মধ্যে, অতি সহজে আপন অস্তিত্ব ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—যখন তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্" যায় নাই—তখনই বৃন্দাবন, ও তাহার সারভূতা রাধার সহিত তাঁহার মিলন সম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজাধিরাজ, ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তখন প্রেমময়ী রাধাকে তাঁহার সহিত মিলিত করিবার চেষ্টা, সত্য সত্যই করিশুণ্ডের সম্মুখে কোমলা নলিনীকে নিক্ষেপ করার মতই নিষ্ঠুর! সেখানে সে কুঞ্জ-কুটির নাই! সেখানে কেহ ভাবাকুল-লোচনে প্রিয়-সমাগমের আশায় বসিয়া থাকে না ত!

নিস্তব্ধ রজনী, শান্ত মুগ্ধ যমুনা—বিশ্ব-প্রকৃতির মিলন-মধুর ভাব—ইহার মধ্যেই বালিকা রাধার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে—অন্য কোথাও নহে। বাল্মিকী এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, সীতাকে রাজাধিরাজ রামচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। পঞ্চবটী-বনে আমরা যে সীতাদেবীকে দেখিয়াছিলাম—তিনি বরাবর তেমনই রহিলেন; কিন্তু পঞ্চবটীর রামে এবং অযোধ্যার রামে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ! পঞ্চবটীর রাম বীর বটেন, কিন্তু করুণাময়, স্নেহময়, সীতাময়-জীবন সীতাপতি! অযোধ্যার রাম মহাবীর রঘুপতি—শুধু সীতাপতি নহেন! সীতাদেবী সীতাপতিতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারেন; কিন্তু রঘুপতিকে লইয়া কি করিবেন, তাহা জানেন না! গোদাবরীতীরের পর্ণকুটীর যিনি অনায়াসে পূর্ণ করিয়াছিলেন, সার্থক করিয়াছিলেন—তিনি সরযূর তীরে, প্রাসাদে, নিষ্ফলতায় গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেছিলেন; তাই কবি দয়া করিয়া, তাঁহাকে রাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন—তথাপি তাঁহার জীবনকে নিষ্ফল হইতে দেন নাই—তাঁহাকে অন্তঃপুরের অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিতে দেন নাই।

করিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষ যখন নানাজাতীয় জীবের আশ্রয়স্থান হইল, তখন কাজে কাজেই লতাটি শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এককালে রামচন্দ্রের আশ্রয়ে, সীতা-চরিত্র সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সীতাদেবী কুঞ্চিতপত্র, পুষ্পহীন, শোভাহীন লতার মত, শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন—তাহাতে কবির দোষ কি?

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

নীপনীসমাজ।

জাপানের সমাজ-চিত্র অঙ্কিত করা একটী গুরুতর ব্যাপার। এখানে ভারতের ন্যায়, জাতিগত, ধর্ম্মগত কিম্বা ব্যবসাগত কোন সমাজই নাই। এখানকার সমাজ জাতীয় সমাজ। সকলেই এক-প্রাণ, এক-মন। জাপানীদের সহিত বিশেষ মিশিয়া দেখিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই যেন রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা এবং শিল্পবাণিজ্য-বিশারদ। এমন কোন বিষয় নাই, যাহার কিছু-না-কিছু, জাপানী গাড়োয়ানগুলি পর্য্যন্ত না জানে। ইহাদের রীতি, নীতি, আচারপদ্ধতি বাস্তবিক আমাদের অনুকরণীয়। মন প্রাণ সম্পূর্ণ এক না করিতে পারিলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটী জাতীয় শক্তির বিকাশ হইতে পারে না।

জাপানের সমাজ সহজে টলিবার নহে। এ সমাজের সমাজপতি এক-মাত্র সম্রাট। দেশের জনসাধারণ তাঁহার অনুচর। এক পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায়, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একতাসূত্রে আবদ্ধ; দেশ ক্ষুদ্র হইলেও, তাই মহা প্রতাপশালী সুবিশাল রুষ সাম্রাজ্যকে কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল।

সমাজসম্বন্ধে জাপানীদের বিশেষত্ব, বুশিদো নামক গ্রন্থে, বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বুশিদো শব্দের অর্থ, ক্ষাত্রধর্ম্ম (military-knight-ways)। এই গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ জাপানী লেখক মিঃ নিতোবে, এ. এম্, পি. এইচ্. ডি. জাপানের সমাজবন্ধনের মূল ভিত্তি ধরিয়াছেন,—স্বদেশ-বৎসলতা। সমাজসম্বন্ধে, এক স্থলে, তিনি বলিয়াছেন :—To us, the country is more than land and soil, from which to mine gold or to reap grain—it is the sacred abode of Gods,

ক্ষুদ্র জাপানেও চারিটী ধর্ম্ম আছে ; যথা—সিন্তোধর্ম্ম, কনফিউসস, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম। ধর্ম্মভেদ থাকিলেও, পরস্পর ভাই ভাই মনে করিয়া, সকলেই একাগ্রমনে দেশের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট।

সমাজ-বিষয়টী বর্ণন করিতে দেশের রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। তাই সংক্ষেপে, কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

অতি পূর্ব্বে, জাপানে, ভারতের ন্যায়, অনেকটা জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন দেশের লোক আট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপে, এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে মিশিতে পারিত না। বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, যাহারা চর্ম্মের ব্যবসা করিত, তাহারা তাহাদের স্ব-শ্রেণীর সমাজেই বদ্ধ থাকিত। সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমেই পার্থক্যের ভাব বিলুপ্ত হইতে থাকে। আজ কাল আর তেমন ভাব নাই। থাকিলেও পদ-অনুযায়ী বা ব্যবসানুযায়ী কিঞ্চিৎ ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়। সেটুকু না থাকিলে, আবার কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না। সকলের ভিতর নিয়তই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগরূক থাকা চাই। যে জাতির হৃদয়ে বল নাই, তাহাদের বাহ্যিক শক্তিও থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে জাপানের যাবতীয় লোক সম্ভ্রান্ত বা নোব্‌ল্, সামুরাই বা ক্ষত্রিয়, এবং সাধারণ,—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তবে, বিশেষ গুণসম্পন্ন হইলে, যে কেহ, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। এখানে, ভারতের ন্যায়, অজস্র অর্থব্যয়ে অসার উপাধি ক্রয় করিতে হয় না। উপযুক্ত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপই, উপাধিবিশেষ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায় যে, উল্লিখিত তিন প্রকার শ্রেণি-বিভাগ জাতীয় উন্নতির সমূহ সহায়তা করিতেছে।

কোণোএ, কুজো, নিজো, ইচিজো এবং তাকাৎসুকাছা এই পাঁচটী

মিকাদো বংশের সামাজিক আদান-প্রদান হইয়া থাকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে, সমগ্র জাপানে ৬০৭টী নোবল্ পরিবার, ৪৩২১৫৯টী সামুরাই পরিবার, এবং ৭৯১৮৪৭৪টী সাধারণ পরিবার ছিল। কিন্তু ক্রমে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিবারসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যুদ্ধবিদ্যার বলে অনেকে সামুরাই-শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন, আবার যথোপযোগী গুণের জোরে, নোবল্ উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন। এইরূপে, জনসাধারণের ভিতর মিশামিশির ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের দেশে, রাজপুতজাতির যেরূপ কীর্ত্তিকাহিনী শুনিতে পাই, জাপানে সামুরাই জাতির কাহিনীও প্রায় তদনুরূপ। বল্লালী-মতে, কৌলীন্য-প্রথায় আমাদের দেশে প্রত্যেক কুলীনের যেমন আচার বিনয় প্রভৃতি নয়টী গুণ থাকা আবশ্যক হইত, তেমনি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণ-সম্পন্ন না হইলে, কেহই সামুরাই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। তাই যুদ্ধে নিপুণ, গুণবান্ ব্যক্তি, সহজেই, সামুরাই শ্রেণীতে মিশিতে পারেন। ক্ষাত্রজনোচিত কার্য্য না করিলে, কাপুরুষের ন্যায় জীবনাতিবাহিত না করিয়া, অনেক সামুরাই "হারাকিরি" অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া পাপজীবনের অবসান করেন; জীবনের মায়ায় বন্দী হইয়া থাকাও ইঁহারা হেয় মনে করেন। তাই, গত রুষজাপান যুদ্ধে, কোন কোন সৈন্য, বন্দী হইবার উপক্রম দেখিবামাত্রই, আত্মহত্যা করিয়া শত্রুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইহাদের জাতীয়-সমাজ এতদূর দৃঢ় হওয়ার প্রধান কারণ, ইহাদের (১) রাজভক্তি এবং স্বদেশানুরাগ; (২) শিক্ষা-প্রণালী; (৩) বাণিজ্য-নৈপুণ্য; (৪) জ্ঞানতৃষ্ণা ও অনুসন্ধিৎসা; (৫) সরলতা ও সহৃদয়তা; (৬) পরস্পরে সমভাব; (৭) উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা; (৮) একতা; (৯) কষ্টসহিষ্ণুতা; (১০) স্বাবলম্বন বা আত্ম-নির্ভর ও (১১) অধ্যবসায়। প্রথমোক্ত তিনটী বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে

জ্ঞান-তৃষ্ণা জাপানীদের যেরূপ প্রবল, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ-প্রকাশ করিয়া থাকে, যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জাহাজ ইয়াকোহামা বন্দরে লাগাইতে না লাগাইতেই, নৌকাযোগে গাড়োয়ানেরা আরোহীর প্রত্যাশায় জাহাজে উঠিয়া, আমাদের নিকট আকার-ইঙ্গিতে এবং দুই একটা ইংরাজী বা জাপানী কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। আমরা তাহাদিগকে কোন জিনিসের জাপানী নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নম্রভাবে তাহার উত্তর দিয়াই জিজ্ঞাসা করিত—'অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, ইহাকে ইংরাজী এবং ভারতীয় ভাষায় কি বলিয়া থাকে!' একটী গাড়োয়ান কিছু ইংরাজী জানিত। সে বেলা নয়টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের সহিত অনেক বিষয়ের গল্প করিয়াছিল। কোন জায়গায় যাইতে হইলে, প্রায় প্রত্যেক জাপানীই একখানি ইংরাজী-জাপানী ক্ষুদ্র পকেট-অভিধান, এবং নূতন বিষয় টুকিবার জন্য একখানা ছোট নোটখাতা সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। গাড়োয়ানটী সমস্ত দিনে তাহার নোটখাতায় অনেক বিষয় টুকিয়া লইয়াছিল। সহজ কতকগুলি কথা তখনই মুখস্থ করিয়াছিল। সে দিনের জন্য, সে তাহার উপার্জ্জনের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। সামান্য নিম্ন-শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত, শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, বাহিরের বিষয় অবগত হইতে নিতান্ত উৎসুক। এখন দেখিতেছি, আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই আবালবৃদ্ধ ভারতের কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। অনেক সময় ভারতসম্বন্ধে এমন কথা ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে, যাহা ভারতবাসী হইয়াও আমরা জানিতে

আমি কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, কয়েকমাস একটী কারখানায় বস্ত্র-বয়ন শিক্ষা করিতাম। একদিন একজন ইলেক্‌ট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কারখানা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে আসিয়াই, আমার সঙ্গে নামের কার্ড বদল করিয়া, ইংরাজীতে অনেক বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় বোধ হইল, তিনি, ভারত কেন,—পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন। বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন ভারতের শক্তি কিরূপ? আমি কথাটা শুনিয়াও শুনি নাই ভাণ করিয়া, তাড়াতাড়ি কার্য্যে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু তিনি ছাড়িবার লোক নহেন! তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করায়, আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম,—ভারতের শক্তি সম্প্রতি কিরূপ বলিতে পারি না, কেননা অন্য শক্তির সহিত সংঘর্ষণেই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়;—যেমন চীন ও রুষের সহিত সংঘর্ষণে এখন আপনাদের শক্তির পরিচয় পাইতেছি। অধুনা ভারতে তেমন কোন সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই, ভারতের শক্তির কথা বলিতে পারিলাম না। ইঞ্জিনিয়ার আমার মতেই মত দিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

পরিচারিকারাও বাহিরের বিষয়সম্বন্ধে যতটা সম্বাদ রাখিয়া থাকে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্র মহিলা সেরূপ রাখেন কি না সন্দেহ! কোন্ দেশ স্বাধীন, কোন্ দেশ পরাধীন এবং যুদ্ধবিগ্রহে কোথায় কি হইতেছে, পরিচারিকাবর্গ সমস্ত খবর রাখে। তাহাকে কোন দ্রব্যের জাপানী নাম জিজ্ঞাসা করিলে, উহাকে আমাদের ভাষায় কি বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লয়। এইরূপে আমাদের একটী দাসী অনেকগুলি জিনিষের ইংরাজী বাঙলা এবং হিন্দী নাম, এবং ছোট ছোট দুই একটা কথাও শিখিয়াছিল। আমাদের জাপানী ভাষার শিক্ষকমহাশয় ইংরাজী, জার্ম্মাণ এবং রুষভাষায় অভিজ্ঞ। আরও দুই একটী ভাষা

"ভারতী" দেখিয়া, ভারতীয় সংবাদপত্রাদি সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় তিনি বাঙলা ভাষা শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি অক্ষরগুলি লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায়, আমি অক্ষরগুলি বাঙলায় লিখিয়া ইংরাজীতে উহার উচ্চারণ লিখিয়া দিলাম এবং বর্ণসংযোগে কিরূপে শব্দ হয়, তাহাও বুঝাইয়া দিলাম। অন্য এক দিন তিনি আবার সংস্কৃত বর্ণমালা লিখিয়া দিতে বলিলেন। এইরূপ প্রত্যেকেরই নূতন কিছু শিখিবার স্পৃহা নিরতিশয় বলবতী। এই উৎসাহ প্রণোদিত হইয়াই, ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, এ দেশীয় অনেক উৎসাহশীল যুবক, দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া, তথাকার শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, রাজনীতিপ্রভৃতি শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ, তত্তদ্বিষয়ক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জনসাধারণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। উঁহাদের যত্ন ও চেষ্টার ফলেই জাপানের এত দ্রুত উন্নতি।

স্বয়ং লর্ডও, কোন নূতন বিষয়, সামান্য লোকের নিকট শিক্ষা করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু ভারতবাসীদিগের অধিকাংশই নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় জানিতে হইলে, বৃথা পরিশ্রম ও সময় নষ্ট বলিয়া মনে করেন; এবং অনেক সময় অন্যের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহাদিগের লজ্জা এবং সঙ্কোচ উপস্থিত হয়।

জাপানীরা নিরতিশয় সরলপ্রকৃতির লোক, এক দণ্ডের জন্যও কুটিলতা উহাদের মনে স্থান পায় না। বহুবৎসর পূর্ব্বে, কোন এক প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন, জাপানীদের হৃদয় প্রাতঃকালীন সাকুরা পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। তাঁহার মূল্যবান শ্লোকটী, প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়া, অদ্যাপিও টোকিও সহরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। বাস্তবিক, ব্যবহারতঃ ইহাদের হৃদয় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ দেখিয়াছি। যে সহরের লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ, সন্ধিবিষয়ক গোলযোগ ভিন্ন এক দিনের

না। কি রেলওয়ে ষ্টেশনে, কি ট্রামগাড়িতে, হাটে, বাজারে, এমন কি লক্ষাধিক লোক-সমাগমের উৎসবে, কেবল গেতা অর্থাৎ জাপানী পাদুকা বা খড়মের শব্দব্যতিরেকে অন্য কোনরূপ কোলাহল শুনিতে পাইলাম না। এত বড় সহরেও বাস করিয়া বোধ করিতাম, যেন বঙ্গের কোন নিভৃত পল্লীমধ্যে আরামে বাস করিতেছি। সমস্ত কাজই, যেন নীরবে, কলে, সম্পাদিত হইতেছে। ইহাদের হৃদয় এমনই ঋজু যে, ক্ষণেকের জন্যও কোন রহস্য বা গোপনীয় বিষয়টী পর্য্যন্ত ইহারা মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিতে পারে না; হঠাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাহির হইয়া পড়ে, অথবা কখন কখন খোলাখুলিই প্রকাশ করিয়া ফেলে। শুনিতে পাই, অন্যের সহিত মনোমালিন্যে কোনরূপ মনোকষ্ট পাইলে, শত্রুর প্রতিশোধ না লইয়া, জাপানীগণ আত্মহত্যাদ্বারা সে কষ্টের অবসান করে।

আমরা জাপানীদের যেরূপ উত্তরোত্তর সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, ইহাদের প্রীতি ও সৌজন্য আন্তরিক! আমি এবং আমার কোন আসামী বন্ধু যখন ছাপ্পোরো রাজকীয় কৃষি-বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম, তখন বোর্ডিংয়ের ছেলেরা এবং কলেজ-ক্লাশের ছেলেরা দুইটী স্বতন্ত্র সভা আহ্বান করিয়া, আমাদিগের দুইজনকে বিশেষভাবে অভিনন্দন দান করেন! কলেজ-ক্লাশের সভায়, জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ এবং এই কলেজের সিনিয়র প্রফেশর ডাক্তার মিইয়ারি ডি. এস্. সি. (Herberd University) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রাচীন সুসভ্য আর্য্যজাতির আবাসভূমি ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রগণ আমাদের কলেজে বিদ্যালাভ করিতে আসিয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। আমাদের শিক্ষায় ইহাদের দেশের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও, আমরা আমাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিব।" সভাপতির ... সেই সভায় কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করি, এবং

বন্ধুর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। এক পরিবারের লোকের মত মিশামিশি হইতেছে। ইহাদের সহৃদয়তার ফলেই টোকিও সহরে "ওরিয়েণ্টাল ষ্টুডেণ্টস্ সোসাইটি" নামক একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিতে সম্প্রতি কোরিয়া, চীন, শ্যাম, ফিলিপাইন, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এবং এ দেশের ছাত্রবৃন্দ একত্র হইয়া পরস্পর সৌহৃদ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। আমাদের জনৈক ভারতীয় ছাত্র সে দিন ট্রামে আসিতেছিলেন। টিকিটের দাম দিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার নিকট ৭৷৹ সাড়ে সাত টাকার একখানা নোট বাদে, একটী পয়সাও নাই। টিকিট কলেক্টরের নিকটও নোটের টাকা নাই। গাড়ীর অপর প্রান্তে কলেজের একটী ছেলে দুইখানা টিকিট খরিদ করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই টিকিটখানা ব্যবহার করেন, তবে বাধিত হইব। এখানা আপনার উদ্দেশেই ক্রয় করিয়াছি।" ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা টিকিটখানা তিনি গ্রহণ করিলেন। ভদ্রলোকটী এবং ভারতীয় ছাত্র এক ষ্টেশনেই নামিলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছুতেই পয়সা গ্রহণ করিলেন না। পরস্পরে নাম ও ঠিকানা জানিয়া লইলেন, এবং 'সময়ে দেখা সাক্ষাৎ করিবেন' বলিয়া ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন। আমরা কোন দিন কোন স্থানে যাইতে রাস্তার সন্ধান করিলে, অনেক সময় জাপানীরা আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া রাখিয়া আইসে।

এখানে ধনী দরিদ্রকে, কিম্বা বিদ্বান অশিক্ষিতকে, ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। পরস্পরে সমভাব। রাজায় প্রজায় সাক্ষাৎ হইলেও অবনতমস্তকে পরস্পরের অভিবাদনাদি হইয়া থাকে। ট্রামগাড়িতে মুটে, মজুর, ইতর, ভদ্র, লর্ড প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে, এক বেঞ্চে, উপবেশন করিয়া থাকে। স্থানাভাবে যদি কখন কোন মুটে গাড়ীতে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য আরোহী একটু ঘেঁষাঘেঁষি করিয়াও তাহাকে আসন

দেন। এখানে অহঙ্কার বা অভিমান বলিয়া কিছুই নাই। এখানকার মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রত্যহই ট্রামে করিয়া কলেজে আসিয়া থাকেন।

এখানে যে কোন বংশের যে কেহ, বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে সমাজের শীর্ষ-স্থলে অধিরোহণ করিতে পারেন। তাই জনসাধারণ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা অতীব উচ্চ। কলেজের বন্ধুদিগের, ভবিষ্যতে কি করিতে ইচ্ছা,—জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় সকলেই বলেন, "এখানকার শিক্ষাসমাপ্তির পর আমেরিকা, ইংলণ্ড, জর্ম্মণি অথবা ফ্রান্সে যাইয়া, তথাকার ইউনিভারসিটিতে পড়িব; তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ দেশের কাজ করিব।" কেহ কেহ বলেন, সদাগর হইয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিবেন। সামরিক স্কুলের ছাত্রেরা বলেন, যুদ্ধ-বিদ্যায় তেমন উন্নতি দেখাইতে পারিলে, সেনাপতি হওয়াও তাঁহাদের সাধ্যাতীত নহে!

ভারতীয় ধনাঢ্যগণ একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, এখানকার 'রাজকুমারেরা' দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র, জনসাধারণের সন্তানগণের সহিত একত্র কিরূপ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন। যে প্রিন্স খান্নিম, এবং প্রিন্স আরিস্থগাওয়ার নাম এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত; উঁহারাও কেবল জাপানের বিদ্যা শেষ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উঁহারা বহুকাল উভয়েই বিলাতে অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই যুবকগণ দলে দলে বিদেশে যাইয়া শিল্প বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষিতত্ত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, রেল জাহাজ প্রভৃতির নির্ম্মাণকৌশল শিক্ষা করিয়া, দেশের কত মহৎ কার্য্য সাধন করিতেছেন। এই জাতিগত উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার ফলেই, জাপানে আজ যুগান্তর উপস্থিত।

কষ্ট-সহিষ্ণুতা জাপানী চরিত্রে একটী বিশেষ গুণ। জাপানের অধি-কাংশ স্থানই পাহাড়-পর্ব্বতে আবৃত। তাই বুঝি, পরমেশ্বর আবাসভূমির উপযোগী করিয়াই অধিবাসিদিগকে সৃজন করিয়াছেন। খড়ম পায়ে

বাঁধিয়া, হয়ত ৭।৮ মাইল হাঁটিয়া চলিল। স্থানবিশেষে, পাহাড়ের উপর দিয়াও চলিতে তাহাদের ক্লান্তি নাই। আমাদেরও সাধ্য নাই যে, আমরা ওরূপ ভাবে হাঁটি। ছোট শিশুগুলি পর্য্যন্তও কষ্ট-সহিষ্ণু। তাহাদেরও কান্না বড় একটা শুনিতে পাই না। গুরুতর আঘাতেও, ক্ষণিক কান্না কাঁদিতে দেখিয়াছি মাত্র। কল কারখানায় পুরুষ-মেয়ে সকলেই, খাবার বাঁধিয়া লইয়া দৈনিক ১৫ঘণ্টা হিসাবে কায করিতেছে। এখানে ঘোড়া বা গাভী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু বড় বিরল, এজন্য গাড়ীগুলি পর্য্যন্ত মানুষে টানে। পশুর কায মানুষে করে বলিয়া, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, জনৈক আমেরিকান্ তাঁহার এক পুস্তকে জাপানীদিগকে এবং জাপানী সভ্যতাকে পরিহাস করিয়াছিলেন। এখন সেই আমেরিকাবাসীগণই বলিতেছেন, শ্রমশীলতা জাপানীদিগের একটী প্রধান গুণ! ইহার ফলেই, জাপানীরা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতেছে। কষ্ট-সহিষ্ণু বলিয়াই, আমেরিকানেরা পাণামা খাল কাটিবার নিমিত্ত, জাপানী মজুর নিযুক্ত করিতে চাহেন।

ভিক্ষায় মানের হ্রাস হয়,—এ কথাটী ভারতের। কিন্তু কথানুযায়ী কার্য্য ভারতে কমই হয়। জাপানে ভিক্ষাবৃত্তি অতীব ঘৃণ্য। সেদিন টোকিও সহরে, ট্রামে উঠিতেই, রাস্তার উপর কয়েকটি পয়সা দেখিতে পাইয়া ভিক্ষুকের জন্য তুলিয়া আনিলাম। কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া খুঁজিয়াও রাস্তায় একটী ভিক্ষুক দেখিলাম না। অথচ যে সে দরিদ্রকে দিতেও সাহসী হই নাই। কেন না সে অনর্থক অপরের মুদ্রা লইবে কেন? কর্ম্মে অশক্ত বৃদ্ধ কি অন্ধ, অপরের শরীর টিপিয়া অথবা শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া পয়সা লইবে, তবুও সহজে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না।

জাপানীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে বড় ভালবাসে। দরিদ্রের কুটীরের

পরিষ্কার! পাশ্চাত্য জাতির বিলাসিতা এ পর্য্যন্ত ইহাদের ভিতর প্রবেশ লাভ করে নাই। বাহ্যিক আড়ম্বর আদৌ নাই। সেদিন ইউনিভারসিটীর কন্‌ভোকেশনে সম্রাট আসিয়াছিলেন,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, বড়লাট আমাদের কন্‌ভোকেশনে যে জাঁকে আসিয়া থাকেন, ইনি অবশ্য তাঁর চেয়ে কিছু বেশী আড়ম্বরে আসিবেন। বস্তুতঃ, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! সাধারণ ভদ্রলোকের মত, একটী দুই-ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে মাত্র ২।৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য!

জাপানীদের মত, অন্য কোন জাতি, অতি সামান্য আহারে সন্তুষ্ট কিনা বলিতে পারি না। ভাত এবং দুই চারি টুকরা সিদ্ধ মূলা কিম্বা অন্য সুলভ তরকারীই সাধারণের প্রধান খাদ্য। সিদ্ধ দাইল, কিম্বা দুই এক টুকরা সিদ্ধ, ভাজা, অথবা কাঁচা মাছ ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। ইহারা মসলার ধার ধারে না। অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। তাহারা ভাত আর মূলাতেই সন্তুষ্ট। জাপানীরা 'ওচা' অর্থাৎ চায়ের শুক্‌না পাতার জল বড় বেশী পান করে; অন্ততঃ দিনের মধ্যে ৮।১০ বার পান না করিলেই নয়। কোন আগন্তুক বাড়ী আসিলে বঙ্গদেশে যেমন পান তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়, এখানে 'ওচা' দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। আহারের সময় কোন ব্যক্তি বাড়ী আসিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই আহার করা হয়। ইহারা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়েই আহার করিয়া থাকে; এবং দিনে তিনবার আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহাদের প্রাচীন আচার-ব্যবহারসম্বন্ধে আলোচনা করিলে দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে যে এ দেশে সভ্যতা ছিল না এ কথা বলাই যাইতে পারে না। তবে জাপান চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত। এ দেশে পূর্ব্বে ষ্টীমার [illegible] আবিষ্কৃত হয় নাই। শিল্প-বাণিজ্যাদিবিষয়েও অন্যান্য সুসভ্য

নিকট ইহারা অপরিজ্ঞাত ছিল। অথবা কিঞ্চিৎ জানিয়া, অন্যান্য জাতি ইহাদিগকে অসভ্য বলিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানে শীলতা ও রুচির আদর্শ অতি উচ্চ। গালাগালি, ভর্ৎসনা, তেমন কিছুই নাই। কেহ কোন একটী অন্যায় কায করিলে, 'ওয়ারুই' অর্থাৎ ''ভাল নহে' বলা হয়। তেমন গুরুতর অন্যায় কায করিলে, অথবা ঝগড়া বাঁধিলে, "নাকি বাকা" অর্থাৎ বোকা বলা হয়। কিন্তু শেষোক্ত শব্দটীর প্রয়োগ এত বিরল, যে, এ পর্য্যন্ত কাহাকে বলিতে শুনি নাই।

বাহিরের লোক দূরের কথা, বাড়ীর লোকই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এবং রাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে পরস্পর অভিবাদন করিয়া থাকে। বাহিরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে, পরস্পরের কত ভাবে অভিবাদন হইয়া থাকে তাহা ভারতবাসীমাত্রেই দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। আবার বিদায়কালেও তদনুরূপ অভিবাদনাদি হইয়া থাকে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে, বিভিন্ন প্রকারের অভিবাদনে, বিভিন্ন প্রকারের ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে (গোমেন্ কুদাছাই)! তারপর যে কোন উত্তর বা কাযের জন্য, ঘন ঘন ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ইহাদের অতি-রিক্ত শিষ্টাচার আমাদের নিকট অনেক সময় হাস্যোদ্দীপক মনে হয়।

জাপানী দেশাচারসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করি। ভারতের সহিত জাপানের কতকগুলি বিষয়ে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে, সকল প্রাচ্য জাতির মধ্যেই কতক-গুলি সাধারণ প্রথা ছিল; ক্রমে পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষণে তাহা অনেকটা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখানে ভারতের ন্যায়, চেয়ার টেবিলের পরিবর্ত্তে বসিবার জন্য মাদুর ব্যবহৃত হয়। বিজয়ার পর, বঙ্গে, আমাদের

এখানেও তেমন প্রীতিসম্ভাষণের অনুষ্ঠান হয়। শুভদিনে নবান্ন উৎসব হয়। ছেলে মেয়েদের, ঠিক ১০০ দিবস বয়স হইলে, অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঘরে প্রদীপ দিয়া বৃদ্ধারা এখনও "নমামি দাবুৎসু" (দাবুৎসু=পরমেশ্বর) বলিয়া করপুটে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া থাকেন। ধূপধূনারও ব্যবহার আছে। প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৫ই ও ১৬ই তারিখে, মৃত ব্যক্তিদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে (ভারতে ভাদ্রমাসের অমাবস্যা-মহালয়া-শ্রাদ্ধের ন্যায়)। শ্রাদ্ধে, মৎস্য মাংস ভিন্ন, নানারূপ সুস্বাদু পানীয় ও আহার্য্য, পূর্ব্ব-পুরুষের সদ্গতির নিমিত্ত, পুরোহিতের দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়।

এখানে, ভারতের ন্যায়, খুড়া, জ্যেঠা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ এক-পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করেন। কোনরূপ অশান্তি বা গোলযোগ নাই। পিতামাতাকে সন্তানেরা দেবজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ছেলে মেয়েদের বিবাহের কর্ত্তা পিতামাতা। বিবাহে পণের প্রথা একেবারেই নাই। তবে পিতামাতা ইচ্ছা করিয়া যৌতুকাদি দিয়া থাকেন। পুত্রবধু বহু সন্তানের জননী হইলেও, শ্বশুর-শাশুড়ীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। তাঁহাদের অবাধ্য হইলে, অথবা পুত্রবধূ দ্বারা সংসারের কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে, উঁহারা তাহাকে পুত্রের বিনা অনুমতিতেই গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন। বিধবা এবং পরি-ত্যক্তা নারীদের পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে। লর্ডবংশে এখনও পুনর্ব্বিবাহ প্রথার প্রচলন অল্প। অল্প বয়সে মেয়েরা বিধবা হইলে সাধারণতঃ পুনর্ব্বিবাহ হইয়া থাকে। আইনানুযায়ী কোন পুরুষের, ২৫ বৎসর বয়সের, এবং স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়সের কমে বিবাহ হইতে পারে না। কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট-কালের পূর্ব্বে বিবাহ দিতে হইলে, গবর্ণ-মেণ্টের অনুমতি লইতে হয়।

আজমীর—মেরওয়ারা।

রাজপুতানার ঠিক মধ্যস্থলে, আজমীর—মেরওয়ারা প্রদেশ। বিস্তীর্ণ সামন্ত রাজন্যদিগের রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত, এই রাজ্যখণ্ডটুকু, খাস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে। শাসন করিবার জন্য একজন কমিশনর আছেন; ইঁহার হেড কোয়ার্টার্স আজমীর সহরে। ইঁহার উপর একজন চিফ্ কমিশনর আছেন। তিনি গবর্ণর জেনারেলের রাজপুতানাস্থ এজেণ্ট; তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স মাউণ্ট আবু। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাঞ্চলে যত সামন্ত রাজন্যদিগের রাজ্য আছে, তাহা দুইটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত:—একভাগের নাম রাজপুতানা এবং অপরভাগের নাম সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া বলিতে, কেহ যেন সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস না বুঝেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজপুতানার এজেণ্ট মাউণ্ট আবুতে থাকেন। ইনি যোধপুর (মারওয়ার), উদয়পুর (মেওয়ার), জয়পুর, বিকানীর, আলোয়ার, যশল্মীর, কোটা প্রভৃতি রাজ্যের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ারও একজন এজেণ্ট আছেন। তিনি ইন্দোরে থাকেন এবং গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়ার রাজ্য), ইন্দোর (হোলকারের রাজ্য), ভোপাল, রেওয়া রৎলাম প্রভৃতি রাজ্যের তত্ত্বাবধারণ করেন। আজমীর-মেরওয়ারা প্রদেশটি, পূর্ব্বে দুইটি বিভিন্ন-জেলায় বিভক্ত ছিল:—আজমীর এবং মেরওয়ারা। ইংরাজী ১৮৪২ সাল হইতে দুইটিকে এক জেলায় পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু রাজস্ব এবং বিচারসংক্রান্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য, দুইজন এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর আছেন। একজন আজমীরের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট,—ইনি আজমীরে থাকেন; এবং আর একজন মেরওয়ারার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট,—ইনি

পুলিশ প্রভৃতি আজমীরে থাকেন। আজমীর ডিষ্ট্রীক্টের দুইটি সবডিবিসন বা তহশিলি আছে,—আজমীর এবং কেকরি। কেকরি একটু সহর গোছের বলিয়া, এখানে একজন একষ্ট্রা এশিষ্ট্যাণ্ট কমিশনর থাকেন। মেরওয়ারা ডিষ্ট্রীক্টেও দুইটি তহশিলি আছে,—বিয়াওর এবং টাডগড়। ইহা ছাড়া নসীরাবাদে একজন ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। আজমীর মেরওয়ারার মধ্যে তিনটি ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে,—আজমীর, নসীরাবাদ এবং দেওলী। তন্মধ্যে নসীরাবাদই বড়। এখানে একটি তোপখানা এবং গোরা ও কালাপণ্টনের একটি রেজিমেণ্টও আছে। আজমীরে কেবল 'মেরওয়ারা ব্যাটেলিয়ন' বলিয়া একটি পণ্টন আছে এবং দেওলীতে দেওলী Irregular Force বলিয়া, আধা-রেসালা আধাপণ্টনের একটি রেজিমেণ্ট আছে। দেওলী সহরটি যদিও নেটিব ষ্টেটের মধ্যে, তথাপি ক্যাণ্টনমেণ্ট-অংশটুকু আজমীর মেরওয়ারার সামিল বলিয়া ধরা হয়। তিনটি ক্যাণ্টনমেণ্টই বম্বে Armyর অন্তর্গত এবং মৌ-ডিবিসনের অধীন।

আজমীর-মেরওয়ারা প্রদেশটি পার্ব্বত্য। এই পর্ব্বতশ্রেণীর নাম অর্ব্বলী পর্ব্বত। ইহারই উপত্যকা কর্ষণ করিয়া এতদ্দেশীয় কৃষকেরা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৃষ্টিপাত খুব কম, গড়ে বিশ ইঞ্চিও হইবে না এবং জমিও তেমন উর্ব্বরা নয়। সুতরাং এদেশে, বিশেষতঃ মেরওয়ারায়, অন্নকষ্ট এবং জলকষ্ট মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়। মেরওয়ারা, আজমীর অপেক্ষা পর্ব্বত-সঙ্কুল। সেখানে পর্ব্বতের ঢালুর জন্য জল দাঁড়াইতে পায় না। তজ্জন্য কূপেও প্রায় জল পাওয়া যায় না। তবে অনেক স্থানে, নীচু জায়গায় বাঁধ দিয়া জলাশয় করা আছে; তাহা হইতে জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে। এ মুল্লুকে কোনও নদী নাই। বনাস নদী

আজমীরেই বটে, কিন্তু আজমীরের সন্নিকটস্থ অংশটুকু 'নদী' শব্দের উপযুক্ত নয়। এদেশের বাড়ীঘর সব পাথরের তৈয়ারী ; ইটের কারবার বড় নাই। কাঠের ব্যবহারও খুব কম ; কাঠের কাজ পাথরেই চলিয়া যায়। পাথরের চৌকাট পাথরের তীর বরগা ইত্যাদি ; খিলানের কাজও একখণ্ড লম্বা পাথর দিয়া সারা হয়। ছাদের জন্য বড় বড় চওড়া পাৎলা পাথর ব্যবহার হয়, তাহাকে পট্টি কহে। পট্টি, শ্লেট-পাথরের ন্যায় খনি হইতে স্তরে স্তরে বাহির করা হয়। কিষণগড়ের অন্তর্গত সীলোড়া গ্রামে এবং আজমীরের নিকট শ্রীনগর গ্রামে, এই পাথরের খনি (quarries) আছে। আগ্রা হইতে আহমেদাবাদ পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, তাহার অনেক অংশ আজমীর মেরওয়ারার মধ্য দিয়া গিয়াছে। বন্যজন্তু বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে হরিণ (কাকসার) এবং ময়ুর যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চিতাবাঘও পাহাড়ের কোন কোন জায়গায় আছে। সাপও এদেশে অনেক। এদেশের জল একটু সাবধান হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। অনেকেই নেহ্রু (guinea worms) হইয়া কষ্ট পায়! কুয়ার জল ছাঁকিয়া ব্যবহার করিলে, নেহ্রু হওয়ার তত আশঙ্কা থাকে না।

এক্ষণে আজমীর-মেরওয়ারার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। আজমীর প্রদেশটির নাম অবশ্যই আজমীর সহর হইতে হইয়াছে। চৌহানবংশীয় রাজা অজাপাল খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই সহর স্থাপিত করেন। তাঁহারই নাম হইতে সহরের নাম অজামীর বা আজ্মের হইয়াছে। অজাপাল তারাগড় নামক গড়টিও নির্ম্মাণ করেন। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে, রাজা বিলমদেবের রাজত্বের সময় সুলতান মাহমুদ আজমীর লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তিনি তারাগড়ের কিছুই করিতে পারেন নাই। বিলমদেবের পুত্রের নাম বিসলদেব। ইনিই বিস্‌লাতলাও নামক জলাশয় নির্ম্মাণ করান। আমাদিগের দেশের কথা হইলে, জলাশয় খনন করান

নির্ম্মাণ করে। বিসলদেবের পৌত্র অনা, অনাসাগর বা আয়নাসাগর নামক জলাশয় নির্ম্মাণ করেন। অনার প্রপৌত্র সোমেশ্বর দিল্লীর রাজা অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারই পুত্র পৃথ্বীরাজ অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক পালকপুত্র গৃহীত হইয়া, দিল্লী এবং আজমীরের রাজা হন। পরে ইনি মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নিহত হইলে, আজমীর পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত একরূপ মুসলমানদিগের অধীন থাকে। তৈমুরলঙ্গের দিল্লী লুণ্ঠনের সময় সুযোগ পাইয়া, মেওয়ারের রাণা কুম্ভ আজমীর দখল করেন। রাণা কুম্ভের হত্যার পর, আজমীর কিছুদিনের জন্য, মালোয়ার রাজার হস্তে আইসে; পরে মারওয়ারের রাঠোরগণের হস্তে যায়। আকবরের রাজত্বের সময় ইহা পুনরায় মুসলমানের হস্তগত হয়। তখন সুবে আজমীর বলিতে, সমগ্র রাজপুতানা বুঝাইত। গ্রীষ্মকালে, দিল্লীর বাদসাহেরা আজমীরে আসিয়া বাস করিতেন। সম্রাট আকবর আজমীরের দুর্গ এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। জাহাঙ্গীর এইখানেই ইংলণ্ডের রাজা, প্রথম জেম্‌সের দূত সার টমাস রোর অভ্যর্থনা করেন। আজমীরেই হতভাগ্য দারা আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক যুদ্ধে বিধ্বস্ত হন। মেওয়ার এবং মারওয়ারের সহিত যুদ্ধের সময় আজমীরেই সম্রাট আরঙ্গজেবের হেড কোয়ার্টার্স ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় মারওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিৎসিংহ আজমীর অধিকার করেন। পরে অজিৎসিংহের পৌত্রগণের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে, একপক্ষ মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্যপ্রার্থী হন। সেই সুযোগে মহারাষ্ট্রগণ, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর দখল করেন। মধ্যে একবার যখন মাধোজী সিন্ধিয়া জয়পুর আক্রমণ করিতেগিয়া, পরাস্ত হন্ তখন আজমীর, রাঠোরগণের হস্তগত হয়, কিন্তু বৎসর-তিনেকের মধ্যেই, মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় আজমীর অধিকার করেন। অবশেষে পিণ্ডারী যুদ্ধের অবসানে

ইং ১৮১৮ সালে, আজমীর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে, এবং সেই অবধি ইহা বৃটিস-রাজ্যভুক্ত।

মেরওয়ারার পুরাতন ইতিহাস কিছুই নাই। কেবল পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর লুণ্ঠন চলিত। ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় না। আজমীর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিলে, পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য মের জাতির অত্যাচারে, বাধ্য হইয়া, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের গ্রামগুলি দখল করিয়া, ইহাদিগকে বশে আনয়ন করেন। পূর্ব্বে ইহারা কোনরূপ কৃষিকার্য্য করিত না; লুণ্ঠনই ইহাদিগের ব্যবসা ছিল। পরে কর্ণেল হল এবং কর্ণেল ডিক্সন সাহেবদ্বয়ের যত্নে, ইহারা আধুনিক সভ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কর্ণেল ডিক্সন সাহেবের ন্যায় শাসনকর্ত্তা খুব বিরল। বিয়াওরে ইঁহার কবর আছে; মের জাতি এখনও এই কবর পূজা করিয়া থাকে। ইনিই মেরওয়ারার জলাশয়গুলি বাঁধাইয়া দেন। ইং ১৮৩৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (ইং ১৮৫৭) গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনওরূপ উৎসাহ এবং সাহায্য না পাইয়া, অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিয়া, ইনি এই অসভ্য মেরগণকে শান্ত কৃষিজীবিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

আজমীর-মেরওয়ারার মধ্যস্থল দিয়া, রাজপুতানা মালোয়া রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। দিল্লী হইতে একটি লাইন, এবং আগ্রা হইতে একটি লাইন বাঁদীকুই ষ্টেশনে মিলিত হইয়া, জয়পুর দিয়া, বরাবর আজমীরে আসিয়াছে; আজমীর হইতে পুনরায় দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে। একটি শাখা ইন্দোর হইয়া খাণ্ডুয়া ষ্টেশনে জি, আই, পি, লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। অপর শাখা আহমেদাবাদ হইয়া বম্বে গিয়াছে। এ সমস্ত রেলই মিটার-গেজ অর্থাৎ রেলের পরিসর ৩ ফুট ৩⅜ ইঞ্চি। কেবল আহমেদাবাদ হইতে বম্বে

অংশের নাম বম্বে বরোদা এবং সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (B. B. & C.I.R.)। পূর্ব্বে রাজপুতানা মালোয়া রেলওয়ে, খাস গবর্ণমেণ্টের ছিল। কিন্তু এক্ষণে বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে কোম্পানি ইজারা লইয়া চালাইতেছেন। লাভ-সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রেলওয়ের মধ্যে ই, আই, রেলওয়ে অদ্বিতীয়; তাহার নীচেই, রাজপুতানা মালোয়া রেলওয়ে। প্রথম যখন এই রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন বেশী ট্রাফিক হইবে না মনে করিয়া, ইহাকে অল্পপরিসর করা হয়। কিন্তু এক্ষণে এত ট্রাফিক হইয়াছে যে, মিটারগেজে কুলাইতেছে না। রৎলাম হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি ব্রড্‌গেজ লাইন করিবার কল্পনা হইতেছে। এক্ষণে রাজপুতানার অনেক স্থানেই রেলে যাওয়া যায়। ফলেরা ষ্টেশন হইতে বিকানীর যাইতে শাখা রেল আছে। এই রেলপথে সম্বরের বিখ্যাত লবণ-হ্রদ। আমাদের দেশে, যে সব রাজপুতানার লোককে, সাধারণতঃ, মাড়োয়ারী বলি, তাহাদের অধিকাংশই বিকানীরের লোক। মারওয়ার ষ্টেশন হইতে যোধপুর যাইতে, একটি শাখা রেল আছে। জয়পুর মেন্ লাইনের উপরেই, চিতোরগড় ষ্টেশনও মেন্ লাইনের উপর, আজমীর হইতে ১১৬ মাইল দক্ষিণে। এইখানেই চিতোরের বিখ্যাত গড়। গড়টি ষ্টেশন হইতে দেখা যায়। গড়ের কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। চিতোরগড় ষ্টেশন হইতে উদয়পুর অবধি নূতন রেল হইয়াছে। আমি যখন চিতোরে যাই, তখন উদয়পুর হইতে কিছুদূরে দেবারি অবধি রেল খুলিয়াছিল, এবং আমার বোধ হইতেছে, উদয়পুর দরবার রেলটি এক্ষণে ঐ পর্য্যন্তই আছে, আর বাড়ান হয় নাই।

আজমীর সহরের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। সহরটি তারাগড় নামক একটি উচ্চ পাহাড়ের নীচেই; এমন কি খানিকটা সহর পাহাড়ের গায়ের উপরেও গিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমার বোধ হয়, আজমীর

সহরটি বড় সুন্দর দেখায়। তারাগড় সমতলভূমি হইতে প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ হইবে। উপরে উঠিবার একটি রাস্তা আছে। তারাগড়ের উপরে পুরাতন কেল্লা ছিল ; উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এখন রুগ্ন সৈনিক-নিবাস হইয়াছে। উপরে একটি ডাকবাংলা আছে, এবং মুসলমানদিগের প্রাচীন কবর ও মস্‌জিদ্‌ও দুই একটি আছে। তারাগড়ের নীচে 'আড়াই দিন্‌কা ঝোঁপ্‌ড়া' নামক একটি ভগ্নাবশেষ মস্‌জিদ্‌ দেখিবার যোগ্য। কথিত আছে, কুতবউদ্দীন বাদসাহের নমাজ পড়িবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের দেবালয় ভাঙ্গিয়া, এই মস্‌জিদ্‌, আড়াই দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়। যাহা হউক, স্তম্ভগুলির উপরে খোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই, ইহা যে হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাংশ তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। দিল্লীর কুতব-মিনারের নিকট যে ভগ্নাবশেষ কুতব-মস্‌জিদ্‌ আছে, তাহা যেরূপ পৃথ্বীরাজের ভবনের ভগ্নাংশ লইয়া নির্ম্মিত, এই 'আড়াই দিনকা ঝোঁপ্‌ড়া' ঠিক তাহারই অনুরূপ। দুটি ঠিক একই ধরণের ; একটি দেখিলেই অপরটির কথা মনে পড়ে। জেনারেল কানিংহাম সাহেব বলেন, "দিল্লীর কুতব-মস্‌জিদ্‌ এবং আজমীরের 'আড়াই দিনের ঝোঁপ্‌ড়া', প্রায় একই সময়ে (১২১১—১২৩৬ খ্রীঃ) নির্ম্মিত, এবং তিনি অনুমান করেন যে, এক শিল্পীই দুটির নক্সা করেন এবং যে সকল কারিকর একটির নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারাই অপরটি নির্ম্মিত হয়। আজমীর সহর চতুর্দ্দিকে উচ্চ দেয়াল-দিয়া-ঘেরা। পাঁচটি ফটক আছে, যথা—মাদার দরওয়াজা, উস্‌রি দরওয়াজা, ত্রিপোলিয়া দরওয়াজা, আগ্রা দরওয়াজা, এবং দিল্লী দরওয়াজা। এই ফটকগুলি ব্যতীত, দুই এক জায়গায় দেয়াল ভাঙ্গিয়া নূতন রাস্তা হইয়াছে। দেয়ালের বাহিরেও এখন সহর খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে ; তন্মধ্যে কায়শরগঞ্জ নামক অংশটিই প্রধান। সহরে এবং কায়শরগঞ্জে, অনেকগুলি বাঙালী বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রেলওয়ে অফিসে কর্ম্ম করেন

তুই একজন কলেজের শিক্ষক এবং একজন পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার। আজমীরে, রাজপুতানা মালোয়া রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার্স। এখানে রেলের ক্যারেজ এবং লোকো সপ্‌ আছে। অনেক গোয়ানীজ (গোয়ার লোক) এবং দেশী লোক, এই সপে কাজ করে। এই কারখানাই কায়শরগঞ্জের নূতন বসতির মূল কারণ। সহরের ভিতর দর্‌গা-বাজারে খাজা সাহেবের দর্‌গা বলিয়া একটি প্রাচীন দর্‌গা আছে। দর্‌গাটি মুসলমানদিগের একটি তীর্থস্থান। মুসলমানেরা বহুদুর হইতে এখানে তীর্থ করিতে আইসেন। এই দর্‌গার জন্য তাঁহাদিগের নিকট আজমীর অতি পবিত্র, এবং আজমীরকে তাঁহারা 'আজমীর শরীফ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। দর্‌গাটি খাজা মৈনুদ্দিন বিস্তি নামক একজন মুসলমান সাধুর কবর। কবরের চারিদিকে মোগল সম্রাটগণ নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। সাহাবুদ্দিন ঘোরীর ভারতবর্ষ আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে, মদিনা হইতে সাধুটি এখানে আইসেন এবং ইং ১২৩৫ সালে, আজমীরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে, দর্‌গায় খাজা সাহেবের স্মরণার্থ, ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা হয়। মেলার নাম উর্স মেলা (Urs mela); মেলায় বহুদুর হইতে যাত্রীর সমাগম হয়। অনেকে কোনরূপ মানস করিয়া 'ধর্‌ণা' দিয়া পড়িয়া থাকে এবং সমস্ত রাত্রি কোরাণপাঠ, সঙ্গীতাদি হয়। খাজা সাহেবের উদ্দেশে নৃত্য-গীতাদি করিলে ব্যবসা ভাল চলিবে, এই বিশ্বাসে, আগ্রা দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক নর্ত্তকী ও গায়ক, মেলায় আইসেন এবং বিনা পয়সায় নৃত্য-গীতাদি করিয়া চলিয়া যান। দর্‌গায় তুইটি প্রকাণ্ড ডেগ আছে,—একটি বড় একটি ছোট। বড় ডেগে ন্যূনকল্পে ৮০ আশি মণ চাউলের পোলাও পাক হইতে পারে;

পাক হইয়া গেলে, ফুটন্ত অবস্থায় এই পোলাও লুঠ হয়। লুঠের সময় সকলে চট্ কিম্বা কম্বলে আপাদমস্তক জড়াইয়া আইসে। যদিও কেহ কেহ অল্প স্বল্প ছেঁচকাপোড়া হইয়া যান, কিন্তু কখনও প্রাণহানি হয় নাই। আমি যেবার মেলা দেখিয়াছিলাম, সেবার হায়দ্রাবাদের নিজাম বড় ডেগটি দিয়াছিলেন; তাহাই পাক হইতেছিল। লুঠের দিন, ভরসা করিয়া যাই নাই।

চিতোর-গড়ের লুণ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে দুইটি জয়ঢাক, একটি ঘণ্টা এবং একটি চন্দন কাঠের দরজা এখানে রক্ষিত আছে। সম্রাট আকবর কোনও মানস করিয়া পদব্রজে আজমীরের দরগায় আসিয়াছিলেন। প্রতি রাত্রে যেখানে তাঁহার ডেরা পড়িত, সেইখানে একটি করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আজমীরের সন্নিকটে ২।৩টি স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে। সহরে একটি পুরাতন মুসলমানি কেল্লা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেল্লাটি সম্রাট আকবরের নির্ম্মিত। ইংরাজের আমলে কিছুদিনের জন্য এখানে arsenal (অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা) ছিল বলিয়া, ইহার নাম এক্ষণে ম্যাগেজিন! কেল্লাটি ভাঙিয়া চুরিয়া এখন রিজার্ব পুলিসের আড্ডা হইয়াছে। এই কেল্লার মধ্যে বাদশাহের প্রাসাদ আছে। এক্ষণে তাহা তহশিলদারের কাছারী হইয়াছে। ইহার নিকটেই নূতন হাঁসপাতাল। হাঁসপাতালটি পুরাতন ধরণে নির্ম্মিত। কার্নিস, গুম্বজ, বারান্দার খিলান প্রভৃতি আগ্রার লাল-পাথরে তৈয়ারী এবং নানারূপ কাজ করা,—রাস্তা হইতে বড় সুন্দর দেখায়। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালী এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়র ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আজমীর-রেলওয়ে-ষ্টেশনটি একেবারে সহরের মধ্যে; বাড়িটি দেখিতে মন্দ নয়, ষ্টেশনের নিকটেই নূতন ক্লক-টাওয়ার। ইহাও একটি দেখিবার জিনিশ। সাহেবদিগের বাংলাগুলি সহর হইতে কিছুদূরে। সেইখানেই কাছারী ও অন্যান্য সমুদয় অফিস। তাহার মধ্যে রেলওয়ে

অফিসটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। এই সাহেবী অঞ্চলে কায়শরবাগ বলিয়া একটি সাধারণের উদ্যান আছে। উদ্যানের মধ্যে সাহেবদিগের ক্লাব। এই বাগানের-লাগাও আর একটি সাধারণ বাগান আছে, তাহার নাম দৌলৎবাগ। দৌলৎবাগটি আয়না-সাগর নামক জলাশয়ের বাঁধের নীচে। আয়না-সাগরে জল সকল বৎসর থাকে না; অনাবৃষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে শুখাইয়া যায়। আয়না-সাগরের বাঁধের উপর কমিশনর সাহেবের বাড়ী। বাড়ীটি পুরাতন মোগল আমলের; তাহারই মধ্যে এদিক ওদিক পরিবর্ত্তন করিয়া হাল-ফেসানী করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই বাঁধের উপর শ্বেত-পাথরের বারদ্বারি pavilion আছে। বারটি দ্বার থাকার দরুণই বারদ্বারি কথাটি হইয়াছে। এই বাড়ী ও বারদ্বারি উভয়ই, সম্রাট শাজাহান নির্ম্মাণ করান। আয়না সাগরের ধারে পাহাড়ের উপর একটি নূতন বাড়ী আছে। আবু হইতে এজেণ্ট সাহেব যখন আজমীরে আইসেন, তখন তিনি এই বাড়ীতে থাকেন। আজমীরে এখন জলের কল হইয়াছে; ফয়সাগর নামক এক বৃহৎ জলাশয় হইতে জল আইসে। পূর্ব্বে অনেকে আয়না-সাগরের জল ব্যবহার করিত। মাদার-দরওয়াজার সম্মুখে মাদার-কুণ্ড নামক একটি কুণ্ডে, আয়না-সাগর হইতে নালি দিয়া জল আনিয়া, ভরিয়া রাখা হইত। উসারি-দরওয়াজার নিকট "দীঘি" বলিয়া আর একটি কুণ্ড আছে—সেটিতে স্বাভাবিক ঝরণা আছে। ইহার জলও ব্যবহার হইত। দুইটি কুণ্ডই কর্ণেল ডিক্সন সাহেব নির্ম্মাণ করান। ইহা ব্যতীত তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে আর একটি স্বাভাবিক ঝরণা আছে, তাহার জলও অনেকে ব্যবহার করিত। এখন সকলেই ফয়সাগরের জল ব্যবহার করে। আয়না-সাগরের জল কেবল কায়শরবাগ এবং দৌলৎবাগের ফুলের গাছে দেওয়া হয়। ফয়সাগর আজমীর হইতে তিন মাইল দূরে। আজমীর

বাঁধ দিয়া এই জলাশয় তৈয়ার হয় বলিয়া, তাঁহারই নামানুসারে ফয়সাগর নাম হইয়াছে। এই দুইটি জলাশয় ভিন্ন বিসলাতলাও বলিয়া আরো একটি জলাশয় রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে ছিল। এখন তাহার বাঁধ কাটিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেস্থলে এখন কপি প্রভৃতি সবজীর চাষ হয়। আজমীরে একটি গবর্ণমেণ্ট কলেজ আছে। কলেজে বি, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া হয়। ইহা ছাড়া মেয়ো কলেজ বলিয়া রাজপুত্র-দিগের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ আছে। এই কলেজের বাড়ীটি অতি সুন্দর, এবং ইহার চতুর্দ্দিকে জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজাদিগের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলি কলেজ কম্পাউণ্ডটিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল বাড়িতে ঐ সকল দেশের রাজপুত্রগণ কিম্বা তাঁহাদিগের সর্দ্দার-পুত্রগণ, কলেজে পাঠকালীন, বাস করিয়া থাকেন ; এ কলেজে কোনও ইউনিভার্সিটি-অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় না। কর্ণেল লক্ সাহেব এই কলেজের প্রিন্সিপাল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুচবিহারাধিপতির জ্যেষ্ঠ-পুত্র এখানকার ছাত্র ছিলেন। কলেজের নিকট মাদার বলিয়া একটি উচ্চ গড় আছে। ইহা তারাগড়ের সমান উচ্চ হইবে। আজমীরে একটি ভেটারিনারি স্কুল (পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয়) আছে এবং তাহার সংলগ্ন একটি পশু-চিকিৎসালয়ও আছে। নেটিব ষ্টেট হইতে মনোনীত হইয়া, অনেক ছাত্র এখানে পশুবিদ্যা শিখিতে আইসে।

আজমীরে একটি ডাকবাঙলা আছে। ডাকবাঙলাটি ষ্টেশনের খুব নিকটে। ইহা ছাড়া ষ্টেশনের উপরে কয়েকটি ঘর আছে, তাহাতে ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে, দৈনিক এক টাকা হিসাবে দিয়া থাকিতে পারেন। সাধারণের নিমিত্ত বড় বড় সরাইও আছে। আজমীরের অধি-বাসিবর্গের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। ইঁহাদিগের অনেকে তারাগড়ের নীচে, ত্রিপোলিয়া দরওয়াজার নিকট ইন্দ্রকোট নামক স্থানে বাস করেন। অজাপালের পুরাতন আজমীর সহর এই ইন্দ্রকোটেই

ছিল। আজমীরে অনেক ধনাঢ্য শেঠের বাস। শেঠ সমীরমল, শেঠ মুলচাঁদ প্রভৃতি শেঠদিগের রোকড়ের কারবার বেশ বিস্তৃত। ইঁহারা প্রাণি-হিংসা সহ্য করেন না; তজ্জন্য আজমীরের মিউনিসিপালিটি রাস্তার কুকুর মারিতে পান না; ফাঁস দিয়া ধরিয়া একটি জায়গায় জমা করেন এবং সুবিধামত সেখান হইতে লইয়া গিয়া দূরে দেহাতে ছাড়িয়া দেন। এক রেলওয়ে সপ্ ছাড়া আজমীরে কল-কারখানা বড় নাই। একটি সীসার খনি ছিল; কিন্তু আজমীরের আর্সিনাল উঠিয়া যাওয়ার পর খনির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খনিটি তারাগড়ের নীচে ইন্দ্রকোটে। আজমীর জেলে সুন্দর গালিচা ও দরী প্রস্তুত হয়।

আজমীর হইতে ৭ মাইল দূরে বিখ্যাত পুষ্কর-তীর্থ। বরাবর পাকা রাস্তা আছে। আজমীর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের ঘাটি পার হইতে হয়; অনেকটা উঠিতে হয় এবং নামিতে হয়। ঘাটিটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। তাহার পর সোজা রাস্তা,—উঠা-নামা নাই; কিন্তু পাহাড়ের ধার দিয়া যাইতে হয়। এই পাহাড়ের নাম নাগ পাহাড়। পুষ্কর তীর্থের প্রধান অঙ্গ পুষ্কর হ্রদ। পুষ্কর হ্রদের তিনদিক বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি বাঁধান ঘাট; ঘাটের উপর নানা দেব-দেবীর মন্দির এবং রাজন্যবর্গের সৌধশ্রেণী। তাঁহারা যখন তীর্থ করিতে আইসেন, তখন আপনাদিগের বাড়ীতে থাকেন। হ্রদ খুব গভীর এবং জল বারমাস থাকে। যখন অনাবৃষ্টির জন্য আজমীরের সমস্ত জলাশয় শুষ্ক, তখনও পুষ্কর-হ্রদে প্রচুর জল। পদ্মফুলের ঝাড়ে হ্রদ অনেকটা ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং কুমীরও অনেক আছে, তজ্জন্য মনের সুখে স্নান করা যায় না। হ্রদের দৃশ্যটি বড় মনোহর। উজ্জয়িনী সহরে শিপ্রা-নদী-তীরের ঘাট ও মন্দির গুলি দেখিয়া আমার অনেকটা পুষ্করের কথা মনে পড়িয়াছিল। পুষ্করে ব্রহ্মা এবং সাবিত্রীর মন্দিরই প্রধান। সাবিত্রীর মন্দিরটি একটি উচ্চ

বর্ণিত আছে ; এখানে তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। আজমীর হইতে পুষ্কর আসিবার পথে বুড়া-পুষ্কর বলিয়া আর একটি হ্রদ আছে। এ দুইটি হ্রদই স্বভাবোৎপন্ন। পুষ্কর একটি ছোট-খাট সহর। অধিবাসীদিগের মধ্যে পাণ্ডার সংখ্যাই অধিক। বাজার বেশ আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলার নাম পুষ্কর বা পোখর মেলা। মেলাটি তিনদিনকাল স্থায়ী। মেলায় ঘোড়া উট এবং বলদই বেশী আমদানী হয়। মারওয়ারের কষ্টসহিষ্ণু ঘোড়া এবং কাঠিবাড়ের বিখ্যাত দ্রুতগামী ঘোড়া বিস্তর বিক্রয় হয়। মেলার তিনদিন আজমীর হইতে পুষ্কর পর্য্যন্ত রাস্তাটি মানুষে, ঘোড়ায়, এক্কায় একেবারে পরিপূর্ণ থাকে। যে বালুকাময় প্রান্তরে মেলা বসে, সেই প্রান্তর হইতেই মাড়ওয়ারের মরুভূমি আরম্ভ।

নসীরাবাদ আজমীর হইতে ১৫ মাইল দূরে। আজমীর হইতে খাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত যে রেল গিয়াছে, সেই রেলপথে আজমীরের পরবর্ত্তী ষ্টেশনই নসীরাবাদ। নসীরাবাদ বিশেষ বড় সহর নহে, তবে ইহা একটি ক্যাণ্টনমেণ্ট। চতুর্দ্দিকে বড় বড় ব্যারাক এবং অফিসারদিগের বাঙ্‌লা। জেনারেল স্যার্ ডেভিড অক্‌টারলোনী এই ক্যাণ্টনমেণ্ট স্থাপিত করেন। অকটারলোনী, হুলকারের আক্রমণ হইতে দিল্লী রক্ষা করিয়া সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে নসীরুদ্দৌলা খেতাব পান। সেই নাম হইতেই সহরের নাম নসীরাবাদ হইয়াছে। নসীরাবাদে একটি ডাকবাঙ্‌লা আছে।

আজমীর হইতে আহমেদাবাদের দিকে যে রেল গিয়াছে, সেই রেলপথে ৩৪ মাইল দূরে বিয়াওর বা নয়াসহর। পূর্ব্বে বিয়াওর সামান্য একটি গ্রাম ছিল। কর্ণেল ডিক্সন সাহেব এই সহরের পত্তন করেন; নূতন স্থাপিত বলিয়াই নাম নয়াসহর। সহরের চতুর্দ্দিক দেয়াল দিয়া ঘেরা। চারিটি ফাটক আছে। রাস্তাগুলি খুব চওড়া এবং সোজা। তুলার কারবারে সহর এখন খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে। তুলা গাঁটবন্দি

করিবার কয়েকটি কল আছে এবং কাপড় বুনিবার কলও একটি আছে। এখানকার এশিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন একজন বাঙালী। ইনি কলিকাতা মেডিকাল কলেজের পাশ। এখানে প্রতি বৎসর জুলাইমাসে তেজাজীর মেলা বলিয়া একটি মেলা হয়। তেজাজী সাপের দেবতা; তেজাজীর নাম লইলে সর্পভয় থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিয়াওর, মেরওয়ারা জেলার হেড কোয়ার্টার্স। মেরওয়ারার একদিকে মারওয়ার রাজ্য এবং অন্যদিকে মেওয়ার রাজ্য। মেওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরের প্রাচীন দুর্গ মেরওয়ারার সীমা হইতে বেশী-দূর নয়। আমি একবার বেদনোর দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলাম; তাহা আমার চিরকাল মনে থাকিবে; দু এক জায়গায় এরূপ মনে হইয়াছিল যে, বুঝি আমার প্রিয় অশ্বটিকে চিরকালের জন্য রাখিয়া যাইতে হইল!

মেরওয়ারায় অনেক পুরাতন ধ্বংশোন্মুখ গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সকলগুলিই দুরারোহ পর্ব্বতের উপরে এবং পাথর দিয়া খুব দৃঢ়নির্ম্মিত। ইহা হইতে পূর্ব্বকার গ্রামবাসীদিগের পরস্পর-লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষণে সকলেই সমতলভূমিতে উর্ব্বর-ক্ষেত্রের নিকট গ্রাম স্থাপিত করিয়াছে। বিয়াওর হইতে টাডগড় পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। টাডগড় পাহাড়ের উপরে, এবং বিয়াওর অপেক্ষা এখানে শীতের পরিমাণ অনেকটা বেশী। বিয়াওরে একটি ডাকবাঙ্‌লা আছে। আজমীর-মেরওয়ারায় অনেক ধনী জমিদার বা ঠাকুর আছেন। তন্মধ্যে মসুদা এবং ভি নাই এর ঠাকুর প্রসিদ্ধ। এই জেলার সহিত সংলগ্ন কিষণগড় বলিয়া একটি ছোট নেটিব-ষ্টেট আছে। কিষণগড়, রেলপথে আজমীর হইতে ১৮ মাইল দূরে। কিষণগড়ের মহারাজা আপন রাজধানীতে একটি কাপড় বুনিবার কল খুলিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি মহাসমারোহে এক যজ্ঞও সমাপন করেন।

বিদেশে বাঙালী।

বড়দিদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়ও আর নাই, ব্রজলাল লাহিড়ীও স্বর্গে গিয়াছেন। সুরেন্দ্রের বিমাতা স্বর্গীয় স্বামীদত্ত সমস্ত সম্পত্তি, টাকাকড়ি লইয়া পিতৃ-ভবনে বাস করিতেছেন।

আজকাল সুরেন্দ্রনাথের যেমন সুখ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। একদল লোক কহে, এমন বন্ধুবৎসল উদারচেতা, অমায়িক, ইয়ার-প্রতিপালক জমিদার আর নাই! অন্যদল কহে, এমন উৎপীড়ক অত্যাচারী জমিদার এ তল্লাটে কখন জন্মায় নাই।

আমরা জানি, এ দুইটা কথাই সত্য। প্রথমটি সুরেন্দ্রনাথের জন্য সত্য, দ্বিতীয়টি তাঁহার ম্যানেজার মথুরানাথ বাবুর জন্য সত্য।

সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় আজকাল খুব একদল ইয়ার বসিতেছে; তাহারা পরমসুখে সংসারের সাধ মিটাইয়া লইতেছে। পান-তামাক, মদ-মাংস—কোন ভাবনা তাহাদিগকে করিতে হয় না। চাহিতেও হয় না—আপনি মুখে আসে।

ম্যানেজার মথুরবাবুর ইহাতে খুব উৎসাহ। খরচ যোগাইতে তিনি মুক্ত-হস্ত। কিন্তু এ জন্য জমিদারকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; তাঁহার শাসনগুণে প্রজারা সে ব্যয় বহন করে। মথুরবাবুর নিকট একটি পয়সা বাকি-বকেয়া থাকিবার যো নাই! ঘর জ্বালাইতে, ভিটাছাড়া করিতে, কাছারি-ঘরের ক্ষুদ্র কুঠুরিতে আবদ্ধ করিতে, তাঁহার সাহস এবং উৎসাহের সীমা নাই।

প্রজার আকুল ক্রন্দন মাঝে মাঝে শান্তি দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে। সে স্বামীকে অনুযোগ করিয়া কহে, "তুমি নিজে জমিদারী না দেখিলে সব যে জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়।" সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙে,—"তাইত, তাইত, এ সব কথা কি সত্য?"

"সত্য নয়? নিন্দায় যে দেশ ভ'রে গেল—তোমারই কানে কেবল এ সব পৌঁছায় না। চব্বিশ ঘণ্টা ইয়ার নিয়ে বসে থাকলে কি এ সব কথা কেউ শুনতে পায়? কাজ নেই অমন ম্যানেজারে—দূর করে তাড়িয়ে দাও।"

সুরেন্দ্র দুঃখিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া কহে, "তাইত,—কাল থেকে আমি নিজে সব দেখব।" তাহার পর কিছুদিন জমিদারী দেখিবার তাড়া পড়িয়া যায়। মথুরানাথ ব্যস্ত হইয়া উঠেন, গম্ভীরভাবে কখন কখন কহেন, "সুরেনবাবু, এমন করিলে কি জমিদারী রাখিতে পারিবে?"

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাসিয়া কহে, "দুঃখীর রক্ত শুষিয়া এমন জমিদারীতে কাজ কি মথুরবাবু!"

"তবে আমাকে বিদায় দাও—আমি চলে যাই।"

সুরেন্দ্র অমনি নরম হইয়া যায়। তাহার পর যাহা ছিল, তাহাই হয়। সুরেন্দ্রনাথ বৈঠকখানা হইতে আর বাহির হয় না।

সম্প্রতি আবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। বাগানবাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে নাকি এলোকেশী বলিয়া কে একটা মানুষ কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। নাচিতে-গাহিতে খুব মজবুত, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। ভগ্ন-মধুচক্র মৌমাছির মত বৈঠকখানা ছাড়িয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ইয়ারের দল সেই দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ রাখিবার স্থান নাই; সুরেন্দ্রনাথকেও তাহারা সেই দিকে

দিন, সে স্বামীকে পাইয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল, "এতদিন ছিলে কোথায় ?"

"বাগান-বাড়ীতে।"

"সেখানে কে আছে যে, তিনদিন ধরিয়া পড়িয়াছিলে ?"

"তাইত—"

"সব কথায় তাইত !—আমি সমস্ত শুনেচি।" বলিতে বলিতে শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল—"আমি কি দোষ করেচি যে, আমাকে পায়ে ঠেলেছ ?"

"কৈ—তাত আমি—"

"আবার কি ক'রে পায়ে ঠেল্‌তে হয় ? এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে ?"

"তাইত—তা ওরা সব—"। শান্তি যেন সে কথা শুনিতে পাইল না। আরো কাঁদিয়া কহিল, "তুমি স্বামী—আমার দেবতা! আমার ইহকাল! আমার পরকাল! আমি কি তোমাকে চিনিনে! আমি জানি, আমি তোমার কেউ নই, একদিনের জন্যও তোমার মন পাই না। এ যাতনা তোমাকে বলিব কি ? পাছে তুমি লজ্জা পাও, পাছে তোমার ক্লেশ হয়, তাই কোন কথা বলি না—"

"শান্তি, কেন কাঁদ ?"

"কেন কাঁদি? অন্তর্যামী জানেন। তাও বুঝিতে পারি যে তুমি অযত্ন কর না—তোমারো মনে ক্লেশ আছে—তুমি আর কি করিবে ?" তাহার পর চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানিতে পারি—"

সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া, স্বহস্তে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে কহিল—"তা হলে কি কর শান্তি ?"

এ কথার কি আর উত্তর আছে ? শান্তি ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে শান্তি কহিল,—"তোমার শরীরও আজ-কাল ভাল নেই।"

"আজ কেন, পাঁচবছর থেকে নেই। যে দিন কলিকাতায় গাড়ী চাপা পড়েছিলাম, বুকে-পিঠে আঘাত পেয়ে একমাস শয্যায় পড়েছিলাম, সেই অবধি শরীর ভাল নেই। সে ব্যথা কিছুতেই গেল না, মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য্য হই—কেমন করে বেঁচে আছি!"

শান্তি তাড়াতাড়ি স্বামীর বুকে হাত দিয়া বলিল, "চল, দেশ ছেড়ে আমরা কলিকাতায় যাই—সেখানে ভাল ডাক্তার আছে—"

সুরেন্দ্র সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, "তাই চল। সেখানে বড়দিদিও আছে।" শান্তি বলিল, "তোমার বড়দিদিকে আমারও বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে—তাঁকে আন্‌বেত?"

"আন্‌ব বই কি!" তাহার পর ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, "নিশ্চয় আস্‌বেন—আমি মরে যাচ্ছি শুন্‌লে—।" শান্তি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—"তোমার পায়ে পড়ি, আর ও সব বলো না।"

"আহা—তিনি যদি আসেন ত' আমার কোন দুঃখই থাকে না।"

অভিমানে শান্তির বুক পুরিয়া গেল। এইমাত্র সে কহিয়াছিল—স্বামীর সে কেহ নহে! সুরেন্দ্র কিন্তু অত বুঝিল না, অত দেখিল না। যাহা বলিতেছিল, তাহাতে বড় আনন্দ হয়,—কহিল, "তুমি নিজে গিয়ে বড়দিদিকে ডেকে এনো—কেমন?"

শান্তি মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিল।

"তিনি এলে দেখ্‌তে পাবে, আমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না—" শান্তির চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

পরদিন সে দাসীকে দিয়া মথুরবাবুকে সংবাদ প্রেরণ করিল, যে বাগনবাটীতে যাহাকে আনা হইয়াছে, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া না

শাসাইয়া বলিল, "আর যাই হোক, তুমি বাড়ীর বাহির হলে আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মর্‌ব।"

"তাইত—ওঁরা কিন্তু বড় রাগ—"

"আমি তার ব্যবস্থা কর্‌চি।" এই বলিয়া দাসীকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিয়া দিল, "দরোয়ানকে বলে দে, যেন ঐ হতভাগারা আমার বাড়ীতে না ঢুক্‌তে পায়।"

আর সুবিধা নাই দেখিয়া, মথুরবাবু এলোকেশীকে বিদায় করিয়া দিলেন; ইয়ারদলও ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি ছুটাইয়া জমিদারী দেখিতে মন দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথেরও সম্প্রতি কলিকাতায় যাওয়া হইল না। বুকের ব্যথাটা আপাততঃ কিছু কম বোধ হইতেছে। শান্তিরও কলিকাতা যাইতে তেমন উৎসাহ নাই—এখানে থাকিয়া যতখানি সম্ভব, সে স্বামি-সেবার আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে একজন বিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া দেখাইল। বিজ্ঞ চিকিৎসক সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—এবং বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বক্ষের অবস্থা যেমন আছে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই সঙ্গত নহে।

অবসর বুঝিয়া, ম্যানেজার বাবু যেরূপ কাজ দেখিতেছিলেন, তাহাতে গ্রামে গ্রামে দ্বিগুণ হাহাকার উঠিল। শান্তি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইত, কিন্তু স্বামীকে জানাইতে সাহস করিত না।

—০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বাটীতে ব্রজবাবুর স্থানে শিবচন্দ্র এখন কর্ত্তা। মাধবীর

শিবচন্দ্র স্নেহ যত্ন করে, কিন্তু তাহার এখানে থাকিতে আর মন নাই। বাড়ীর দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা এখনো "বড়দিদি" বলে, কিন্তু সবাই বুঝে যে, আর একজনের হাতে এখন সিন্দুকের চাবি পড়িয়াছে। তাই বলিয়া শিবচন্দ্রের স্ত্রী যে মাধবীকে অবজ্ঞা বা অমর্য্যাদা করে তাহা নহে, কিন্তু সে এমন ভাবটি দেখাইয়া যায়, যাহাতে মাধবী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই নূতন স্ত্রীলোকটির অনুমতি-পরামর্শ ব্যতীত সব কাজ করা তাহার শোভা পায় না—মানায়ও না!

তখন বাপের আমল ছিল, এখন ভাইয়ের আমল হইয়াছে। কাজেই একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে। আগে আদর ছিল, আব্দার ছিল, এখন আদর আছে, কিন্তু আবদার নাই। বাপের আদরে সে সর্ব্বময়ী ছিল, এখন "আত্মীয়-কুটুম্বের" দলে পড়িয়াছে।

এখন যদি কেহ বলেন যে, আমি শিবচন্দ্র কিম্বা তাহার স্ত্রীর দোষ দিতেছি, সোজা করিয়া না বলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিন্দা করিতেছি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। সংসারে যাহা চির-প্রসিদ্ধ নিয়ম, যে রীতি-নীতি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিয়াছি মাত্র! মাধবীর যেন কপাল পুড়িয়াছে, তাহার আপনার বলিবার স্থান নাই, তাই বলিয়া অপরে নিজের দখল ছাড়িবে কেন? স্বামীর দ্রব্যে স্ত্রীর অধিকার, এ কথা কে না জানে? শিবচন্দ্রের স্ত্রী কি শুধু এ কথা বুঝে না? শিবচন্দ্র মাধবীর ভ্রাতা, কিন্তু সে মাধবীর কে? পরের জন্য সে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে না, ইহা নিশ্চয়। মাধবী সব বুঝিতে পারে। বউ যখন ছোট ছিল, যখন ব্রজবাবু বাঁচিয়া ছিলেন, তখন মাধবীর নিকট প্রমীলাতে ও তাহাতে প্রভেদ ছিল না। এখন কথার অনৈক্য হয়। সে চিরদিন অভিমানিনী, তাই সে সকলের নীচে। কথা সহিবার ক্ষমতা নাই, তাই সে কথা কহে

তাহার মাথা কাটা যায় ! মনে দুঃখ পাইলে নীরবে সহিয়া যায়,—শিবচন্দ্রকে কিছুই বলে না। স্নেহের দোহাই দেওয়া তাহার অভ্যাসের বাহিরে, তাই আত্মীয়তার ধুয়া ধরিয়া অধিকার কায়েম করিতে, তাহার সমস্ত শরীরে-মনে ধিক্কার উঠে। সামান্য স্ত্রীলোকের মত ঝগড়া-কলহে তাহার যে কত ঘৃণা, তাহা শুধু সে-ই জানে !

একদিন সে শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল—"দাদা, আমি শ্বশুর-বাড়ী যাব।" শিবচন্দ্র বিস্মিত হইল। "সে কি মাধবী, সেখানে ত কেউ নেই !" মাধবী মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ছোট ভাগ্নে কাশীতে ঠাকুরঝির কাছে আছে,—তাকে নিয়ে আমি গোলাগাঁয় বেশ থাক্‌ব।" পাবনা জেলার গোলাগাঁয়ে মাধবীর শ্বশুর-বাড়ী। শিবচন্দ্র অল্প হাসিয়া বলিল, "তা কি হয়, সেখানে যে তোর বড় কষ্ট হবে !" "কেন কষ্ট হবে দাদা ? বাড়ীটা এখনো পড়ে যায় নি। দুবিঘা, দশবিঘা জমিজরাতও আছে, একটি বিধবার কি তা'তে চলে না ?" "চলার কথা নয়। টাকার ভাবনা নেই, কিন্তু তোর যে বড় কষ্ট হবে মাধবী !" "কষ্ট কিছুই নয়।"

শিবচন্দ্র কিছু ভাবিয়া বলিল "কেন যাবি বোন্ ? আমাকে সব খুলে বল্ দেখি, আমি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।" ইতিপূর্ব্বে শিবচন্দ্র, বোধ হয়, স্ত্রীর নিকট ভগিনীর বিরুদ্ধে কিছু শুনিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ তাহাই মনে হইয়াছিল। মাধবীর কিন্তু সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—বলিল, "দাদা তুমি কি মনে কর, আমি ঝগড়া করে তোমার বাড়ী থেকে যাব ?" শিবচন্দ্র বড় লজ্জিত হইল। তাড়াতাড়ি কহিয়া ফেলিল, "না, না—তা' নয় ; আমি ও কথা বলিনে, কিন্তু এ বাড়ী চিরদিন তোমার, আজ কেন তবে চলে যেতে চাও ?" যুগপৎ দুইজনেরই সেই স্নেহময় পিতার কথা মনে পড়িল। দুজনের চক্ষেই জল দেখা দিল। চোখ মুছিয়া মাধবী বলিল—"আবার আস্‌ব। তোমার ছেলের যখন পৈতা হবে, তখন নিয়ে এস। এখন যাই—"

"সে-ত আট দশ বছরের কথা—"

"যদি বেঁচে থাকি তা'হলে আস্‌ব।"

কোনরূপেই মাধবী এখানে থাকিতে সম্মত হইল না, যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নূতন বৌকে সংসারের চার্জ্জ বুঝাইয়া দিল, দাস-দাসীকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। শেষ দিনটিতে শিবচন্দ্র অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষে ভগিনীর কাছে আসিয়া বলিল, "মাধবী, তোর দাদা কখনোত তোকে কিছু বলে ফেলেনি?"

মাধবী হাসিল—"সে কি কথা দাদা!"

"তা নয়; যদি কোন অশুভক্ষণে, যদি কোন দিন মুখ থেকে অসাবধানে কিছু—" "না দাদা—সে সব কিছু নয়।"

"সত্যি কথা?"

"সত্যি।"

"তবে যা'। তোর নিজের বাড়ী যেতে আর মানা কর্‌ব না—যেখানে ভাল লাগে—। তবে সর্ব্বদা সংবাদ দিতে ভুলিসনি!"

প্রথমে মাধবী কাশী গিয়া ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইল—তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া গোলাগাঁয়ে আসিয়া, এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিল!

তখন গোলাগাঁয়ে চাটুয্যে মহাশয়ের বড় বিপদ ঘটিল। তিনি এবং যোগেন্দ্রের পিতা বড় বন্ধু ছিলেন; মৃত্যুকালে তিনি যোগেন্দ্র ও কয়বিঘা জমি জায়দাদ, তাঁহারই হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের জীবিত-কালে, তিনি সে সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতেন, যোগেন্দ্র সে সকলের কোন সংবাদও লইত না। শ্বশুর মহাশয়ের অনেক টাকা, তাই এই ক্ষুদ্র পিতৃ-দত্ত বিষয়টুকু তাহার যত্নের বাহিরে ছিল। তাহার পর সে মরিবার পর, চাটুয্যে মহাশয় অতিশয় ন্যায্য অধিকারে, বিনা বাধায় সে সকল

আসিয়া তাঁহার সুশৃঙ্খল নিয়মবদ্ধ পাতা-সংসারে গোলমাল বাধাইয়া দিল। এটা চাটুয্যে মহাশয়ের পক্ষে অবিচার করা হইয়াছে, এবং সে যে হিংসা করিয়াই এমনটি করিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, "তাইত বউমা, তোমার দুবিঘা যে জমি আছে, তার দশবৎসরের খাজনা মায় সুদশুদ্ধ একশত টাকা বাকি আছে, সেটা না দিলে জমি নিলাম হইবার মত হইয়াছে।" মাধবী, ভাগিনেয় সন্তোষকুমারকে দিয়া বলাইল যে, টাকার জন্য চিন্তা নাই, এবং অবিলম্বে একশত টাকা বাহিরে পাঠাইয়া দিল। অবশ্য, এ টাকা চাটুয্যে মহাশয়ের বাক্সে স্থান পাইল।

মাধবী কিন্তু অত সহজে ছাড়িবার লোক নহে—সে সন্তোষকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, শুধু দুইবিঘা জমির উপর নির্ভর করিয়া তাহার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত না, সুতরাং বাকী যে সব জমি জায়গা আছে তাহা কোথায়, এবং কাহার নিকট আছে!

চাটুয্যে মহাশয় নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিলেন যে, "যাহা কিছু ছিল তাহা সমস্তই বিক্রি হইয়া গিয়াছে, কিছু বা বন্দোবস্তে আছে। এই আট দশ বছর ধরিয়া জমিদারের খাজনা না দিলে জমি-জায়গা কিরূপে থাকা সম্ভব?"

মাধবী কহিল, "জমির কিছু কি উপস্বত্ব হইত না যে, এই কটা টাকা খাজনা দেওয়া হয় নাই? আর যদি যথার্থই বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কে বিক্রয় করিয়াছে, এবং এখন কাহার নিকট আছে, সংবাদ পাইলে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা যায়। কাগজপত্রই বা কোথায়?" চাটুয্যে মহাশয় অবশ্য কিছু জবাব দিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবী তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ বিড় বিড় করিয়া কত কি বকিলেন, তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া, নামাবলি কোমরে জড়াইয়া, একখানা থান

মুখে রওনা হইলেন। এই লালতা গ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাটি এবং ম্যানেজার মথুরবাবুর কাছারী। ব্রাহ্মণ আট দশক্রোশ বরাবর হাঁটিয়া একেবারে মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন,—"দোহাই বাবা, গরীব ব্রাহ্মণকে বুঝি পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়।"

এমন ত অনেক আইসে। মথুরবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হয়েছে কি ?"

"বাবা, রক্ষে কর।"

"কি হয়েছে তোমার ?"

বিধু চাটুয্যে তখন মাধবী-দত্ত একশত টাকা দক্ষিণা হাতে গুঁজিয়া বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মাবতার, আপনি না রক্ষা করিলে, আমার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে।"

"আচ্ছা, খুলিয়া বল।"

"গোলাগাঁয়ে রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূ, কোথা থেকে এত দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার সমস্ত দখল করিতে চায়।"

মথুরবাবু হাসিলেন, "সে তোমার সমস্ত দখল করিতে চায়, না, তুমি তার সর্ব্বস্ব দখল করিতে চাও,—কোন্‌টা ?"

ব্রাহ্মণ তখন হাতে পৈতা জড়াইয়া ম্যানেজারের হাত চাপিয়া ধরিলেন, "আমি যে এই দশ বছর হইতে সরকারে খাজনা জোগাইয়া আসিতেছি!"

"জমি ভোগ করিতেছ, খাজনা দিবে না ?"

"দোহাই আপনার—"

ভাবটা মথুরবাবু বেশ বুঝিলেন।—"বিধবাকে ফাঁকি দিতে চাও ত?"

ব্রাহ্মণ চাহিয়া রহিল।

"কয়বিঘা জমি ?"

"পঁচিশ বিঘা।" মথুরানাথ হিসাব করিয়া বলিলেন, "অন্ততঃ তিন হাজার টাকা। জমিদারী-কাছারীতে কত সেলামি দিবে ?"

"যাহা হুকুম হইবে তাই,—তিনশ টাকা ।"

"তিনশ টাকা দিয়া তিন হাজার টাকা লইবে ? আমা-দ্বারা কিছু হইবে না ।"

ব্রাহ্মণ শুষ্ক-চক্ষে জল বাহির করিয়া বলিল,—"কত টাকা হুকুম হয় ?"

"এক হাজার দিতে পারিবে ?"

তাহার পর গোপনে বহুক্ষণ ধরিয়া দুজনে পরামর্শ হইল ; ফল এই দাঁড়াইল যে, যোগেন্দ্রনাথের বিধবার প্রতি বাকী খাজনা-বাবদ, দশ বৎসরে সুদে আসলে দেড়সহস্র টাকার নালিশ হইল। শমন বাহির হইল, কিন্তু মাধবীর নিকট তাহা পৌঁছিল না। তাহার পর একতরফা ডিক্রি হইয়া গেল এবং দেড়মাস পরে মাধবী সম্বাদ পাইল যে, বাকী-খাজনার দায়ে জমিদার-সরকার হইতে তাহার মায় বাটীশুদ্ধ নিলামের ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে।

মাধবী একজন প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া কহিল, "তোমাদের দেশ কি মগের মুল্লুক ?"

"কেন বল দেখি ?"

"তা' নয়ত কি ? একজন ঠকিয়ে আমার সর্ব্বস্ব লইতে চায়, তোমরা দেখিতেছ না ?" সে বলিল, "আমরা আর কি করিব ? জমিদার যদি নিলাম করে, আমরা দুঃখী লোক তাতে কি করিতে পারি ?"

"তা' যেন হইল, কিন্তু আমার বাটী নিলাম হইবে, আর আমাকে সংবাদ নাই ? কেমন তোমাদের জমিদার ?"

সে তখন বিবৃত কাহিনী বলিতে লাগিল,—এমন উৎপীড়ক জমিদার, এমন অত্যাচার, এ দেশে কেহ কখন পূর্ব্বে দেখে নাই। সে আরও কত কি কহিল, এ যাবৎ যাহা কিছু লোকপরম্পরায় অবগত ছিল, সমস্ত একে একে খুলিয়া বলিলে, মাধবী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জমিদার বাবুর সহিত নিজে দেখা করিলে হয় না ?" ভাগিনেয় সন্তোষ-

কুমারের জন্য মাধবী তাহাও করিতে স্বীকৃত ছিল। সে তখন কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু কথা দিয়া গেল-যে, কা'ল তাহার বোনপোর নিকট সব কথা ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়া বলিবে। তাহার বোনপো দুই তিনবার লালতা-গ্রামে গিয়াছিল। জমিদার-সরকারের অনেক কথা সে জানিত। এমন কি, সে দিন সে বাগান-বাড়ীতে এলোকেশীর সম্বাদ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর মাসিমাতা যখন জমিদার বাবুর সহিত রামতনু বাবুর বিধবা পুত্রবধূর দেখা করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল, তখন সে মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া বলিল—"এই বিধবা পুত্রবধূটীর বয়স কত ?"

মাসিমাতা বলিল—"তা, কুড়ি-একুশ হইবে।" সে মাথা নাড়িয়া বলিল—"দেখিতে কেমন ?"

মাসিমাতা কহিল—"পরীর মত।"

তখন সে মুখভঙ্গি-সহকারে কহিল—"দেখা করিলে কাজ হইতে পারে ; কিন্তু আমি বলি, তিনি আজ রাত্রেই নৌকা ভাড়া করিয়া বাপের বাড়ী প্রস্থান করুন।"

"কেন রে ?"

"এই যে বলিতেছ—সে দেখিতে পরীর মত।"

"কেন তা'তে কি ?"

"তা'তেই সব। দেখিতে পরীর মত হইলে জমিদার সুরেন রায়ের কাছে রক্ষা নাই।"

মাসিমাতা গালে হাত দিলেন,—"বলিস্ কি, এমন !"

বোনপো মৃদু হাসিয়া—"হাঁ এমন—দেশশুদ্ধ লোক এ কথা জানে।"

"তবে ত দেখা করা উচিত নয় ?"

"কিছুতে নয়।"

"চাটুয্যে মহাশয় যখন এর ভিত

নাই ; তার উপর গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে

পরদিন তিনি মাধবীকে

হইয়া গেল। জমিদার সুরেন রা

মাধবী ভাবিল, সুরেন রায় ! নাম ... ন্তু লোক

সহিত মিলিতেছে না ! এ নাম সে কত ... ছে। আজ

পাঁচ বৎসর হইল ! ভুলিয়াছিল,—আবার ... ড়িয়াছে !

স্বপ্নে ও নিদ্রায় মাধবীর সে রাত্রি ব ... নেকবার

পুরাণো কথাগুলা মনে পড়িতেছিল, ... আসিয়া

পড়িতেছিল। সন্তোষকুমার তাহার মুখপানে চা ... কহিল, "মামীমা, আমি মা'র কাছে যাব।" মাধবী নিজেও ক ... এ কথা ভাবিয়াছিল—কেননা এখানকার বাস যখন উঠিয়াছে, তখ কাশীবাস ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সন্তোষের জন্য, সে জমিদারের সহিত দেখা করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় না। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিষেধ করিতেছে। তা' ছাড়া এখন যেখানেই সে যাউক্, একটা নূতন ভাবনা, একটা নূতন উপসর্গ হইয়াছে। সেটা এই রূপ-যৌবনের কথা ! মাধবী মনে করিল, পোড়া কপাল ! এ উৎপাতগুলা কি এখনো এ দেহটায় লাগিয়া আছে ! আজ সাত বৎসর হইল, এগুলা তাহার মনে পড়ে নাই, মনে করিয়া দিতে কেহ ছিল না। স্বামী মরিবার পর যখন বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন সকলে ডাকিল, "বড়দিদি", সবাই ডাকিল, 'মা' ! এই সম্মানের ডাকগুলি তাহার মনকে আরও বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছিল ! ছাই রূপ-যৌবন ! যেখানে তাহাকে বড়দিদির কাজ করিতে হইত, জননীর স্নেহ-যত্ন বিলাইতে হইত, সেখানে কি এ সব কথা মনে থাকে ? মনে ছিল না, মনে পড়িয়াছে,—তাই ভাবনাও হইয়াছে !

রে' উল্লেখটা! লজ্জায় মলিন হাসি
ার লোকগুলা কি অন্ধ, না পশু!"
ই মন তাহার মত একুশ বাইশ

জমিদারের পিয়াদা তাহার দ্বারপথে
ডাক করিয়া গ্রামবাসীকে জানাইতে
একটা নূতন কীর্ত্তি করিয়াছে, তখন মাধবী
অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া নৌকায় উঠিয়া

, মাঝিকে কহিয়া দিল—'সোমরাপুরে যাইতে
ার প্রমীলাকে দেখিয়া যাইতে হইবে!
হইতে পনর ক্রোশ দূরে সোমরাপুরে প্রমীলার বিবাহ
আজ এক বৎসর হইতে সে শ্বশুর-ঘর করিতেছে।
কলিকাতায় আবার যাইবে,—কিন্তু মাধবী তখন কোথায়
ই একবার দেখা করা!

বেলা সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল! স্রোতের নৌকা ভাসিয়া চলিল; বাতাস অনুকূল ছিল না, তাই ধীর-মন্থর গমনে ক্ষুদ্র নৌকা বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া, শিয়াকুল ও বেতঝোপের কাঁটা বাঁচাইয়া, শরঝাড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিল। সন্তোষকুমারের আনন্দ ধরে না! সে ছইয়ের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা ও ডগা ছিঁড়িবার জন্য অতিশয় উৎসাহের সহিত বাহিরে নদীতীরে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রাখিল। মাঝিরা কহিল, "বাতাস না থামিলে কাল দুপুর পর্য্যন্ত, নৌকা সোমরাপুরে লাগিবে না।"

আজ মাধবীর একাদশী; কিন্তু সন্তোষকুমারের জন্য কোথাও পান্সি বাঁধিয়া, পাক করিয়া, তাহাকে খাওয়াইতে হইবে। মাঝি কহিল,

"দিস্তেপাড়ার গঞ্জে নৌকা বাঁধিলে বেশ সুবিধা হইবে,—সেখানে সব জিনিষ পাওয়া যায়।"

দাসী কহিল—"তাই কোরো বাপু, যেন দশটা এগারটার মধ্যে ছেলেটা খেতে পায়।"

—o—

নবম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস যায় যায়। একটু শীত পড়িয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উপরের ঘরে জানালার ভিতর দিয়া প্রাতঃসূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া বড় মধুর বোধ হইতেছে। জানালার কাছে অনেকগুলি বাঁধা খাতা ও কাগজপত্র লইয়া টেবিলের এক পাশে সুরেন্দ্রনাথ বসিয়াছিলেন। আদায়-উসুল, বাকী-বকেয়া, জমা-খরচ, বন্দোবস্ত, মাম্‌লা-মোকদ্দমার নথী-পত্র সব একে একে উল্‌টাইয়া দেখিতেছিলেন। এ সব দেখা শুনা এক রকম আবশ্যকও হইয়া পড়িয়াছিল, এবং না হইলে সময়ও কাটে না। শান্তির সহিত এজন্য অনেকখানি ঝগড়া করিতে হইয়াছিল। অনেক করিয়া তবে তাহাকে বুঝাইতে পারিয়াছিল যে, অক্ষরের পানে চাহিলেই মানুষের বুকের ব্যথা বাড়িয়া যায় না, কিম্বা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। অগত্যা শান্তি স্বীকার করিয়াছে এবং আবশ্যক মত সাহায্যও করিতেছে।

আজকাল স্বামীর উপর তাহার পুরা অধিকার—তাহার একটি কথাও অমান্য হয় না। কোন দিনই হয় নাই, শুধু পাঁচজন হতভাগা ইয়ার বন্ধু মিলিয়া শান্তিকে দিন কতক বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স্ত্রীর আদেশে সুরেন্দ্রের বাহির-বাটিতে পর্য্যন্ত যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শ ও উপদেশটা শান্তি প্রাণপণে খাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছে।

এইমাত্র সে কাছে বসিয়া রাঙা ফিতা দিয়া কাগজের বাণ্ডিল বাঁধিতে ছিল। সুরেন্দ্রনাথ একখানা কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সহসা ডাকিলেন, "শান্তি!"

শান্তি কোথায় গিয়াছিল—কিছুক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি! ডাক্‌ছিলে?"

"হাঁ, আমি একবার কাছারি ঘরে যাব।"

"না। কি চাই বল, আমি আনাইয়া দিতেছি।"

"কিছু চাই না, একবার মথুরবাবুর সহিত দেখা করিব।"

"তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাই,—তোমাকে যেতে হবে না। কিন্তু এমন সময় তাঁকে কেন?"

"বলিয়া দিব যে, অগ্রহায়ণ মাস হইতে তাঁহাকে আর কাজ করিতে হইবে না।"

শান্তি বিস্মিত হইল; কিন্তু সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁর অপরাধ?"

"অপরাধ যে কি, তাহা এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না,—কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন।" তাহার পর আদালতের সার্টিফিকেট ও কয়েক খানা কাগজ-পত্র দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখ গোলাগাঁয়ে এক জন বিধবার ঘরবাড়ী সমস্ত বেনামি নিলাম খরিদ করিয়া লইয়াছে আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করে নাই।"

শান্তি দুঃখিত হইয়া কহিল, "আহা, বিধবা! তবে এ কাজটা ভাল হয় নাই—কিন্তু বিক্রি হল কেন?"

"দশ বৎসরের খাজনা বাকি ছিল। সুদে আসলে দেড় হাজার টাকার নালিশ হইয়াছিল।"

টাকার কথা শুনিয়া শান্তি মথুরনাথের প্রতি একটু নরম হইয়া পড়িল। মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা ম্যানেজার-বাবুর বা দোষ কি?

অত টাকা কেমন করিয়া ছাড়িয়া দেন!" সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "হুঁ—আমি পারি।"

"অত টাকা ছাড়িয়া দিবে?"

"দিব না ত কি, অসহায় বিধবাকে বাড়ীছাড়া করিব—? তুমি কি পরামর্শ দাও?"

কথাটার ভিতর যতটুকু জ্বালা ছিল সবটুকু শান্তির গায়ে লাগিল। অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতভাবে সে বলিল,—"না বাড়ীছাড়া করিতে বলি না। আর তোমার টাকা তুমি দান করিবে আমি তাতে বাধা দিব কেন?" সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন—"সে কথা নয় শান্তি,—আমার টাকা কি তোমার নয়? কিন্তু বল দেখি, আমি যখন না থাকিব, তখন তুমি—"

"ও কি কথা"—

"তুমি—আমি যা ভালবাসি তা' করিবে ত?"

শান্তির চোখে জল আসিল, কেননা স্বামীর শারীরিক অবস্থা ভাল নহে; বলিল—"ও কথা কেন বল?"

"বড় ভাল লাগে তাই বলি; তুমি, আমার কথা, আমার সাধ-ইচ্ছা জানিয়া রাখিবে না শান্তি?"

শান্তি চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাথা নাড়িল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র পুনরায় কহিলেন—"আমার বড়দিদির নাম।"

শান্তি অঞ্চল সরাইয়া মুখপানে চাহিল।

একখানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন—"এই দেখ আমার বড়দিদির নাম।"

"কোথায়?"

"এই দেখ, মাধবী দেবী—যাহার বাড়ী নিলাম হইয়াছে।"

একমুহূর্ত্তে শান্তি অনেক কথা বুঝিল। কহিল,—"তাই বুঝি সমস্ত ফিরিয়ে দিতে চাইছ?"

সুরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তাই বলিয়া নিশ্চয় ফিরাইয়া দিব—সমস্ত—সব!"

মাধবীর কথার শান্তি একটু দুঃখিত হইয়া পড়িত; ভিতরে বোধ হয়, একটু হিংসার ভাব ছিল।

কহিল, "তিনি হয়ত তোমার বড়দিদি নন! শুধু মাধবী নাম আছে। নামেতেই এই————

"বড়দিদির নামের একটু সম্মান করিব না?"

"তা কর, কিন্তু তিনি নিজে কিছু জানিতে পারিবেন না————"

"তা পারিবেন না—কিন্তু আমি কি অসম্মান করিতে পারি?"

"নাম ত এমন কত লোকের আছে!"

"তুমি দুর্গা নাম লিখিয়া তাহাতে পা' দিতে পার?"

"ছি! ওকি কথা? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে————"

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা ঠাকুর-দেবতার নাম না'ই নিলাম, কিন্তু তোমাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, যদি একটি কাজ করিতে পার?"

শান্তি উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—"কি কাজ?"

দেওয়ালের গায়ে সুরেন্দ্রনাথের একটা প্রতিকৃতি ছিল, সেই দিকে দেখাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এই ছবিটা যদি—"

"হুঁ————"

"চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াইতে পার————"

অদূরে বজ্রাঘাত হইলে লোকের যেমন প্রথমে সমস্ত রক্ত নিমেষে সরিয়া যায়, মুখখানা সর্পদষ্ট রোগীর মত নীলবর্ণ হইয়া থাকে—শান্তির প্রথমে সেইরূপ অবস্থা হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে মুখে চোখে রক্ত ফিরিয়া আসিল—তাহার পর করুণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। পুরোহিত ডাকাইয়া রীতিমত শান্তি

স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া, রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব মানত করিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, এই বড়দিদি যিনিই হউন, ইহার সম্বন্ধে সে আর কোন কথা কহিবে না। তাহার পরে ঘরে দ্বার দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুমোচন করিল। এ জীবনে এমন কটূ কথা সে আর কখনো শোনে নাই!

সুরেন্দ্রনাথও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন। কাছারি ঘরে মথুরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলাগাঁয়ে কাহার বিষয়-সম্পত্তি নিলাম হইয়াছে ?"

"মৃত রামতনু সান্যালের বিধবা পুত্রবধূর———"

"কেন ?"

"দশ বৎসরের মাল-গুজারি বাকি ছিল——"

"কই খাতা দেখি———"

মথুরানাথ প্রথমে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল; তাহার পর কহিল—"খাতা-পত্র এখনও পাবনা হইতে আনা হয় নাই।"

"আনাইতে লোক পাঠাও। বিধবার থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত রাখ নাই ?"

"বোধ হয় নাই।"

"তবে সে কোথায় থাকিবে ?"

মথুরানাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—"এতদিন যেখানে ছিল সেইখানে থাকিবে, বোধ হয়।"

"এতদিন কোথায় ছিল ?"

"কলিকাতায়। তাহার পিতার বাটিতে।"

"পিতার নাম কি, জান ?"

"জানি। ব্রজরাজ লাহিড়ি।"

"বিধবার নাম ?"

"মাধবী দেবী"

নতমুখে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। মথুরানাথ ভাব-গতিক দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইল ?" সুরেন্দ্রনাথ সে কথার উত্তর না দিয়া, একজন চাপরাশিকে ডাকিয়া কহিলেন—"একটা ভাল ঘোড়ায় শীঘ্র জিন কষিতে বল—আমি এখনি গোলাগাঁয়ে যাইব। এখান হইতে গোলাগাঁ কতদূর, জান ?"

"প্রায় দশ-ক্রোশ"

"এখন নয়টা বাজিয়াছে—একটার মধ্যে পৌঁছিতে পারিব ?"

ঘোড়া আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিয়া বলিলেন,—"কোন্ দিকে ?"

"উত্তর দিকে, পরে পশ্চিমে যাইতে হইবে।"

তাহার পর চাবুক খাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ কথা শুনিয়া শান্তি ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়িয়া রক্ত বাহির করিল,—"ঠাকুর এই তোমার মনে ছিল! আর কি ফিরে পাব ?"

তাহার পর দুইজন পাইক ঘোড়ায় চড়িয়া গোলাগাঁ উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। জানলা দিয়া তাহা দেখিয়া শান্তি ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। "মা দুর্গা! ঘোড়া মহিষ দিব—যা' চাও তাই দিব—তাঁকে ফিরাইয়া দাও—বুক চিরিয়া রক্ত দিব—যত চাও—হে মা দুর্গা, যত চাও—যতক্ষণে তোমার পিপাসা না মিটে!"

গোলাগাঁ পৌঁছিতে আর দুই ক্রোশ আছে! অশ্বের ক্ষুর পর্য্যন্ত ফেনায় ভরিয়া গিয়াছে! প্রাণপণে ধূলা উড়াইয়া, আল ডিঙাইয়া, খানা টপকাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য!

ঘোড়ার উপর থাকিয়াই গা-বমি-বমি করিয়া উঠিল—ভিতরের প্রত্যেক নাড়ি যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবে! তাহার পর টপ্ করিয়া

সুরেন্দ্রনাথ হাত দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটার পূর্ব্বেই গোলা-গাঁয়ে উপস্থিত হইলেন। পথের ধারে দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই গোলা-গাঁ ?

"হাঁ।"

"রামতনু সান্যালের বাটি কোথায় ?"

"ঐ দিকে——"

আবার ঘোড়া ছুটিল। অল্পক্ষণে বাঞ্ছিত বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারেই একজন সিপাহী বসিয়াছিল—প্রভুকে দেখিয়া প্রণাম করিল।

"বাটীতে কে আছেন ?

"কেউ না।"

"কেউ না ? কোথায় গেলেন ?

"প্রাতঃকালে নৌকা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

"কোথায়—কোন্ পথে ?

"দক্ষিণ দিকে——"

"নদীর ধারে-ধারে পথ আছে ? ঘোড়া দৌড়িতে পারিবে ?"

"বলিতে পারি না। বোধ হয়, নাই।"

পুনর্ব্বার ঘোড়া ছুটিয়া চলিল। ক্রোশ-দুই আসিয়া আর পথ নাই—ঘোড়া চলে না! ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথ পদব্রজে চলিলেন। একবার চাহিয়া দেখিলেন—জামার উপর অনেক ফোঁটা রক্ত ধূলায় জমিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠ বাহিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে। নদীতে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন—তার পর প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে আর জুতা নাই—সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মাঝে মাঝে শোণিতের দাগ; বুকের উপর কে যেন রক্ত ছিটাইয়া দিয়াছে!

বেলা পড়িয়া আসিল; পা আর চলে না—যেন এইবার শুইতে

পারিলেই জন্মের মত ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই যেন অনন্ত-শয্যার পার্শ্বে এই জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায় সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দেহে যতটুকু শক্তি আছে, সমস্ত অকাতরে ব্যয় করিয়া শয্যা আশ্রয় করিবে, আর উঠিবে না!

নদীর বাঁকের পাশে,—একখানা নৌকা না! কল্‌মী-শাকের দল কাটিয়া পথ করিতেছে! সুরেন্দ্র ডাকিল, "বড়দিদি!" শুষ্ককণ্ঠে শব্দ বাহির হইল না—শুধু দুই ফোঁটা রক্ত বাহির হইল!

"বড়দিদি"—আবার দুই ফোঁটা রক্ত!

কল্‌মীর দল নৌকার গতি রোধ করিতেছে। সুরেন্দ্র কাছে আসিয়া পড়িল।

আবার ডাকিল—"বড়দিদি।"

সমস্ত দিন উপবাস ও মনোকষ্টে মাধবী নির্জ্জীবের মত নিদ্রিত সন্তোষকুমারের পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিল। সহসা কানে শব্দ পৌঁছিল; পুরাতন পরিচিত স্বরে—কে ডাকে না!

মাধবী উঠিয়া বসিল। ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। সর্ব্বাঙ্গে ধূলা-কাদা-মাখা—মাষ্টারমহাশয় না?

"ও নয়নতারার মা, মাঝিকে শীগ্‌গির নৌকা লাগাতে বল্—"

সুরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে কাদার উপর শুইয়া পড়িতেছিল।

সকলে মিলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিয়া আনিল। মুখে চোখে জল দিল। একজন মাঝি চিনিত, সে কহিল, "লাল্‌তা-গাঁয়ের জমিদার।" মাধবী ইষ্ট-কবচ শুদ্ধ স্বর্ণহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "লাল্‌তাগাঁয়ে এই রাত্রে পৌঁছা-ইতে পার? সবাইকে এক একটা হার দিব।"

সোণার হার দেখিয়া তাহাদের মধ্যে তিনজন গুণ ঘাড়ে লইয়া নামিয়া পড়িল।

"মা ঠাকরুণ—চাঁদনি রাত—ভোর-নাগাদ পৌঁছে দিব।"

সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া মাধবীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, শুধু কপালের কিয়দংশ কাপড়ে ঢাকা। ক্রোড়ের উপর তাহার মাথা লইয়া মাধবী বসিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল,—"তুমি বড়দিদি?"

অঞ্চল দিয়া মাধবী সযত্নে তাহার ওষ্ঠ-সংলগ্ন রক্তবিন্দু মুছাইয়া দিল, তাহার পর আপনার চোখ মুছিল।

"তুমি বড়দিদি?"

"আমি মাধবী"

সুরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আঃ—তাই!" বিশ্বের আরাম যেন এই ক্রোড়ে লুকাইয়া ছিল! এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে! অধরের কোণে সরক্ত হাসি তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বড়দিদি, যে কষ্ট!"

তর্ তর্ ছল্ ছল্ করিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। ছইয়ের ভিতর সুরেন্দ্রের মুখের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে। নয়নতারার মা একটা ভাঙা পাখা লইয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল,—"কোথায় যাচ্ছিলে?

মাধবী কণ্ঠ চাপিয়া কহিল, "প্রমীলার শ্বশুরবাড়ীতে!"

"ছিঃ—এমন করে কি কুটুমের বাড়ী যেতে আছে দিদি!"

—o—

দশম পরিচ্ছেদ।

নিজের অট্টালিকায়, তাহার শয়ন-কক্ষে, বড়দিদির কোলে মাথা রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আছে। পা দুটি শান্তি কোলে

করিয়া অশ্রুজলে ধুইয়া দিতেছে। পাবনার যতগুলি ডাক্তার কবিরাজ, সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমে রক্ত বন্ধ করিতে পারিতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সেই আঘাত এখন রক্ত-বমন করিতেছে।

মাধবীর অন্তরের কথা তোমাদিগকে আর বলিব না। আমিও ভাল জানি না। তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িতেছে। বাড়ী হইতে সে তাড়াইয়া দিয়াছিল, আর ফিরাইতে পারে নাই; পাঁচ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

সন্ধ্যার পর উজ্জ্বল দীপালোকে সুরেন্দ্রনাথ মাধবীর মুখপানে চাহিল। পায়ের কাছে শান্তি বসিয়া আছে, সে যেন শুনিতে না পায়,—হাত দিয়া তাই মাধবীর মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"বড় দিদি, সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি—তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম—কেমন শোধ হ'ল ত?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মাধবী চৈতন্য হারাইয়া লুণ্ঠিত মস্তক সুরেন্দ্রের স্কন্ধের পার্শ্বে রাখিল—যখন জ্ঞান হইল, তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে!

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

—০—

প্রতিষ্ঠা।

আজকে, নারি, দাওগো রাখি
ফুলের মালা, ফুলের সাজে—
চিত্তে আজি উদ্দীপনার
স্নিগ্ধ-গভীর বাঁশী বাজে!
তাহার সুরে, তাহার তানে,
কি এক নব পুলক আনে,—
উঠছে হিয়া উন্মাদিয়া,
ঝাঁপ্ দিতে চায় কর্ম্মমাঝে!
আজকে, নারি, দাওগো রাখি
ফুলের মালা, ফুলের সাজে!

জ্যোৎস্না-রাতে বাতায়নে
প্রেমের মধু, মুগ্ধ কথা,
দুদিন বন্ধ রাখতে হবে
বাজুক্ প্রাণে হাজার ব্যথা!
বেদনা কত, মরছে ঘুরে—
উদ্দীপনা-বাঁশীর সুরে,
প্রাণের মাঝে ঠিক্‌রে উঠে
শিউরে দে যায় বজ্র যথা!
থাকুক্ বন্ধ দুদিন না হয়,

মধুর-যত, কোমল-যত
রাগরাগিণী, স্বপ্নরাশি
সকল ছেড়ে, উঠতে হবে—
লোকের মাঝে ডাকছে বাঁশি!
স্বপ্নে ডুবে, কুঞ্জমাঝে
থাক্‌লে কিছুই হবে না যে,—
আজকে যখন লক্ষ বিপদ
আকাশ হতে পড়ছে খসি!
ক্ষণেক এবে, ছাড়তে হবে
কোমল মধুর স্বপ্নরাশি!

ফুলের মালা ফুলের সাজে
সেজেছিলে পুষ্পময়ী!
চাঁদের অমল আলোর মাঝে
কবির চিত্তে সর্ব্বজয়ী!
বিকচ কুসুম শয়নমাঝে
বর-তনুর দীপ্তি রাজে,—
আহ্বানে যার কবির চিত্ত
পুলক বিভল থাকত অয়ি!
ফুলের সাজে ফুলের মাঝে
ছিলে কবির চিত্তজয়ী!

আজকে, নারি, প্রেমিকার সে

দাও গো রাখি কবরী-বেশ,
　　　　শিথিল আঁচল, প্রেমের বাণী !
বিভোর নয়ন, তৃষার সাজে—
বিসদৃশ লাগবে লাজে !
কবির প্রাণে, গভীর বাণী
　　　　জাগবে শুধু, হে কল্যাণি !
আজকে রাখো, প্রেমিকার সে
　　　　স্বপ্ন-রঙীন চিত্রখানি !

নায়িকা নও আজ ত তুমি,
　　　　আজ ত তুমি নও গো প্রিয়া,—
যাবে শুধু কবির চিত্ত
　　　　প্রেমের স্বপ্নে বিহ্বলিয়া !
হৃদয়-মাঝে শক্তিসমা,
জাগবে, দেবি, নিরুপমা,
জগৎমাঝে লোকের কাজে
　　　　মাতিয়ে দেবে সবার হিয়া !—
নায়িকা নও আজ ত তুমি,
　　　　আজ ত শুধু নও গো প্রিয়া !—

ভগ্নী তুমি লক্ষ ভ্রাতার,
　　　　জন্মভূমির কন্যা, অয়ি !
বিলাসবেশে, চন্দ্রালোকে,
　　　　সাজবে না আর রঙ্গময়ী !

দিবসের এই দীপ্ত আলো
জ্বালো, তোমার চিত্তে জ্বালো,
লক্ষ ভ্রাতায় জাগিয়ে তোলো,
মাতিয়ে তোলো, বিলাসজয়ী !
ভগ্নী যে আজ লক্ষ ভ্রাতার,
জন্মভূমির কন্যা, অয়ি !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-চয়ন।

কাফিরি জাতি।

গিলগিট ও চিত্রলের পোলিটিক্যাল্ এজেণ্ট রবার্টসন সাহেব কাফিরি স্থান পরিদর্শন করিয়া তাহার এক বিবরণ লিখিয়াছেন। ইহাতে কাফিরি জাতির আচার-ব্যবহার এবং রীতি-নীতিসম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। এই বৃত্তান্ত বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

কাফিরি স্থান গভীর সংকীর্ণ গিরিগুহা এবং অপ্রশস্ত উপত্যকায় পরিপূর্ণ। যে সকল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উপত্যকায় কাফিরিগণ বাস করে, সেগুলি দুরারোহ, অসমান পর্ব্বতশৃঙ্গের দ্বারা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন। কেবল গ্রীষ্মকালেই সময়ে সময়ে এক উপত্যকা হইতে উপত্যকান্তরে গমনাগমন করিতে পারা যায়। এই প্রদেশের দৃশ্য অতি মনোহর, এবং বিচিত্র। পার্ব্বত্য প্রদেশের দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে যত প্রকার সৌন্দর্য্য নিহিত থাকিতে পারে,—অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ, সুবৃহৎ তুষার-ক্ষেত্র ও তুষার-নদী (Glaciers), পাদদেশে ক্রমনিম্ন চিরশ্যামল অরণ্যানী, স্বচ্ছ-সলিলা নির্ঝরিণীর চিরকল্লোল-মুখরিত দাড়িম্ব-কুসুম-পরিশোভিত অরণ্য-সুলভ দ্রাক্ষালতার নিভৃত নিকুঞ্জ, কিছুরই অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে এখানে যেমন অসহনীয় গ্রীষ্ম, শীতকালে সেইরূপ দুঃসহ শীত। সার জর্জ্জ রবার্টসন যখন এই দেশ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় কাফিরিগণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তিনি যেন দেবতা ইমরার নিকট তাহাদের দেশকে শীতকালে আর-একটু গরম করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

কাফিরিগণ আপনাদিগকে দেবযোনি-সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত

আছে যে, এক সময় স্বর্গের এক কর্ম্মকার তাহার পুত্রকে স্থানান্তর হইতে অগ্নি আনিবার জন্য আদেশ করে। পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা বজ্রাহত হইয়া স্বর্গের ছিদ্রপথ দিয়া পৃথিবীর উপর পড়িয়া গেল। এই স্বর্গভ্রষ্ট কর্ম্মকারের বংশে ইহাদিগের জন্ম!

ইহাদের প্রতিবাসী প্রেসনবাসীদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে আর একটি কৌতুকাবহ গল্প প্রচলিত আছে! সর্ব্বপ্রথমে ইমরাদেব একদল দৈত্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তিনি স্বীয় আচরণের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন, এবং ইচ্ছা হইলেও, যাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে স্বহস্তে নিপাত করা বিহিত জ্ঞান করিলেন না। তিনি অন্যতম দেবতা মণিকে ইহাদিগের ধ্বংশ-সাধনের জন্য নিয়োগ করিলেন। মণির তরবারির আঘাতে প্রায় অধিকাংশ দৈত্য নিহত হইল, কেবল সাতজনমাত্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল; প্রেসনগণ ইহাদিগেরই উত্তরপুরুষ। অবশ্য সার জর্জ্জ বলেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে যে সকল গ্রীক সৈন্য মাসিদনীয় বীর আলেক-জান্দারের সহিত প্রাচ্য ভূখণ্ডে পদার্পণ করে, তাহাদের অনেকেই মধ্য এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; ইহারা সেই সকল প্রাচীন গ্রীকের আধুনিক বংশধর।

কাফিরি জাতি অত্যন্ত সাহসী। কিন্তু কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা সময়ে সময়ে ভীরুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। দুই তিন জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সংগঠনপূর্ব্বক ইহারা প্রচ্ছন্নভাবে দূরবর্ত্তী শত্রুদিগের গ্রামে প্রবেশ করে, ধৃত হইলেই নৃশংসরূপে নিহত হয়, কিন্তু তথাপি ইহারা বৈরতা-সাধনে পশ্চাৎপদ নহে। রাত্রিকালে শত্রু-শিবিরে এবং গ্রামের মধ্যে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহারই বুকে ছুরি বসাইয়া পলায়ন করে। ইহাদিগের অস্ত্র যেরূপ সামান্য, তাহাতে এই অস্ত্রের ব্যবহারে ইহাদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখা যায়। কোন বিদেশীয় রাজার পক্ষে

এই দেশ অধিকার করা সহজ নহে ; দুর্গমতা একটি কারণ বটে, কিন্তু কাফিরিদিগের বীরত্ব, সাহস এবং স্বাধীনতার প্রতি অদম্য অনুরাগ তাহার অন্যতম এবং প্রধান কারণ। কাফিরি জাতি বন্দুককে অত্যন্ত ভয় করে, এমন কি ইহা একটা বিপজ্জনক ভৌতিক পদার্থ বলিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস। একবার একদল কাফিরি অশ্বারোহী এক পর্ব্বত-প্রান্তে সার জর্জ্জের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। সেই দলে প্রায় শতাধিক লোক ছিল, তাহাদিগকে কৌতুক দেখাইবার অভিপ্রায়ে সার জর্জ্জ একবার বন্দুকের আওয়াজ করেন, তাহাতে সমবেত কাফিরিগণ এতই ভয় পায় যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে পর্ব্বতের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

সার জর্জ্জ বলেন, কাফিরিদিগের বৈঠকের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর! বৈঠকে তাহাদিগের গণ্ডগোল এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, দশ বারোজন লোক একত্রে কথা কহিয়া উঠে, এবং শ্রোতৃবর্গ কিছু অন্যমনস্ক হইলে, বক্তাগণ 'আই' 'আই' করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতেও কৃত-কার্য্য না হইলে হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাহাদিগের শরীরে "কাতুকুতু" দেয়। কোন একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইলে সকলেই কিছু বলিতে চায়,—সকলেই বক্তা, সে ক্ষেত্রে আর শ্রোতা মিলে না। কিন্তু কোন প্রধান ব্যক্তি যদি কোন গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব করে, তাহা হইলে প্রায় সকলেই তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করে। অনেক সময় তাহার বন্ধুবর্গও তাহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া থাকে। কোন গুরুতর কাজ উপস্থিত হইলে, ইহারা তর্ক-বিতর্কের দ্বারা একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে ভালবাসে। স্ব স্ব স্বাধীন মত-প্রকাশের সময় ইহারা প্রায়ই সুযুক্তির অনুসরণ করে, কিন্তু যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কোন বৃক্ষতলে কিম্বা নৃত্য করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমবেত হয়, এবং উৎসাহের সঙ্গে তর্ক করিতে থাকে, তখন ইহাদিগের মতামতের স্থিরতা থাকে না।

অনেক সময় এমনও হয় যে, ইহারা একবিষয়ে একদিন একরকম সিদ্ধান্ত করিল, আর একদিন আর একরকম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল এবং তৃতীয় দিনে সে মতও পরিবর্ত্তিত হইল! কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি অল্পই ঘটিতে দেখা যায়। কোন বিষয় লইয়া ইহাদের মধ্যে জিদ উপস্থিত হইলে কিম্বা একটা অনির্দ্দিষ্ট লাভের সম্ভাবনা ঘটিলে, সর্ব্বদাই ইহাদের মত-পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

কাফিরিগণ রমণীদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের স্বাধীনতাও অসামান্য। যদি কোন রমণী তাহার স্বামীর লাভের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে তাহার স্বামীর অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়। যে পুরুষের মেষপাল নাই, মেষপাল সংগ্রহ-কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করা তাহার স্ত্রীর অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধনবান পিতামাতার পুত্রকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য, সে বিবিধ প্রকার কৌশল অবলম্বন করে, রমণী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আপনার গৃহে লইয়া আসে; তাহার পর প্রেমিক যুবক যখন সেই রমণীর কর্ণে প্রেমপূর্ণ বচনধারা ঢালিতে থাকে, তখন হঠাৎ রমণীর স্বামী গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া উভয়ের সন্নিকটবর্ত্তী হয়, ক্রুদ্ধ স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া রমণী যেন কতই ভীত হইয়াছে, এইরূপ ভাণ করে। বলা বাহুল্য, প্রেমিক যুবকের প্রাণও ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। এদিকে রমণীর স্বামী পাঁচ জন আত্মীয়-প্রতিবাসীকে আহ্বান করে এবং উক্ত যুবক যে তাহার স্ত্রীর প্রতি অন্যায় অধিকার-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে, সেজন্য তাহাদিগের হস্তে সুবিচারের ভারার্পণ করে। যুবকের যাহা কিছু দণ্ড হয়, তাহা সেই রমণীর স্বামী প্রাপ্ত হয়; তাহা দিয়া সে মেষপাল ক্রয় করে। সমাজও যুবককে সহজে ছাড়ে না; একটি ভাল রকম ভোজ দান করিলে তবে তাহার অব্যাহতি লাভ হয়। ইচ্ছা হইলে কাফিরিগণ স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে, স্ত্রী-ত্যাগের ইচ্ছা হইলে যদি ক্রেতা না জুটে, তাহা হইলে তাহাকে

বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। কাফিরিদিগের মধ্যে সুন্দরীর অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল রূপসীর স্বভাব-চরিত্র এতই মন্দ যে, সেরূপ আর কোন দেশে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। যাহাদের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ, তাহারা দোষের জন্য স্বামীকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে পুরুষান্তরের নিকটও আশ্রয় পায় না, সুতরাং অগত্যা তাহাদিগকে পিতামাতার নিকট ফিরিয়া আসিতে হয়। কাফিরিজাতির কুসংস্কারের সংখ্যা নাই! বশীকরণ-মন্ত্র ও গুণজ্ঞানের উপর তাহাদিগের অগাধ বিশ্বাস। ইহারা মনে করে যে, এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে পুরুষ বা রমণীকে অন্যের প্রেমে বশীভূত করা যায়! কিন্তু এই ঘাস সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। কথিত আছে, এক জন লোক একবার এই আকাঙ্ক্ষিত ঘাস-সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিল; তাহাতে একদল স্ত্রীলোক তাহার প্রণয়লাভের জন্য পাগলিনী হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল!

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় কাফিরিগণও নৃত্যগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত। সুখের সময় এবং শোকের সময় ইহারা নৃত্যগীতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। যদি কোন ব্যক্তি দৈব-দুর্ঘটনাবশতঃ আহত হয় কিম্বা পীড়িত অথবা বসন্ত প্রভৃতি কঠিন রোগে মৃতপ্রায় হয়, তাহা হইলে রোগীর আত্মীয়-প্রতিবাসী তাহার গৃহে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্যগীত-দ্বারা তাহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করে। সার জর্জ্জ বলেন, রোগীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে এই নৃত্য-গীতের আয়োজন হয় এমন বোধ হয় না, সম্ভবতঃ তাহার আরোগ প্রার্থনায় দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, হয়ত শোকে-দুঃখে ইহাদিগের বুক ভাঙিয়া যায়, কিন্তু তথাপি নৃত্য করা চাই! কাফিরিদিগের দেবতাকে নৃত্যগীত ও বলির দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায়; দেবতাকে বশীভূত করিবার ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নৃত্য-গীত ইহাদের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এই উৎসব

উপলক্ষে ইহারা ঢাক বাজায়, গান করে, এবং কখন কখন বংশীধ্বনি করিয়া থাকে; ঢাকে কাটি দিবামাত্র ইহারা গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া, কখন দ্রুত কখন বা ধীর-গতিতে নানা ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করে।

মালয় জাতি।

সিঙ্গাপুরের বর্ত্তমান সমর-সচিব মিঃ সুইটেনহ্যাম মালয়বাসীর ভাষা এবং তাহাদিগের আচারব্যবহারসম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। মালয়বাসীর জীবন ও তাহাদিগের দেশের বিশেষত্ব-প্রদর্শনের জন্য তিনি যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি একত্র মুদ্রিত করিলে, একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারে।

মালয়ের ইতিবৃত্ত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কোন বিষয়ই এই সকল প্রবন্ধে সন্নিবদ্ধ হয় নাই। ইহাতে শুধু প্রাচ্য ভূখণ্ডের একটি অতি রমণীয় অংশের অধিবাসী, এক অতি আশ্চর্য্য জাতির বৃত্তান্ত বৈদেশিক পাঠক-মণ্ডলীর গোচর করা হইয়াছে।

মালয়ের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোহর এবং বিস্ময়ের আধার। এখানে চেতন পদার্থ ও উদ্ভিদ্ জগৎ,—অরণ্যের পশু, আকাশের পাখী, তরু, লতা, সকলই সতেজ, সবল, বর্দ্ধনশীল! যেন সৃষ্টির লোহিত রাগ-রঞ্জিত প্রাথমিক ঊষা এখনো তাহাদের নিকট অভিনব বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

মালয়ের অধিবাসীগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপগুলির আদিম অধিবাসীগণের বংশধর, কিন্তু বর্ত্তমানকালে এ কথা প্রমাণ করা কঠিন। ইহাদের জাতীয় সাহিত্য থাকিলে হয়ত এ সম্বন্ধে কোন তথ্য অবগত হওয়া যাইত।

অসভ্য সমস্ত পৃথিবীর আলোক এবং উত্তাপের সহিত যেন উষ্ণ-

দিগের কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহারা যেন পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন-ভাবে বাস করে। জগতের সভ্যতা ও জীবন-সংগ্রামের কলরব হইতে বহুদূরে, সুবৃহৎ ছায়াস্নিগ্ধ বনানীর অন্তরালে, প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণীর তটদেশে, অমৃতময় ফলপূর্ণ বৃক্ষমূলে, ইহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

মালয়েরা চঞ্চলপ্রকৃতি। ইহাদিগের পরিচ্ছদের নিম্নে নানাপ্রকার অস্ত্র রক্ষিত হয়; ইহারা অত্যন্ত অলস, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই মৃগয়া-কার্য্যে সুদক্ষ। সদয় ব্যবহার পাইলে প্রাণপণে ইহারা উপকারীর সহায়তা করে। সাহস এবং বিশ্বস্ততা ইহাদিগের প্রধান গুণ।

মালয়েরা খর্ব্বকায়; ইহাদিগের শরীর দৃঢ়, চর্ম্ম স্থূল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, অনমিত, বর্ণ কটা, ওষ্ঠ ও নাসিকা অত্যন্ত পুরু, চক্ষু উজ্জ্বল এবং বুদ্ধি-বৃত্তি-ব্যঞ্জক। ইহারা স্বভাবতঃ দয়ালু, সরল এবং নম্র, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির সহিত ইহারা কখন অধিক কথা কহে না, তাহাদিগের প্রতি সতত সন্দিগ্ধ; তবে এই সন্দিগ্ধভাব প্রকাশ্যতঃ ব্যক্ত করে না। ইহা-দিগের প্রতি কোন কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে, তাহা যতই কেন কঠিন হউক না, বিশেষ সতর্কতা এবং বিশ্বাসের সহিত ইহারা তাহা সম্পন্ন করে। ইহারা অমিতব্যয়ী, ঋণলিপ্সু এবং উত্তমর্ণের ঋণ-পরিশোধে অত্যন্ত অমনোযোগী। ইহারা গল্প করিতে অত্যন্ত ভালবাসে,—কথায় কথায় উপমা, চলিত কথা (Proverbs) প্রভৃতি প্রয়োগ করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপেও ইহাদিগের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। আত্মীয়-প্রতিবাসীর কথা ও গল্প-গুজব লইয়া ইহাদের অনেক সময় কাটিয়া যায়।

মালয়েরা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী, অদৃষ্টবাদী। ইহারা মদ্যপান করে না, কখন কখন কাহাকেও গুলি টানিতে দেখা যায়। বাজি রাখিয়া খেলা, মোরগের লড়াই বাধানো, মৃগয়া করা, ইহাদের জীবনের প্রধান দৈনিক

মাছ মারে, নৌকাচালনেও বিশেষ দক্ষ। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ইহাদিগের অত্যন্ত অনুরাগ এবং প্রাচীন রীতিনীতি ও কিংবদন্তীর উপর ইহাদিগের অপরিমিত শ্রদ্ধা দেখা যায়। স্বদেশের রাজাকে ইহারা অত্যন্ত ভয় করে, রাজকর্ম্মচারীগণকেও সমুচিত মান্য করিয়া চলে।

মালয়দিগের প্রতি অবজ্ঞা কিম্বা উপেক্ষা প্রকাশ করিলে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না। অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য ইহারা অপমানকারীকে হত্যা করিতে পশ্চাৎপদ নহে এবং কোন অবস্থাতেই অপমানের প্রতিশোধ না দিয়া ইহারা ক্ষান্ত হয় না। অপমানকারীকে হাতে না পাইলে, ক্রোধান্ধ হইয়া ইহারা যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রাণ সংহার করে; বালক, বৃদ্ধ কিম্বা রমণী কাহাকেও ক্ষমা করে না। মামাত নামক একজন মালয় পুরোহিত একবার এইরূপে ছয়জন লোককে হত্যা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইটি পূর্ণগর্ভা রমণী ছিল, এবং আর সকলেই তাহার বিশেষ আত্মীয়।

খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ মালয়ে আড্ডা বাঁধিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইতেছে না, কারণ মালয়গণ বৈদেশিকের সংস্রবে আসিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক; মিসনারীরা লোকের সহিত ভাব করিয়া লইবার বিস্তর ফন্দি জানিলেও, ইহাদের সহিত মিশিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, তাহাতে বোধ হয় মালয়বাসীদিগের কিছু ক্ষতি নাই। অজ্ঞতাতেই যেখানে সুখ, বিজ্ঞতার প্রলোভন সেখানে বিড়ম্বনামাত্র।

যৌবনের প্রারম্ভে মালয়বালকেরা দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়া উঠে। চক্ষু, চক্ষুর পক্ষ্ম, ভ্রূ সমস্তই সুন্দর,—তাহাতে যেন একটা চিন্তাহীন স্বপ্নালসভাব অঙ্কিত দেখা যায়। ইহাদিগের মুখে এমন একটি বিষাদ-গভীর শোভা ফুটিয়া থাকে, যেন দেখিলে মনে হয়, ইহারা কোন পরম রমণীয় সুখকুঞ্জ হইতে এই ধূলিময় পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তাহাদের

উজ্জ্বল চক্ষুতে এই বিষণ্ণ ভাব পরিস্ফুট, যে দিকেই তাহারা দৃষ্টিপাত করুক এই বিষাদের ছায়া কিছুতেই বিদূরিত হয় না। যেন তাহারা কোন প্রিয়তম সামগ্রীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহা নয়নগোচর হইতেছে না! মালয়দেশে বালকগণ বিশেষ স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালিত হয়; বালক-বালিকাগণকে কোন নিয়মে আবদ্ধ দেখা যায় না, ইহারা ইচ্ছামত নিদ্রা যায়, আবার প্রয়োজন হইলে আবশ্যকমত রাত্রি জাগে, ক্ষুধার সময় খায়; ইহাদের মধ্যে কোন রকম খেলনার চলন নাই, পিতা মাতা ইহাদিগকে তাড়না করে না এবং ইহাদিগকে কাঁদিতে বড় একটা দেখা যায় না।

মালয়বালিকারা যৌবন অপেক্ষা শৈশবেই অধিক সুন্দরী থাকে। কিন্তু পনর ষোল বৎসর বয়সের সময়ও ইহাদিগকে মন্দ দেখায় না! এই সময় ইহাদিগের লজ্জাশীলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুন্দর কাপড়, গহনা, এই সমস্ত ভালবাসে। মালয়ের পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের বর্ণ অধিক গৌর নহে, কিন্তু রমণীদিগের হস্তপদ অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার, মুখ প্রসন্ন, দন্তশ্রেণী সুগঠিত, চক্ষু এবং ভ্রূ পরম-সুন্দর। লম্বা কাল চুল, বাদামী রঙ এবং দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় ভ্রূ ইহাদিগের অনেক সাধনার সামগ্রী।

মালয়যুবতীগণের মধ্যে প্রায় কেহই চিরকুমারী থাকে না। পূর্ব্বকালে অনেক রমণী অবিবাহিত অবস্থায় কালাতিপাত করিত, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা কঠিন। মালয়ে পতিতা রমণীও অনেক আছে। এখানে বিবাহচ্ছেদ-প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় পক্ষ প্রয়োজন বুঝিলেই বিবাহ-বন্ধন ছেদন করে। অনেক পুরুষ সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে, তিন চারিটি রমণীকেও বিবাহ করিয়া থাকে—কিন্তু আমাদের দেশের বিলুপ্তপ্রায় কৌলীন্যপ্রথার সমকক্ষতা লাভ করিতে আজও ইহারা সক্ষম হয় নাই।

মালয়গণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, সন্দিগ্ধচিত্ত, আত্মসম্মানের প্রতি তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিসম্পন্ন। রমণীদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিবার জন্য সতত যত্নশীল হইলেও, ইহাদের এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, যদি কোন রমণীর প্রতি কোন পুরুষ অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে সেই রমণীর চরিত্র যতই কলুষিত ও ঘৃণিত হউক না কেন এবং অন্য পুরুষবর্গের সহিত তাহার যে পরিমাণেই ঘনিষ্ঠতা থাকুক না কেন, লুব্ধ পুরুষ তাহা নিতান্তই সামান্য জ্ঞান করিবে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না।

—o—

নিয়াসা জাতি।

নিয়াসাল্যাণ্ড মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত। এই স্থানের পুরুষ ও রমণীগণ আফ্রিকার অন্যান্য অংশের অধিবাসীগণের ন্যায় অসভ্য ও বর্ব্বর। এখানকার রমণীগণ পুরুষদিগের নিকট তৈজসপত্র অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদানে সক্ষম, সে-ই সুন্দরী রমণীলাভের অধিকারী। কোন যুবক কোন যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, যুবতীর নিকট তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে; যুবতীর পিতাকে সে কিছু পণ দেয় না, শুধু তাহাকে যুবতীর পিতার বাড়ীর কাছে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হয়, এবং সর্ব্বদা তাহার ক্ষেতে খাটিতে হয়। উভয়পক্ষ সম্মত হইলে বিবাহ স্থির হইয়া যায়, তখন বর কন্যাকে একটি মোরগ উপহার প্রদান করে, কন্যাও বরকে একটা মুরগী দেয়। এই সময় বিবাহের আবশ্যকীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া যায়। তাহার পর বিবাহ।

বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ সম্মত হইলে বিবাহ হইতে অধিক বিলম্ব হয় না; কিন্তু যদি কোন এক পক্ষের এক বা অধিকসংখ্যাক লোক, উপস্থিত বিবাহ-প্রস্তাবে অসম্মতি বা আপত্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলেই বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং বরকন্যার মধ্যে উপহার আদান প্রদান হইয়া

থাকিলে তাহা পরস্পরকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। বিবাহের পর বর যদি তাহার শ্বশুরের ক্ষেতে না খাটে, কিম্বা তাহার স্বার্থরক্ষায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে কন্যার পিতা তাহার কন্যাকে সেই অবাধ্য জামাতার নিকট হইতে পুনর্গ্রহণ করে; নবদম্পতীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ কিম্বা তাহাদিগের প্রণয়ের গাঢ়তা এই কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপন্ন করিতে পারে না। অনেক সময়ে পতিব্রতা স্ত্রীকেও স্বামীর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উৎসাহশীল শ্বশুরভক্ত পুরুষকে সেই কন্যা সম্প্রদান করা হইয়া থাকে। বিবাহের পর যখন এই সকল আফ্রিক-রমণী সংসারের গুরুভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করে, তখন আর তাহারা স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারে না, এমন কি সঙ্গিনীগণের সহিত মিশিয়া গল্প করিতে কিম্বা স্বেচ্ছানুসারে নিকটবর্ত্তী কূপ বা নদী হইতে জল আনিবারও তাহার অবসর থাকে না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র সে ক্ষেতে কাজ করিতে যায়; সেখানে বীজবপন হইতে শস্যসঞ্চয় পর্য্যন্ত সকল কাজই তাহাকে করিতে হয়। শ্বশুরের ক্ষেতে খাটিয়া তাহার স্বামী যেটুকু অবসর পায়, সে সময়টুকু সে বাড়ীতে বসিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাটাইয়া দেয়, বন্ধুবর্গের সহিত মিলিয়া আমোদপ্রমোদ করে এবং যদি খুব বেশী কাজ করে ত, হয় একটা ঝুড়ি, না হয় একটা চাটাই তৈয়ারী করে। ইহাদিগের অধিকাংশ সময়ই তাড়ি খাইতে কাটিয়া যায়। তাড়ি-পানে ইহারা আবাল্য অভ্যস্ত।

সমারোহপূর্ব্বক তাড়ি খাইবারও সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। বিবাহ কি অন্য কোন উৎসব, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বড় বড় পারিবারিক ব্যাপারে, ইহারা তাড়ির আড্ডা বসায়; এতদ্ভিন্ন সামান্য সামান্য ব্যাপার উপলক্ষেও তাড়ি খাইবার আয়োজন হয়, যেমন কোন বন্ধুর প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন, জলে নূতন নৌকা-ভাসানো, ক্ষেতে বীজবপন করা, অর্থলাভ ইত্যাদি। ইহাদিগের এই তাড়ি অত্যন্ত উগ্র এবং মাদকতাপূর্ণ। ইহারা স্বভাবতঃ

প্রফুল্ল ও হাস্যপ্রিয়; তাড়ি খাইবার সময় তিন চারিজনে একত্র হইলে ইহাদিগের মধ্যে হাসি ও গল্পের ধূম পড়িয়া যায়। ইহারা নৃত্যগীতে অত্যন্ত অনুরক্ত। দল বাঁধিয়া বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া, ইহারা নৃত্য করে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত নৃত্য গীত চলিবে তাহার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং এই আমোদে ইহারা কখন ক্লান্ত হয় না। নৃত্য করিবার সময় ইহারা সমতালে পা ফেলিয়া হাত নাড়ে এবং বুক চাপড়ায়। কাহারো মৃত্যু-উপলক্ষে শোক-প্রকাশ করাকে, ইহারা 'মালিরো' বলে। 'মালিরো'র সময় ইহারা অগ্নি জ্বালিয়া তাহার সম্মুখে কয়েকমাস ধরিয়া শোকসূচক সঙ্গীত করে ও ঢোলক বাজায়। ইহাদিগের সেই সঙ্গীত হৃদয়স্পর্শী এবং গভীর বেদনা-প্রকাশক।

কোন অপরাধ করিলে, তাহার বিচারের জন্য ইহাদিগের মধ্যে "মুয়াভি" * অর্থাৎ বিষ-পরীক্ষা প্রচলিত আছে। যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হয়, সে গ্রামের সমস্ত সমবেত লোকের সম্মুখে বসিয়া বিষপান করে। যদি বিষপান করিয়াও সে ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিরপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু অপরাধ না থাকিলেও, বিষ-হজমে বেশী লোককে কৃতকার্য্য দেখা যায় না। বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেই অপরাধ সাব্যস্ত হয়, এবং তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে না। নিয়াসা জাতি বিষপরীক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী বলিয়া অনেক লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়েও এই পরীক্ষার অবতারণা করে। ইহাদিগের ধর্ম্ম কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন, কারণ ইহারা অত্যন্ত ভীরুপ্রকৃতি এবং কাহারো নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে না; তবে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বৎসরে একবার করিয়া গরু ও ছাগল বলি দিয়া লেসাদেবের পূজা করে; এই সময়ে ইহাদিগের মধ্যে মদ্যপান ও নৃত্য-গীতের অত্যন্ত আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রলেপ।

(১)

সমস্ত দিন বাড়ীতে বসিয়া বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল ; তাই সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বেই বন্ধুবর অচলনাথের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। অচলের বৈঠকখানায় তখন ভারি ভিড় ! দেশোদ্ধার-সমিতি, সাহিত্য-সেবকমণ্ডলী, অনাথ-ভাণ্ডার প্রভৃতির প্রতিনিধিবর্গ তাহাদের চক্‌চকে চাঁদার বহি বাহির করিয়া বন্ধুবরকে নিতান্ত কাবু করিয়া তুলিয়াছে ! ঘরের এক পাশে একটি সাহেব চুরুট-মুখে একখানা খবরের কাগজের আড়ালে এতদূর আপনাকে মগ্ন রাখিয়াছে যে, তাহার মুখখানা একেবারে দেখাই যাইতেছে না। অচলের দয়াদাক্ষিণ্য বেশ আছে, এবং সেটি নিতান্ত অকারণ নহে। পাবলিক্ কাজে যোগদান করিলে পশার প্রতি-পত্তির স্ফূর্ত্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী—ইহাই তাহার বিশ্বাস। কিন্তু সে কথা সবিস্তারে বলিয়া আপনাকে পিনালকোডের ধারাস্নাত করিবার আবশ্যক দেখি না !

প্রতিনিধিবর্গকে যথাযোগ্য মিষ্টকথা ও মুদ্রায় সন্তুষ্ট করিয়া অচল কহিল,—"কিহে, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?"

আমি কহিলাম, "দেখছি—চাঁদার ভয়ে আত্মগোপন করছিলাম !"

এমন সময় সাহেবটি কাগজ রাখিয়া কহিল,—"হ্যলো ব্যানার্জি, good evening.

"আরে কে—লাহিড়ী যে ! তারপর, খপর কি ? ছুটিতে কোথাও যাওনি যে !"

নীহার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার ! সেই আমাদের কলেজের বাঙাল নীহার, এখন পূরাদস্তুর সাহেব ! অদৃষ্ট-চক্রের অলঙ্ঘনীয় গতি, সন্দেহ নাই ! কিন্তু, সে কথায় আর কাজ কি !

ক্রিড়িরিং ! বাহিরে বাইসিক্লের বেলের শব্দ শোনা গেল, এবং তাহা মিলাইতে না মিলাইতেই সাহেব-বেশী জনৈক বাঙালীর প্রবেশ ! অভিবাদনান্তে কতকগুলা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা চট্‌পট্ শেষ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

লাহিড়ী কহিল,—“দেখলে হে বাঁড়ুয্যে, লোকটা সাহেবিয়ানাতে সবে এপ্রেণ্টিসি সুরু করেছে।”

“কি রকম ?” “দেখলে না ?” “কি আবার দেখব হে !”

লাহিড়ী কহিল,—“এঃ, তোমাদের observation এর faculty টা ভারী কমে গেছে ! দেখলে না, লোকটা যতক্ষণ এখানে ছিল, কেবল টাইটা ধরে টানছিল—পাছে তার তলায় কলারের বোতামটা দেখা যায়—তবে টুপিটা তেমন দস্তুরমাফিক রাখতে পারছিল না, অথচ তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। নূতন সাহেবিয়ানা করবার সময় ওসব খুঁটিনাটিগুলার জন্য ভারী বিব্রত হতে হয় ! যদিও এগুলো কেউ নজর করে না, তবু মনে হয়, যেন বিশ্বশুদ্ধ সবার চোখ ঐ খুঁতগুলোর উপর ব্যগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছে !”

আমি কহিলাম—“বহুৎ আচ্ছা ! খাসা আবিষ্কার ত’ ! আবার বলবারও তারিফ্ আছে। কাগজে প্রবন্ধ লেখনা কেন ?”

লাহিড়ী কহিল, “তা বুঝি জাননা—প্রথম সাহেবিয়ানা ধরবার সময় আমি কি বিপদেই পড়েছিলুম !”

“কৈ না ?”—

“তবে শোন !”

অচল কহিল, “ওহে সমস্তদিন ঘরে থেকে অসহ্য হয়ে উঠেছে—চল, একটু খোলা বাতাসে যাওয়া যাক্ !”

লাহিড়ী আমাদের সহপাঠী। বরাবরই সে য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে ; ইহার ফলে, সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী

সামান্য সেরেস্তাদারের পুত্র হওয়া-সত্ত্বেও, বি, এ পড়িবার সময়, মজঃফর পুরের ব্যারিষ্টারপ্রবর এস্ স্যানিয়ালের কন্যাকে বধূরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লাট-কৌন্সিলের মেম্বর ব্যারিষ্টার 'স্যানিয়ালের' পরিচয় প্রদান বোধ হয় অনাবশ্যক।

(২)

খোলা বারাণ্ডায় আসিয়া ইজিচেয়ারে পা ছড়াইয়া লাহিড়ী একটা সিগার ধরাইল। দু' একটা টানের পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিল, "হাঁ, তারপর যা বলছিলাম—তোমাদের বোধ হয় মনে আছে যে, বিবাহের পর শ্বশুর মহাশয় বারবার অনুরোধ করা-সত্ত্বেও, আমি শ্বশুরালয়ে যেতে চাইতাম না,—তার প্রধান কারণ, য়ুনিভার্সিটি আমাকে হাজার মার্কা মেরে দিলেও, আমি সামান্য সেরেস্তাদারের পুত্রমাত্র এবং শ্বশুর মহাশয়, আজ এ স্বদেশীর দিনেও—সত্য কথা বলতে আর হানি কি—পুরারকম সাহেব! বাড়ীর পুরুষেরা কাপড়ের ধার ধারিতেন না—বিসদৃশ হইলেও ঢিলা পায়জামার একান্ত ভক্ত! বাড়ীতে রীতিমত টেবিলে বসিয়া খানা, পিয়ানো বিলিয়ার্ড প্রভৃতির সরঞ্জাম, অর্থাৎ একেবারে চৌখসভাবে সাহেব আর কি! তবে অন্তঃপুরের মধ্যে সাড়ীর প্রথাটা অবশ্য বয়কট হয়নি—আর দেখো ভাই, কাকেও প্রকাশ করোনা, আমার একটি শ্যালিকাও শ্যালকপত্নীর চক্ষুও সুদৃশ্য চশমাবরণে মণ্ডিত! যাই হোক্, এহেন শ্বশুরালয়ে যাইতে আমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিত। বল কি হে, বিবাহের পর পত্রভিন্ন আমার প্রিয়তমা জোটি ওরফে জ্যোৎস্না বালার সহিত, অন্যরূপে আলাপের সুবিধাই ঘটিয়া উঠে নাই। তোমরা বেকালে রাত দশটা এগারটার সময়, আকাশটা সহসা মেঘভরা দেখে, মেঘদূতের শ্লোক আউড়ে বাড়ীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে গোপনে শ্বশুর-বাড়ীর দিকে moonlight masquerade চালাতে, সে সময় আমি

বেচারী প্রিয়ার পত্র বুকে করিয়াই দীর্ঘ বিরহের রাত্রি কাটাইয়া দিতাম! যৌবনের সেই মধুময় মুহূর্ত্তগুলা এমন বিফলে কেটে গেছে যে, সে কথা মনে হলে এখনো চোখ ছল-ছল করে!

আমি ঠিক্ করে রেখেছিলাম, বিলাতী এটিকেটগুলার সঙ্গে বেশ খানিকটা পরিচয় না হওয়া অবধি শ্বশুরবাড়ী যাব না। সেখানে চালচলনে পাছে কেউ আমাকে 'বাঙাল' ঠাওরায়, কারো কাছে পাছে কোন বিষয়ে আনাড়ি বনে যাই—এইটাই বিষম আশঙ্কা ছিল! কিন্তু উঃ ভগবান কি কঠিন শাস্তিই দিলেন!

শ্বশুরবাড়ী একদিন যেতে হবে জান্‌তাম—বিশেষ আরো যখন স্থির ছিল, যে শ্বশুর মহাশয়—এম্ এ, পাশ হলে আমাকে বিলাত পাঠাবেন! কাজেই ক্লাশে ডব্লিউ মিটার, গোভিন্ চন্দর-দের দলে অতটা ভিড়তুম্। তোমরাও কি তখন আদত কারণ ঠাওরাতে পেরেছিলে হে, কেবল ত ঠাট্টাই কর্‌তে!

যাই হোক্, অবশেষে এম্, এ, একজামিনের পর শ্বশুর মহাশয়ের পত্রাঘাতে অস্থির হয়ে উঠেছিলুম; অন্তঃপুর থেকেও পত্রশরের অভাব ঘটেনি—সেগুলো যে আরো তীক্ষ্ণ, আরো মর্ম্মস্পর্শী, সে কথা বলাই বাহুল্য! তখন আমি "বিলাত-ফের্‌তা" সমাজরূপ-ষ্টেজে নামবার জন্য দস্তররকম রিহার্স্যাল দিতে ব্যস্ত। কিরূপে কাঁটা-চাম্‌চের ব্যবহারটা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয়, কিরূপে টাই কলার ও সার্টের প্লেটের মধ্য দিয়ে আমার সাহেবিয়ানা পূর্ণতেজে মাথা তুল্‌তে পারে, তারি নিয়মিত 'জবরদস্ত' রিহার্স্যাল! একজামিনের পড়া নিয়ে ত মাতা যায় হে, এ একেবারে তার চেয়ে মেতে উঠেছিলাম। এম্, এন্ ধরের হোটেল, আরো নানান্ 'হোটেল', 'নিবাস', 'আশ্রমে' প্রত্যহ আহারাদি চলছিল, সঙ্গে 'মোণি গুপ্ত'কে 'ল্যাংবোটের' মত বেঁধে ফিরতে হোত। সে আমাকে খানার

তার প্রমাণ পেয়েছিলুম—পরে বল্‌ছি। এইভাবে দিন কতক হোটেলাদিতে আনাগোনা করে যখন মনে হল কাঁটা-চাম্‌চের ব্যবহার প্রভৃতি এক রকম 'রপ্ত' হয়ে এসেছে, তখন বাবার কাছ থেকেও এক চিঠি এসে হাজির—মজঃফরপুর যাবার জন্য এক তাগিদ! বাস্‌,—সেইদিনই শ্বশুরমহাশয়কে টেলিগ্রাফ করে দিলাম—"সপ্তাহশেষে মজঃফরপুর যাচ্ছি।" তিনি অচিরে ট্রেণের ভাড়া, কোট-প্যাণ্ট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় তৈয়ার করাইয়া লইবার 'পকেট-মণি' প্রভৃতি পাঠাইলেন এবং প্রিয়াদর্শনপ্রার্থী আমিও আসন্ন বিরহ-অপনোদনের আশায় ঈষৎ উল্লসিত হয়ে উঠলাম!

দুই চারি দিনের মধ্যেই মহা-উৎসাহে ট্রাঙ্ক পোর্টম্যাণ্ট সাজাইয়ে ব্যারিষ্টার-জামাতার যোগ্যবেশে শ্বশুর-মন্দির ভেটিবার শুভ উদ্দেশ্যে বোর্ডিংয়ের ভৃত্যকে হাবড়ার গাড়ী আনিতে আদেশ দিলাম। সে দিনের আনন্দ,—ওঃ সে ভাষায় প্রকাশ হয় না—দীর্ঘকাল পরে শ্বশুর-মন্দিরে প্রেয়সীর ভুজবন্ধন-প্রয়াসী কাতর বিরহী ভিন্ন, সে উল্লাস সহজে কারো বোধগম্য হবে না! তবে আনন্দের আতিশয্যে, বোর্ডিংয়ের বন্ধুবর্গকে সেদিন পেলিটি-ভবনে 'বিশেষ ডিনারে' আপ্যায়িত করেছিলুম!

রাত্রি ৮॥০ টার সময় নিজের ঘরে এসে দ্বার বন্ধ কর্‌লাম। এখন নায়কের রাজবেশ ধারণ! 'মোণি-গুপ্টু'র শিক্ষায় সাহেবী-বেশটা বেশ একরকম অভ্যস্তই ত হয়েছিল, কিন্তু এখন আবার এ কি উপদ্রব! প্রত্যেক জিনিষটা যেন বিদ্রোহী হয়ে বসে আছে! ইংরেজী বেশটার উপর চড়ে চটে গেলাম! বেশভূষাগুলা সংখ্যায় এত অধিক, আর এ কিছুতে নিজেদের অধীন হতে চায় না, বরং অবনত-মস্তকে আমাকে তাদের অধীনতা স্বীকার কর্‌তে হবে। উপদ্রব আর কাকে বলে? আগাগোড়া সব নূতন স্যুট ছিল। কলারকে ত অনেক কষ্টে আয়ত্ত করা গেল—পরে টাইটাকে নিয়ে ত বিষম বিপদ! কিছুতেই ত তাকে

বাগাতে পারি না,—কলারের মাঝামাঝি সে কিছুতেই যেন আসিবে না! ওদিকে ভৃত্য গদাধর হাঁকিতেছে, "দাদাবাবু, গাড়োয়ান হাঁকা-হাঁকি কর্‌ছে!" মেসের সঙ্গীরা হাঁকে, "ওহে সময় হয়ে এল যে, দরোজা বন্ধ করে কি করছ?" আমার মুণ্ড করছি, শ্রাদ্ধ করছি! রাগে তখন সর্ব্বশরীর জ্বল্‌ছে! অবশেষে টাইটাকে নিয়ে পৈশাচিক বলে টানাটানি আরম্ভ কর্‌লে হ্যাথাওয়ের বাড়ীর রীতিমত দামী সিল্ক টাই 'দ্বিধাভিন্ন'—অবশ্য তোমার রঘুবংশের 'শিখণ্ডীর কেকা'র মত নয়! উঃ, তখন আমার কপালে ঘাম বেরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া দ্বিতীয় টাইয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে হৃদয়ে গভীর ত্রাস ও বিষাদের সঞ্চার করিয়া স্পষ্ট "গুড়ুম" শব্দে ৯৷৷টার তোপ পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখি সত্যই ত সাড়ে নয়টা!—অবসন্নভাবে আমি নেয়ারের খাটের উপর বসিয়া পড়িলাম! আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পরদিন মজঃফরপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শ্বশুরমহাশয়ের গাড়ী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল—শ্বশুরালয়ে একটা ভাবনার তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সজ্জিতা, মিলনাশায়-উৎফুল্লহৃদয়া, প্রতীক্ষাকারিণী হৃদয়-লক্ষ্মীর নয়নপল্লব-দুটি অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গে অশ্রুভারাক্রান্ত! আহা, সে যে লিখিয়াছে,—বুকপকেট হইতে ধাঁ করিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম,—সে লিখেছে,—"তুমি এসো, নিশ্চয় এসো,—কতদিন বল দেখি, আশাপথ চেয়ে বসে থাকব? এবার না এলে তোমার জোটিকে আর দেখতে পাবে না, এ নিশ্চয় জেনো!" এই দুটি-ছত্র থেকে, আমি তার ছোট-হৃদয়ের প্রগাঢ়-অনুরাগ অনুভব করে যে, আপনাকে নায়কগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে বসে আছি! হায়, এ কি গ্রহ! এ কি বিড়ম্বনা! ভাবিলাম, "কি আর হবে, কাল যাব!"

নিকটেই ছিল, আসিয়া কহিল, "কেন দাদাবাবু?" আমি কহিলাম, "গাড়ী চলে গেছে?" "না।" "আচ্ছা, আজ আর আমার যাওয়া হল না! বড় মাথা ধরেছে, তাই শুয়েছিলুম—মাথাধরা ক্রমশঃই বাড়ছে—তা ঐ গাড়ী করে লালদীঘির টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসি।" গদাধর কহিল,—"ইঃ, তাইত, দাদাবাবু, তা হলে দেরী কর্‌বেন না—তাঁরা আবার ভাববেন! আপনার মুখখানাও যে উঃ, জ্বর-জ্বর-মত দেখাচ্ছে!" আর জ্বর-জ্বর! আমার কান্না পাচ্ছিল। বল কি হে, কতকাল পরে এই প্রিয়া-সম্মিলন—আর এই প্রথম! তাহার উপর এমনি ব্যাঘাত! দু' একজন বন্ধু এলেন। তাঁরা গদাধরের কাছে সমস্ত শুনে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, "কাল যেয়ো, তার আর কি?" আমিও কহিলাম, "হাঁ, তা না ত কি!" কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে বেদনা হচ্ছিল, তা যেন, হে ভগবান্, এমন দুর্দ্দশা এমন বিপদ শত্রুরও না হয়! বিলাতী-বেশ ত্যাগ করে একজন সহবাসীকে নিয়ে টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালাম—"বড় মাথাধরা—কাল যাইব—পঞ্জাব মেল—!" তার পর ভাবিলাম, আজিকার এ উদ্বেগ নিয়ে শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ বিড়ম্বনা হবে। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন শনিবার—ষ্টার থিয়েটারে নূতন "চন্দ্রশেখর" খুলিয়াছে—তাহারি অভিনয় দেখিতে গেলাম। উঃ, কি ভিড়! আটটি টাকা দিয়ে দুখানি ড্রেস্-সার্কেলের টিকিট নিয়ে উপরে গেলাম! খানিকটা প্লে দেখার পর মন কিছু সুস্থির হল; নিজের অবস্থাটা একবার ভাবলুম—কোথায় ট্রেণের প্রথম শ্রেণীতে বসে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি, তা' না কোথায় ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রশেখর" অভিনয় দেখ্‌ছি! ভাগ্যে বার্থটা রিজার্ভ করিনি, ভগবান্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন আর কি! ভাবলুম, অমৃত বোসকে ব্যাপারখানা খুলে বললে এখনি একখানা ফার্স লিখে ফেলে! স্থির করলুম, আগে ত শ্বশুরবাড়ী

যাই হোক্, পরদিন সন্ধ্যাবেলায় 'মোণি গুপ্টু'কে এনে বসিয়ে, তাকে দিয়ে নিজের বেশভূষা ঠিক করে, সাতটার মধ্যেই ফিট্ হয়ে রইলুম। তারপর সে রাত্রে যখন ৯৷৷০ টার তোপ পড়ল, তখন দেখি, আমি ট্রেণের প্রথম শ্রেণীতে বসে! একবার সন্দেহ হোল, ভাবলুম, এ বুঝি স্বপ্ন! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। পরে দেখি, না, সত্যই ত বটে—এই যে গাড়ী বেশ চল্‌ছে, আর আমি তার মধ্যে এই যে বসে মজঃফরপুর চলেছি।"

লাহিড়ী স্থির হইয়া সিগারে টান দিল। আমরা বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। আমি কহিলাম, "তা হলে সাহেবের প্রাণেও এ দৌর্ব্বল্যটুকু আছে।"

লাহিড়ী কহিল,—"কিসের দৌর্ব্বল্য?" আমি কহিলাম, "নবোঢ়া পত্নীর জন্য কাতরভাবে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হওয়া!"

লাহিড়ী কহিল,—"কেন, এ উদ্ভট প্রশ্নের অর্থ কি?" আমি কহিলাম, "আমাদের ভারী ঠাট্টা করতে কি না—ছুটি পেলে কিম্বা কলেজ পালিয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতুম বলে!"

লাহিড়ী কহিল,—"সেটা ভাই, গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নয়। বল কি, তোমরা স্ফূর্ত্তি করে বেড়াবে, আর আমি খালি চিঠি নিয়েই থাক্‌ব!"

অচল হাত বাড়াইয়া কহিল, "পথে এসো দাদা, ও romantic excursion টুকুর লোভ সুবিধা পেলে যে ছাড়ে, সে-ত অতি হতভাগা!"

আমি কহিলাম, "থাক্ থাক্, এখন যা বলছিলে বল হে, ভারী জমিয়ে তুলেছ—"

লাহিড়ী কহিল, "সত্যি নাকি? Thanks!"

(৩)

লাহিড়ী আবার আরম্ভ করিল,—"ষ্টেশনে দুইটি সম্বন্ধী আসিয়াছিলেন আমার অভ্যর্থনার জন্য! সাহেবী-বেশ ও আমার কাছে ফটো ছিল, তাহা হইতেই তাঁহাদিগের সম্বন্ধ-নির্ণয় কর্‌তে অসুবিধা হয় নি! বাহিরে ল্যাণ্ডো ছিল, আমরা গৃহাভিমুখে চলিলাম।

বাড়ীতে আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়ে গেল। বলা বাহুল্য, আমি কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিলুম। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সঙ্গে কখনো এমন ভাবে ত মিশি নাই, আর এ একেবারে অন্তরঙ্গ বলে অন্তরঙ্গ! পদে পদে অপ্রতিভ হচ্ছিলুম। কথাবার্ত্তা, চলাফেরা, বসা-দাঁড়ান কিছুতেই যেন তেমন সুবিধা-গোছ মনে হচ্ছিল না; এ সব আদব-কায়দা দুরস্ত ত নেই! এদের দলে পড়ে কেবলি মনে হচ্ছিল, এরা যেন কতকগুলো রূপার টাকা আধুলি, আর তার মধ্যে আমি যেন নেহাৎ একটা পারা-মাখান পয়সা কোন রকমে সেঁধিয়ে পড়েছি!

হঠাৎ আদেশ শোনা গেল,—"ফুলচাঁদ, গোসলখানা—"! শ্বশুর-মহাশয়ের মুখ হতে এ আদেশ-বাণী নিঃসারিত হল! ফুলচাঁদের ব্যগ্রতায় আমি ত সন্ত্রস্ত! হক্ কথা বলতে কি, বাড়ীর লোকেদের কাছে যেন কতকটা থই পাচ্ছিলুম, এ ফুলচাঁদ্-মহীপতের কাছে আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলুম। এরা মুখের সামনে তড়বড় করে নাটকোচিত ভাবে এমনি অনর্গল হিন্দী বলে যায় যে, আমার তাক্ লেগে যায়! আমি সত্যি ভাবি,—হা আমার সোণার দেশ!—এদের বাড়ী বিয়ে করে কি ঝকমারিই করেছি! যাক্, তার পর ত খাবার পালা! শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসা গেল। দু' তিনটি ছোট মেয়েও আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বস্‌ল। আমাকে খাতির করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য! আঃ, সে রকমারি ডিস দেখে আমার রসনা

সবিশেষ প্রলুব্ধ হলেও, আপনার দুর্দ্দশার কথা মনে করে আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিলাম! এরা কেমন নিঃশব্দে ক্ষিপ্রহস্তে আপনাদের ভোজন ব্যাপার সমাধা করে চলেছে, আমার প্লেট আর খালি হয় না। যতই সতর্ক হতে যাই, ততই প্লেটে-কাঁটায় ঠোকাঠুকি হয়ে এক অপূর্ব্ব কিঙ্কিনী-রাগিণীর সৃষ্টি করে! কাঁটা-বিদ্ধ আলু ও মাংসের টুক্‌রা মুখের কাছে তুলতে যাই আর অমনি কাঁটা-চ্যুত হয়ে পড়ে যায়! কোন্‌দিক সামলাই ঠিক করতে পারছি না—এমন সময় হঠাৎ একটি মেয়ে বলে উঠল—"বাবা দেখ, লাহিড়ীমশায় বাঁ হাতে ছুরি ধরেছেন, আর ডানহাতে কাঁটা!" শ্বশুরমশায় বললেন, "নীহার, ছুরিটা ডানহাতে ধরলে সুবিধা হবে, বোধ হয়!" তখন ফক্কড় মোণি গুপ্টুর মস্তক-চর্ব্বণের বিফল বাসনা আমার অন্তরের মধ্যে গুম্‌রে উঠতে লাগ্‌ল। পাজী, নিমকহারাম!—

আবার বিপদ!—কিছু পরে একটি জ্যাঠা ছেলে—আমার শ্যালক-মহাশয়ের বংশধর—বলে উঠ্‌ল—"কেমন করে Salad খাচ্ছে দেখ।" কথাটা বলিয়া সে তাড়া খাইল বটে, কিন্তু আমার মনে পড়িয়া গেল সেই কথামালার মৃণ্ময় ও কাংস্যপাত্রের গল্প! কেন, আমার এ সাহেবিয়ানা প্রকাশের কি প্রয়োজন ছিল, আর এই কি তার উপযুক্ত স্থান?—নির্লজ্জভাবে এমন হাস্যাস্পদ হওয়ার কি এমন সার্থকতা? স্পষ্ট নিজের অক্ষমতা স্বীকার করলেই হত ত! দিব্য আসনে বসিয়া বাঙালীর ছেলে সেরেস্তাদার-পুত্র পূর্ণ-আরামে ভোজ্যবস্তুর সদ্‌ব্যবহার করতে পারতাম, তাহাতে আপনার দৈন্যকে এমন মর্ম্মঘাতীভাবে সকলের সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান করে তুলতে হত না ত!—

আহারাদির পর বিশ্রামের আয়োজন হল! কিয়ৎকালের জন্য নিদ্রা দেওয়া গেল। শয্যাত্যাগ করিতেই শ্বশুরমহাশয়ের আহ্বান আসিল। গেলাম—প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া কংগ্রেসের আলোচনা

শাশুড়ীঠাকুরাণী ত জামাতাকে নিকটে বসাইয়া খাওয়াইলেন না—আর ততোধিক মর্ম্মবেদনা, এখনো অবধি জোটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না—একটা বিদ্যুৎচমকের মত ক্ষণিক দৃষ্টি-বিনিময়ও নয়! আমি যে, হায়, সেই আশায় দিবানিদ্রার ভাণ করিয়া, কক্ষ হইতে সকলকে বিদায় দিয়া তাহার নূপুর-শিঞ্জিতের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম! নাঃ, এ কষ্ট অসহ্য! শ্বশুরবাটিতে এতদিন পরে, এবং এই প্রথম আসিয়া এখনো যার অদৃষ্টে প্রিয়া-সন্দর্শন না ঘটে, সে অতি 'বেচারী'!

অপরাহ্নে শ্যালকবৃন্দে পরিশোভিত হইয়া ক্লাবে চলিলাম। সেখানে দু'একজন ঘোষ বোস চৌধুরীর সহিতও আলাপ হইল। মধ্যম শ্যালক কহিলেন, "টেনিস খেল্‌তে জান বোধ হয়?" টেনিসের নিয়মগুলা শুধু জানতাম, আর খেলাও এক রকম দেখিয়াছি, তবে হাতে-কলমে কখনো অভ্যাস করি নাই। নেহাত এতগুলা লোকের সম্মুখে একেবারে 'জানিনা' বলিতে কেমন সঙ্কোচ হল; তাই বললুম, "হ্যাঁ তা জানি বৈ কি! তবে আজ প্রায় বছরখানেক অভ্যাস নেই!" "O! Never mind Johnny. come along old chap" বলিয়া মধ্যম শ্যালক সোৎসাহে আপনার দলে আমাকে টানিয়া একেবারে খেলিতে হাজির! তখন আমার হঠকারিতার ফল হৃদয়ঙ্গম কর্‌লাম। 'খেলিতে জানি' বলিলেই কি খেলিতে হয়, মহাশয়! এ কি বদ্ এটিকেট!

নিতান্ত গ্রহবৈগুণ্য ভেবে নেমে ত পড়লাম। ভাবলেম, মরি আর বাঁচি, সটাসট্ ব্যাট হাঁকড়াবো। হাঁ হাঁকড়াব, হেসোনা, তাকে হাঁকড়ানোই বলে হে, খেলা বলে না—দেখি যা থাকে বরাতে! এমনি গোঁ নিয়ে ত ব্যাট ধরলুম। যেমনি বল আসে, অমনি চোখ কাণ বুজে সজোরে ব্যাট চালাই—আর অদৃষ্টের গুণে লেগেও ত যাচ্ছে। বলব কি, চারিধারে আনন্দধ্বনিও উঠেছিল। কিন্তু উঃ কি ভারী ব্যাট হে, চালাব কি বল, ধরবারই যুৎ হয় না, আর একটু হাল্কা হলে টেনিসে champion

হবার চেষ্টা দেখা যেত! তারপর টেনিস্ 'সু' নাই, যদিও তা থাকলে কতটা সুবিধা করা যেত, সেটা খুবই একটা কঠিন সমস্যা! এই রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একবার যেমনি লাফিয়ে উঠে সজোরে বল মারতে যাব, অমনি পা পিছলে একেবারে পপাত "ধরণীং ভরণীং মাতরম্!" মূর্চ্ছা যাইনি এটা ঠিক, কেননা তদ্দণ্ডেই চারিধারে যে বর্ব্বর হাস্যধ্বনি উঠেছিল, মূর্চ্ছা গেলে তা' কখনই শোনা যেত না! কিন্তু ভাই, ভয়ঙ্কর লেগেছিল! মানুষের এই যে দুর্ব্বল স্বভাব, একজন পড়ে গিয়ে জখম হচ্ছে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা দেখে সকলে অকাতরে কি করে দন্তোন্মীলন করে হাসে—এটা একটা মস্ত দার্শনিক সমস্যা! এটা নিশ্চয় মানুষের আদিম অসভ্যতার একটা জাজ্জল্যমাণ প্রমাণ, এই মনে করে গায়ের ধূলা ঝেড়ে ত উঠলাম। তখন চারিধার এমনি শান্তভাব ধারণ করেছে যে, মনে হল, কিছু-পূর্ব্বে যে হাস্যধ্বনিটা শোনা গেছল সেটা যেন এখান থেকে ওঠেনি, যেন কোন অদৃশ্য দানবরাজ্য থেকে হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য ছুটে এসেছিল! দু' একজন সান্ত্বনা দিলেন—"জমি পিছল আর পায়ে কোর্ট সু!" আমি নতমুখে তাঁদের ধন্যবাদ দিলুম। কিন্তু চেয়ে যখন দেখলুন যে, ব্যাটখানা একেবারে লাইনের ধারে গিয়ে পড়েছে, তখন এঁদের হাস্যরসের উৎস কোথায়, বুঝতে পারলুম। এদের হাসাটা সত্যই অন্যায় হয়নি! যাই বল, এমন নিষ্ঠুরভাবে কেউ কখনো টেনিস খেলেনি'! আমিও স্তম্ভিত হলাম্ আমার হাতের জোর দেখে—তাইত, ব্যাটখানা এতদূর এসে পড়েছে! আশ্চর্য্য!

বাড়ী ফিরলুম। ভাবলুম, এ সব দুঃখ এখনি ভুলে যাব। এখন জোটিকে কখন দেখব। রাত্রে আহারাদির পর হলঘরে সব বসে গল্প হচ্ছে, আমি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাইছি কখন শয়নমন্দিরে যাবার ডাক পড়বে! এমন সময়ে বাহিরে একখানা গাড়ী থামল। হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকুরাণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ওদের আর আসা হোল না! তাঁরা

কিছুতে ছাড়লেন না। নাচ হবে, সখের থিয়েটার হবে,—নেলি, জোটি মেজবৌমা রইলেন! দত্তসাহেবের স্ত্রী কিছুতে ছাড়লেন না।" এ কি কথা! জোটি তবে এ বাড়ীতেই আজ নাই? হায় কপাল!

সমস্ত ব্যাপার শুনিলাম। এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট জজ দত্ত সাহেবের পুত্রের অন্নপ্রাশন, তাই তাঁহার গৃহে আজ নাচ, থিয়েটার! গৃহিণী, কন্যা ও বধূবর্গকে নিয়ে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; নিজে ত ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু নেলি জোটিরা সেখানে পড়িয়া রহিল! আমার ভারী রাগ হইল। কতকাল পরে আজ প্রথম এই শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছি, স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর মোটে দেখাই হয় নাই, দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছি, আর ইঁহারা সটান্ তাহাকে নিমন্ত্রণে পাঠাইলেন। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের উপর একটা মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মাইল। জোটির উপরও রাগ হইল। সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য একটুও উৎসুক নয়? এই তার ভালবাসা! নাচ-দেখাটা স্বামিসম্ভাষণের চেয়েও তার কাছে গুরুতর বোধ হল! এই স্ত্রী নিয়ে আমাকে সমগ্র জীবন কাটাতে হবে, আর আমি সুখী হব? হা ভগবান্! বলব কি ভাই, দুর্ব্বলতাই বল, আর যাই বল, রাগে, দুঃখে, অপমানে আমার চোখে জল আসবার মত হল। ভাবলুম, এর প্রতিশোধ চাই! কালই আমি এখান থেকে চলে যাব! শ্বশুরবাড়ীকে জানাব যে, তোমরা বিলাত পাঠাইবে বলিয়া তোমাদের প্রসাদলাভের জন্য কি এতদূর হীন অপমান সহিতে হইবে? কখনো না! না হয়, বিলাত না-ই-বা গেলাম! এরূপ আচরণ কি আমাদের সমাজে সম্ভব হইত?

(৪)

পরদিন বেলা আটটার সময় শ্যালকবৃন্দ বনভোজনের আয়োজন করিলেন। পাছে কোনরূপে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়,—এই আশঙ্কায় মনের ভাব আমি মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিলাম।

বনভোজনে সঙ্গীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইল না। গান-বাজনায় আমোদ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। সহসা প্রস্তাব উঠিল,—"চল একটু নৌকায় বেড়ান যাক্।" আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। বেশ!

বাগানের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দীঘি। তাহাতে ছোট একখানা ডিঙীরও অভাব ছিল না। আমরা ৫।৬ জনে ডিঙীতে উঠিলাম। ঈডেন গার্ডেনে Rowing করা ছিল, সেই সাহসে এখানে একেবারে হাল ধরিবার প্রলোভন সম্বরণ করা গেল না।

অদূরে বৃক্ষতলায় গানের আসর বেশ সরগরম! রবিবাবুর সুন্দর গানে আমার মন নৌকার দিকে ছিল না; গান বড় সুন্দর লাগছিল। দিব্যি গলা। আমার পা কাঁপিতেছিল। কেমন করিয়া হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, হাল সজোরে আমার স্কন্ধে আসিয়া লাগিল ও আমিও সে প্রচণ্ড বেগ সামলাইতে না পারিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম! তাহার পর কি হইল, কিছুই জানিনা।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল—অর্থাৎ বেশ স্পষ্ট জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন দেখি রাত্রি হইয়াছে মাত্র! ঘরে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় আমি শয়ন করিয়া আছি, আলো জ্বলিতেছে, হঠাৎ মনে পড়িল, আমি জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। ঘাড়ে বেশ ব্যথা বোধ হইতেছিল—হাতে দু'এক স্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—চোট লাগিয়াছিল, সমস্ত শরীরেও বেদনা। যন্ত্রণায়, আঃ মাগো বলিয়া পাশ ফিরিলাম। চোখ আপনি অলসভাবে বুজিয়া আসিল। সহসা চুঁড়ির টিংটাং শব্দ শুনিলাম ও একটি স্নিগ্ধ পুষ্প-সুরভি! চোখ চাহিবার পূর্ব্বেই একটি কোমল হাত আমার ব্যথিত ললাট স্পর্শ করিল—আঃ এ কি শান্তি! এ কি আরাম! ভাবিলাম, এ কি স্বপ্ন! মিষ্টকণ্ঠে কে ডাকিল, "ঘুমুচ্ছ?" "কে!" করুণসুরে উত্তর হইল, "আমি জোটি, চেয়ে দেখ!" আমি কহিলাম—"জোটি, এসেছ?" "হাঁ, এখন কেমন

পড়ে গেছলাম, না জোটি?"—"হাঁ, দাদারা ও সবাই মিলে তোমাকে তোলে। বেশী জল ছিল না তাই, নহিলে উঃ কি হোত!"—"আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলাম, না?" "হাঁ—উঃ, কেবল আমি ভাবছি কতক্ষণে তুমি কথা কবে! ডাক্তার সাহেব জাগাতে বারণ করে গেছেন আবার তিনি রাত নটার সময় আসবেন!" জোটি আমার পাশে বালিশে মুখ গুঁজিল।

আমি কহিলাম,—"জোটি, তোমার নাচ দেখার ব্যাঘাত হয়নি ত?"

জোটি আমার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌ছি, আমি একটুও নাচ দেখিনি; আমার মোটে ভাল লাগ্‌ছিল না—একপাশে পড়ে ঘুমিয়ে ছিলুম—কি করে রাত কেটে— তা আমিই জানি! আমি ত মার সঙ্গে চলে আসছিলুম, তা তাঁরা কি ছাড়েন? মা বললেন,—তুমি এসেছ, কি মনে করবে! তা তাঁরা তোমাকে শুদ্ধ নে যাবার জন্য ব্যস্ত। মা বললেন, তোমার একে ট্রেণে আসতে কষ্ট হয়েছে, এখানে আসতে গেলে আরো কষ্ট হবে। তা মা চলে এলেন, আমাদের কিছুতে তাঁরা ছাড়লেন না। সত্যি আমার যাবারও ইচ্ছা ছিল না। আমার দোষ হয়েছে, আমাকে মাপ কর!"

জোটির মিষ্ট কথায় ও ততোধিক মিষ্ট ব্যবহারে আমার রাগ পড়ে গেল। তবু দুর্জ্জয় অভিমানের একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়লুম। বললুম, "জোটি, কাল যদি জলে ডুবে মরে যেতুম, আর দেখা হতো না—তা হলে বেশ হত, না?"

"তোমার পায়ে পড়ি, ও কথা বলোনা; আমায় মাপ করবে না?" জোটির চক্ষু হইতে টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল আমার কপালে পড়ল। আঃ, সেই একফোঁটা চোখের জল কি পবিত্র! কি নির্ম্মল! তাতে আমার যন্ত্রণারও যেন কতক উপশম হল। আমি তাকে বুকের উপর

অচল হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"বল কি হে, এককোঁটা চোখের জলে যন্ত্রণার উপশম হল, আর ডাক্তার-সাহেবের ঔষধে কিছু হয়নি! বেইমান্!"

লাহিড়ী কহিল, "হাঁ হে, সে কি সামান্য জিনিষ! সে যেন একেবারে——"

আমি কহিলাম,—"স্নিগ্ধ প্রলেপ আর কি!"

লাহিড়ী কহিল,—"That's it! সত্যি হে, সেই সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনা-ক্ষতের উপর সেই চোখের জলটুকু বাস্তবিকই মনে হয়েছিল, যেন সুধাস্নিগ্ধ প্রলেপ!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সহযোগী।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "মলমাস ও পাঁজী" হৃদয়গ্রাহী বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। "প্রাচীন ভারতের অনার্য্য নরপতি কনিষ্ক" শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; বিশেষ সরল না হইলেও সুপাঠ্য। "শিল্পসমিতির প্রবন্ধাবলী"তে "রেশমের-চাষে"র উপাদেয় বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য" শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক রচনা। "মাথায় ঘোল" বৌদ্ধ জাতক-গ্রন্থ হইতে তথা-প্রচলিত 'মাথায় ঘোল ঢালা' প্রবাদ-প্রসঙ্গের অনুবাদ। "পেকিন রাজপুরী" পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। 'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের' "রামধনের কীর্ত্তি" গল্পটি কৌতূহলোদ্দীপক, সরল সহজ বর্ণনাভঙ্গীতে সুখপাঠ্য। "স্বদেশীয়ত্ব ও বিদেশীবর্জ্জনের মাত্রা ও প্রকার-ভেদ" বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি! কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ! "স্বদেশী ও বহিষ্কার" চিন্তাশীল সময়োপযোগী প্রবন্ধ! "হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি" প্রবন্ধের লেখক আবদুল হামিদখান ইউসফজী, হিন্দুমুসলমান-বিরোধে 'কতিপয় অজ্ঞানদৃপ্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমগ্র মোসলমান জাতিকে দেশের এই দুঃসময়ের মধ্যে অবিশ্বাস, করিতে সকলকে নিষেধ করিতেছেন এবং পরিশেষে বলিতেছেন, "আসুন আমরা জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করি, বাদ-বিসম্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক হইয়া যাই।"' শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "মা" কবিতাটি স্নেহ জ্যোৎস্নার নির্ম্মল-কিরণে সুন্দর বিকাশলাভ করিয়াছে। "তপস্যা" শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি দুর্ব্বোধ কবিতা। ভাষার বিরাট গহনে ভাব-বেচারী নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। লেখক ও পাঠক উভয়েরি দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই!

সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "কবি-

কঙ্কণ চণ্ডী"র মনোজ্ঞ আলোচনা এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।" অবশেষে "সাহিত্য"ও এ অমৃতবণ্টনে প্রবৃত্ত হইলেন; ভাল! শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনের "চন্দ্রশেখর-চরিত্র" একটি অক্ষম রচনা। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত চন্দ্রশেখরকে আদর্শস্বরূপ একাসনে বসাইতে লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। 'আদর্শ-মেকারের' দিনে বসাইলেই হইল! লেখক চন্দ্রশেখরকে অতঃপর 'ঋষি'-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন! তিলে-তাল করিবার পক্ষে বাঙালীর যে একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, এবং যাহার ফলে দুই ছত্র কবিতার লেখককে ব্রাউনিং এবং রামশ্যামের কথাবার্ত্তা-রিপোর্টারকে সেক্সপিয়রের সহিত একাসনে বসাইবার আগ্রহ,—এটি সেই প্রবৃত্তিরই ফলপ্রসূত! চরিত্র-সমালোচককে সর্ব্বদা যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে,—অসঙ্গত আবেগের দ্বারা পরিচালিত হইলে, সে সমালোচনা নিতান্ত অর্থহীন দাঁড়াইবে, এ কথা প্রত্যেক চরিত্র-সমালোচকের স্মরণীয়। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "কমলা" গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্রে'র ক্ষীণ ছায়া আসিলেও, ইহার মধ্যে লেখকের একটি স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। অন্তর-প্রকৃতির সহিত বহিঃ-প্রকৃতির সহানুভূতি, লেখক অতি সু-কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "অনুবাদ-সাহিত্য" উপভোগ্য রচনা। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের "মিলন।" সনেট! "সহযোগী সাহিত্যে" 'ভারতের পরীকাহিনী' ও 'লে মসারেবেল গ্রন্থের উদ্দেশ্য' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দের "জয়দেব ও তদানীন্তন কালের সমাজচিত্র" প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। "১৫১৩ সাল" এখনো চলিতেছে এবং যেরূপ দেখিতেছি, কিছুকাল চলিবেও। মন্দ কি! শ্রীযুক্ত [illegible]

উইলের কথা বিবৃত হইয়াছে। প্রথম বর্ষের "সাহিত্য-সংহিতা"তে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল ত', তবে আবার এ পুনরাবৃত্তি কেন? শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের "বঙ্গীয় নাট্যশালা" সুন্দর সুদক্ষ আলোচনা; এ সংখ্যা 'বাণীর' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গ পাঠ না করিলে কর্ত্তব্য-হানি হইবে। লেখক এই প্রবন্ধে রঙ্গালয়ের পোষাক পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, "পোষাক ঠিক উপযুক্ত না হইলে অভিনয়ে কোন অভিনেতা যথার্থ ভাবোদ্রেক করিতে পারেন না। এজন্য পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব অভিনেতার।" ইহা অতি সাধারণ কথা হইলেও, আমাদিগের নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গের এদিকে ঔদাসীন্য প্রবল! যাহার যে পোষাকে অবতীর্ণ হওয়া উচিত, তাহাও ঘটিতে দেখা যায় না। সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে "প্রফুল্ল" নাটকের অভিনয়ে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফিমহাশয় রমেশ-এটর্ণির ভূমিকা লইয়া অবতরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র 'আধময়লা' এবং হাঁটুর প্রান্তটুকু কোনমতে আবৃত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং গাত্রেও আধময়লা পঞ্জাবি! প্রায় সকল দৃশ্যে ঐ একই কাপড় এবং একই জামা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম—ইহাই কি রমেশ-এটর্ণির পোষাক? ষ্টারে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুমহাশয় রমেশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি বেশ ধোপদোস্ত কাপড় ও কখনো পঞ্জাবি, কখনো সার্ট, কখনো বা গেঞ্জিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ত এটর্ণির মত পোষাক! যাহার যেমন পদবী তাহাকে সেরূপ বেশে নামিতে হইবে ত! অর্দ্ধেন্দুবাবুর ন্যায় প্রবীণ বিশেষজ্ঞর পক্ষে এরূপ ঔদাসীন্য প্রকৃতই দুঃখের কথা। make-up অর্থাৎ বর্ণ-সজ্জার প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—"যুবামুখে কোথায় কি রঙ্ দিলে, কোথায় কি রঙের কিরূপ রেখা টানিয়া দিলে তাহা বৃদ্ধের মুখ হইবে, বঙ্গীয় নাট্যশালার কোন অভিনেতা বা বেশ-কারী তাহা জানে না। যাত্রার দলের সজ্জার

অনুকরণে একটা বুড়ার চুল মাথায় দিয়া, ভ্রূতে ও গোঁফে খড়ি লাগাইলেই বুড়া সাজা যায়, ইহাই আমাদের নাট্যশালার বিশ্বাস। বুড়া সাজিতে হইলে যে যুবকের মুখেও বুড়ার মুখের মত গাল তুবড়াইতে হইবে, চোখের কোণে কপালে কোঁচকা দেখাইতে হইবে, রগে শিরতোলা দেখাইতে হইবে, তাহা না হইলে যে বুড়ার মুখই হইবে না, তাহা কেহ বুঝে না, ভাবে না, জানে না।” এ বিষয়ে ইংরাজী-ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক আছে, রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অধ্যক্ষের সেগুলির সহিত সম্যক পরিচয় একান্ত বাঞ্ছনীয়! আর একটী কথা, যতদিন না দায়িত্ব-জ্ঞানবিশিষ্ট শিক্ষিত সম্প্রদায় রঙ্গালয়-সংস্কারের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিবেন, তত দিন এ সকল ত্রুটি কিছুতেই সংশোধিত হইবে না। ফ্রী-পাশের আশায় সাপ্তাহিকের সম্পাদককে কখনো অভিনয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে দেখিলাম না। ফ্রি-পাশের মায়ায় আবদ্ধচক্ষু সম্পাদক, ভীষণ চীৎকার ও বিষম তাণ্ডব লম্ফ-ঝম্প বীর্য্যাভিনয়ের চূড়ান্ত বলিয়া চারিধারে ঘোষণা করিতে ব্যস্ত! এসকল প্রকাণ্ড গলদ তাঁহাদিগের চক্ষে বিরাট গুণ বলিয়াই যে ক্ষেত্রে প্রতীত হইতেছে, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের হাস্যকর এবং অনিষ্টজনক অভিনয়ালোচনা যাহাতে কোনরূপ প্রশ্রয় না পায়, তৎকল্পে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। “৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন, “ইঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় ঘটনা অনেকেরই জানা নাই, অথচ বঙ্গসাহিত্য-হিসাবে বিশেষ প্রয়োজন।” সাধু! কিন্তু প্রবন্ধ হইতে এতটুকু প্রয়োজনীয়তাও ত বুঝা গেল না। “পদ্মাতটে” শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। ইহার ভিতর “সোণালি সবুজ গাঙ্-ভরা জল”, “দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না”, “চুকান সুখের” ও “লুকান মুখের” অভাব নাই। এত গালভরা কথার অস্তিত্ব সত্ত্বেও যদি “কাব্যি” না হয়, তাহা হইলে কবি ত নাচার!

প্রায়শ্চিত্ত ।

(১)

তারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে আজ একটু বিশেষ সমারোহ। গ্রামের বৃদ্ধ এবং প্রবীণ নেতাগণ আজ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "একালের ছেলেগুলো লেখা পড়া শিখে একেবারে বয়ে গেল। নবীনমাধব এই সে-দিনকার ছেলে, সে কি না কলকাতা থেকে একটা পতিতা কলঙ্কিনীর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল, একবার আমাদের জিজ্ঞাসাও কল্লেনা। কুশিক্ষার কি বিষময় ফল!"

বৃদ্ধ বামনদাস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাই জন্যেই ত' অনেক ভেবে-চিন্তে ছেলেটাকে টোলে দিলাম।"

তারাশঙ্কর অধিকতর ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এর প্রতিকার করতেই হবে। যতদিন তারাশঙ্কর চাটুয্যে বেঁচে থাকবে, ততদিন এমন কথা কেউ বলতে পারবে না যে, হলুদগাঁয়ে এত বড় একটা গর্হিত পাপ ক'রে পাপী পরিত্রাণ পেয়ে গেল। এর প্রতিকার করতেই হবে।"

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় একপাশে বসিয়াছিলেন; তিনি এইবার কথা কহিলেন,—"কিন্তু দাদা, এর নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ নবীনমাধব দেখাবে। যতক্ষণ তার মুখ থেকে আমি সব কথা না শুনি, ততক্ষণ আমি তোমাদের এর ভিতর নেই।"

তারাশঙ্কর রাগিয়া কহিলেন, "তবে তুমি বলতে চাও, আমরা মিথ্যা কথা বলচি।"

হরিহর মাথা নাড়িলেন, "ঠিক এমন কথাটি আমি বলিনে, তব বলচি ত নবীনমাধবের মুখ থেকে সব কথা আমি আগে শুনতে

খানিকটা চুপ করিয়া তারাশঙ্কর কহিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে।"

(২)

পরদিন সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপে তেমনি ভিড়। এক-পার্শ্বে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এবং সমবেত জনমণ্ডলী নিস্তব্ধে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

নবীনমাধব আসিয়া তারাশঙ্করকে অভিবাদন করিল, "আপনি আমাকে ডেকেছিলেন ?"

তারাশঙ্কর বলিলেন "হাঁ, বস, তোমার সঙ্গে আমাদের একটু বিশেষ কথা আছে।" নবীনমাধব উপবেশন করিলে, তারাশঙ্কর বলিলেন, "নবীন, তোমার বিবাহসম্বন্ধে আমরা যে একটা কুৎসা শুনছি, সেটা কি সত্য ?"

নবীনমাধব নির্ভয়ে তারাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সম্পূর্ণ সত্য।"

বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল ; শুধু তারাশঙ্কর বিজয়ীর মত দুই রক্তচক্ষু হরিহরের লজ্জাম্লান মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

খানিক পরে তারাশঙ্কর নবীনমাধবকে বলিলেন, "এত বড় গর্হিত কাজটা তুমি কেন করলে নবীন ?"

নবীন সহজ নম্রস্বরে উত্তর করিল, "আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, সে কথা আমি বলিব না।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় ! সমবেত জনমণ্ডলী পরস্পরের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

(৩)

মালতীকে নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া নবীনমাধব বলিল, "এখন বুঝতে পারচি, মালতী, তোমাকে না পেলে আমার জীবনটা

মালতী আপনার দুই বাহুদ্বারা নবীনকে জড়াইয়া ধরিল "কেমন করে তুমি আমাকে পেলে, বল না!"

নবীন কহিল, "সেদিন কলেজ থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। পাপের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বাস করেও তোমার অনাবিল অকলুষ হৃদয়ে পাপের প্রতি যে ঘৃণা সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সংসার তোমাকে পাপের মধ্যে ত্যাগ করেছিল, কিন্তু তোমার পবিত্র সুনির্ম্মল চিত্তে উদ্ধারের জন্যে যে করুণ প্রার্থনা জেগে উঠেছিল, তারি একাগ্রতা আমার চিত্তে সঞ্চারিত হয়ে তাকে অপূর্ব্ব বেদনায় মুহুর্মুহু কম্পিত, আলোড়িত ক'রে তুললে।"

"তার পর?" "তখনই আমি স্থির করলাম, ভগবান আমাকে একটা পুণ্য কার্য্য করবার এই যে সুযোগ দিয়েছেন, তাকে আমি কিছুতেই অবহেলা করতে পারিনে। অনেক বাধা এবং বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে যে তোমাকে আমি পেয়েছি, এইটে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করি।"

"কিন্তু আমি তোমাকে একমুহূর্ত্তও সুখ দিতে পারি নি। আমাকে বিবাহ করার পর থেকে তোমাকে কি লাঞ্ছনা, কি নির্য্যাতনই না সহ্য করতে হয়েছে! কে জানে, এখনও কত বিপদ আছে! এখন আমি ভাবি, হায়, কেন তোমাকে আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করেছিলাম!" মালতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

চোখের জল মুছাইয়া দিয়া নবীনমাধব কহিল, "ছি, মালতী।"

ঠিক সেই সময়ে তারাশঙ্করের চণ্ডীমণ্ডপে নবীনমাধবের বিপক্ষে একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র হইয়া গেল।

(৪)

গভীর রাত্রি! অস্ফুট জ্যোৎস্নার মধ্যে সুপ্ত হলুদ-গাঁ একখানি

এমন সময় নবীনমাধবের গৃহে আগুণ ধরিয়া উঠিল!

প্রথমটা কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অবশেষে যখন গৃহ হইতে বাহির হইবার একমাত্র পথে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, তখন নবীনমাধবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নবীনমাধব মালতীকে সত্বর উঠাইয়া দিল।

দুইজনে যখন বাহির হইবার পথ হইতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন গৃহের অধিকাংশ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং মালতী ভয়ে কাঁপিতেছিল। নবীনমাধব তাহাকে আপনার বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মালতী, ভয় নেই, ওই জানলা ভেঙে আমরা বেরুবো।"

সে দিকে তখনও অগ্নিসংযোগ হয় নাই; নবীনমাধব সজোরে জানলার গরাদ ধরিয়া টানিতে লাগিল!

জানলার বাহিরে চট্টোপাধ্যায়-বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিড় লাগিয়াছিল। তাহারই মধ্যে একজন বলিল, "হায়, হায়, লোকগুলো পুড়ে মারা গেল।"

তারাশঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত!"

জানলা ভাঙিল না; উত্তেজনায় নবীনমাধব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ঘরের বাহিরে তখন ভয়ঙ্কর শব্দে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং ঘরের ভিতর এই একান্ত-অসহায়া নারী বুকে তাহার চেতনাহীন স্বামীকে জড়াইয়া, ধীরে ধীরে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িতেছিল।

এমন সময়ে মালতী হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল, এবং আপনার নিঃশেষ-প্রায় শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাণপণে ডাকিয়া উঠিল, "বাবা!" সহসা বাণবিদ্ধ হইলে ব্যাঘ্র যেমন চমকিত হইয়া উঠে, লেলিহাণ অগ্নির মধ্য হইতে সেই করুণ ক্রন্দনে তারাশঙ্কর তেমনি চকিত হইয়া একবার ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "মালতী!" এবং সেই মুহূর্ত্তেই উন্মত্তের মত লোলজিহ্ব অগ্নি-সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

পৈশাচিক বলে একহস্তে নবীনমাধবকে এবং অপর হস্তে মালতীকে ধরিয়া যখন তারাশঙ্কর আগুণ হইতে বাহির হইলেন, তখন দেখা গেল, তাঁহার বস্ত্রে আগুণ ধরিয়া উঠিয়াছে, এবং দেহের বহুস্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে!

মুহূর্ত্তে তারাশঙ্কর মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৫)

পাঁচদিন পরে তারাশঙ্কর চক্ষু চাহিলেন! মাথার শিয়রে হরিহর বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হরিহর, তারা কেমন আছে?"

"ভাল" বলিয়া হরিহর তারাশঙ্করের মস্তকে ধীরে কর-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া তারাশঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,"—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, হরিহর।"

"কিন্তু তাদের জন্যে তুমি তোমার জীবনকে এমন ক'রে কেন বিপন্ন ক'রলে, দাদা!"

বিস্ফারিত দুই চক্ষু হরিহরের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া, তারাশঙ্কর কহিলেন, "হরিহর, তোমার মেয়ে যদি তোমার হস্ত-প্রজ্বালিত আগুণের ভিতর থেকে তার সংজ্ঞাহীন স্বামীকে বুকে ক'রে নিয়ে, পরিত্রাণের জন্য আকুল প্রার্থনা জানায়, তা হ'লে কি তুমি স্থির থাকতে পারো?"

হরিহর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তারাশঙ্করের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালতী তা হ'লে—"

ধীরে ধীরে, পাশ ফিরিতে ফিরিতে তারাশঙ্কর বলিলেন, "হাঁ, মালতী আমারি মেয়ে!"

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলেয়া।

(১)

কে গো পথ-হারা কে গো গৃহ-হারা
চলেছ পথিক তুমি,
চঞ্চলচিত চরণ জড়িত
কণ্টক বনভূমি ?
শষ্প-বিরত প্রান্তর কত,
নির্জ্জন নদী-তট,
ধূধু ধূধু ধূসর ক্ষেত্র
কর্দ্দম লটপট,
মুণ্ডিত-শির খর্জ্জুর কোথা
পুকুর-কিনারে তাল
ফেলি পশ্চাতে কে তুমি ধাইছ
ঘর্ম্ম-পূরিত ভাল ?

(২)

থরে থরে থরে চলে মন্থরে
জলদ গগনময় ;
সম্মুখে, পিছে, মস্তকে, নীচে
অতনু তিমির বয় ;
চন্দ্র-তারক- -হীন অম্বর,
আলোক-শূন্য ধরা ;
দ্বিতীয় পথিক নাহিক চলিছে
যাই যাই ভয় ভরা ;

হে পথিক ! তোর   চোখে বহে লোর,
কেমনে চিনিবি পথ ?
ভিতরে বাহিরে   বিপুল তিমিরে
গতি-হীন মনোরথ।
এমন আঁধার !   উদ্দেশে কা'র
পান্থ ! চলেছ তুমি ?
চঞ্চল চিত   চরণ জড়িত
কণ্টক বনভূমি !

(৩)

ও কি ও সহসা   ওই অতি দূরে
প্রান্তর পর-পার
জ্যোতির্ম্ময়ীও   কাহার মূরতি
পড়ে চোখে বারবার ?
ত্রিদিব-কিরণ   জমায়ে যেন রে
গড়িয়াছে তনুখানি,
অংশু-গোলক   চন্দ্রমা যেন
ধরাতলে এল নামি !
যেন রে পথিকে   দেখাতে সুপথ
ইঙ্গিত বিধাতার,
ও কি ও সহসা   চমকে সুদূরে
প্রান্তর পরপার ?

(৪)

সে মূরতি হেরি   ভ্রান্ত নাবিক

আশার হরষে ছুটিল পথিক
লখি' সে চরণ-মূল।
যত যায় পথ না ফুরায় তত,
তবু ছবি-পানে ধায়;
ধরি' ধরি' করে, ধরিতে না পারে
ছবি যেন ছলে তায়!
এই আসে কাছে, এই যায় দূরে,
এই আছে, এই নাই;
খেলিছে যেন রে মায়ার চাতুরী
মোহিনী সর্ব্বঠাঁই!
স্তম্ভিত চিত দাঁড়াল পান্থ
দু'করে চাপিয়া আঁখি;
তবু সে মূরতি মানস-নয়নে
ফুটিছে আলোক মাখি।
চিৎকার করি' নয়ন মেলিয়া
পুনঃ সে পথিক চায়,
দেখে কাছে, পাছে, সুদূরে, অদূরে
অংশু-গোলক ধায়!
একটি গোলক আছিল পূরবে,
বিস্ময়ে দেখে হায়!
ক্ষুদ্র-বৃহৎ শতেক গোলক
নীরব-হাস্যে চায়!
কভু অতি-থির কভু বা অধীর
কাঁপিছে মূরতিগুলি;
ঘূর্ণিত-গতি নৃত্যে, লাস্যে

পান্থ পাগল   চিত চঞ্চল
ছুটিছে হারা'য়ে দিশা,
ছুটিছে যত রে   পথিকের চিতে
জাগিছে আলোক-তৃষা!
কি হ'বে ছুটিলে?   যে দূরে, সে দূরে,
ঘোরা-ফেরা শুধু সার;
শষ্প-বিরত   প্রান্তর সে'ত
কিছুতে না হয় পার!
মুণ্ডিত-শির   খর্জ্জুর সেই,
পুকুর-কিনারে তাল,
গেছিল ছাড়া'য়ে,   আসিল পিছায়ে,
ঘর্ম্ম-পূরিত ভাল!

(৫)

ধুধু ধুধু   ধূসর ক্ষেত্র
সংসার মরুভূমি;
তুমি পথ-হারা,   তুমি গৃহ-হারা
ভ্রান্ত পথিক তুমি!
অজ্ঞান ঘোর   গভীর আঁধার
ঘিরে আছে চারিধার;
সঙ্গ-বিহীন   চলেছ একাকী
গৃহপানে অনিবার।
পান্থ! তোমারে   সুপথের নামে
কুপথে লইতে হায়!
আলোক-মূরতি   আলেয়ার রূপে

আশ্বাস কভু তুলো না হৃদয়ে
বিশ্বাস করি' তা'রে,
ছোট-ছোট-ছোট মায়া-ছবিগুলি
ঘিরে তা'র চারিধারে।
সে যে রে মোহিনী মায়ার গোলক,
ত্রিদিব-গোলক ভ্রমে
পড়োনা রে হায়! গোলক-ধাঁধাঁয়
হে পথিক, কোন-ক্রমে।
ত্রিদিব-মাধুরী সে শুধু চাতুরী,
নহেক স্বরূপ তা'র;
গড়ে সে শরীর মর ধরণীর
বাষ্পিত ক্লেদভার!
ভ্রান্ত পথিক! শুন রে শুন রে
সে নহে স্বরগ-দূত,
সঙ্গে সঙ্গে বিহরে রঙ্গে
মায়ার প্রেতিনী ভূত!
কটূতে মধুর, গরলে পীযুষ
একি রে ভ্রান্তি তোর?
ভ্রান্ত পথিক! ছাড়রে ছাড়রে
মায়ার মোহিনী ঘোর।

(৬)

নয়ন মুদিয়ে নেহারো পথিক!
আপন চিত্তাকাশে
সুধার গোলক চির ধ্রুব-তারা
মরি কি মধুর হাসে!

তুমি ছুটে' মর,　　সে যে রে অমর,
সতত মরমে রয় ;
নিত্য চেতন　　নির্ম্মল জ্যোতি
নিয়ত অমৃতালয়।
হে পথিকবর!　　নেহার নেহার
মধুর মূরতি তা'র,
লখি সে কিরণে　　চল গৃহপানে
প্রান্তর পরপার।
মুণ্ডিত-শির　　খর্জ্জুর নহে,
মন্দার তরু শত,
শষ্পশ্যামল　　কনক ক্ষেত্র
রাজে তথা অবিরত।
মায়ার ঘোরালো　　আলেয়া-আলোকে
ভ্রান্ত না হয়ো তুমি,
মানস-নিহিত　　ধ্রুবতারালোক
পান্থ! চলহ চুমি'।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

গ্রন্থ ও পাঠক।

কবি বলিয়াছেন,—"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচপৃথ্বী"—কিন্তু যদি বলি যে জগতে গ্রন্থ-সংখ্যা নিরবধি ও পাঠক বিপুল, তবে বোধ করি সে উক্তি তেমন ভ্রমাত্মক হয় না। বাস্তবিক গ্রন্থসংখ্যার তুলনা দিতে হইলেই গড্ডলিকা-প্রবাহ, ত্রিশ সালের বন্যা, সমুদ্রতীরের বালুকারাশি, আকাশের তারকারাজি প্রভৃতি উপমাগুলি একাদিক্রমে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইতে থাকে! গ্রন্থের যদি এরূপ সংখ্যা হয়, তবে পাঠকপাঠিকার ত কথাই নাই!

আমি বলিতেছিলাম, গ্রন্থ-সংখ্যা অপেক্ষা পাঠক-সংখ্যা অধিক; কেন না, এক গ্রন্থের একাধিক পাঠক না হইয়া যায় না, তা সে গ্রন্থ যেমনই হউক না কেন! গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বেই অন্ততঃ দুই চারিজন অন্তরঙ্গের (বৈঠকখানা এবং অন্তঃপুর উভয়ত্রই) হাত ফিরিয়া আসে। মনে করুন, রামবাবুর মনে মনে জ্ঞান যে, তিনি একজন রীতিমত ভাবুক এবং সুলেখক—আর লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কেই বা নিজেকে মনে মনে সেটা না ভাবেন *? মধ্যে মধ্যে একটা-আধটা চুটকি লেখা উপরি-উক্ত অন্তরঙ্গদের দেখান। অবশ্য তাঁহারা আপুষী-প্রশংসা-সমিতির চিরন্তন ব্যবস্থামতে সোৎসাহে বলিবেন,—"এ হেন রত্ন হইতে পৃথিবীকে বঞ্চিত করা তোমার অতীব অন্যায় ও ঘোরতর নিষ্ঠুরতা; এখনই ইহা গ্রন্থাকারে ছাপাইয়া জগজ্জনকে অনুগৃহীত ও ধন্য কর।" এইরূপে আপুষী-প্রশংসা-সমিতির করতালি-নিনাদে কখনো

---

* লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদিগের বিনীত নিবেদন, যে তাঁহারা যেন এ কথায় বিচলিত না হন, কারণ বর্ত্তমান লেখকের এই উক্তির সহিত আমাদিগের

বা গৃহলক্ষ্মীর আকিঞ্চনে লেখকের গ্রন্থকার হইবার বাসনারূপ বৃক্ষটি দিনে দিনে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার উপর যদি তাঁহার অর্থ-সংস্থান থাকে, তবে ত আর রক্ষা নাই। আর সে বৃক্ষের ফল টক হউক বা মিষ্ট হউক, বাজারে যাইলে কেহ না কেহ আস্বাদ করিবেই। সুতরাং দেখা গেল যে, গ্রন্থ-সংখ্যা অপেক্ষা পাঠক-সংখ্যা অধিক। এখন দেখা যাউক, গ্রন্থরাজি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

গ্রন্থের শ্রেণি বিভাগ মোটামুটি দুই রকমে করা যায়,—বিষয়ভেদ ও উদ্দেশ্যভেদে। বিষয়ভেদে শ্রেণি-বিভাগের পথ সহজ, যথা ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি। ফলতঃ, বিষয়ানুযায়ী গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। আবার কোন কোন গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের দুই বা ততোধিকের মিশ্রণ বা সমাবেশ আছে।

দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণি-বিভাগ বা উদ্দেশ্যভেদে শ্রেণি-বিভাগ জিনিষটা অপেক্ষাকৃত দুরূহ, কেন না সে কার্য্য পুস্তকের নাম বা সূচিপত্র দেখিলেই সাধিত হয় না। অনেক সময় গ্রন্থরূপ সমুদ্রে বেশ করিয়া একটু তলাইলে, তবেই তাহার উদ্দেশ্য-রত্নটী হস্তগত হয়। এই কার্য্যটী এক এক সময় এরূপ কষ্টসাধ্য যে, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে কতকগুলি গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। আমি ত নগণ্য ব্যক্তি—অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিকেও এরূপ বিষম সমস্যায় পড়িতে দেখিয়াছি। এই সমস্যার দুই উত্তর আছে—হয় ডুবুরীর ক্ষমতার অভাব, না হয় সে সমুদ্রে রত্ন নাই। এখন যিনি গ্রন্থকারের পক্ষে, তিনি প্রথম উত্তরটী দিবেন, ও যিনি পাঠকের পক্ষে তিনি অবশ্যই দ্বিতীয় উত্তরটি দিবেন। আর যিনি বিনা আয়াসে আপনাকে বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তিনি হয়ত গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিবেন—'উভয়তঃ'। অবশ্য

ইহা স্বীকার্য্য যে, এরূপ উভয়-সঙ্কটরূপ যণ্ডের শৃঙ্গোপরিক্ষেপণকারী গ্রন্থের সংখ্যা অল্প। সাধারণতঃ সকল গ্রন্থেরই এক বা একাধিক উদ্দেশ্য গ্রন্থপাঠান্তে বুঝা যায়।

অতঃপর বিবেচ্য, সচরাচর গ্রন্থের উদ্দেশ্য কত প্রকারের হইতে পারে।

প্রথম—জ্ঞানবিস্তার বা শিক্ষা-প্রদান :—বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম। যেমন ধনীর পক্ষে দান ও সদ্ব্যয়ের দ্বারা পরোপকার করাই ধনের সদ্ব্যবহার, তেমনি জ্ঞানী, শিক্ষিত বা চিন্তাশীলের পক্ষে জগৎকে নিজ জ্ঞান, শিক্ষা বা চিন্তা প্রদান করাতেই তাহার সার্থকতা। এইরূপে জগৎকে উপকৃত করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে চিরকাল জাগিয়া আসিতেছে; এবং আসিতেছে ও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে বলিয়াই, মানবজাতি বর্ব্বরতার তিমির হইতে সভ্যতার আলোকময় রাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক যুগের স্তূপীকৃত জ্ঞানরাশি বা সচ্চিন্তাসমূহ পরবর্ত্তী যুগের মানবের পক্ষে উন্নতিশিখর-আরোহণের সোপান-স্বরূপ হইয়া আছে। আবার এইগুলি যখন একীকৃত হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণত হয়, তখন ঐ গ্রন্থগুলির প্রত্যেকখানি যে এক একটি অমূল্য রত্নবিশেষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়—কল্পনাশক্তির সাহায্যে চিত্ত-রঞ্জন ও চিত্তোৎকর্ষ-সাধন :—উচ্চ অঙ্গের কাব্য ও নাটক-উপন্যাসাদি এই শ্রেণীর ভিতর আইসে। জিহ্বা ও তালু শরীরের পক্ষে যেরূপ, এগুলি মানসিক হিসাবে তদ্রূপ। জিহ্বা তালু প্রভৃতি আস্বাদেন্দ্রিয় না থাকিলেও, আহার-পানীয়াদির গলাধঃকরণ ও শরীরের পোষণ-বর্দ্ধন অসম্ভব হইত না। তবে এই ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে খাদ্যের আস্বাদ জানাইয়া দেয় ও তাহা দ্বারা পরিপাক ও শারীরিক পরিপুষ্টিসাধনের যথেষ্ট সহায়তা করে। সেই

রূপ কাব্য-নাটকাদি জ্ঞান বা শিক্ষালাভের নিমিত্ত প্রথমোল্লিখিত গ্রন্থের ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও জ্ঞান জিনিষটীকে স্বাদু, ও জ্ঞানার্জ্জন-কার্য্যটীকে প্রীতিকর করিয়া দেয়, ও মানসিক বৃত্তি গুলির উন্মেষ ও অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। কল্পনা বিকাশ ব্যতীত জ্ঞানলাভ, আস্বাদেন্দ্রিয়-বিহীন ব্যক্তির খাদ্য-গলাধঃ করণের ন্যায় একটা mechanical process বা যান্ত্রিক প্রকরণ হইয়া দাঁড়ায়। এই গ্রন্থগুলি যেন বহির্জ্জগৎও অন্তর্জ্জগতের বিবাহের ঘটকস্বরূপ। নানা চেষ্টা করিয়া, অনেক আনা-গোনা করিয়া, লক্ষ কথা কহিয়া, তবে উভয়পক্ষের মিলন ঘটাইয়া দেয়। যাহাকে পূর্ব্বে ভালরূপ চিনিতাম না, বা জানিতাম না, তাহাকে একেবারে নিজস্ব ও অন্তরঙ্গ করিয়া দেয়। বাস্তবিক, একটু ভাল করিয়া ভাবিলেই সেক্স্ পীয়র ও কলিদাসপ্রমুখ কবিগণকে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বলিয়া বোধ হয়। যাহা অতি সাধারণ, জড়বৎ ও প্রাণহীন বলিয়া ঠেকে, এই কল্পনাবলে তাঁহারা তাহাকেই কেমন নানারঙে ফলাইয়া, বিচিত্র সাজে সাজাইয়া, আমাদেরই ন্যায় মন-প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরেন, ও যেন এক নূতন রাজ্যের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন! আবার যে মানবকে হস্তপদাদি অবয়ব ও ক্ষুধা-নিদ্রাদি পাশবিক বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টিমাত্র বোধ হয়, সেই মানবকেই কতশত দেব-ভাবে পূর্ণ ও অপূর্ব্ব গুণরাশির আধার-স্বরূপ ফুটাইয়া দেন। তবে এই শ্রেণীর গ্রন্থের একটী দোষ আছে; সেটী এই যে, এ সকল লইয়া অতিমাত্রায় চর্চ্চা করিলে বাস্তব রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ক্রমশঃ ভাবরাজ্যে প্রবাসী হইয়া থাকিতে হয়! তবে এ দোষসত্ত্বেও যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যথেষ্ট, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ও চিত্তোৎকর্ষসাধনের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া কাব্য ও উপন্যাসাদির নাম এক-নিশ্বাসে লইয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে কাব্যকে উপন্যাস-নাটকাদি হইতে স্বতন্ত্র ধরিয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে সাহিত্যিক হিসাবে ইহাদের উভয়েরই এক দর ফেলিয়াছি। ফলতঃ একটু সূক্ষ্মবিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে প্রকৃত কাব্য উপন্যাসাদি অপেক্ষা উচ্চতর আসন পাইবার যোগ্য; কেন না প্রকৃত কবির কল্পনাশক্তি যেরূপ অসীম, সেইরূপ চিত্তোৎকর্ষসাধক বা চিত্তশুদ্ধিজনক। অবশ্য যাহা কিছু ছন্দোবদ্ধ তাহাকেই কাব্য বলিতেছি না, বা যিনি কবিতা লেখেন তাঁহাকেই কবি বলিতেছি না, তাহা হইলে আজকালের বাজারে বঙ্গদেশে সকলেই কবি। যিনি স্বীয় কল্পনাশক্তির বলে ও রচনা-পারিপাট্যের সাহায্যে রচনীয় বিষয়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আমাদের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন এবং আমাদের হৃদয়কে উচ্চ ও পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। এই হিসাবে কোন কোন উপন্যাসলেখকও স্বরচিত উপন্যাসে যথার্থ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। Victor Hugo তাঁহার Les Miserables গ্রন্থে Jean val Jeanএর, বঙ্কিমবাবু তাঁহার চন্দ্রশেখরে প্রতাপের চরিত্রাঙ্কনে যে সুন্দর অনুপম কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ কবিত্ব পৃথিবীর অনেক খাঁটী কাব্যেও দুর্ল্ভ। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের আদর্শ কবির সহিত তুলনায় উপন্যাসলেখকের ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ; ইহার কেন্দ্র মনুষ্য ও মনুষ্য-সমাজ; কবির কল্পনাশক্তি মনকে অতি ঊর্দ্ধতম রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, ও ইহার jurisdiction বা এলাকার মধ্যে নহে এরূপ বিষয় বা বস্তু নাই বলিলেই হয়! ভগবানের পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গরাজ্য হইতে ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র বস্তু পর্য্যন্ত অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে

ধরেন। এই জন্যই মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন, যে কবির কল্পনাচক্ষু স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত নিরন্তর ঘূর্ণায়মাণ হইতেছে। এই সর্ব্বপ্রসারিণী দৃষ্টিই কবির বিশেষত্ব; ও এই নিমিত্তই রামায়ণ মহাভারত কাব্যাংশে পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট উপন্যাস-নাটকাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং এই জন্যই উপন্যাস-নাটকাদি অতি উচ্চদরের ও সুলিখিত হইলেও তৎপাঠে মন মুগ্ধ হইবে, তৃপ্ত হইবে, প্রীত হইবে, এমন কি শিক্ষা-প্রাপ্তও হইবে, কিন্তু সেই মর্ত্ত্যধামেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, স্বর্গরাজ্যে উঠিয়া ধন্য হইবে না।

তৃতীয় উদ্দেশ্য:—কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষণ বা মনোরঞ্জন—সাধারণ উপন্যাস নাটক, গল্প, নক্‌সা, প্রহসনাদি এই উদ্দেশ্যে লিখিত। এতক্ষণ যে সকল কাব্য উপন্যাস নাটকাদির কথা বলা গেল, সে সকল উচ্চ-অঙ্গের;—চিত্তাকর্ষণ সেগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও তাহার অপর উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ চিত্তোৎকর্ষসাধন বা চিত্তশুদ্ধিজনন। কিন্তু এই তৃতীয় উদ্দেশ্য প্রসূত গ্রন্থগুলি কেবলমাত্র সময়ক্ষেপণ বা মন ভুলাইয়া রাখা ভিন্ন অপর কোন কাজে লাগে না। আজকাল এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রণয়ন-প্রবৃত্তি, প্রচার ও পাঠকসংখ্যা—এ তিনেরই কিছু বাহুল্য দৃষ্ট হয়। ইহা সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ, তাহা সাধারণের বিচার্য্য! অবশ্য এরূপ বলিতেছি না যে, এগুলি পড়িলেই 'জাত যায়' বা মানসিক অবনতি ঘটে—কিন্তু ব্যক্তিভেদে, বয়সভেদে ও শিক্ষাদিভেদে এগুলির বহুল পাঠ বিশেষ অপকারী হইতে পারে। এগুলি বিশেষ মুখরোচক ও মধ্যে মধ্যে মুখ বদলাইবার নিমিত্ত সাহিত্যিক 'আচার' বা 'চাট্‌নি' স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে তাদৃশ ক্ষতি নাই, কিন্তু আগাগোড়া খোরাকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে শারীরিক ও পক্ষান্তরে মানসিক পুষ্টিসাধন না হইয়া

চতুর্থ উদ্দেশ্য :—গ্রন্থকার বলিয়া স্বনাম বাহির করা বা আয়ের সংস্থান করা। এ শ্রেণীর গ্রন্থও আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল নহে। এ গ্রন্থগুলির যে কি বলিয়া বলিয়া পরিচয় দিব, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তবে ইহাদিগকে চিনিবার কয়েকটী লক্ষণ আছে। যথা :—(১) ইহাদের আর কোন পার্থিব বা নৈসর্গিক উদ্দেশ্য বা মাথামুণ্ড কিছুই পাওয়া যায় না ; (২) মুখবন্ধের উপলক্ষ করিয়া নিজের গ্রন্থের এক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে।* এরূপ স্বকীয় পটহ স্বয়ং নিনাদ করার প্রথা আজকাল যতই প্রচলিত হউক না কেন, সাহিত্যে তাহার বাড়াবাড়ি দেখিলে সত্য সত্যই গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। আবার শিষ্টাচার করিয়া মুখবন্ধের প্রারম্ভেই এইরূপ লেখা হয়—"কতকগুলি বন্ধুর আগ্রহাধিক্যে বা নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল"। 'কতিপয় বন্ধু' হয়ত অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থকার স্বয়ং ; আর লিখিবার বিষয়ই বা কি ? কেহ "সুকুমারমতি বালকবালিকার জন্য" এক "প্রবন্ধ-লহরী" লিখিলেন—সে প্রবন্ধ-লহরীর দুইটা ঢেউ খাইয়া হয়ত কতশত বিদ্যাদিগ্‌গজ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতে থাকেন, তা সুকুমারমতি বালক-বালিকা ত দূরের কথা! কেহ হয় ত স্বর্গীয় সাধুচরণ পোদ্দারের দুইশত-পৃষ্ঠাব্যাপী এক জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া ফেলিলেন, পোদ্দারমহাশয় হয় ত গ্রন্থকারের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত থাকা ভিন্ন জগতের আর কোন উপকার করিতে পারিতেন না। সে জীবনবৃত্তান্ত আর কিছু হউক না হউক—তাহা পাঠ করিয়া তদ্দণ্ডেই গ্রন্থকারের মস্তকচর্ব্বণের বিফল বাসনা মনে উদিত হয়। আর

---

* লেখকের এই লক্ষণ-নির্দ্দেশ আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। স্বনাম বাহির করার লক্ষণ-স্বরূপ ধরা যাইলেও আয়ের সংস্থানের জন্য এরূপ প্রথাসমূহও যে ফলপ্রদ হয় না, তাহা উক্তশ্রেণীর গ্রন্থকারগণও বিশেষরূপ বিদিত

যদি গ্রন্থটী বিয়োগান্ত কবিতা বা গাথা হইল—তবে ত আর রক্ষা নাই। বামনগাঁয়ের নসীরাম বাবুর চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হইল, অমনি তিনি ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকবর্গের উপর এক পদ্য পুস্তকরূপ দণ্ডবিধান করিলেন, আর সে পদ্যও "যা পদ্য যা মিলে যা" গোছের! কোন প্রসূতির সূতিকাগৃহে এক অষ্টমদিবসের কন্যা মরিল, লেখ তার কবিতাময়ী এক জীবনী! অমুকের বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিল—অমুকের পতি বিদেশে চাকরি করিতে চলিলেন—অমনি ছাপাখানারূপ পর্ব্বতগৃহ হইতে এক হা-হতোস্মিপূর্ণ, দীর্ঘনিশ্বাস-'ফোঁসফোঁসান্বিত' পদ্যগ্রন্থরূপ নদীপ্রবাহ পাঠকবর্গরূপ সিন্ধুর উদ্দেশে মহাবেগে প্রধাবিত হইল—এবং "কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি"! এবং মাসিকপত্রের ললাটে প্রায়ই সেই সকল রচনা কিরীটের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে! সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন নির্লজ্জ প্রতিপত্তি-চেষ্টা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

এইবার পাঠকসম্বন্ধে কিছু বলিব। পাঠকগণের শ্রেণি-বিভাগও উদ্দেশ্য-ভেদে হইতে পারে।—যথা:—

১। জ্ঞানার্থী পাঠক।—ইঁহারা জ্ঞান বা শিক্ষালাভের জন্য পাঠ করেন ও তদ্দ্বারা স্বয়ং উন্নত ও উপকৃত হন এবং অপরকেও উন্নত ও উপকৃত করিতে সমর্থ হয়েন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই আদর্শ পাঠক।

২। বিশেষ-শিক্ষার্থী পাঠক।—অর্থাৎ যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন বা এইরূপ কোন একটা প্রয়োজনে, কোন বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজের পেশা বা বৃত্তির অন্তর্গত যাহা না হইল, তাহা পাঠ করা দূরে থাকুক্, তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকাও অনাবশ্যক মনে করেন। দেশের কত মেধাবী উকীল বা ডাক্তার Indian Law Reports বা Lancetরূপ ঘাণির চতুষ্পার্শ্বে

দেশের যে কত ক্ষতি করেন, তাহা ভাবিতে গেলে সত্য সত্যই দুঃখ হয়।

৩। যাঁহারা সময়ক্ষেপের জন্য গ্রন্থ পাঠ করেন। ভাল হউক বা মন্দ হউক, গ্রন্থগুলিকে ইহারা সময়রূপ চক্রের ঘূর্ণনবেগ-বৃদ্ধির নিমিত্ত চর্ব্বিরূপে ব্যবহার করেন। সময়টা কোন রূপে কাটিয়া গেলেই হইল, কি পড়িলাম বা কেমন পড়িলাম, অত খবর কে রাখে!

৪। ছিদ্রান্বেষী পাঠকঃ—কবি-কথিত ব্রণান্বেষী মক্ষিকা বা অসৃক‌পায়ী জলৌকার ন্যায় ইহারা কেবল গ্রন্থকারের ভ্রম বা রচনা-চাতুর্য্যের অভাব বা বিদ্যাবুদ্ধিহীনতা দেখাইতে পারিলেই পরম চরিতার্থতা লাভ করেন এবং তৎসম্বন্ধে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিও জাহির করিতে চাহেন। ইহা নিশ্চয় যে নিজেকে বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচয় দিবার যতগুলি উপায় আছে, তাহার মধ্যে অপরকে বিদ্যাহীন বা বুদ্ধিহীন বলিয়া ঘোষণা করা একটী প্রধান উপায়। বলা বাহুল্য, এরূপ পাঠক তাঁহার পাঠের দ্বারা নিজে ত উপকৃত হনই না, বরং অপরের অপকার করিয়া বসেন।

৫। যাঁহারা নিজেদের বিদ্যা জাহির করিয়া লোককে চমৎকৃত করিবার জন্য গ্রন্থ পাঠ করেন। অপূর্ব্ব রচনাকুশল বিধাতার সৃষ্টিবিধানে ইহারা এক অপরূপ জীব-বিশেষ। গ্রন্থে পঠিত বিষয় বা গ্রন্থকারের মনের ভাব বুঝি বা না বুঝি, গোটাকতক বড় বড় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থের কোন কোন স্থান মনে করিয়া রাখিলাম—সময়-অসময় পাত্রাপাত্র, স্থান-অস্থান, প্রয়োগ-অপ্রয়োগ কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, জলস্রোতের ন্যায় সেগুলি আওড়াইয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিলেই হইল! বোধোদয়ের ব্যাখ্যা করিতে বসিলেই কঠোপনিষদের অমুক তত্ত্ব বা ওমর খৈয়ামের অমুক ছত্র ইঁহাদিগের

হ্যামলেটের Soliloquy বা বার্কের Impeachment হইতে গোটা দুয়েক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তবে অন্য কথা! মুদি বা ধোপার হিসাব করিতে গিয়া ফসেট বা মিলের দোহাই দেন! অধীত-পল্লীগ্রাম-সম্ভবা, কেবল-মাত্র রন্ধন-ক্রন্দন-কোন্দল-বিশারদা, বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনা সহধর্ম্মিণীকে একটা সামান্য সাংসারিক কথা বুঝাইতে গিয়া বেচারা ম্যালথস বা ডারুইনকে লইয়া ইঁহারা নির্দ্দয়ভাবে টানাটানি করেন! এক কথায় চর্ম্মপাদুকাসীবন হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করেন, তাহার ভিতর একটা না একটা নামজাদা গ্রন্থকারের 'ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য' না করিয়া ছাড়েন না! সাধারণ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি বা স্ত্রীলোক বা বালকেরা ইঁহাদের বিস্তার ধুমধাম দেখিয়া অবাক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। তবে যাঁহাদের ঘটে কিছু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাঁহারা কৃচ্ছ্রসম্বৃত হাস্য মনের মধ্যে চাপিয়া হয় ত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে থাকেন। ইঁহাদের এটা একটা রোগ-বিশেষ। অন্যনামের অভাবে এই রোগকে intellectual dyspepsia বা মানসিক অজীর্ণ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যেমন অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রোগীর দুষ্পাচ্য খাদ্য-প্রপীড়িত ও অজীর্ণাধ্মাত উদর হইতে ঘন ঘন অম্লোদ্গার হইতে থাকে, তদ্রূপ ইঁহাদেরও অজীর্ণ বিদ্যাগুলি অনবরত গল্-গল্ রবে উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। নবশিক্ষাদৃপ্ত যুবকবৃন্দের মধ্যেই এ রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বিভিন্ন-প্রকার পাঠকগণকে স্যামুয়েল টেলর কোল্রিজ্ কয়েকটী সুন্দর উপমা দ্বারা বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম, "বালির ঘড়ি" জাতীয় পাঠক—যেমন বালির ঘড়ির একাংশে রক্ষিত বালুকাগুলি অল্পে অল্পে সমস্তই নিঃসারিত হইয়া অপরাংশে চলিয়া যায়, একটি দানাও অবশিষ্ট

রাখেন, তাহা কিছুকাল পরে অল্পে অল্পে সমস্তই নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। পড়িবার পূর্ব্বেকার ও কিছুকাল পরের অবস্থা ঠিক একই প্রকার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলিপ্সু পরীক্ষার্থিদিগের মধ্যে অনেকেই এই "বালির ঘড়ি" জাতীয় পাঠক। দ্বিতীয়, "স্পঞ্জ জাতীয়" পাঠক—ইহাঁরা স্পঞ্জের ন্যায় যাহার মধ্যে নিমগ্ন থাকেন, সমস্তই শুষিয়া লয়েন, আবশ্যক হইলে আবার উদ্গীর্ণ করিতে পারেন; কিন্তু অন্তরের সার উহাতে কিছুমাত্র বাড়ে না। তৃতীয় "প্রজাপতি জাতীয়" পাঠক—ইহারা প্রজাপতির পুষ্পমধু-আহরণের ন্যায় যে গ্রন্থের মধ্যে যতটুকু স্বাদু বা মুখরোচক, ততটুকু পড়িয়াই ক্ষান্ত হন। ইহারা মাসিক সাহিত্যের মধ্যে গল্পাংশটুকু বা রবিবাবুর কবিতাটি বা দ্বিজেন্দ্ররায়ের হাসির গানটি—অনেক সময় অন্য পাতাগুলি কাটাও হয় না—উপন্যাসের মধ্যে হয় ত নায়কনায়িকার প্রণয়-সম্ভাষণ বা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পরিচ্ছেদটী, কাব্যের মধ্যে নায়িকার রূপবর্ণনাংশটুকু, ইতিহাসের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধবিপ্লবের অংশটী, এইরূপ যে অংশটুকু চিত্তরঞ্জক বা রসিকতাসিক্ত বোধ হয়, সেইটুকু পড়িয়াই ফেলিয়া দিবেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই যে এই প্রজাপতি জাতীয় পাঠক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চতুর্থ—"ছাঁকনি জাতীয়" পাঠক। ইঁহাদিগের পাঠ "ছাঁকনির ছাঁকার" ন্যায়; যাহা কিছু ভাল তাহা ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, যাহা পড়িয়া রহিল, তাহা পরিত্যজ্য 'ছিবড়া' বই আর কিছুই নহে!

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য।

সপ্তম অধ্যায়।

I hold it to be free from doubt that if fortresses be built in Diu and Calicut (as I trust in Our Lord they will be), when once they have been well fortified, if a thousand of the Sultan's ships were to make their way to India, not one of those places could be brought again under his dominion.

(*D'Alboquerque's Commentaries.*)

ফিরিঙ্গিগণ এদেশে কেবল বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, এদেশ জয় করিতে আসে নাই; বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাহারা সেকালে ভারতবর্ষের নানা-স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ-নির্ম্মাণ করিতেই কেবল ব্যস্ত ছিল। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাহাদিগের অকরণীয় কোন কার্য্যই ছিল না। কেবল রুমী তুর্কের আক্রমণভীতি মধ্যে মধ্যে ফিরিঙ্গি বণিকদিগকে একান্ত বিচলিত করিয়া তুলিত। তেজস্বী আল্‌বুকার্ক ফিরিঙ্গিদিগের সেই ভীতি অনেক পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই তিনি ফিরিঙ্গি নৃপতিকে বারংবার লিখিয়াছিলেন—'এদেশে আর বাণিজ্যতরণী প্রেরণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অর্ণবপোতের সংখ্যা এখানে কম নহে। আমরা এখন কেবল প্রচুর যুদ্ধোপকরণ চাই।'

অনন্ত অত্যাচার-স্রোতে ভারতভূমি প্লাবিত করিয়া, নিরপরাধী শান্ত শিষ্ট প্রজাদিগের শোণিতপাতে শাণিত কৃপাণ কলঙ্কিত করিয়া পর্তুগালের ফিরিঙ্গি বণিকগণ এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল;

তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে এসিয়াবাসীমাত্রেই দয়ার পাত্র নহে।* ১৫০৭ খৃঃ অব্দে যখন চেউলে ফিরিঙ্গির কামান ডাকিল, যখন সেই গর্জ্জনে সমস্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশ কম্পিত হইয়া উঠিল, তখনও সে প্রদেশে স্বাধীন মুসলমান নরপতি বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ফিরিঙ্গির কামানগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীতচিত্তে বিবরমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন! আপনাদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থ, হীন আত্মকলহ পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্বপদে কুঠারাঘাত করিলেন। বৈদেশিক পরস্বাপহারকদিগকে পরম যত্নের সহিত আপন আপন গৃহ-পথ প্রদর্শন করিলেন, এবং স্বেচ্ছায় লক্ষ্মীশ্রীকে পদাঘাতে বিতাড়িত করিয়া শেষে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন! ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফিরিঙ্গির রণপোত ধবল (Dabul) নদীতে প্রবেশ করিল, তখন লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরাম রহিল না! ফিরিঙ্গিগণ যে দ্বীপ প্রথম জয় করিলেন, তাহাই এখন গোয়া নামে ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ফিরিঙ্গি বণিক পর্ত্তুগালে লিখিলেন—"ধবলের অধিবাসীবৃন্দ কুক্কুরের সমান। তাহাদিগকে শুধু তরবারিহস্তেই শাসন করিতে হইবে।"† পূর্ব্ব অধ্যায়েই আমরা দেখিয়াছি, ফিরিঙ্গি আলবুকার্ক গোয়ার জন্য কত না আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। যদিও বীর ইডসুফ আদিল সাহ রণমত্ত ফিরিঙ্গি বণিকদিগের হস্ত হইতে গোয়া রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।‡

গোয়া জয় করিয়া আল্‌বুকার্কের রাজ্যলিপ্সা ক্রমেই বর্দ্ধিত

---

* The permanent attitude of the Portuguese to all Asiatics, who resisted, was void of compunction.—W. W. Hunter.

† Duff's History of the Mahrattas.

‡ Letter from Joan de Lima for the King, dated Cochin,

হইল। তিনি মনক্কাদ্বীপ, আদেন প্রভৃতি জয় করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। ফিরিঙ্গির পরাক্রম তখন অজেয় ছিল। তাহাদিগের রণতরী দেখিবামাত্রই তখন এদেশীয়গণ পলায়ন করিত। যাহারা বাধা দিতে চেষ্টা করিত, তাহারা ফিরিঙ্গির পৈশাচিক শাসনদণ্ডে চির-নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত। ভারতীয় নৃপতিগণ একান্ত অসময়ে ফিরিঙ্গিদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; একান্ত অসময়ে তাঁহাদিগের মহাসুপ্তি ভঙ্গ হইয়াছিল, তাই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিজাপুর এবং আহম্মদনগরের নৃপতিদ্বয় ১৫৭১ খৃঃ অব্দে ফিরিঙ্গি বণিকদিগের সহিত জীবণ-মরণ-রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে—তাহাদিগের নিকট হইতে গোয়া-নগরী উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সময় হারাইয়া চেষ্টা করিলে আর কি ফল হইবে? তাঁহাদিগের পরাজয়কাহিনীর সহিত ঘৃণিত উৎকোচের চিত্র আঁকিয়া ইতিহাস তাৎকালীন বীর-সমাজকে একান্ত কালিমা-মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে! ইতিহাস অকপটে কহিতেছে যে, সেই দুর্দ্দিনেও নিজাম শাহের প্রধান কর্ম্মচারীগণ ফিরিঙ্গি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট সুরা উৎকোচ পাইয়া এমনি মত্ত হইয়াছিল যে, তাহাতেই ফিরিঙ্গির জয়-লাভ সহজ সাধ্য হইয়াছিল!*

চতুর্দ্দিকে জয়লাভ করিয়া আল্‌বুকার্ক কালিকটে দুর্গনির্ম্মাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কন্নুর ও কোচিনের রাজা যদিও প্রকাশ্যে আল্‌বুকার্কের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাতে সামরীরাজ ফিরিঙ্গির মনোবাসনা পূর্ণ না করেন, তদ্বিষয়েও তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আল্‌বুকার্কের ভ্রাতুষ্পুত্র নরন্‌হা দূতস্বরূপ কালিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া সামরী-রাজের সহিত সন্ধির

প্রস্তাব করিলেন। সে সন্ধির অদ্ভুত সর্ত্তগুলি পাঠ করিলে মনে হয় তখন ফিরিঙ্গিগণ যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতে পারিত। সন্ধির প্রস্তাব একটা ছল বলিয়াই মনে হয়। নতুবা কোন স্বাধীন নৃপতির নিকট বৈদেশিক বণিক এরূপভাবে ভিক্ষা চাহিতে পারে না! নরনৃহা প্রস্তাব করিলেন—

১। কালিকটে ফিরিঙ্গিদিগকে দুর্গনির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান প্রদান করিতে হইবে।

২। কালিকটে যে পরিমাণ মরিচ উৎপন্ন হয়, সে সমুদয়ই ফিরিঙ্গি বণিকদিগকে দিতে হইবে। ফিরিঙ্গিগণ তাহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্য প্রদান করিবে। কালিকটের সমুদয় আদা, ফিরিঙ্গিগণ ক্রয় করিয়া লইবে।

৩। ইতিপূর্ব্বে মুর বণিকগণ ফিরিঙ্গিদিগের যে সকল ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, সে সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৪। ফিরিঙ্গিনির্ম্মিত নবদুর্গের ব্যয়ভার এবং যে সকল ফিরিঙ্গি সেই দুর্গ-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদিগের ব্যয়ভারও সামরীরাজকে আংশিক বহন করিতে হইবে।

এই সকল প্রস্তাবই, ভিক্ষাপাত্র-করে দীন ফিরিঙ্গি ভিখারীর 'কাতর প্রার্থনা' বলিয়া পরিচিত ছিল! সামরীরাজ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহস করিলেন না! আলবুকার্ক তখন এক ঘৃণিত কৌশল অবলম্বন করিলেন। রাজ্যলিপ্সু রাজভ্রাতাকে হস্তগত করিয়া আলবুকার্ক কালিকটের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আলবুকার্ক অম্লানবদনে রাজভ্রাতাকে জানাইলেন যে, যদি তিনি কোনক্রমে বিষপ্রয়োগে সামরীরাজকে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে

নরকুলকলঙ্ক পাপিষ্ঠ জামোরিণ-ভ্রাতা ফিরিঙ্গির এই ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিষপ্রয়োগে সামরীরাজকে নিহত করিলেন। মুর বণিকদিগের মধ্যে অনেকে তখনও ফিরিঙ্গীদিগের আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্য উদ্যোগী ছিল। কিন্তু ভ্রাতৃ-হন্তা নব জামোরিণ সেই সকল বণিকদিগকে আপনার সম্মুখে নিহত করিলেন। এবং বৈদেশিক মুরদিগকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-সহ স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফিরিঙ্গির পাদলেহনে প্রবৃত্ত হইলেন! ইতিহাস মীর জাফরের কাহিনী স্মরণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়, দুঃখে গলিতহৃদয় হইয়া বঙ্গভাগ্য-বিপর্য্যয়ে আক্ষেপ করে; কিন্তু মীরজাফরও এতটা পারে নাই! মুসলমান মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া যাহ না করিয়াছিলেন, হিন্দু জামোরিণ ভ্রাতা ফিরিঙ্গির পাদুকাস্পর্শ করিয়া তাহার অধিক করিয়াছিলেন!

হতভাগ্য জামোরিণ ভ্রাতৃপ্রদত্ত তীব্র বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন, আলবুকার্কের চিরপুষ্ট আশা ফলবতী হইল, কালিকটে ফিরিঙ্গির দুর্গ শির উত্তোলন করিয়া সেই কলঙ্ককালিমালিপ্ত ঘৃণিত চিত্রের অমর সাক্ষ্যস্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিল! ভারত-মহাসাগরের অনন্ত নীল-সলিল প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সামরীরাজের সহিত হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য ভারতের উপকূল হইতে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। ফিরিঙ্গিগণ নবীন জামোরিণের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের উপকূলে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। সেই সন্ধিপত্রে লিখিত হইল:—

পারদ, সিন্দুর, তাম্র, সীসক, প্রবাল, রেশমীবস্ত্র, ফটকিরি, কুঙ্কুম এবং পর্ত্তুগাল হইতে আনীত অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্য কালিকটের বন্দরে ও পর্ত্তুগীজদিগের কুঠীতে বিক্রয় হইতে পারিবে। সামরীরাজের

সে সমস্তই রপ্তানীর জন্য পর্ত্তুগীজদিগকে অর্পণ করিবেন এবং তাহারাও মূল্য দিয়া সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইবে। ক্রেতাগণ তাহাদিগের নিকট যাহা ক্রয় করিবে, তাহার মাশুল তাহারাই দিবে। হরমুজ, সুন্ডা, মালাক্কা, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল মুসলমান বাণিজ্যতরণী সামরীরাজের রাজ্যমধ্যে আসিবে তাহাদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত শুল্ক লইতে হইবে। কন্ননূর ও কোচিনের জাহাজ ব্যতীত অন্য কোনস্থানের জাহাজ 'ছাড়' লইতে আসিলেই পর্ত্তুগীজগণ তাহাদিগকে 'ছাড়' দিবে। দেশীয় বা কোন পর্ত্তুগীজ পরস্পরের উপর উপদ্রব করিলে সামরারাজ দেশীয় ব্যক্তির বিচার করিবেন এবং ফিরিঙ্গি দুর্গাধ্যক্ষ ফিরিঙ্গির বিচার করিবেন। সামরী-রাজের যাহা আয় হইবে, পর্ত্তুগাল-অধিপতি তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবেন (!)—প্রয়োজন হইলে, পর্ত্তুগাল-রাজ সৈন্য দ্বারা সামরীরাজের সাহায্য করিবেন এবং আবশ্যক হইলে জামোরীণের সৈন্য ফিরিঙ্গির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে। ফিরিঙ্গিগণ যে সকল গোল মরিচ ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিবে, তাহার মূল্য বাণিজ্য-দ্রব্যে প্রদান করিবে, এবং সমুদয় শুল্ক প্রদান করিতে তাহারা বাধ্য থাকিবে।

শতাধিক বর্ষ পরে ইংরাজ বণিকের সহিত যেমন বাঙলার নবাবের সন্ধি হইয়াছিল, ফিরিঙ্গি বণিকের সন্ধি-পত্রেও তাহারই আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্য-লিপ্সু জামোরিণ যেমন ফিরিঙ্গি বণিকের সন্ধি-পত্র পরম-আশীর্ব্বাদ-জ্ঞানে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, বাঙলার নবাবও তেমনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন!

অষ্টম অধ্যায়।

Even a high-minded soldier and devout Cavalier of

be a necessity of his position, and that in giving no quarter, he best rendered service to Christ and acted with the truest humanity in the long run to the heathen.

Sir W. W. Hunter.

আল্‌বুকার্কের বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন যে ভারতবর্ষের তীরে ফিরিঙ্গিদিগকে যে সকল যুদ্ধ করিতে হইবে, সে সমুদয় যুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজদিগকে পরাজয় করিলেই পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিবে না,—পর্ত্তুগাল যদি সম্মিলিত মুসলমান শক্তিকে পদদলিত করিতে পারে, তবেই তাহার শক্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। আল্‌বুকার্কের সকল বাসনাই পূর্ণ হইল।

ভারতীয় বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ করিবার জন্ম পর্ত্তুগাল প্রাণপণে যত্ন করিতেছিল। আল্‌বুকার্ক কখনও বা কৃপাণমুখে কোথাও বা কৌশলপূর্ণ সন্ধি-সংস্থাপনে সেই বাঞ্ছিত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রাধান্য লাভ করিয়া বাহুবলে তাহা রক্ষা করিবারও আয়োজন করিয়াছিলেন। তাই আমরা দেখিতে পাই ফিরিঙ্গির সুদৃঢ় দুর্গ মালাক্কা, হরমুজ, কালিকট, কোচিন এবং কন্ননূরে সগর্ব্বে শির উত্তোলন করিয়াছিল। আল্‌বুকার্ক তাই ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গির রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে লোহিত সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকল স্থানে একই চিত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। হরমুজের সন্ধিই সেই চিত্রের পরিচয় প্রদান করে। হরমুজ-অধিপতি ভয়চকিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন যে (১) হরমুজ-সিংহাসন চিরদিন পর্ত্তুগালের প্রজা এবং আশ্রিত বলিয়া পরিচিত হইবে ; (২) হরমুজে ফিরিঙ্গির দুর্গ এবং শিল্পশালা নির্ম্মিত হইবে ; (৩) নির্দ্দিষ্ট বর্ষে বর্ষে পর্ত্তুগাল-সিংহাসনকে রাজকর

যোগাইবেন! যে ফিরিঙ্গি সৈন্য তাঁহাকে একান্ত উৎপীড়িত ও নিগৃহীত করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের ব্যয়ভারও যোগাইবেন! ফিরিঙ্গিগণ শক্তি-প্রতিষ্ঠার এই তিনটি মূলমন্ত্র লইয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং যেখানেই অনুগ্রহ-দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেইখানেই সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই! যে বন্দরেই পর্ত্তুগালের বাণিজ্য তরণী আসিয়া লাগিত, সেইখানেই তাহারা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত এবং তদ্দেশবাসী বণিকদিগের নিকট হইতে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করিত! পর্ত্তুগালের সন্ধি-সংস্থাপন-নীতি আমাদিগকে সর্ব্বদা এই একই আলেখ্য দেখাইয়া থাকে—ইংরাজ বণিকের বাঙলার প্রথম জীবনেও আমরা এই নীতি দেখিতে পাই—মীরকাশেমের কামান-গর্জ্জনে আমরা এই নীতিরই প্রতিবাদ শুনিতে পাই।

আল্‌বুকার্ক ফিরিঙ্গি-সর্দ্দারদিগের মধ্যে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি ছলে বলে কৌশলে এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। অত্যাচার রক্তপাত প্রভৃতি কিছুই করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না! কালিকটের ইতিহাস পাঠ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, চতুর ফিরিঙ্গি বণিক কখনও বা পদলেহন করিয়া, কখনও বা আবার কৃপাণতাড়নে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধ করিতেন। কালিকট ভারত উপকূলের একটী অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তাহার অপ্রমেয় শক্তি ছিল, জামোরিণের ক্ষমতাও অশেষ ছিল। ফিরিঙ্গিগণ প্রথমে কালিকটের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। শির লুকাইবার আশ্রয় লাভ করিয়াই ফিরিঙ্গিগণ কালিকটের জমোরিণকে পাইয়া বসিল। ১৫১৩ খৃঃ অব্দে কালিকটের সহিত ফিরিঙ্গি বণিকের যে সন্ধি হয়, তাহার বলে ফিরিঙ্গিগণ গোলমরিচ ও আদা গ্রহণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হইত। জামোরিণ দেশের কর্ত্তা হইয়াও বৎসরে দুইখানি মাত্র বাণিজ্য-তরণী

পাইলেন! তাহাও আবার ফিরিঙ্গি বণিকের অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল! পর্ত্তুগাল হইতে যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানি হইত, ফিরিঙ্গিগণ সে সমুদয়ের জন্য তখনও শুল্ক প্রদান করিত।

কিছুকাল পরেই ফিরিঙ্গির সুদৃঢ় শিলা-দুর্গ কালিকটে উন্নতশীর্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হইল, সঙ্গে সঙ্গে জামোরিণের কণ্ঠশৃঙ্খল আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল! তাহার পর ১৫১৫ খৃঃ অব্দে পুনরায় সন্ধি হইল। শৃঙ্খল আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল! জামোরিণ তখন পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের দাসত্ব স্বীকার করিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফিরিঙ্গির শত্রুকে স্বরাজ্য মধ্যে স্থান দিবেন না। ক্রুশভক্তগণ, এমন কি এদেশীয় ক্রুশভক্তগণও শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিল—শুধু ইহাই নহে, জামোরিণ স্বীকার করিলেন যে, পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক অর্দ্ধেক ব্যয়ভার পর্য্যন্ত তিনিই বহন করিবেন। * চতুর ফিরিঙ্গি বণিক যতই কণ্ঠ-শৃঙ্খল সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, নিশ্বাস-নিরুদ্ধ জামোরিণ ততই শিথিল হইতে লাগিলেন; শেষে স্বীকার করিলেন,—'আমার রাজ্যে যত গোলমরিচ ও যত আদা উৎপন্ন হউক না কেন, সে সমুদয় আমি শুধু ফিরিঙ্গি বণিকদিগের নিকটই বিক্রয় করিব—সে সমুদয়ই আমি আমার প্রভুর (পর্ত্তুগাল-অধিপতির) পূজার জন্য প্রদান করিব! পর্ত্তুগালের শত্রুদিগকে সর্ব্বদা রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিব এবং তাহার মিত্রের সহিত কোন কারণেই যুদ্ধ করিব না।' জামোরিণের ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি এইখানেই নিরস্ত হইতে পারিলেন না, স্বীকার করিলেন,—'আমি আরবের সহিত কোন বাণিজ্য-সম্বন্ধ রক্ষা করিব না, আমার কোন প্রজাকেও বাণিজ্য-পোত লইয়া আরব-উপকূলে যাইতে দিব না।' পতনের পথ চিরপিচ্ছিল—জামোরিণ সেই পিচ্ছিল পথে

অনন্ত অন্ধকার-মধ্যে নিপতিত হইলেন, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আমি একখানি যুদ্ধ জাহাজও রাখিব না—অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ সামান্য একখানি জীর্ণ তরীও আর আমার থাকিবে না!' জামোরিণের পতন শেষ হইল—হিন্দু মুসলমান চিরদিনের জন্য ভারত মহাসাগরে ডুবিয়া গেল—ফিরিঙ্গি বণিকের বিজয়-নিনাদে সুদূর য়ুরোপখণ্ড পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল—কালিকটের স্বর্ণ সিংহাসন—সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিহীন পুত্তলিকাতুল্য নরপতি এবং কালিকটের মণিমাণিক্য-সুশোভিতা লক্ষ্মীশ্রী তখন ফিরিঙ্গির পদতলে অর্ঘ্য যোগাইতেছিল!

কালিকটের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্রেরও পরে সেই অবস্থা ঘটিল। আলবুকার্কের পূর্ব্ববর্ত্তী ফিরিঙ্গি-সর্দ্দার ক্যাকরাল কোচীনরাজকে আশা দিয়াছিলেন যে, একদিন না একদিন তাঁহাকেই জামোরিণ-পদে অধিষ্ঠিত করিবেন। আলবুকার্কের শাসন-কৌশলে ভ্রাতৃহন্তা অবশেষে জামোরিণের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন—কোচিন-রাজ্যের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না, কারণ কোচিনের বর্ণ-গন্ধ-মধু তখন ফিরিঙ্গিদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে! ফিরিঙ্গির কৌশলজাল তখন কোচিনের যে দুই একটা পণ্টন ছিল, তাহাও এমনি করিয়া উৎখাত করিয়াছে যে, আর আঘাতের কোন ভয় ছিল না।

কোচিনরাজ বৃথাই নয়নজলে ভাসিয়া পর্ত্তুগাল-নৃপতিকে জানাইলেন,—"মহারাজ! আপনিই আমাকে সুবর্ণ-কিরীট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা পাইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমি সদ্বীপ ভারতবর্ষের প্রধান নরপতি হইলাম।.........আপনার শাসনকর্ত্তা আমাকেই নৃপতি বলিয়া অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমার সিংহাসনারোহণের পথে যিনি কণ্টকস্বরূপ

স্বীকার করিয়াছিলাম যে, যতদিন আমার দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে, ততদিন আমি পর্ত্তুগীজদিগকে রক্ষা করিব। পর্ত্তুগীজগণও পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরে আমার মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। একে একে দ্বাদশ বর্ষ চলিয়া গেল—সেই প্রতিজ্ঞা শুধু বাক্যমাত্রই রহিয়া গেল, আজিও প্রতিপালিত হইল না। এখন দেখিতেছি যে আলবুকার্ক কালিকটের সহিত সন্ধিসংস্থাপনে তৎপর হইয়াছেন—কোচিন ভাসিয়া যাইতেছে।”

কুইলন কোচিন অপেক্ষা হীনবল ছিল। তাহার অবস্থা আরও ভীষণ হইয়াছিল। কুইলনবাসী ভদ্রমণ্ডলী অথবা যে কোন মুসলমান কুইলনে অবাধে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার পাইল—খ্রীষ্টানের ধর্ম্মমন্দির জয়গর্ব্বে শির উত্তোলন করিল—কুইলন-রাজ্ঞীর দোষ না থাকিলেও তথায় একজন ফিরিঙ্গি নিহত হইয়াছিল বলিয়া কুইলনকে ২৫০০ মণ গোলমরিচ অর্থদণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইল। তাহার পর ১৫২০ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হইল তাহাতে সেণ্ট্ টমাস্ খ্রীষ্টিয়ানগণ কুইলনে ফিরিঙ্গি কামানের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিদিন পুষ্ট হইতে লাগিল—কুইলনের সমুদয় গোলমরিচ পর্ত্তুগালে প্রেরিত হইতে লাগিল, বাধা দিবার কেহ রহিল না—পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যপোতগুলি পর্য্যন্ত শেষে মাশুল-মুক্ত (duty free) হইয়া অবাধে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল।

ফিরিঙ্গিগণ প্রতিদিন পারস্য-উপসাগরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে আলবুকার্কের বিজয়-দুর্গ হরমুজকে করায়ত্ত করিল। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হইল, তাহাতে পর্ত্তুগীজগণ রপ্তানী করিবার জন্য সংগৃহীত বাণিজ্য-দ্রব্য ভিন্ন অপর সকলপ্রকার দ্রব্যের মাশুল-প্রদানে অব্যাহতি পাইল। শুধু ইহাই নহে—হরমুজ ফিরিঙ্গির

সিংহাসন লাভ করিবেন, সন্ধিপত্রে এরূপ বন্দোবস্তও থাকিল! পর্ত্তুগালরাজ একান্ত অনুগ্রহ করিয়া যতদিন হরমুজের সিংহাসন গ্রহণ না করেন, হরমুজ ততদিন মণিমুক্তা-হীরকাদিতে প্রতিবৎসর ৬০,০০০ আসরাফিন যোগাইতে বাধ্য হইল।

লুব্ধ ফিরিঙ্গি বণিক কিন্তু ইহাতেও তুষ্ট হইল না। নিয়ম হইল যে হরমুজে মুসলমানমাত্রেই কোন প্রকার অস্ত্র রাখিতে পারিবে না। কেবল মাত্র রাজার দেহরক্ষী সৈন্য ও নগরকোতোয়ালগণ এই নিয়ম হইতে রক্ষা পাইল। মুসলমানগণ অস্ত্র রাখিলে দ্বিতীয় অপরাধে বেত্রা-ঘাত এবং তৃতীয় অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গিগণ মুসলমানদিগকে চিরদিনের জন্য উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল! তাই আরও নিয়ম হইল যে মুসলমান বণিককে সকল প্রকার পণ্যদ্রব্যের জন্যই মাশুল দিতে হইবে, কেবল ফিরিঙ্গিগণের এদেশে বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকিবে। পারস্য উপসাগরের প্রবেশ-মুখ এইরূপে ফিরিঙ্গি বণিকের করতলগত হইয়া পড়িল। কিন্তু লোহিত সাগরের প্রবেশ-পথ অধিকার করিতে যাইয়া আলবুকার্ক স্বহস্তে চেষ্টা করিয়াও মিসর হইতে মুসলমান বাণিজ্য ধ্বংস করিতে পারিলেন না।

তিনি মালাবার অধিকার করিলেন—মালাক্কার দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করাতেই মুসলমানের সিংহলে একাধিপত্য-বাণিজ্যাধিকার লুপ্ত হইয়া গেল। অবস্থা বুঝিয়া পর্ত্তুগাল-রাজ তাঁহার সেনাপতিদিগকে রাজ্যাধিকারের ক্ষমতা প্রদান করিলেন—নানাস্থানে পর্ত্তুগালের বিজয়-কেতন উড্ডীন হইতে লাগিল। শেষে ইংরাজ বাহাদুর যখন এদেশে প্রথম আসিলেন এবং আসিয়া যে রাজসিংহাসনের উপরেই তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিলেন, সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাহাই পর্ত্তুগালের অধীন!

পর্ত্তুগাল বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদিগের রণতরীর শক্তি যত দিন অটুট থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষ পর্ত্তুগালের। কিন্তু ফিরিঙ্গি

বণিক ভীতচিত্তে দেখিল যে পশ্চিম ভারতে দুইটি রাজ্য সমরপোত-নির্ম্মাণে কুশলী। কালিকট এবং গুজরাটের রণ-তরীসমূহ যে কত শক্তি ধরিত, তাহা ফিরিঙ্গি সর্দ্দার আলমিহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই দিউএর যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াই ফিরিঙ্গিগণ আদেশ করিল যে, এদেশে আর রণতরী নির্ম্মিত হইতে পারিবে না। দক্ষিণে কালিকট তখনও সুসজ্জিত তরণী লইয়া দিগ্বিজয়ে সক্ষম ছিল। কিন্তু ফিরিঙ্গির সন্ধিপত্র কালিকটকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিল—অর্ণবপোত দূরের কথা, ক্ষুদ্র তরী পর্য্যন্ত আর কালিকটে রহিল না। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাট স্বীকার করিল যে, তাহার বন্দরে আর জাহাজ নির্ম্মিত হইবে না। যে ফিরিঙ্গি-নীতি মুর বণিকদিগকে অস্ত্রহীন করিয়াছিল, সেই নীতিই ভারতবর্ষকে রণতরী-বর্জ্জিত করিয়াছিল। প্রায় তিন শতাব্দী পরে লণ্ডন এবং লিভারপুলের রোদনধ্বনি শুনিয়া কোম্পানী বাহাদুর যাহা করিয়াছিলেন, ফিরিঙ্গি বণিক বহুপূর্ব্বেই তাহা সাধিত করিয়াছিল। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের নৌ-শিল্প জীবিত ছিল! *

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

* The correct forms of ships—only elaborated within the past ten years by the science of Europe—have been familiar to India for ten centuries. *Notes on India—Dr. Buist (Bombay.)*

পরাজয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকটি গাড়িচাপা না পড়িলেও ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছিল। নীরজা অনেক কষ্টে তাহাকে তুলিয়া লইয়া দু-এক-পা অগ্রসর হইতেই গাড়ির আরোহী ততক্ষণে নিকটে আসিয়া নম্রস্বরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ছেলেটিকে আমায় দিন, আপনি পারবেন না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তিনি বড় রক্ষা করেচেন"—

সত্য-সত্যই সে পারিতেছিল না। তাই, আগন্তুক চাহিবামাত্রই, সে বিনাবাক্যে তাঁহাকে বালককে লইতে দিল।

তিনি বলিলেন, "একটু কষ্ট করতে হবে, এদের বাড়ি যদি আপনি—" "আসুন" বলিয়া নীরজা অগ্রসর হইল। তিনি তাহার অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে একটি পুরাতন বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। নীরজা বালকের মাতাকে একান্ত ভয়বিহ্বল দেখিয়া সান্ত্বনার সহিত কহিল, "ভয় নেই, ননী পড়ে গিয়েছে। কিন্তু দোষ সব আমারি, আমায় দেখে ও ছুটে আসছিল আমি তা দেখিনি, আর একটা গাড়ি সেই সময়"—

অপরিচিত আগন্তুক সেই সময় সহসা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আমারি দোষ, আমি অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলুম তাতেই এই দুর্ঘটনাটা হচ্ছিল। যা হোক ছেলেটি যে তেমন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে এই আমার ভাগ্য! মা একে কোথায় শোয়াব?" বালকের জন্য বিছানা পাতিয়া দিলে তিনি তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলেন, এবং সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করাতে শীঘ্রই বালকের চৈতন্য হইল।

নীরজা তাহার মুখের উপর নত হইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ননী, ননী, গাড়ি চলে গেছে। দেখনা এ যে তোমার বাড়ি, তোমার মা রয়েচেন!"

বালক 'মা' বলিয়া দুই হাত বাড়াইয়া দিল, মা সাগ্রহে ছেলেকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আর কিছু ভয় নেই, ওকে একটু দুধ দিন, ক্লান্ত হয়ে পড়েচে।" স্বর নামাইয়া নীরজাকে বলিলেন, "ডেনজার এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই, ডাক্তারকে একবার ডাকা উচিত,—ওকি, ওকি!"

নীরজা লজ্জার সহিত কাপড় টানিয়া শোণিতাক্ত স্থানটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া উত্তর করিল, "ও কিছু না, কিছু না।"

"কিছু না! বলেন কি? রক্তে ভেসে গেছে। আমি ডাক্তার ডাকি—"

নীরজা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না এখানে মিথ্যে এঁদের ব্যস্ত করে কি হবে? আমি বাড়ি যাই। বাবাকে দেখতে এখনিতো ডাক্তার আসবে, আমি বরং তাঁকে এখানেও পাঠিয়ে দেবো।"

"নিশ্চয়! কিন্তু তাঁকে কাটাটা দেখাবেন। কি করে কেটে গেলো? গাড়ির চাকাটা বোধ হয়—"

"আপনি দেখচি আমার জন্যে বড্ডই ব্যস্ত হচ্চেন। ও তেমন কিছু কাটেনি। আমি তা হলে বাড়ি যাই।"

"কিন্তু হেঁটে যাবেন না কি?" "হাঁ, হেঁটেই যাবো। আমাদের বাড়ি তেমন বেশী দূরে নয়। আমি দু'বেলাই বেড়াতে আসি। এর চেয়ে বেশি দূরেও যাই।"

"সে স্বতন্ত্র কথা! আজ এ অবস্থায় তা হবে না, আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার গাড়িতে আপনি যেতে পারেন।"

একটু ইতস্তত করিয়া অগত্যা নীরজা সম্মত হইল। অপরিচিতের মুখে-চোখে এমন একটা গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য বিরাজ করিতেছিল যে তাঁহাকে অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করিতে তাহার মন সরিল না!

গাড়ী বা ঘোড়ার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। গাড়ী ধীর-মন্থর গমনে আসিতেছিল, আগন্তুক হাঁটিয়া আসিতেছিলেন! নীরজার পিতার উদ্যানের নিকট গাড়ী আসিতেই সে বলিয়া উঠিল, "এই বাড়ি"! চমকিয়া আগন্তুক তাঁহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন, আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিলেন," ওঃ!" তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা?" চিন্তিত মুখ অল্প তুলিয়া সে উত্তর দিল, "হাঁ! কিন্তু আমি যেজন্য গিয়েছিলেম তা—"। এ কথাটা সে কাহারও উদ্দেশ্যে না বলিলেও তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধৃষ্টতা মাপ করবেন, যদি আমা-দ্বারা কোন—"

"না, তা হয় না, যতীন্দ্র বাবুর কাছে আমার কিছু সামান্য কাজ ছিল, তা থাক্—"লোকটি হঠাৎ এমন-ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন যে নীরজা একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া আগ্রহহীন ভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কোন যতীন্দ্র বলচেন? যতীন্দ্রনাথ ঘোষ? 'আনন্দ-কানন' যাঁর বাড়ী?"

"হাঁ তিনিই! কিন্তু আনন্দ-কানন এখন আর তাঁর নাই।"

আগন্তুক গম্ভীর মুখে ঔদাস্যের সহিত কহিলেন, "ওঃ তাঁর এখন ভারি অবস্থা-বিপর্য্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, না?"

নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিল, "অত্যন্ত, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ীটা শুদ্ধ সেদিন বিক্রি হয়ে গেলো।"

তাঁহার সঙ্গীর মুখে একটা ঔৎসুক্যের ভাব দৃষ্ট হইল, তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর ষ্টেটের নূতন অধিকারী

বাধা দিয়া নীরজা ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিল, "মাপ করবেন, আমি তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা জানিও না, আর জানতে ইচ্ছুকও নই! তাঁর কথায় আমার কি আবশ্যক?"

নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়া তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি জন্য আপনার এত অপ্রিয় হইয়াছেন, শুনিতে পাই কি?"

নীরজা একটু চিন্তিতভাবে কহিল, "কে জানে, আমি তাঁকে কেমন পছন্দ করি না। তিনি একজন বড়লোক, আমার মত একজন লোকের সহানুভূতি কম থাকলে তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না! যে ভাগ্যহীন আজ অদৃষ্টক্রমে সৌভাগ্যের উচ্চ চূড়া হতে নিম্নে পতিত হয়েছে, আমার সহানুভূতি তাঁর উপরেই, আহা! আজ তিনি একেবারেই নিঃস্ব!"

নীরজার আয়ত নেত্রে দুই ফোঁটা সহানুভূতির অশ্রু ফুটিয়া উঠিয়া উষাকালের শিশির-বিন্দুটীর মত ধীরে ধীরে তাহার গোলাপ ফুলের ন্যায় কোমল গোলাপি গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল।

তাহার সঙ্গী ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "তার নাই কি? যার প্রতি এমন কোমল প্রাণের সহানুভূতি রয়েছে, তার আর কিসের অভাব! সাত রাজার ধনের চেয়ে সে ত বেশী ধনী!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নীরজার জ্ঞাতি-ভ্রাতা অমরনাথের বিবাহ কলিকাতায় হইলেও দেশে আসিয়া সেই উপলক্ষে সে একদিন ভারি ধূম করিয়া প্রীতিভোজ দিল।

নববধূ যূথিকা যূথিকার মত সলজ্জ অম্লান মুখখানি লইয়া অপরিচিত দলের মধ্যে একখানি চেনা মুখ দেখিবার আশায় করুণ চোখে চাহিয়া ছিল। [illegible]

সম্প্রদায়ের লোকের ঠিক উপযুক্তা করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। তাই অমরনাথ প্রথমেই তাহার সংস্কারে মনোযোগ দিয়া তাহাকে আরো সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছেন!

বাড়ীতে বৃদ্ধা শাশুড়ি ভিন্ন অপর কেহ নাই, বেচারী একেবারে হাঁফাইয়া পড়িয়াছে, ভাগ্যে নিরুদিদি এই দুঃসময়ে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন, তাই সে একটু ভরসা পাইয়াছে। সেই তাহাকে আদব-কায়দা-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাকে ঘোর লজ্জার হাত হইতে মুক্ত করিতেছিল! আর একটা বিষয়ে সে নীরজার কাছে উপকৃত হইতেছিল, নীরজাকে দেখিলেই সকলে তাহার সহিত কথা কহিতে থাকে, যূথিকাকে আর কেহ দেখেও না, সে-ও বর্ত্তাইয়া যায়! সে তাই আগ্রহের সহিত তাহাকে খুঁজিতেছিল!

এদিকে তাহার স্বামীও তাঁহার এক বন্ধুর অনুরোধে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "কই হে, তাঁকে যে দেখাতে পারলে না!" অমর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "ভাল জিনিষ তো তোমার আমার মত পথে ঘাটে ছড়ান থাকে না, ভাই! একটু ধৈর্য্য রাখ, দেখবেই এখন"

বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ধৈর্য্য থাকে কই?"

"অধীর হয়েও তো কোন ফল নেই! মিঃ দত্ত, ভুলে যেও না—নীরজা যতিন ছাড়া যে কারুর দিকে চাইবে, তেমন মেয়েই সে নয়। কাকা তার জেদ জানেন বলেই যতিনকে তার দুর্দ্দশা থেকে প্রাণপণে টেনে তুলতে চেষ্টা করছেন।"

"ভুলিনি অমর! কিন্তু মেঘ সমুদ্রে জল ঢালে বলে কি খানা-ডোবাকে বঞ্চিত করে হে?"

পড়ে নেই? সবি কি তিনি তাঁর যতিন ঘোষকে দান করে নিঃস্ব হয়ে বসে আছেন? এক কণাও অবশিষ্ট নেই?"

অমর পরিহাসের ভাব সম্বরণ করিল, "বড় দুঃখ হচ্চে! তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারচি! আমার অনুরোধ, আর তুমি তার সঙ্গে দেখা করোনা। করলে সুখী হবে না। দেখো, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, যা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তা সবি তুমি অপর্য্যাপ্ত পেয়েছ! শুধু শুধু সাধ করে জীবনে অভাব ডেকে এনো না ভাই, সুখের উপাদান যা পেয়েছ তাই—"

মিঃ দত্ত হাসিয়া উঠিলেন। "তুমি যে আস্ত একখান নভেল বানিয়ে ফেল্লে হে? কি জান অমর! তোমাদের মত কবিরা একবার দেখা হলেই Loveএ পড়তে পারে, কিন্তু আইন-জীবীর প্রাণ ততটা সরস থাকে না; ভয় পেয়ে যেও না হে, আমি বেশ সহজ সজ্ঞানে আছি, সে ভয়ানক রোগের কোন লক্ষণই তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাবে না, খাবার সময় দেখো পাতে কিছুই নষ্ট হবে না, রাত্রে দেখো চাঁদের আলোর সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না।" অমর নীরজাকে তাহাদের অল্প দূরে দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িল,—"ওই যে সে! তাহলে তোমার মত বদলায় নাই? দেখা কর্ব্বে?"

"কেন কর্ব্বোনা? আমি ওঁকে বন্ধু মনে করে গর্ব্বিত হতে চাই। তুমি মিথ্যে বাধা দিওনা।" "বেশ, কিন্তু আবার মনে করে দিচ্চি, তার চেয়ে বেশি দাবি করে ফেলোনা, তা হলে সব দিকই নষ্ট হয়ে যাবে!" মিষ্টার দত্ত মৃদু হাসিলেন, "ভয়েই যে অস্থির হে! আমায় কি তুমি এমনি বোকা মনে করো নাকি অমর! ও সব কথায় আর কাজ নেই, এসো ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে—"

তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, নীরজাও অমরনাথকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসির সহিত বলিল,—"অমর দাদা! জুঁই

যে—"মিঃ দত্তকে দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "আপনি—?"

"আমায় চিনতে পেরেচেন ?" মিঃ দত্ত মৃদু হাসিলেন,—"আপনার সে কাটাটা ?"

নীরজা মুখ নত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "সে ভাল হয়ে গেছে !" "সেই ছেলেটিকে দেখতে গেছলেম ! তার অল্প একটু জ্বর হয়ে সেরে গেছে ।"

"আপনি গেছলেন ? আমি কিন্তু আর যেতে পারিনি, বাবা ও পিসিমা ভাবেন বুঝি রোজই তেমনি কিছু একটা বিপদ আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করবে" বলিয়া নীরজা মৃদু হাসিল !

"সত্য-সত্যই সেদিন আমার বড় অন্যায় হয়েছিল। আপনি চিৎকার করে না উঠলে, আমিত ছেলেটীকে দেখতেই পাইনি।"

"তাতে আপনার দোষ বেশি ছিল না ! তা আপনি দোষের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত অনেক বেশি করেচেন। বাস্তবিক আপনি বড় দয়ালু !"

মিঃ দত্ত লজ্জিত হইয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিলেন, "আপনার বাবা ভাল আছেন ?" "অনেকটা, কেমন আমাদের বউ দেখলেন ? অমর দাদা, ও অমর দাদা !'

মিঃ দত্ত সস্মিত মুখে উত্তর দিলেন, "বউ তো আমার অচেনা নয়, জুঁই আমার প্রতিবেশিনী !" অমরনাথ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল, নীরজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে, দেখিল, তিনি হলের অপর দিকে এক অপরিচিতা বালিকার সহিত কথা কহিতেছেন। সে বিস্ময়ের সহিত সেই দীর্ঘাকৃতি সুশ্রী বালিকাকে দেখিতে দেখিতে মিষ্টার দত্তের কথার উত্তরে বলিল, "তবেতো আপনি তার আপনার লোক !"—বলিয়া

মিঃ দত্তও একটু হাসিলেন, পরে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে তার বোধ হয় খুব বন্ধুত্ব হয়েছে ?"

"হাঁ, খুব ! আচ্ছা, ও মেয়েটী কে, চেনেন ? আমি তো ওঁকে কখনো এখানে দেখিনি।"

মিঃ দত্ত সহাস্য মুখে উত্তর করিলেন, "চেনাতো উচিত ! ও আমারি ছোট বোন পুষ্প।"

"আপনার বোন ? ওঃ, আমি কি নির্ব্বোধ আপনার নামটি আমি এখনো জানতে ইচ্ছা করিনি ; অমর দাদাই বা কি রকম লোক, তিনিও কিছু বল্লেন না !"

লজ্জা পাইয়া নীরজা তাহার সুনীল নেত্রদ্বয় তুলিয়া মিঃ দত্তর দিকে চাহিল, "মাপ কর্ব্বেন, আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কার সঙ্গে আমার আলাপ হলো ?"

একটু ইতস্তত করিয়া মিঃ দত্ত উত্তর করিলেন, "আমার নাম মোহিতকুমার।"

নীরজার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, "কিন্তু, আপনি বোধ হয় মিঃ দত্ত নন,—ব্যারিষ্টার !"

"হাঁ আমিই মোহিতকুমার দত্ত হরিপুর ষ্টেটের নূতন জমিদার !" নীরজার স্বর হইতে সমস্ত বন্ধুত্বের কোমলতা চলিয়া গিয়াছিল। মিঃ দত্ত তাহার সেই ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির নিচে আপনার দৃষ্টি নত করিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হরিপুরের নূতন জমিদার, মিস্ রায় !"

নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তা, আমি তা জানতাম না। মিঃ দত্ত, মাপ কর্ব্বেন, আমার কাজ আছে, আমি যাই—"সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। মিঃ দত্তের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। হরিপুরের নূতন জমীদার যে তাহার কাছে কি অপরাধে

করিলেন, "আপনি কেন আমার উপর রাগ করলেন? আমি কি কিছু অন্যায়—"

উত্তেজিত স্বরে নীরজা উত্তর দিল, "আমার ভুল আমি স্বীকার করছি। আপনার নাম শুনলে আমি কথনোই আপনার সঙ্গে আলাপ করতেম না। কিন্তু সে সম্বন্ধে অমর দাদাই দোষী—" বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে মিঃ দত্ত সেই ঘৃণাপূর্ণ রাগরক্তিম মুখের পানে চাহিয়া দুঃখিত ক্ষুব্ধস্বরে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আমার কি অপরাধ তা যদি দয়া করিয়া বলতেন—!" ঘোর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে একবার-মাত্র চাহিয়া দেখিয়া বিনাবাক্যে নীরজা অন্যদিকে চলিয়া গেল! আহতচিত্ত মিঃ দত্ত ভাবিলেন, "আহা! যদি আমি হরিপুর ষ্টেটের নূতন জমীদার না হইতাম!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"মিস্ রায়! তোমাদের কিসের ঝগড়া হচ্ছিল? তুমি অত রেগে-ছিলে কেন? উনি তোমায় কি বলছিলেন?" "ঝগড়া কিসের যতিবাবু! আমি ও লোকটাকে মোটে পছন্দ করি না! ও একটুও ভাল লোক নয়। তোমার বিষয় কিনে নিয়ে—"

"নীরজা! তাই তুমি ও'র উপর বিরক্ত! উনি আমার বাড়িটা বড়ই অল্প দামে কিনে নিয়ে আমায় ক্ষতিগ্রস্ত করেচেন! আবার সেদিন বলে পাঠিয়েছিল যে যদি আমি ওই দামে আবার কিনে নিতে পারি তো সে ফিরিয়ে দেয়, তাই বা এখন আমি কোথায় পাবো?"

"আমি বাবাকে বলে দেখবো, তিনি যদি—" "না নীরজ তিনি কতই দবেন, তোমারি কথায় চাকরি দিয়েছেন, আবার বাড়ীর জন্য অত টাকা দেবেন কেন? নিরো, তুমি এখনো আমায় এত যত্ন কর দেখে

এমন করে বলোনা। তুমি কি মনে করো তোমার জমিদারীকেই আমি"
—"না নিরু না, আমি কি তোমার মন জানি না, কিন্তু তোমায় আমি সুখী কর্ত্তে পারলাম না। এবার যদি কলে লাভ করাতে পারি তাহলেই আমি আবার মাথা তুলতে পার্ব্বো, না হলে নিরু! আমার সব আশা ফুরিয়ে যাবে, তোমার বাবা কি তা হলে আর আমার হাতে তোমায় দিতে চাইবেন! নিরু, তাহলে আমি বাঁচবো না, উঃ!"

সগর্ব্বে নীরজা বলিয়া উঠিল, "যতীবাবু আমি ত কতবার তোমায় বলেছি যে পর্ণগৃহে যদি তোমায় বাস করতে হয় তা হলেও আমি তোমায় ত্যাগ করবো না। বাবাও আমার ইচ্ছায় বাধা দেবেন না, তা আমি বেশ জানি, তুমিও জান, তবে মিথ্যা কেন ভয় কর?"

ম্লানমুখে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার আর কিছু ভরসা হয় না, নিরু, মিষ্টার দত্ত এসে পর্য্যন্ত আমার বড় ভয় হয়েচে," বাধা দিয়া সভ্রূভঙ্গে নীরজা গর্ব্বিত স্বরে কহিল, "ওঃ, ওঁকে আমার কিসের ভয়? ওঁর কথা নিয়ে আমি মনকে উত্যক্ত করতে চাই না, এসো, আমরা বারান্দায় বসিগে, ভারি গরম!"

অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের গতিবিধি ঈর্ষার চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মিঃ দত্ত অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যতিন ঘোষ বুঝি তোমার কাকার ম্যানেজার হয়েচে?" অমর উত্তর দিল, "হঁা, আর অংশীদার" "আর ভাবি জামাই, না?"

"তা ত বটেই! সেইটেই তো হলো প্রধান কথা, সেই জন্যই তো অংশীদার করে নিয়ে ওর উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন!"

"কিন্তু ম্যানেজারির পক্ষে লোকটা উপযুক্ত কি?" অমরনাথ হাসিল, "যাকে তিনি কন্যা দান করতে পারেন, তাকে ম্যানেজারির জন্য বিশ্বাস করতে পারেন না?"

মিঃ দত্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন, "আমি ওকে

যতদূর জানি তাতে ওকে জমীদারি-ম্যানেজের মত ক্ষমতাপন্ন বলে মনে করি না। তা হলে নিজের সব কি নষ্ট হয়! অবশ্য ওঁরা বেশী জানেন!”

“ওর সবতো মকদ্দমায় নষ্ট করেচে। তা সত্যি, কাকারও আজ কাল চারিদিকে মকদ্দমা বাধাচ্চে শুনছি। কিন্তু কাকা ওকে খুব ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। ও বেচারিরও এখন বড় কষ্টের সময়, পৈত্রিক সম্পত্তি আর কিছুই নেই, এখন ওই যা ভরসা।”

মিঃ দত্ত তীক্ষ্নস্বরে উপহাসের ভাবে বলিলেন, “কেন, অমন সুন্দর চেহারা আছে, আর কি চাই?” অমরনাথ বুঝিল লক্ষপতির অভাব বোধটা কোথায় পৌঁছিয়াছে! মনে মনে দুঃখিত হইল, প্রকাশ্যে হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল, “যার যা নাই, তাই নিয়ে সে অন্যের হিংসা করে, ওর জমিদারী বাড়ী বাগান সব নিয়েও বুঝি তোমার মন উঠলো না? আবার ওর রূপটুকুর উপর দৃষ্টি দিচ্চ! না ভাই, ও টুকু ওর থাকতে দাও, ওইটুকুর জোরেই বেচারী আজ নিঃস্ব হয়েও ধনী!”

মিঃ দত্ত হাসিলেন,—“ওই টুকুর বদলে আমি ওর জমিদারী মায় বাগান বাড়ি সব ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীরজা বড় রাগিয়া গেল। হরিপুরের নূতন জমিদার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বন্ধের তিন মাস তাহাদের বাড়ীর অনতিদূরে যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সে বাড়ীও এখন জীর্ণ শরীর গোলাপী রঙে ঢাকিয়া ও ভিতরে-বাহিরে নূতন সাজ পরিয়া যেন সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে! নীরজা ছাদে উঠিয়া আর সে বৃষ্টির-জলে-মলিন, স্থানে-স্থানে-চুন-সুরকি-খসিয়া-পড়া

বাঁধাঘাটের ভগ্ন সিঁড়িগুলা দেখা যায় না! যেখানে বসিয়া যতীন্দ্রনাথ সকালে-বিকালে ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেন, বেহালা কোলে লইয়া সুশিক্ষিত মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন, এখন সেখানে নূতন অধিকারী গাছের কেয়ারির মধ্যে মর্ম্মর সোপানের দুই পার্শ্বে লৌহ বেঞ্চ স্থাপন করিয়া সন্ধ্যা-সকালে মোটা মোটা বই কোলে লইয়া বসিয়া থাকেন! স্তব্ধ রাত্রে নীরজার মুক্ত বাতায়ন-পথে বাতাস আর সে প্রিয়কণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত বহিয়া আনিয়া তাহাকে পুলক-কণ্টকিত করে না! নূতন আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়া তাহার চোখের উপর হইতে তাহার সমস্ত আনন্দের, আগ্রহের স্মৃতিগুলি মুছিয়া দিয়াছেন, কোনখানে বিন্দুমাত্র পূর্ব্বচিহ্ন ফেলিয়া রাখেন নাই! দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ ধনবান হইলে সে যেমন তাহার পূর্ব্ব-দারিদ্র্যের এতটুকুও সহ্য করিতে পারে না, যতীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ীও নূতন বড়লোকের হাতে পড়িয়া তাহার গত দুর্ভাগ্যের কোন চিহ্ন কোথাও রাখিয়া দেয় নাই!

সে সব দৌরাত্ম্যও বরং সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সে যে আবার যখন-তখন তাহার পিতাকে বৈষয়িক পরামর্শ দিতে আসে, ইহা একেবারে অসহ্য!

ইহাতে যেন অহঙ্কার করিয়া জানান হয়, 'দেখো আমি একজন কত বড় বুদ্ধিমান! অপদার্থ যতীটা তোমার ম্যানেজার, আমি তার ভুল ধরে দিয়ে তাহার হাত থেকে ভাগ্যে তোমায় রক্ষা করচি না হলে তার মত তুমিও এতদিনে ধ্বংশ হয়ে যেতে!'

একদিন অত্যন্ত বিরক্তির মুখে আত্মদমন করিতে না পারিয়া, সে বলিয়া ফেলিল, "বাবা তুমি না কি কল বিক্রী কচ্চো? দত্ত'র পরামর্শ নিয়ে না কি খনিরও—"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ মা, তাইতো মনে করচি। মিঃ দত্ত একজন খুব

মৈত্ররা যখন লাভ দিয়ে কল কিনতে চাইচেন তখন এইবেলা বিক্রি করে দিন! ওঁরা চালাচ্ছিলেন, ওঁরা নেনতো নিন! তাঁর মতে এ বছর ময়দার কলে তেলের কলে লাভ হবে না, তার চেয়ে একটা কাপড়ের কল”—“হ্যাঁ, তাঁর যেমন কথা! তাঁর কথা শুনে তুমি কাপড়ের কল খুলে মিথ্যে টাকা নষ্ট করোনা বাবা! উনিতো সবি বোঝেন! আর যতীবাবু বলছিলেন কল যদি লোকসানের হতো, তাহলে মৈত্ররা টাকা পেয়েই আবার ফিরিয়ে নিতে চাইতো না। খনির জন্যে নাকি অন্য একজন লোক রাখা হবে?”

“উনিতো তাই বলেন! বলছিলেন একজন লোক সবদিক ম্যানেজ করে উঠতে পারেন না, তাই ভাল লাভটাভও হয় না। তা ছাড়া যতীন তেমন পাকা লোকও নয়—”

নীরজা রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, “না, যত পাকা লোক উনি নিজে, এমন হিংসুকে লোকতো আর দুটী নাই! লোকটার সব বিষয়ে অভিজ্ঞতার ভাণ! কিন্তু আসলে যে কি, তাতো দেখতে পাই না। যতীবাবু বলছিলেন, এমন করে ওঁকে জ্বালাতন করলে তো উনি আর টেঁকতে পারেন না। সবেতেই ছুতো ধরেন, সব মকদ্দমা ওঁর কথায় তুমি তুলে নিতে হুকুম দাও, ওঁকে কেউ মানে না, গ্রাহ্য করে না। ওঁকে কত বলে কয়ে তবে আমাদের চাকরি নিতে দাদা মত করিয়েছিলেন! উনি বলেন দত্তের ব্যবহারে উনি বড় অপমানিত হচ্চেন, ওঁর তাঁবেদার হয়ে থাকতে, তিনি পারবেন না।”

বলিয়া নীরজা আরক্ত মুখ ফিরাইল “তবে উনি কাজ ছেড়ে দিন অন্য লোক খোঁজা হোক”! কন্যাকে ব্যথিত দেখিয়া কন্যাস্নেহাতুর পিতা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “না মা, তাঁকে তোমরা বুঝিয়ে বলো, তিনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। মিঃ দত্তর তো দোষ

সংসারের কথায় কি প্রয়োজন? তিনি বলেন মকদ্দমা-মামলা করে প্রজাদের চটিয়ে তোলা হয়, শুধু, আর এ সব সাজান মামলা কোর্টে—” ক্রোধে নীরজা পাংশু হইয়া উঠিল “এত বড় মিথ্যা অপবাদ! বাবা, দেশে এতো লোক থাকতে—” “আচ্ছা মা আমি তাঁর পরামর্শ আর নেবো না”। বৃদ্ধ জমীদার একটু ভাবিয়া বলিলেন, “কিন্তু লোকটা খুব বুদ্ধিমান বলেই আমি তাঁর পরামর্শ চাইতাম। যতীনের চেয়ে তিনি বোধ হয় বেশী বোঝেন”।

কন্যা অভিমান করিয়া কহিল, “বাবা কি বলো! এঁরা পুরুষানুক্রমে জমীদারি চালাচ্চেন, আজি না হয় ওঁর এই অবস্থা হয়ে পড়েচে, আর দত্তর বাপ শুনেচি রেলওয়ে আফিসের কেরাণী ছিল, যতীবাবুর সঙ্গে ওর তুলনা হতেই পারে না!’

বৃদ্ধ স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কন্যার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সহজ-সত্যটুকু পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তাঁহার এই বিদূষী কন্যাটীর বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাঁহার অপর্য্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল, সঙ্গত-অসঙ্গত সকল বিষয়েই তিনি কন্যার কাছে পরাজয় মানিয়া লইতেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যামিনী এ বিপদে একেবারে চারিদিক অন্ধকার দেখিল! সে-ও পিতার মত নীরজার উপর বড় নির্ভর করিত, তাই টেলিগ্রাম পড়িয়াই ছুটিয়া নীরজার ঘরে গেল। খোলা জানলার কাছে একটা আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া আর্দ্র চুল ছড়াইয়া দিয়া সে একটা বই পড়িতেছিল। জানালার মধ্য দিয়া রৌদ্র আসিতেছিল, ঈষৎ শীতোষ্ণ বাতাসে ঘরের সমস্ত পর্দ্দাগুলা ও টানাপাখার ঝালর নড়িতেছিল। নীরজার চক্ষের সম্মুখে ইংরাজী উপন্যাসের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নায়িকা তখন স্বীয় নির্ব্বাচিত পতি

আত্মঘাতিনী হইতেছিলেন! সহানুভূতিতে নীরজার চোখ ছল-ছল করিতেছিল, হতভাগ্য নায়কের জন্য তাহার কণ্ঠ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল! এমন সময় হঠাৎ ভ্রাতাকে শুষ্কমুখে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া তাহার কাল্পনিক সহচরদের কথা বিস্মৃত হইয়া সে ধড়মড়িয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

যামিনী ঘরে ঢুকিয়াই উচ্চকণ্ঠে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিরো, নিরো! আমাদের সর্ব্বনাশ হলো, আমাদের সর্ব্বস্ব গেছে!"

চমকিয়া নীরজা ভয়ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাদা, কি হয়েচে?"

"আজ কিস্তির শেষ দিন, দুর্ভিক্ষর জন্য বেশি খাজনা আদায় হয়নি, যা সামান্য হয়েছিল আর ম্যানেজার কলের টাকা থেকে খাজনা দিবার জন্য টাকা আনিয়েছিলেন, সে সব প্রজারা দাঙ্গা করে লুটে নিয়ে গেছে। তিনি আমাদের পূর্ব্বে কিছু জানাননি, অন্যত্র টাকা ধার কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছিলেন, কিন্তু তাও পেরে ওঠেননি, আজ এক মাস শেষ হয়ে গেলো এখন টেলিগ্রাম করেছেন; আবার শুনচি কলেও বিস্তর লোকসান হয়ে গেছে।"

বাহির হইতে একজন ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, "বাবু তার আয়া!" ভ্রাতা-ভগ্নী স্পন্দিত বক্ষে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। যামিনী কম্পিতহস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খানিকটা পড়িয়াই বসিয়া পড়িলেন্, তাঁহার হাত হইতে কাগজটা পড়িয়া গেল। নীরজা তাহার লেখার উপর চোখ বুলাইয়া গিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হতাশ কণ্ঠে যামিনীনাথ বলিলেন, "আমাদের যেখানে যা ছিল সব গেল; আর কিছুই আশা নাই! কয়লার খনিতে আগুন ধরে ভয়ানক accident হয়ে গেছে। জনকতক কুলি মারা পড়েচে।"

যামিনী উঠিয়া নীরজার কাছে আসিলেন, "তুই অত অধীর হোস্‌নে নিরু! কি উপায় আছে ভেবে দেখ্‌ এখন খাজনা আজ না দিলেই নয়। কালেক্টরীর খাজনা দাখিল না করতে পাল্লে কাল আমাদের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ম্যানেজার এই সর্ব্বনাশটা কল্লে—" ক্রোধে, অনুশোচনায় যামিনীনাথ রুদ্ধ-কণ্ঠে থামিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে নীরজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, অল্প পরে আসিয়া মুহ্যমান ভ্রাতার হস্তে একটা ফিতা-বাঁধা ক্ষুদ্র বাণ্ডিল দিয়া বলিল, "আমার নিজের জমান এই পাঁচশ টাকা আছে, দাদা, আর আমার ও মার গহনা এই বাক্সে আছে, এর দামও অন্ততঃ দশ হাজার টাকা হবে।" বলিয়া সে একটা ষ্টীলের বাক্স খাটের উপর রাখিল। মাথা নাড়িয়া যামিনী হতাশভাবে কহিলেন, "এখন আমি গহনা কোথায় বেচতে যাবো? সময় থাকলে আর ভাবনা কি ছিল। এত নগদ টাকা এখন কে দিতে পারে যে—" নীরজার বিবর্ণ মুখ সহসা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "দাদা একজন বোধ হয় শুধু আমাদের রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে আমি না বুঝে বড় অপমান করেছি, তিনি কি ভুলতে পারবেন? তাঁর পরামর্শ যদি তখন বাবাকে নিতে দিতেম, তা হলে বোধ হয় এমন বিপদ ঘটিত না।"

যামিনী উৎসাহের সহিত বলিল, "কার কথা বলচো, মিষ্টার দত্তের? আচ্ছা, দেখি তিনি আছেন কি না, আজ তাঁর চলে যাবার কথা ছিল।"

"দাদা! বাবা কি করচেন?" "তিনি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তবু এখনো খনির কথা শোনেননি। তাঁরি জন্যে বেশি ভয়, নিরু! আমাদের জন্য ভাবি না। এ বয়সে যদি অবস্থার এমন বিপর্য্যয় ঘটে, তা হলে তিনি বাঁচবেন না!"

"মিঃ দত্ত! আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কাছে ভারী অপরাধী!"

মোহিতকুমার লজ্জিতার শঙ্কিত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্নেহের হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ক্ষমা কিসের মিস্ রায়! আপনি কিছু দুঃখিত হবেন না! আপনার বাবা আমায় ডাকচেন। আমি পাঁচটার ট্রেনে কল্‌কাতা যাবো; বেশি সময় নেই, তিনি কেন ডাকচেন শুনে আসি!" শুনিয়া নীরজার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে গিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাদের এ বিপদে আপনিই একমাত্র ভরসা। দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন! নাহলে আমার বাবা বাঁচবেন না!"

মোহিতকুমার সাশ্চর্য্যে নীরজার পানে চাহিয়া থাকিলেন, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে?"

রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠে নীরজা সকল কথা বলিল শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমারি সব দোষ, আমিই আপনার কথামত চলতে বাবাকে বারণ করি!"

স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া মোহিতকুমার হাঁফ ছাড়িয়া কহিলেন, "আচ্ছা আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।" তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, ও কিছুক্ষণ পরে নামিয়া চলিয়া গেলেন। নীরজা নিজের ঘরে জানলার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। যতীন্দ্রের উপর খুব রাগ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই রাগ আসিল না। বরং তাঁহার লজ্জা মনে করিয়া সহানুভূতি আসিল!

যামিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে বাবা ডাকচেন!" পরে কাছে আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "নিরু, লক্ষ্মীটি বোন বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করিস্, তাতে যদি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় তো সেদিকে চোখ দিস্‌নে। তোর ক্ষতি পুরতে পারবে কিন্তু বাবার প্রাণ দুবার পাবি না। যা, তুই আমায় কেন জিজ্ঞেস করছিস, আমি কিছু জানিনে, তুই যা।"

বিস্মিতা নীরজা পিতার ঘরে গিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। তাঁহার রুগ্ন দেহ যেন এ প্রবল আঘাতে একেবারে ঝড়ে-ভাঙা গাছের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। মুখে-চোখে নিরাশার স্পষ্ট রেখা আঁকা! কন্যাকে দেখিয়া তিনি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া কম্পিত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "নিরু, মা, আজ শুধু তুমিই আমায় রক্ষা কর্ত্তে পারো!" নীরজা আশ্চর্য্য হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলচো বাবা?" সে ভয় করিতেছিল, পাছে পিতা এই আঘাতে উন্মাদ হইয়া গিয়া থাকেন! রাজেন্দ্রনাথ কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "নিরু আমাদের যে বিপদ সে তুমি ভালই বুঝতে পারচো তোমায় আমি আর কি বোঝাব? আমার খনি গেছে, কল যায়! জমিদারী নিলামে চড়তে আর দেরি নেই। কাল তোমাদের হাত ধরে আমায় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কলের জন্য বিস্তর দেনা হয়ে গেছে। এই মুহূর্ত্তে টাকা দিয়ে এক মিঃ দত্ত আমায় রক্ষা কর্ত্তে পারেন, কিন্তু তাঁর কাল একটা মকদ্দমা আছে, না গেলে পাঁচ হাজার টাকা লোকসান হবে। তিনি তাও লোকসান দিয়ে এই মুহূর্ত্তে আমার টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে প্রস্তুত আছেন। আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত কলের অর্দ্ধেক সেয়ার কিনে নিয়ে ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে আমায় রক্ষা করতে চাইচেন,—শুধু তাঁর একটি দাবি আছে, সে নিরু তুমি ভিন্ন উপায় নাই!" সোৎসুক-নয়নে বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নীরজার বুক এক অনিশ্চিত ভয়ে দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, শুষ্ক মুখ আরো শুখাইয়া গেল; ভগ্নস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বাবা?"

একটু ইতস্তত করিয়া রাজেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "তিনি তোমায়

সরিয়া গেল। তাহার কম্পিত বক্ষে হৃৎপিণ্ডের দ্রুত আঘাত-জনিত স্পন্দন সেই স্তব্ধ গৃহে যেন শব্দিত হইয়া উঠিল। দুই হাতে সে বিছানার প্রান্তটা চাপিয়া ধরিল। রাজেন্দ্রনাথ সস্নেহে ডাকিলেন, "নিরু!" নীরজার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইল না। সে পিতার দিকে চাহিয়া কি বলিতে গেল, পারিল না। বৃদ্ধ তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "নিরু! ভেবে দেখ্ মা! ভাল করে ভেবে দেখ্! তোর বাপ বড় বিপদে পড়েচে, তোর ভাই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে, আমাদের উঁচু মাথা মাটিতে ঠেকবে।"

নীরজার দুই চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে ডাকিল, "বাবা!" রাজেন্দ্রনাথ বুকের উপর তাহার মাথা সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া উত্তর দিলেন, "কি মা?"

"বাবা তুমি এই মত করচো? পণ্য দ্রব্যের মত আমায় তুমি দত্তের কাছে বেচবে?"

কাতর হইয়া রাজেন্দ্রনাথ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া একান্ত অসহায় ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "নিরু, নিরু, আমায় দগ্ধ করিসনে"—তারপর একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "যদি তুই তোর বাপ ভাইকে রক্ষা করবার জন্য তার স্ত্রী হতে পারিস্ আমি তাতে সৌভাগ্য ভিন্ন দুর্ভাগ্য ভাববো না। মিষ্টার দত্তের মত সুপাত্র পায় কে? আমাদের বাধ্য করে বিয়ে করার জন্য আমি তাঁর দোষ দিই না। তিনি জানেন তুমি সহজে তাঁকে বিয়ে করতে মত দেবে না, আর আমিও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পার্ব্বোনা। তাঁকে কি বলবো, বল্, আমি তা হলে লিখে পাঠাই, তিনি উত্তরের অপেক্ষা কচ্চেন।"

নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল, ত্বরিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা বাবা তাঁকে লিখে দাও তিনি তাঁর কাজের দাম যা চেয়েচেন তা পাবেন!" পিতা কন্যার ললাটে চুম্বন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে কহিলেন, "মা, ঈশ্বর

তোমায় চিরসুখী করুন! আমি জানি আমার মেয়ে আমার অবাধ্য হবে না!”

নীরজা নিজের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া কাঁদিল! তারপর উঠিয়া যতীন্দ্রকে চিঠি লিখিল, “এ ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি একবার আসিয়া আমায় দেখা দিয়া যাও। আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে!” বিষপায়িনী নায়িকার চিত্রখানা বোধ হয় তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়া থাকিবে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যতীন্দ্রনাথ আসিয়া সব শুনিল। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সুখী হবে?” নীরজা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, “অসম্ভব!” “তবে কেন তুমি মত দিলে? কেন এমন নির্ব্বোধের মত কাজ করলে, নিরো?” চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে নীরজা বলিল, “বাবার জন্য, শুধু বাবার জন্য!” যতীন্দ্র বারম্বার চোখ মুছিল, বলিল, “তুমি আমার হলেনা! তার চেয়ে তুমি আমার এমন সাংঘাতিক শত্রুর হলে, এই আমার বেশি কষ্ট!”

তারপর একমাস পরে এক জ্যোৎস্নারাত্রে আলোক, উৎসব ও আনন্দের মধ্যে মোহিতকুমার দত্তের সহিত কুমারী নীরজার বিবাহ হইয়া গেল।

অমরনাথ বিস্ময়ে চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া বন্ধুর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিল, বহুক্ষণ পরে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইলে বলিল, “তোমার অসাধ্য কাজই তা হলে জগতে নেই! ব্যাপারটা কি? এ engagement কবে, আর কি করে হলো? আশ্চর্য্য!”

যূথিকা নীরজার কাঁধে মাথা রাখিয়া আহ্লাদে তাহার গলা জড়াইয়া বলিল, “বেশ হলো নিরুদিদি! এখানে-সেখানে দু জায়গায় আমি

তোমায় পাবো! মোহিতদাদার মত স্বামী হল, তোমার খুব আনন্দ হচ্চে, না?" নীরজা লাল হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমায় কিছু জিজ্ঞেস করিস্‌নি বোন!"

বিবাহের পর মোহিতকুমার পত্নীর সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না। সে ইচ্ছা করিয়া নিমন্ত্রিতাদের মাঝখানে দিনটা কাটাইল।

রাত্রে ফুলশয্যার পুষ্প-বাসরে নবদম্পতির সাক্ষাৎ ঘটিল। নীরজার অত্যন্ত-গম্ভীর মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞার ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। ফুলের গহনা গায়ে যেন মানাইতেছিল না!

প্রফুল্লচিত্ত মোহিতকুমার কাছে আসিয়া বসিলেন, কহিলেন, "নিরু, সেদিন তোমার হাত কেটে গেছে দেখে কেন অত ব্যস্ত হয়েছিলেম বুঝতে পেরেছ, প্রথম দেখেই তোমায় আমি—" নীরজার মুখের দিকে চাহিয়া সাদরে তাহার একটি হাত নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইলেন, "তোমার শরীর সুস্থ নেই নিরু! এসো, শোবে এসো—" নীরজা সবেগে হাত টানিয়া লইল, "তুমি সরে যাও।"

তাহার স্বর ভগ্ন ও কম্পিত! মোহিতকুমার তাহার রাগে-রাঙা মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুকের হাসি হাসিলেন। সহাস্য মুখে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া অন্য হাতে তাহার স্বেদাক্ত কম্পিত হস্ত ধরিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, "নিরু! তুমি রাগ করোনা, তোমার কাছে আমি একটু লজ্জিত হচ্চি, কিন্তু যতক্ষণ তুমি সব ব্যাপার না জানতে পারচো, ততক্ষণের জন্য! তারপর তুমি—আমি জানি আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, তুমিও আমায় তেমনি ভালবাসবে!"

"আমি—" সবেগে স্বামীর নিকট হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া স্বামীর দিকে

চাহিল, "আমি তোমায় ভালবাসবো ? জন্মেও নয়!" মোহিতকুমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কিন্তু নিরো—"

"যখন তুমি তোমার কাজের দাম চেয়েছিলে, তখন কি এটা-শুদ্ধ সর্ত্ত হয়েছিল ? যা তুমি চেয়েছিলে তাতো পেয়েছ—"

"কিসের দাম ?" আশ্চর্য্য হইয়া মোহিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল্‌চো" "কেন, তাও কি স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে ?" নীরজার স্বর স্পষ্ট হইয়া উঠিল "—তুমি আমার বাবাকে টাকা দিয়েছ আমি তাঁর দেনা শোধ করেছি, আমি—"

ক্রোধে ও দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। "বেশ এখন থেকে তোমার আমার মধ্যে আর কোন প্রশ্নোত্তর নেই। আমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই—"

মোহিতকুমারের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল! তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, "হৃদয়ের সম্পর্ক নাই ? দাম চেয়েছিলাম ? আচ্ছা, আমি কি তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি, কেন তুমি এমন কল্পনা করচো যে আমি আমার কাজের দাম তুলবো বলেই তোমায় বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিলাম ?" তাঁহার আগ্রহ অবসাদে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল, স্বরে ঈষৎ ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইল।

"কল্পনা আমি করচি! না হয় তুমি বড়লোক, প্রতিবাসী, না হয় লোকে তোমায় বুদ্ধিমান বলে! তাই না হয় বিপদের সময় আমরা তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম, তাই বলে কি না তুমি সেই সময় বাবাকে বাধ্য করে ফেল্লে! নিজে নিজের সততার দাম চেয়ে বসলে! যদি বাবা তোমার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হয়ে তোমার কাজের পুরস্কার-স্বরূপও আমায় তোমাকে যেচে দান করতেন, তা হলেও আমি তোমায় হয়তো শ্রদ্ধা করতে পাত্তেম। এত বড় স্বার্থপর—"

"নিজের মূল্যটা বড়ই বেশি ধরচো, নীরজা"—ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া

মর্ম্মাহত মোহিতকুমার বলিলেন, "যদি তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, তা হলে আমি বলচি আমি তাঁকে বাধ্য করিনি! তিনি নিজেই আমায় দিতে চেয়েছিলেন, আমি প্রথম যখন তোমায় দেখি তখনি তোমার সৌন্দর্য্য সরলতা ও দয়া তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমি কখনো তোমার উপর লোভ করিনি। আমি উপন্যাসের নায়কও নই বা বড়লোকের ঘরের নিষ্কর্ম্মা ছেলেও নই! আমি জন্মাবধি কাজেই জোড়া আছি! মনের মধ্যে ও-রকম দুর্ব্বলতা পুষে বেড়ান আমার চলে না! শুধু আমি তোমাকে উচ্চাদর্শের কোমল-প্রকৃতি রমণী ভেবে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিলেম! অবশ্য আমি ভুল করেছিলাম! তার পর তুমি সেদিন কি রকম ঘৃণা করে আমায় উপেক্ষা করলে, কেন, না, আমি নিজের উপার্জ্জিত টাকায় যতীনঘোষের নিলামে-বিক্রীত সম্পত্তি কিনে নিয়েছি, মাত্র এই অপরাধে! তাতেও আমি বিরক্ত হইনি, দুঃখিত হইনি! তোমার বাবা যখন আমায় ডেকে পাঠালেন, আমি শুনবা-মাত্র নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর সাহায্য করতে সম্মত হলেম। কলেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু,—তাঁকে অনুনয় করে বিপদের কথা জানিয়ে একদিন সময় নিলেম, সে সব তুমি জান যে কত চেষ্টায় তোমাদের জমিদারী ও কলের ক্ষতি আমায় শুধরে তুলতে হচ্ছে, সে সব প্রতিদানের আশা না করেই স্বীকার করেছিলাম; পুরস্কারের কথা আমার মনেও আসেনি, তোমার বাবাই আমায় বল্লেন 'তোমার যে আমি এত ক্ষতি করাবো, কি দিয়ে আমি এর শোধ দেবো! আমার এমন কি আছে যা দিয়ে আমি তোমার ঋণ কিছু শোধ কত্তে পারি!' তখনো আমি এমন নীচ নই যে তাঁকে বাধ্য করাবো! আমি বল্লেম আমি আপনার যামিনী-অমরের বন্ধু, আমি আপনার পুত্র, আমা-দ্বারা যদি আপনার কিছু

কিন্তু তিনি তো সত্য তোমার মত স্বার্থপর নন, পরের কাছে কেন তিনি কুণ্ঠিত হয়ে থাকবেন, তিনি বললেন 'মোহিত, তোমায় আমার দেবার মত আর কিছু নেই, শুধু আমার নীরজা আছে, তাকে আমি যতিনকে দিতে পার্ব্বো না ! যদি তুমি তাকে নিয়ে আমার হও তাহলে আমি সকল দিকে উদ্ধার পাই।' নীরজা ! সাধ করিয়া কে নিজের জীবনের সমস্ত আনন্দ সমস্ত আলোক ত্যাগ করিতে পারে ? আমি বললাম, 'কিন্তু তিনি কি সম্মত হবেন। তিনি আমাকে তেমন পছন্দ করেন না।' তোমার বাবা সে ভার নিজের হাতে রাখিয়া কহিলেন 'সে বোধ হয় যতিনকে বিয়ে কর্ত্তে আর ইচ্ছুক নয়। আমি তাকে বল্লে সে অমত করতে পারবেনা মোহিত! আমার জামায়ের কাছে আমি ঋণী হতে পারি, অন্যের কাছে পারি না,' এতে বুঝে দেখো আমার কতখানি দোষ ?"

একটুখানি থামিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "এর ভিতর তুমি সর্ত্ত দেখলে, কাজ বিক্রি দেখলে, কতই দেখলে।"

"নয়ই বা কিসে ?" উত্তেজিত হইয়া নীরজা বলিয়া উঠিল "আমি তোমায় কতটুকু জানতেম, আমি—আমি, তোমায় অপছন্দই করতেম আমি কখন স্বপ্নেও জানতেম না যে তোমার কাছে আমায় আত্মবিক্রয় করতে হবে, বাবা না হয় বলেছিলেন, কিন্তু তুমি সব জেনে-শুনে আমার অদৃষ্টের উপর শনিগ্রহের মত কোথা থেকে এসে পড়লে ?" কম্পিত পদে দুই পা সরিয়া গিয়া দেয়ালে ভর রাখিয়া জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি টাকা ও পরিশ্রমের দ্বারা আমার বাবাকে যে সাহায্য করেছ তার দাম তো তুলে নিয়েছ। আরতো তোমার কিছু দাবি নেই, এই পর্য্যন্তই থাক্—"

"কিছু দাবি নেই ?" নিষ্ঠুর বিদ্রূপের সহিত মোহিতকুমার তাঁহার আহত চিত্তের তীব্র জ্বালা ঢালিয়া আঘাতকারিণীকে একটা তীক্ষ্ণ আঘাত করিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। শুধু কহিলেন, "আমার idea ছিল না"—পরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "শোন নীরজা, যা ভুল আমি করেছি তা আর শোধবার তো পথ নাই ; এখন এ অপরাধের দণ্ড আমায় মাথা

আর কি—" নীরজা কি বলিতে গেল, কিন্তু ক্রোধে তাহার কথা বাহির হইল না, সে দ্রুতপদে জানালার নিকটে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল! "আমায় বলতে দাও—" মোহিতকুমার কৌচ ছাড়িয়া উঠিয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া তীব্রভাবে কহিলেন, "তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, নীরজা, তুমি হরিপুর ষ্টেটের Mistress! লোকের কাছে তুমি মিসেস্ দত্ত! কিন্তু আজ থেকে আমি তোমার কাছে কিছুই দাবি করবো না। না তোমার ভালবাসা, না তোমার শ্রদ্ধা, যতদিন নিজে যেচে তা না দেবে—"

"তা আমি কখনই দেবো না—" নীরজা সগর্ব্বে ফিরিল, গর্ব্বিত-ভাবে বলিল, "তোমার সাহস তো মন্দ নয়, তুমি কল্পনা করচো যে আমি—"

"আচ্ছা, তাই ভালো, এও আমার এক সর্ত্ত নীরজা!" মোহিত জোরের সহিত এই কথা বলিলেন! তাঁহার চিরহাস্যময় চক্ষু ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্থির কণ্ঠে আবার বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করচি, দেখো, এ আমি রাখতে পারি কি না! যদি কখনো ভালবেসে কাছে ডাকো তাহলে কাছে আসবো, নাহলে তোমার আমার মধ্যে চিরদিন ব্যবধান থাকলো।"

অপমানিত বক্ষ হইতে ফুলের মালা খুলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া মোহিতকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন! শুক্লা দ্বিতীয়ায় চাঁদ তখন তাহার সবটুকু জ্যোৎস্না ছড়াইয়া হাসিতেছিল। রজনীগন্ধার গন্ধে মাতিয়া বাতাস মাতালের মত লতায়-পাতায় ঢলিয়া পড়িতেছিল! অদূরে যতীন্দ্রনাথের বাসায় তখনো মজলিস বন্ধ হয় নাই। তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি উঠিয়া বেহালার স্বরের সহিত সেই সুপ্ত স্তব্ধ রজনীর অঙ্গে অমৃত ঢালিয়া দিতেছিল! নীরজা শুনিল, তিনি গাহিতেছেন,

"আর ত হলনা দেখা, এ জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি, যমুনা-তীরে!
মধুযামিনী রে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

মিনতি।

ভুলে যদি ভুল হয়ে যায়
আমারে নিদয়ে ভুলোনা,
মোরে মনে করে তরীতে
আর কারে ভুলে তুলোনা।
আন-মনে যদি ত্বরিতে
না পারি তোমারে ধরিতে
দয়াহীনা, যেন আমারে
তীরে ফেলে তরী খুলোনা!
ভুলে যদি ভুল হয়ে যায়
আমারে, নিদয়ে, ভুলোনা!

দেরী যদি হয় আসিতে
অভিমানে নাহি দহিয়ো,
ক্ষমা করে, অয়ি চপলে,
মোর অপরাধ সহিয়ো!
নিশা যদি যায় চলিয়া,
শশী যদি যায় ছলিয়া,
মনোরমে, নব প্রভাতে
মোরে হেরে কথা কহিয়ো!
ক্ষমা করে, অয়ি চপলে,

ভুলে যদি তব হৃদয়ে
ব্যথা দিই, ক্ষমা করিয়ো;
কঠিন শাসনে, নিদয়ে,
আমার পরাণ হরিয়ো!
অভিমানে যেন, ললনা,
আমারে কোরোনা ছলনা,
চাহ যদি দিতে যাতনা,
যাতনায় মোরে ভরিয়ো!
কঠিন শাসনে, নিদয়ে,
আমার পরাণ হরিয়ো!

শশধর যবে ভাসিবে
নির্ম্মল-নীল গগনে,
কুসুমেরা যবে হাসিবে
মন্দ মলয় পবনে,
মিনতির গান গাহিয়া
মুখ-পানে রব চাহিয়া,
ডেকো মোরে, অভিমানিনি,
তোমার কুঞ্জ-ভবনে!
শশধর যবে হাসিবে
নির্ম্মল-নীল গগনে!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস।

পূর্ব্বকথা।

বাঙালীর প্রথম নাট্যশালার দিন হইতে আজি অবধি এক শতাব্দীর ত্রি-চতুর্থাংশ অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ যদি ইহার ইতিহাস-সঙ্কলনে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে, তাহা অসাময়িক হইবে বলিয়া মনে হয় না। সত্য বটে, বাঙালীর স্থায়ী-নাট্যশালা-স্থাপনের দিন হইতে এখনও চল্লিশ বর্ষ অতীত হয় নাই; কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে কেমন করিয়া, কি ভাবে, নাট্যশালা-স্থাপনের চেষ্টা বাঙালীর সমাজে প্রবিষ্ট হইল, তাহার বিবরণ যদি অনুসন্ধান করিয়া এখনও ইতিহাসবদ্ধ করা না যায়, তাহা হইলে আরো ভবিষ্যতে তাহার অনেকগুলি সংগ্রহ করা অধিক কষ্টসাধ্য এমন কি অসাধ্য হইয়া পড়িবে। বাঙালীর আয়ুষ্কাল অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্থায়ী-নাট্যশালা-স্থাপনের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন কতকগুলি ব্যক্তিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা হারাইয়াছি। দুই-চারি-জন যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রাচীন, সুতরাং এই অবশিষ্ট কয়েকজন বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে, তাঁহাদের সমক্ষেই এ বিষয়ের একটা ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় মনে হয়।

বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস এই প্রথম নহে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গীয়-নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে এ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা আনুসঙ্গিক কথা-মাত্র, ইতিহাসের পক্ষে তাহা কিছুই নহে।

১৩০১—৪ সালে "পুরোহিত ও অনুশীলন" পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত পত্রিকায় প্রধানতঃ প্রবীণ অভিনেতৃবৃন্দের সাহায্যে এ বিষয়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাঁহার চেষ্টায় বঙ্গীয়-নাট্যশালার আদ্যকালের ঘটনাবলীর কতকগুলি মূল সূত্রমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখনকার প্রধান বাঙালী নাট্যকার ও বঙ্গীয়-নাট্যশালা স্থাপনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নানাবিধ গান সংগ্রহ করিয়া, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গিরীশ বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীর সহিত বঙ্গীয়-নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেরও একটা অসম্পূর্ণ কঙ্কাল প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিহাসের পক্ষে তাহা কোন-ক্রমেই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয়-নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গেলে, যে সকল অবশ্য-লেখ্য বিষয় আছে, তাহার অধিকাংশই ইহাতে নাই ; এমন কি, প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অনেকের নাম ও কার্য্যাবলীর বিবরণও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। গিরীশবাবুর গীত-সংগ্রহকার অবিনাশবাবু গিরীশবাবুরই কর্ম্মচারী। গিরীশবাবুর কর্ম্মচারীদ্বারা গিরীশবাবুর সম্মুখে যে ইতিহাস-কঙ্কাল গঠিত হইয়া থাকিল এবং তাহাতে যে সকল প্রধান কথার অবতারণা করা হইল না, ভবিষ্যতে সে সকল কথাও কোন ইতিহাসে স্থান পাইলে, এই কঙ্কালের দোহাই দিয়া অনেকে সে সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অন্য যুক্তি ও প্রমাণ থাকিলেও গিরীশবাবুর সম্মুখে প্রকাশিত এই ক্ষুদ্র ইতিহাস-কঙ্কালটুকুর সাহায্যে তাহাকে প্রামাণরূপে খাড়া করাও ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের পক্ষে বিশেষ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিতে বলেন। প্রবীণ ও নবীন অনেক বন্ধুর আগ্রহে আমায় এই ভার লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।* আমরা, যথা-সাধ্য পরিশ্রম করিয়া, ইহা সঙ্কলন করিয়াছি।

বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হইলে, প্রথমে সংস্কৃত নাটক ও সেই সকল নাটকীয় যুগের নাট্যশালা-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা উচিত মনে হয়। সংস্কৃত নাটককারগণের মধ্যে কেহ বাঙালী ছিলেন কিনা, তাঁহাদের সময়ে বাঙ্‌লা দেশে নাট্যশালা ছিল কি না, তাহারও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর মুসলমান রাজত্বে ও ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত-কালে বাঙালীর নাটকীয় রুচি কি ভাবে উদ্ভূত ও বিকশিত এবং কি ভাবে তাহার পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে, এ ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়; কিন্তু ইহার অবতরণিকাতেই যদি এই সকল দুষ্প্রবেশ্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তবে ইহার উপক্রমণিকা লিখিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইবে; এই জন্য ঐ সমস্ত বিষয় ইহার পরিশিষ্ট ভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

এই ইতিহাস-সংগ্রহ-বিষয়ে আমরা অনেকের নিকট কৃতজ্ঞ। যথাস্থানে তাঁহাদের নামাদি কৃতজ্ঞতাসহকারে উল্লিখিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়।

নাট্যামোদস্পৃহা বাঙালীর হৃদয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্ফুরিত হইয়াছিল। বাঙ্‌লা দেশে যখন পাঠান রাজাদিগের রাজত্ব, যখন তাঁহারা দিল্লী হইতে স্বাধীন হইয়া বাঙলা দেশ শাসন করিতেছিলেন,—সে

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় যখন "পুরোহিত ও অনুশীলনে" "রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন এবিষয়ের তথ্য সংগ্রহের

আজ চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা,—তখন হইতে বাঙালীর মনে নাট্যামোদের বিকাশ দেখা যায়, স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই তাহার সাক্ষী। তিনি স্বয়ং শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সখীভাবে সঙ্কীর্ত্তনকালে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া ভাবসমাবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্‌লাদেশে যাত্রা-নামে যে নাট্যামোদের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে এই বিষয়ের যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথমে যখন ইংরাজদিগের দ্বারা ইউরোপীয় প্রথায় নাট্যশালা বাঁধিয়া ইংরাজগণের সমাজেই নাট্যামোদ উপভোগের ব্যবস্থা হইল, তখন বাঙালীর মধ্যে যাত্রার আমোদ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। বাঙালী এই যাত্রার আমোদের মধ্যে কতকাল পূর্ব্বে, কিরূপে ইউরোপীয় প্রথায় নাট্যামোদ উপভোগ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। অতীতকালের লিখিত নানাবিধ বিবরণের অনুসন্ধান করিলে এবিষয়ে অনেক কথাই জানিতে পারা যাইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল নাটক আছে, তাহাদের রচয়িতার মধ্যে বাঙালা লেখকের অভাব নাই; কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র-অনুসারে এ দেশের কোথাও কোন নাট্যশালা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; সুতরাং আমাদের সমাজে নাট্যশালা বাঁধিয়া নাট্যামোদ উপভোগ করিবার চেষ্টা যে ইংরাজ-সংস্পর্শেই জন্মিয়াছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

১১৬৪ সালের আষাঢ় মাসে (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন) ইংরাজ পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া কলিকাতায় রাজধানীর সূত্রপাত করেন এবং ১১৭২ সালের শ্রাবণ মাসে (১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট তারিখে) ক্লাইভ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া বাঙ্‌লায় ইংরাজ-

ডিরেক্টারেরা প্রকাশ্যভাবে ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে কেবল বাঙ্লার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসন-কালে এ দেশে কালেক্টর-নিয়োগ, বিচারালয়-স্থাপন, ফৌজদার-নিয়োগ, সুপ্রীমকোর্ট-স্থাপন, বাঙ্লা-মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, প্রথম-সংবাদপত্র-প্রচার, এসিয়াটিক সোসাইটি-স্থাপন, মাদ্রাসা-স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সময়েই কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের মধ্যে নাট্যামোদস্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠে। এসময়ে ইংরাজেরাও এদেশীয়দগের ন্যায় আলবোলার নল মুখে দিয়া তামাকু টানিতে টানিতে 'বাই-নাচ' দেখিয়া আমোদস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্-প্রমুখ ইংরাজদিগের চেষ্টায় প্রথম-প্রথম আবৃত্তিরূপে নাটকীয় অংশ পাঠের প্রথা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পর ক্রমশঃ কোন নাটকের অংশ বিশেষ হইতে দ্ব্যাত্মক কথোপকথন (Dialogue) অভিনয়ের ছলে নাট্য-চেষ্টার ক্ষীণ আভাস দেখা দেয়। এরূপ ব্যবস্থা প্রধান প্রধান ইংরাজদিগের আলয়ে ভোজের নিমন্ত্রণেই হইত। ইহাতে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাও যোগ দিতেন। এই সময়ে লালবাজারে দুইটি প্রমোদাগার স্থাপিত হয়,—একটির নাম Harmonicum ও অপরটির নাম London Taverus. ইহাতে নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইত, কোনরূপ অভিনয় এখানে হইত বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। ইহার পর কলিকাতায় ইংরাজেরা কবে প্রথম নাট্যশালা স্থাপন করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। ১১৬০ সালে (১৭৫০ খৃষ্টাব্দে) লেফ্টেনান্ট উইল্স্ ফোর্ট উইলিয়মের এবং কলিকাতা সহরের কিয়দংশের যে নক্সা প্রস্তুত করেন, তাহাতে প্রাচীন আদি নাট্যশালার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া ছিল। ইহা লালবাজারের রাস্তার দক্ষিণাংশে, এবং পুরাতন 'কোর্ট হাউসের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে

'রোপওয়াক' নামক রাস্তার পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন 'রোপওয়াক' রাস্তার বর্ত্তমান নাম 'মিশন রো'। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় লঙ্ সাহেব যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে এবং কেরির Good old days of Hourable John Company নামক পুস্তকে ও নিউমানের 'Hand book of Calcutta নামক পুস্তকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের যে বিবরণ আছে,* তাহা হইতে জানা যায় যে, মুসলমানেরা এই নাট্যশালা হইতে কামান দাগিয়া কেল্লার ইংরাজদিগকে মহা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গে 'সেণ্ট আনের গির্জ্জা' নামে এক গির্জ্জা (Church of St. Anne) ছিল। সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণকালে উহা ধ্বংস হইয়া যায়! পলাশীর যুদ্ধের পর যখন কলিকাতা শান্তভাব ধারণ করে, তখন গির্জ্জার জন্য চেষ্টা করা হয়। সেই সময়ে এই প্রাচীন নাট্যশালার বাড়ীটিকে অল্পব্যয়ে গির্জ্জায় পরিণত করিবার কথা হয় এবং কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরের অনুমতি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করা হয়। ১১৬৪ সালের চৈত্র মাসে (৩রা মার্চ্চ, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) কোর্ট অফ ডিরেক্টর লেখেন,—"We are told that the Building formerly made use of as a Theatre may with a little expense be converted into a church or Public place of worship, as it was built by the voluntary contributions of the inhabitants of Calcutta we think there can be no difflculty in getting it freely applied to the before mentioned Purpose especially when we authorise you to fit it up decently at the company's expense as we

* এই সকলে প্রথমে আদি নাট্যশালার যে অবস্থিতি স্থান লেখা আছে তাহা

hereby do."—(Wilson : Old Fort William Vol. II. p. 103)*—"আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার ইংরাজেরা ইচ্ছাসুখে চাঁদা দিয়া যে বাড়ীটা তৈয়ার করিয়া নাট্যশালা হিসাবে ব্যবহার করিতেন, তাহা অল্প খরচেই গির্জ্জায় বা সাধারণ উপাসনাগারে পরিণত করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় কোম্পানীর ব্যয়ে ইহা অনায়াসেই করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তজ্জন্য আমরা এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছি।"

এই আদেশ পাইলেও তাহা করা হয় নাই। এই নাট্যশালায় অবৈতনিক অভিনেতারা অভিনয় করিতেন এবং কোম্পাণীর কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা এখানে অভিনয় দেখিতে আসিতেন। এদেশে নাট্যামোদ প্রতিষ্ঠার জন্য তখনকার সকল ইংরাজেই বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এত দূর দেশে এরূপ একটা আমোদের প্রতিষ্ঠা করিতে অনুষ্ঠাতৃবর্গকে যে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন ইংলণ্ডে গ্যারিক অভিনয় বিদ্যায় বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার ইংরাজ দিগের প্রার্থনায় গ্যারিক ইহাদের জন্যে অনেক সুব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এখানকার অধ্যক্ষেরা ১১৭৯ সালে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) দুই পিপা 'মেদিরা' মদ্য তাঁহাকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই নাট্যশালার সহিত একটি সাধারণ নৃত্যশালা (Ball room) ছিল। কাপ্তেন ফিলিপ, ড্রোমার ষ্ট্যান্‌হোপ † ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই নৃত্যশালায় নৃত্য দেখিয়া অতি পরিস্ফুট বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

---

* As quoted in the "Bengal Past and Present Vol. II. No. I. p, 96).

† ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে যে The Genuine memoirs of Asiaticus নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়—অনেকে বলেন এই ষ্ট্যানহোপ তাহার রচয়িতা।

আদি নাট্যশালার (The old play house) বিবরণ এই পর্যান্তই পাওয়া যায়। তখন কোন সংবাদপত্র ছিল না, কাজেই ইহাতে কি কি পুস্তক অভিনয় হইত, কে কে অভিনয় করিত, তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, এই নাট্যশালা যে একদিন সত্য সত্যই যুদ্ধরঙ্গের রঙ্গভূমি হইয়াছিল, তাহা অতীব বিস্ময়ের কথা। এখানে কতদিন আমোদ আনন্দ চলিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। শেষকালে এখানে আমোদ আনন্দ বন্ধ হইয়া গেলে মিঃ উইলিয়াম্‌সন (Mr. Williamson)* এখানে একটা নিলামের দোকান খুলিয়াছিলেন। এই আদি নাট্যশালা কোথায় ছিল? দুইতিন বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ডাবলিউ ম্যাজ (Mr. W. Madge) ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি লেখেন লালবাজার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যেখানে প্রথম স্কচকার্ক নামক গির্জ্জা আছে, সেইখানে প্রাচীন কোর্ট হাউসের সম্মুখে এই নাট্যশালা ছিল; আর ডাক্তার বষ্টীড বলেন, লালবাজারের দক্ষিণে ইহা ছিল; কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান জন্য ঐতিহাসিক সমিতি স্থাপিত † হইয়াছে, তাহার Bengal Past and Present পত্রিকা সম্পাদক সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে ৮ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে রেলি ব্রাদার্স দিগের যে পাটের গুদাম আছে, উহার সম্মুখের প্রাচীরটি দেখিলে, উহা যে এক সময়ে কোন সাধারণ অট্টালিকার সম্মুখভাগে ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন উহা প্রাচীন ট্যাভারণ নামক প্রমোদাগারের সম্মুখভাগ। কিন্তু Bengal Past and Present পত্রিকা সম্পাদক ইহার অবস্থিতি

---

* ইনি তখনকার একমাত্র নিলামকারী ছিলেন এবং আপনাকে Vendu master of the Hon'ble company বলিয়া অভিহিত করিতেন ও বিজ্ঞাপনাদিতে ঠিকানাস্থলে old play house লিখিয়া দিতেন।

† The Calcutta Historical Society. Dr. Busteed

স্থান বিবেচনা করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে ইহা কলিকাতার আদি নাট্যশালার সম্মুখভাগ হইতে পারে। আমরাও এই অনুমানের পোষকতা করি। এই প্রাচীর সংলগ্ন প্রাচীন ফটক্‌টি পর্য্যন্ত এখনও বর্ত্তমান আছে। ডাক্তার বষ্টীডের কথামত এই বাটী লালবাজারের দক্ষিণদিকে বটে, কিন্তু মিঃ ম্যাজের অনুমান মত দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নহে।

যাহা হউক, এই আদি নাট্যশালা বন্ধ হইয়া গেলে, ১৯ বৎসর পরে ইংরাজেরা আবার একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রভৃত ক্ষমতা লাভ করিয়া বাঙ্‌লার গভর্ণর-জেনারেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহা ১১৮০ সালের (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের) কথা। তখন কলিকাতাবাসী আমোদপ্রিয় ইংরাজেরা চাঁদা করিয়া একটি নাট্যশালা স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। বর্ত্তমান রাইটার্স্ বিলডিংএর পশ্চাতে এখনকার নূতন চীনাবাজার নামক স্থানে উহার স্থান স্থির হইল।

এখানকার লায়ন্স রেঞ্জনামক রাস্তার উত্তর পশ্চিম কোণে যেখানে মেসার্স ফিন্‌লে মুরকোম্পানীর বৃহৎ আফিস আছে, ঐ স্থানেই ইংরাজদিগের এই দ্বিতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৮৪—৮৫ খৃষ্টাব্দে উড্‌সাহেব এবং ১৭৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দে আপ্‌জনসাহেব কলিকাতার যে মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে এই দ্বিতীয় নাট্যশালার অবস্থিতি স্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে রাস্তা ছিল, তাহার তখন নাম ছিল 'থিয়েটার ষ্ট্রীট'। যে জমীতে এই দ্বিতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে আদি নাট্যশালার সময়ে মিঃ আয়ার (Eyre) বাস করিতেন এবং অন্ধকূপ হত্যার সময়ে মিঃ আয়ার তন্মধ্যে মারা পড়িলে ঐ বাড়ীতে ক্লাইভ থাকিতেন।* তাহার পর উহা জে, কার্টিয়ার সাহেবের সম্পত্তি হইয়াছিল। ১১৮২ সালের

আষাঢ় মাসে) ১লা জুন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে) এই জমী পাট্টা করিয়া নূতন নাট্যশালার জন্য দেওয়া হয়।*

এই নাট্যশালা নির্ম্মাণে লক্ষটাকা ব্যয় হয়। প্রত্যেক অংশে একশত টাকা ধরিয়া চাঁদা তোলা হয়। চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, জেনারল মনসন, সার এলিজা ইম্পে, জষ্টিস হাইড, চেম্বার্স ও লেমেষ্টেয়ার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। ১১৮৭ সালে (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহার রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপটাদি সর্ব্বপ্রথমে বিলাত হইতে মিঃ গ্যারিকের সাহায্যে আনান হয়। মিঃ মিসিঙ্ক্স্ নামক এক ব্যক্তিকে এই নাট্যশালার ব্যবস্থা করিবার জন্য মিঃ গ্যারিক পাঠাইয়া দেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে school for scandal অভিনীত হয় এবং ঐ রাত্রি মিঃ মিসিঙ্ক্সের সাহায্যরজনী বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংএর ন্যায় বৃহৎ উচ্চ বাড়ী উহার দক্ষিণে পড়ায় এই নাট্যশালায় দক্ষিণা-বাতাস আসিবার সুবিধা হইত না। এই অভাব দূর করিবার জন্য উহার ছাদের উপর জাহাজের চাকার ন্যায় কাপড়ের পাখা-দেওয়া চাকা খাটাইয়া (furnished with wind-sails on the roof) ঘরের মধ্যে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; এই উপায়ে স্বভাবতঃ বায়ু-চলাচল অল্প থাকিলেও গৃহমধ্য বেশ শীতল থাকিত। ইহার প্রেক্ষা-গৃহে (দর্শকের বসিবার স্থানে, auditorium) প্রথমে দুই প্রকার আসনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। 'পিট' (Pit) অর্থাৎ গর্ভাসনের মূল্য ৮৲ টাকা এবং 'বক্স্' (Box) অর্থাৎ কক্ষাসনের মূল্য এক মোহর† নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

---

* Sterndale's Historical Account of the Calcutta Collectorate.

† 'ষোল টাকায় এক মোহর' তখন বোধ হয়, শুধু কালী কলমে ছিল না।

তত্র ইংরাজেরা এখানে কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া অভিনয় করিতেন। এই নাট্যশালার নাম সাধারণতঃ 'The Theatre' ছিল; কিন্তু ১১৮৭ সালের (১৭৮০ খৃষ্টাব্দের) জেম্‌স্ হিকি-কর্ত্তৃক সম্পাদিত Bengal Gazette বা Calcutta General Advertiser'* নামক প্রধান সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যায় এই নাট্যশালার যে সকল অভিনয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এই নাট্যশালার নাম 'The Calcutta Theatre' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ১১৮৭ সালেই কলিকাতায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে এই নাট্যশালায় কি কি পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই। ১১৮৭ সালে উহাতে যে সকল পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল;—

১৭৮০। ৩১ জানুয়ারী, সোমবার—The Comedy of Beaux Stratagem ও Lethe নামক প্রহসন।

১৭৮০। ৩ মার্চ্চ—The Comedy of Foundling ও Like Master Like Man নামক প্রহসন।

১৭৮০। ৪ এপ্রেল ও ১১ এপ্রেল—The School for Scandal.†

এতদ্ভিন্ন এই নাট্যশালায় ঐ বৎসরই ১২ই, ১৯শে এবং ২১শে আগষ্ট তারিখে The Tragedy of Mahomet নামক নাটক এবং 'Citizen' নামক প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। এই বৎসরেই মিসেস্ ফে (Mrs. Fay) এই নাট্যশালায় 'Venice Preserved' নামক

---

* James Hickie, Printer of the Hon'ble Company. ইনিই প্রথম সংবাদ-পত্র-প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার 'বেঙ্গল গেজেট'ই কালে 'কলিকাতা গেজেট' হইয়াছে।

† Calcutta General Advertiser Vol. I. No. I. 29th January, and

পুস্তকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন *। এই অভিনয়ে লেফ্‌টেনেণ্ট জন নরফার (Lieut. John Norfar) বেলভিডেরার (Belvedera) ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুখ্যাতিসহকারে অভিনয় করেন। নরফার ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার বেশ সুখ্যাতি ছিল। নরফার এবং এখানকার আরও কতকগুলি অভিনেতার নাম Williamson's Indian Vede Macum নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। এই নাট্যশালায় কেবল শীতকালেই যে অভিনয় হইত তাহা নহে, বৎসরের সকল সময়েই অভিনয় হইত। ইহাতে হ্যাণ্ডেলের 'মেসায়া' (Handle's Messiah), শেক্‌স্পীয়ারের 'ওথেলো,' (Shakespeare's Othello) ও 'মার্চেণ্ট্‌ অফ্‌ ভেনিস্‌' (Merchant of Venice) প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে 'আইরিশ উইডো, (Irish Widow), 'মক্‌ ডক্‌টর' (Mock Doctor) প্রভৃতি সামান্য প্রহসন অবধি অভিনীত হইত। এক রাত্রিতে 'The Busy Body,' 'The Recruiting Sergeant,' ও 'The Mayor of Garrett' এই তিনটি বিষয়ই অভিনীত হইয়াছিল। †

প্রথমে এখানে কেবল গর্ভাসনের শেষে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলাদের সুবিধার জন্য দুটি কক্ষাসনের বন্দোবস্ত করা হয়। রাত্রি ৮টার সময়ে দ্বার খোলা হইত। দ্বারে ইংরাজ পাহারা থাকিত। এদেশীয় ব্যক্তির হস্তে বিশেষ কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

---

* Echoes from Old Calcutta, p. 127.

† এই সকল অভিনয়ের বিবরণ পড়িয়া ডাঃ বষ্টীড তাঁহার প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ পুস্তকে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উল্লিখিত হইল,—'In short, Seneca could not be too heavy nor Plautus too light for them"—Echoes from Old Calcutta p. 128.—এই মন্তব্যটীতে যে অন্তর্নিহিত শ্লেষ আছে, তাহা হইতেই নাট্যশালার অভিনেতৃবর্গের কৃতিত্ব ও সফলতা অনুমান করা যায়।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে 'হার্টলি হাউস' (Hartly house) নামে একখানি পুস্তক এক ইংরাজ মহিলা প্রকাশ করেন। ইহাতে এই নাট্যশালা সম্বন্ধে লিখিত আছে,—equals the most splendid European Exhibition, কিন্তু মিঃ কেরি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী তারিখে Richard III এর অভিনয় দেখিয়া কলিকাতা গেজেটে লিখিয়াছিলেন—"The performances seem to have been of a medicore description and theatrical talent must have been a very low ebb indeed." ১১৯৯ সালে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) ওল্ড্ কোর্ট হাউশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইলে, এই নাট্যশালায় সাধারণ সভাগৃহের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এইখানে সাধারণ ভোজের আয়োজন ও সভাসমিতির অধিবেশন করা হইত।

প্রথম প্রথম এই নাট্যশালায় স্ত্রী-অভিনেত্রী ছিল না। ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) কোন সংবাদ-পত্রে এই নাট্যশালার একজন অভিনেত্রীর প্রশংসাবাদ সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। ঐ পত্রে উক্ত অভিনেত্রীর প্রশংসাসূচক কবিতা পর্য্যন্ত* প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 'জুলিয়াস্ সীজার' নাটকে 'লুসিয়াস্' নামক বালক-ভৃত্য সাজিয়া বিশেষ পটুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এখানে অভিনেত্রী লইবার পূর্ব্বে পুরুষেরই স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিতেন। সময়ে সময়ে তাহাতে বড়ই হাস্য উদ্রেক করিত। অভিনেতারা প্রত্যেক ভূমিকার জন্য নূতন নূতন পোষাক পরিতেন

---

* সে কবিতাটি এই,—

When with new powers to charm
Our partial eyes,
Thy beauteous form appears
In visible guise,

ইহার পর ডাঃ বষ্টিড বলেন যে, কবির উচ্ছ্বাস এত বেশী মাত্রায় ফুটিয়া পড়িয়াছে যে আর উদ্ধৃত করা চলে না।

এবং বন্ধুবান্ধবের জন্য বিস্তর টিকিট লইতেন। শেষে যখন পুরুষের অভিনয়ে আর দর্শক জমিত না, তখন ১৬৲। ১৮৲ টাকা টিকিটের মূল্য হইলেও দেনা হইতে লাগিল, কাজেই তখন স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার ব্যবস্থা হইল। এরূপ হইবার কারণ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে জন ব্রিষ্টো নামক এক বণিকের পত্নী নাট্যশালায় রমণীদ্বারা ভূমিকা অভিনয় করাইবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার নাট্যশালার অনুকরণে এখানেও রমণীঅভিনেত্রী লওয়া হয়। এই থিয়েটারে শেষে মিসেস ক্রুসিফিফস্ মিশেস অরম্‌সবি, মিঃ ব্যাটল, মিঃ হিউস্ মিঃ ফার্ডিনাণ্ডস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবর্গের সাহায্যার্থ 'সাহায্য রজনীর'ও বন্দোবস্ত করা হইত। কেহ কেহ দুই তিন রাত্রি সাহায্য পাইয়াছেন। এত চেষ্টা করিয়াও—অবশেষে এই নাট্যশালায় আকর্ষণ কমিয়া গেল। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও কেরি বলেন, স্থানটা ক্রমশঃ Uufashionable হইয়া পড়িল। ইহার অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। Mrs. John Bristow নামক জনৈক মহিলার চৌরঙ্গীতে বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে তাঁহার নিজের একটি নাট্যশালা ছিল ১১৯৯ সালে (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) তিনি এই নট্যোগার স্থাপন করেন। সুতরাং এইটি কলিকাতার দ্বিতীয় নাট্যশালা। মিসেস ব্রিষ্টো নিজে অতিশয় নাট্যপ্রিয়া এবং নাট্যকলাকুশলা ছিলেন। ইনিই প্রথমে ইংরাজ-মহিলাকুলকে নাট্যামোদে যোগদান করিতে প্রলোভিত করেন। ইঁহারই চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথমে ইঁহারই বাড়ীতে কতিপয় ইংরাজ-মহিলা অভিনেতব্য বিষয়ের নায়িকাদিগের ভূমিকা লইয়া অভিনেত্রীরূপে রঙ্গমঞ্চে দর্শন দেন। তদবধি ইংরাজ-মহিলাকুলে অভিনেত্রী হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে। ইহার পর হইতে 'কলিকাতা থিয়েটারে'ও স্ত্রী-অভিনেত্রী পাওয়া আর কষ্টসাধ্য রহিল না। মিসেস ব্রিষ্টো লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে নিজের বাড়ীতে নাট্যশালা

স্থাপন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১১৯৩ সালের মধ্যভাগে (১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে) এদেশের গভর্ণর-জেনারেল হন। মিসেস ব্রিষ্টো সম্ভবতঃ ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেই) নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অতি নিপুণা অভিনেত্রী ছিলেন। কলম্যানের নাটিকায় পাল হনিকোমের ভূমিকা অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। মিসেস্ ব্রিষ্টোর নাট্যাগারে 'The Sultan and the Padlock' নামক নাটিকার অভিনয় বড়ই সুখ্যাতিলাভ করে। তিনি ঐ পুস্তকে তুরুষ্ক-সুলতানের অবরোধে আবদ্ধা ইংরাজ-ক্রীতদাসীর বহুবিধ অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্য ও কলাকৌশল প্রদর্শন করিতেন। তিনি সজ্জাকৌশলেও বিশেষরূপ অভিজ্ঞা ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রীতদাসীর রূপের মোহে তুরষ্ক-সুলতানের অভিনেতা হাবভাব প্রকাশের সময় যে সকল চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন, তাহা মিসেস ব্রিষ্টোর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে এবং সজ্জাকৌশলের প্রভাবে কিছুই অতিরক্ত, অস্বাভাবিক বা অন্যায় বলিয়া মনে হইত না। ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খৃষ্টাব্দে) মিসেস ব্রিষ্টো বিলাত গমন করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় নাট্যরসগ্রাহী ইংরাজের মনে শান্তি বা তৃপ্তি ছিল না।*

হিকির গেজেট-পাঠে জানা যায়, এই নাট্যশালায় ১১৮৯ সালের পৌষ মাস (১৭৮২।৫ জানুয়ারী) পর্য্যন্ত অভিনয় চলিয়াছিল।† তাহার পর কিছুদিন ইংরাজ-সমাজে নাট্যাভিনয় বন্ধ ছিল। ১২০২ সালের আশ্বিন মাসে (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) আবার তাঁহাদের মধ্যে নাট্যামোদ জাগিয়া উঠে। সেই বৎসরে শীতকালের জন্য ছয়টী অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া চাঁদা তোলা হয়। এই অভিনয়গুলিকে

* Echoes from Old Calcutta, p. 128.

† Hickie's Gazette Vol. II. No. 2—1782.

Subscription Plays বলা হইত। পূর্ব্বোক্ত নাট্যশালাতেই এই সকল অভিনয় হইয়াছিল। চাঁদার টাকা টিকটের মূল্য হিসাবে লওয়া হইয়াছিল। যিনি ১২০টী সিক্কা টাকা দিতেন, তিনি ও তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সব কয়টী অভিনয় দেখিবার অধিকার পাইতেন। একক ব্যক্তির টিকিটের মূল্য ছিল ৬৪৲ সিক্কা টাকা। ছয়টী অভিনয়ের মধ্যে তিনটি অভিনয়ের বিবরণ মাত্র পাওয়া গিয়াছে;—প্রথমদিন 'Winter in the Suds' নামক নাটিকা, 'Trick upon Trick' নামক প্রহসন অভিনীত হয় এবং 'Poor Soldier' নামক গীতাত্মক একটা সঙ দেওয়া হয়। ১২০৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৭৯৫।১৩ মে তারিখে) বুধবারে 'Neck or Nothing' নামক প্রহসন অভিনীত হয় ও 'Waterman' নামক গীতাত্মক সঙ দেওয়া হয়।* আর একদিন "The Farce of Barnaby Brittle" অভিনীত এবং "Rule Britannia" গান হয়।

এই প্রাচীন কলিকাতা থিয়েটার বা কলিকাতার আদি নাট্যশালার গৃহটী ১২১৫ সাল (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া গেলে, রোওয়ার্থ সাহেব উহাতে একটা নিলামের দোকান করিয়াছিলেন, শেষে পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ৺গোপীমোহন ঠাকুর ঐ নাট্যশালা এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী আরো কতকগুলি বাড়ী কিনিয়া লইয়া ঐ স্থানে নূতন চীনাবাজার নামে একটী বাজার বসাইয়া দেন।†

যে ১২০২ সালে আদি নাট্যশালায় চাঁদার অভিনয়ের বন্দোবস্ত

* আমরা যাহাকে 'সঙ দেওয়া হয়' বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহা ইংরাজীতে the musical entertainment of 'Poor Soldier' or of 'Water-man' বলিয়া উল্লিখিত হইত; আমরা ইহা হইতে বুঝিয়াছি যে 'দরিদ্র সৈনিক' বা 'ভিস্তি' সাজিয়া নাচিবে গাহিবে ইত্যাদি।

† এই বাজার খুলিবার সম্বন্ধে ১৮০৮।১ লা নভেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটে যে বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"Whereas the house and buildings formally called '*The Theatre,*' wherein Mr. Roworth established an auction and was lately pur- ... constructed several buildings,

হয় সেই বৎসরে ডোমটুলিতে (এখনকার পুরাতন চীনাবাজারের নিকটে এজরা ষ্ট্রীটে) মিঃ লেবেডেফ্‌ New Theatre নামে একটী নাট্যশালা নূতন স্থাপন করেন। ইহাই কলিকাতার তৃতীয় নাট্য-শালা। এই নাট্যশালা স্থাপনের জন্য গভর্ণর-জেনারেলের অনুমতি লইতে হইয়াছিল। সার জন শোর তখন গভর্ণর-জেনারেল। এখানে প্রথম হইতেই স্ত্রী ও পুরুষ অভিনেতা লওয়া হইয়াছিল। ইহার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, এই নাট্যশালা বাঙালী প্রথায় সাজান হইত। অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে এখানে কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত হইত। যে সকল বাদ্যযন্ত্রকে তখনকার কালে বাঙালীরা শ্রদ্ধা করিতেন সেই সকল যন্ত্রের সাহত ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র মিলাইয়া এইখানেই সর্ব্বপ্রথম ভবিষ্যৎ বাঙালী একতান-বাদনের সূত্রপাত করা হয়। বাঙালীর যাত্রার দলে তখনকার কালে যেমন অঙ্ক-ব্যবাহিত সঙ আনিবার ব্যবস্থা ছিল, মিষ্টার লেবেডেফ ঠিক যেন বাঙালীর সেই রুচির অনুসরণ করিয়া এই নাট্যশালাতেও অঙ্ক-ব্যবাহিত কালে সঙ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরো একটী নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন এখানে হয় এবং সেটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক। ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বসাইয়া এখানে গাহিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের এই কবিতা যে কি,তাহা বিজ্ঞাপনে

---

that he intends for a new bazar, known by the name of the 'New China Bazar.' * * * Notice is therefore hereby given to the public from and after the twentieth day of November instant, the shops in the New China Bazaar, behind the Writers' Buildings, will be open, where European and other articles of every description will be found for sale."—এই গোপীমোহন ঠাকুর মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিতামহ।

কলিকাতার এই আদি নাট্যশালার বিবরণ পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রাদি এবং পুস্তকাদি ব্যতীত The Good Old days of Honorable John Company নামক পুস্তকের প্রথম ভাগের ১০২—৫ পৃষ্ঠায় ও The Bengal and Agra Annual (Guide and Gazetteer) 1841, Vol. I. p. 63 প্রভৃতি দেখিলে জানা যাইবে।

খুলিয়া লিখিয়া না দিলেও ইহা যে বিদ্যাসুন্দর,—অন্নদামঙ্গল অথবা মানসিংহ নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। ইহা হইতে আমরা আরও একটা বিষয় জানিতে পারিতেছি। তখনকার বাঙালী-সমাজে যাত্রাদিতে যেখানে-সেখানে বিদ্যাসুন্দর গাওনা হইত। গোপালে উড়ের যাত্রার পূর্ণ গৌরবের সময়ই এই। অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীর বাড়ীতে ইংরাজ-দর্শকেরাও এই যাত্রা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন, বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার মনোহারিত্ব ইংরাজ-সমাজেও এমন ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাঁহারাও তাঁহাদের নবীন প্রমোদ-মন্দিরে ইহার অবতারণা না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। আরো একটী বিষয় আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। মিঃ লেবেডেভ্ হঠাৎ বাঙালীর রুচি-অনুযায়ী এতগুলি ব্যাপার একেবারে অবলম্বন করিলেন কেন? মিঃ লেবেডেফ্ এই সকল উপায়ে তাঁহার রঙ্গালয়ে বাঙালী-দর্শক আকর্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,—ইহা স্পষ্টতঃ কোথায়ও উল্লিখিত না থাকিলেও ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

আদি কলিকাতা-থিয়েটারে বা মিসেস ব্রিষ্টোর থিয়েটারে বাঙালীর যে প্রবেশাধিকার ছিল না, ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই বর্ত্তমান নাই, বরং সেকালে বাঙালী ও ইংরাজের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহাতে ঐরূপ অধিকার ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে আর সে অনুমানে বিশেষ কোন দোষও দেখা যায় না। এই নূতন ব্যবস্থা দেখিলে, মিঃ লেবেডেফ্ যে সুকৌশলী ব্যবসাদার ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তিনি ইংরাজপক্ষের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়া ইংরাজকে এবং বাঙালী-পক্ষের বিস্ময় জাগাইয়া বাঙালীকে আপন রঙ্গালয়ে আকৃষ্ট করিবার অতি সমীচীন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই নাট্যশালাতেই ইংরাজ-বাঙালীতে মিশিয়া ইংরাজী-প্রথার নাট্যামোদ উপভোগ করিতে আরম্ভ

করেন। এই সময় হইতেই বাঙালীর হৃদয়ে ধীরে-ধীরে নাট্যাভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবেশ করে। কালে এই বীজ হইতে যে বৃহৎ ব্যাপারের উৎপত্তি হইয়াছে আজ তাহারই ইতিহাস লিখিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি।*

মিঃ লেবেডেফের নব নাট্যশালা কতদিন বর্ত্তমান ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তাহার পর ক্রমশঃ কলিকাতা থিয়েটার (The Calcutta Theatre), হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (The Wheler Place Theatre), চৌরঙ্গী থিয়েটার (Chowringhee Theatre), এথিনিয়ম (The Athæneum), চন্দননগর থিয়েটার (Chandernagore Theatre), দমদমা থিয়েটার (The Dumdum Theatre) বৈঠকখানা থিয়েটার (The Boytaconnah Theatre) প্রভৃতি ১২০৫ সাল হইতে ১২৩৪ সালের মধ্যে (1798-1827) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। †

---

* বষ্টিড তাঁহার প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন,—

There existed in 1795 another Theatre in Doomtullah (Domtooli) a lane leading out of the Old China Bazaar and near the other Theatre (*i. e.* the Old Calcutta Theatre.)

The manager of the Doomtullah Theatre in that year announced an unique performance :—'By permission the Hon'ble Governor-General, Mr. Lebedeff's new Theatre in the Doomtullah, decorated in the Bengali style will be opened very shortly with a play called 'The Disguise'; the characters to be supported by the performers of both sexes. To commence with vocal and instrumental music called the Indian Serenade. To these musical instruments, which are held in esteem by the Bengalees will be added to European. The words of the much-admired poet Sree Bharat Chandra Ray are set to music. Between the Acts some amusing curiosities will be introduced."—Echoes from Old Calcutta, p. 127.

† এই সকল ইংরাজী থিয়েটারের যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

এইরূপে ইংরাজী নাট্যশালার সংঘর্ষে বাঙালীর মধ্যে অল্পে অল্পে নাটকীয় রুচি পরিবর্ত্তিতপ্রথায় পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। যাত্রায় যে রুচি এতদিন একান্ত বৈজিকভাবে নিবদ্ধ ছিল, তাহা এই সময় হইতে ভিন্ন আকারে বিকাশলাভ করিতে লাগিল। যতদুর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে প্রথমে বাঙ্‌লা নাটকেরই উৎপত্তি হয়। আদি বাঙ্‌লা নাটকখানি যে কি, তাহা আজিও কোন অনুসন্ধিৎসুর গোচরীভূত হয় নাই। তাহার পর আরও কয়েকখানি নাটক লিখিত হয় এবং তাহার অভিনয়েরও চেষ্টা হয়। প্রথম কোন্ পুস্তক কি ভাবে, কোথায়, কাহার দ্বারা অভিনীত হয়, তাহাও জানা যায় নাই; তবে Calcutta Review নামক পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি নাটক-অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। উহা ১২২৮ সালের (১৮২১ খৃষ্টাব্দের) কথা। তখন লর্ড ময়রা এ দেশের গবর্ণর। তখন প্রথম বাঙ্‌লা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তখন বাঙ্‌লা নাটকের নামকরণে নাটক শব্দ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় নাই,—দেশপ্রচলিত, সুপারজ্ঞাত 'যাত্রা' শব্দই উহার দ্যোতক হইয়া আছে। তবে উহার অভিনয়ের প্রথায় প্রচলিত যাত্রা-গাওনা হইতে যে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নতুবা উহার কথা তখনকার সংবাদ-পত্রে উঠিত না। ৺রামমোহন রায়ের সম্পাদিত ১২২৮ সালের আর একখানি সংবাদ পত্র 'সংবাদ-কৌমুদীর' ৮ম সংখ্যায় এই অভিনয়ের বিবরণ আছে। যখন এই 'কলিরাজার যাত্রা' নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল, তখন যে বাঙ্‌লা ভাষায় আরও কয়েকখানি নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও ঐ 'সংবাদ-কৌমুদী' * হইতে জানা যায়। ১২২৮ সালের

---

* সংবাদ-কৌমুদী আমরা পাই নাই, তবে Calcutta Review, Vol, XIII.,

"সংবাদ-কৌমুদী"র ৫ম সংখ্যায় নবপ্রকাশিত নাটকগুলির কুরুচি বিষয়ে একটি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ ছিল। এ গুলির নাম কি, বিষয় কি, কোনখানি অভিনীত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় নাই। *

বাঙালীর আদি নাটকের ও নাটকাভিনয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই কিছু অন্ধকার তাহার পর 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি নাটকের নাম ও তাহার অভিনয়ের সংবাদটি মাত্র পাওয়া গেল। ইহাও সুপ্রাচীন কালের ১২-৮ সালের কথা,—বলিতে গেলে এক শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। এইখানে কিন্তু একটা সুখের সংবাদ আছে, তত প্রাচীন কালেও যখন নাটক বলিতে অঙ্গুলিপর্ব্বে গণনীয় কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল,—তখন হইতে বাঙ্গালার নবীন নাট্যসাহিত্যকে পরিমার্জ্জিত করিবার জন্য, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় হিতৈষী মহোদয়ের সংবাদপত্রে বিধিমত চেষ্টাও দেখিতে পাই। ইহা যে বাস্তবিকই আনন্দের কথা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙলায় এই প্রথম নাটক, প্রথম নাটকাভিনয় ও প্রথম নাট্য-সাহিত্য সমালোচনার সংবাদ এবং ইংরাজী হইলেও, বাঙলা দেশের আদি নাট্যশালার সংবাদ দিয়া সঙ্কলিত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ করা গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

* পূর্ব্বোক্ত কলিকাতা রিভিউ পত্রিকা থাকিতে সংবাদ-কৌমুদীর যে বিবরণ

যাত্রা নাস্তি।

আমাদিগকে যদি কখনও কোন শুভকার্য্যে যাইতে হয় পঞ্জিকা খুলিলেই দেখিতে পাই—"যাত্রা নাস্তি"। খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাত্রা শুভ এক-দিনও পাই না, কিন্তু যাত্রা নাস্তি ত্রিশদিনই দেখিতে পাওয়া যায়। মাসের প্রথম, না হয় দ্বিতীয় দিন আমার যাওয়ার কথা, কিন্তু সে স্থলে আমি গিয়া থাকি পোনেরই না হয় ষোলই, তা'ও হয়ত অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে! এই পঞ্জিকাই আমাদিগের অনেকটা অবনতির মূল।

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক দিন ও রাত্রির কিয়দংশ যাত্রা নাস্তির মধ্যে ফেলিতে হয়, ইহা বারবেলা ও কালরাত্রি। প্রতি দিনে ইহাতে বড় অল্প সময় যায় না। যাত্রানাস্তি কেন, সকল কর্ম্মেই অশুভ। সকল মাসেরই পনেরটা তিথি যাত্রা নাস্তি—শুক্লা প্রতিপদ, দুইটা চতুর্থী, দুইটা ষষ্ঠী, দুইটা অষ্টমী, দুইটা নবমী, দুইটা দ্বাদশী, দুইটা চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রত্যেক মাসেরই প্রথম দিন ও সংক্রান্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মঙ্গল, শনি ও রবি এই তিনটিবার বড় অমঙ্গলদায়ক ইহাও পঞ্জিকা লিখিতেছে। আবার সকল বারেই হয়ত এক দিকে না এক দিকে যাইতে নিষেধ,—পশ্চিমে রবি ও শুক্রবারে, উত্তরে মঙ্গল ও বুধে, পূর্ব্বে শনি ও সোম, এবং দক্ষিণে বৃহস্পতিবারে। তারপর, সকলেরই এক-একটা জন্মদিন আছে, তাহাতেও প্রত্যেককে প্রতি মাসে চারি পাঁচটা দিন ছাড়িয়া দিতে হয়। এই সকল বাছিয়া গুছিয়াও দিন মিলিতে পারে এ প্রকার ধারণা যদি হয় তো দেখা যাইবে এমন অনেকগুলি নক্ষত্র আছে যাহাতে পঞ্জিকা-কার আমাদিগকে [illegible] দিতে অনিচ্ছুক। উত্তরফল্গুনী, মঘা, ভরণী,

বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্রে কোথাও যাত্রা করিতে নাই। ইহার পর আবার যোগাযোগ আছে। মৃত্যুযোগ, বিষযোগ প্রভৃতি যোগ, ত্র্যহস্পর্শ, দগ্ধা, বিষ্টি, রিক্তা, গ্রহণের পর সাত দিন, এ প্রকার যে কত আছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সকল একটা না একটা দোষ পঞ্জিকার সকল দিন ও সকল দণ্ডেই আছে। যদি কোথাও সিদ্ধিযোগ মিলে, হয়ত তাহাতে নক্ষত্র-দোষ, না হয় অন্য একটা কিছু দোষের সংযোগ হইয়া পড়িল; যদি তৈতিলকরণ পাওয়া গেল অমনি দেখা যাইবে তাহার সঙ্গে আর একটা গুরুতর ব্যাপার কিছু সংঘটিত হইয়াছে; যদি হস্তা জ্যেষ্ঠা কি পুনর্ব্বসু কোন একটা নক্ষত্র পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাইবে তিথিদোষ, না হয় একটা-কিছু সংযোগ আছেই আছে, যাহাতে সব যাত্রা পণ্ড হইয়া যায়! ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে পঞ্জিকা-কার যেটুকু অনুমতি দিয়াছেন সেটুকুও তিনি তাঁহার যোগাযোগে হরণ করিয়া লন, কাজেই আমরা মাসের মধ্যে একটা দিনও পাই না। তাহাও যদি আমাদের অনেক অনুসন্ধান বা মন বুঝানর ফলে পূর্ব্বে শুভ পশ্চিমে অশুভ-গোছ কোন একটা দিন প্রাপ্ত হই, তথাপি আমরা সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়দিগের হাত ছাড়াইতে পারি না; অমনি হাঁচি, টিক্‌টিকি, ধোপা, কলু, নপুংসক, মাকুন্দ, শূন্য কলসী, পিছনে-ডাকা, হোঁচট-খাওয়া, শৃগাল মরা এবং আরও লক্ষ গণ্ডা জিনিষ আসিয়া দেখা দিবে! এ সকল ছাড়াও আবার পুরোপুরি মাসের ব্যবস্থা আছে; ভাদ্র, পৌষ প্রভৃতি মাসে আমাদিগকে ঘর ছাড়িতে নাই। সুতরাং পঞ্জিকা আমাদিগকে বলিতেছে, তোমরা কোথাও যাইও না, যবস্থব হইয়া সর্ব্বদা গৃহে বসিয়া থাক।

আর একটু পরিস্ফুট ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, প্রত্যেক মাসেই কয়টা দিন করিয়া আমাদিগকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে হয়।

মঙ্গল, শনি ও রবি এই তিনটী বারে যদিও কিছু দোষ না থাকে পঞ্জিকা-কার বলিতেছেন দোষবিশিষ্ট যে পনরটা তিথি, মাসের মধ্যে সেই পনর দিন কোথাও যাইও না। অগস্ত্য-দোষ ও সংক্রান্তি-দোষ— যদিও ইহার সঙ্গে ঐ সকল তিথির একটাও সংযোগ হইতে পারে, তবুও একটাও একক থাকিবার সম্ভাবনা, সুতরাং ইহাতেও প্রতি মাসে এক দিন বাদ যাইবে। তারপর চা'র পাঁচটা জন্মদিনের মধ্যে দুই একটার সঙ্গে তিথ্যাদি সংযোগ যে না থাকতে পারে তাহা নহে—সুতরাং জন্মদিনের জন্যও মাসে দুইটা দিন বাদ দিতে হয়। আবার এতগুলি যে খারাপ নক্ষত্র আছে ইহার মধ্যে চারি পাঁচটাও কি একক থাকার সম্ভাবনা নাই? সুতরাং নক্ষত্রের জন্যও মাসে ৪।৫ টা দিন বাদ যাইবে কাজেই পঞ্জিকার মতে সকলকে একুনে তেইশ কি চব্বিশ দিন প্রতিমাসেই যাত্রানাস্তির জন্য বাদ দিতে হয়। বাকি ছয় সাত দিনও, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যোগ, যোগিনী, করণ, দগ্ধা, বিষ্টি, দিকশূল, ইত্যাদিতে বাদ যাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হাঁচি, টিকটিকি, অশুভ দর্শন প্রভৃতি সমস্ত গুলি কাজে না লাগাইয়া এমন কি ফাজিলই দাঁড়াইবে!

যাঁহারা কার্য্যপ্রিয় বা practical ধাঁচের লোক তাঁহারা এই ব্যাপারের সাংঘাতিক মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; সেইজন্য, কেহবা শিবজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ম এবং কেহবা নিতান্ত মন-বুঝান-গোছ কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল নিয়মগুলির বিষয় ভাবিতে গেলে পাঞ্জিকার নিয়মগুলিকে অসার বলিয়া বোধ হয়। দুই একটী উদাহরণ দেখা যাউক।

(১) জ্যোতিষের মতে শুদ্ধ দিন একেবারেই নাই, এইজন্য বরাহ নিয়ম করিয়াছেন যে যোগ, বার, তিথি এ সকল তোমরা কিছু দেখিও

মঙ্গলে গলায়, বুধে উদরে, বৃহস্পতিতে পার্শ্বে, শুক্রে কর্ণে ও শনিতে পৃষ্ঠে হাত দিবে তাহা হইলেই সকল অসাধ্য সুসাধ্য হইবে ও কোন অমঙ্গল হইবে না। আর যদি হাঁচি, টিকটিকি ইত্যাদি কোন বিঘ্ন সংঘটিত হয় তবে ভূমিতে তিনবার বাম পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবে!

যদি বাস্তবিক কুদিনে যাত্রা করিলে আমার অমঙ্গল হয়, বারবেলা, কালরাত্রিতে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে, তবে মাথায় হাত, মুখে হাত না হয় পেটে হাত দিয়া গেলে কিজন্য যে তাহার ব্যাতক্রম ঘটিবে এ কোন শাস্ত্রই বুঝিতে পারে না।

(২) যদি নক্ষত্রাদি তোমার যাত্রা নষ্ট করিয়া দিতে চায়, তবে ঊষা না হয় গোধূলিতে যাত্রা করিবে। ঊষা এবং গোধূলির এমন কোন্ গুণ আছে যাহাতে ভরণী, মঘা বা অষ্টমী নবমীর পরাক্রম নষ্ট করিতে পারে?

(৩) আমরা শয়ন ঘর বা ভোজন ঘর পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীর মধ্যে বা নিকটে আর একটা ঘরে গিয়া থাকি, কিন্তু মৃত্যুযোগ বা শূল লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা করি।

(৪) খনা বলেন—

আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের যত দিন
তিথি বার ঐক্য করে সাতে কর হীন,
একে শুভ দুয়ে ভাল তিনে শত্রুক্ষয়
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়,
ষষ্ঠে মৃত্যু, শূন্য হলে পায় বহু সুখ
খনা বলে এ যাত্রায় কভু নহে দুখ।

ইহা বাস্তবিকই কাগজে-কলমের গণনা এবং মন-বুঝান নয় কি? খনার "মন সরেত যা" এ নিয়মও অনেকে অবগত আছেন। বস্তুতঃ এ নিয়মটাকে বড় ভাল নিয়ম বলিয়া বোধ হয়।

(৫) যদি আমরা পথে অনিমিত্ত সকল দেখিতে পাই তখন কি করিব? সকলেই অবগত আছেন—

ভরা হইতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়,
মরা হইতে তাজা ভাল যদি মরিতে যায়
আগে থেকে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়,
বামে হইতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
ইত্যাদি।

সকলেই জানেন যে পথে কলসী লইয়া লোকের জল আনিতে যাওয়াই সম্ভব। সেকালে লোকে সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য "জীবন্ত মরা"ই পথে লইয়া যাইত। ছেলের বাহিরে যাওয়ার সময়, এটা ভুল হইল ওটা ফেলিয়া গেল করিয়া মাতার মনটা যেমন ব্যস্ত হয় তেমন কাহারো নয় সুতরাং মাতারই পিছনে ছুটিয়া গিয়া বলাটা বেশী সম্ভব; এবং সম্ভবতঃ এমন শৃগাল এ পর্য্যন্ত কেহ দেখেন নাই যে পদশব্দ বা অন্য কোনও কারণবশতঃ সর্ব্বদা ফিরিয়া না তাকায়!

(৬) খনার আর একটা বচন আছে—

হাঁচি জ্যেষ্ঠা পড়ে যার
শত গুণে লভ্য তার।

(৭) দ্বিরাগমনের দিন মেলা দুরূহ; 'ধূলো পায়ে যাত্রার' কথা অনেকে অবগত আছেন। বিজয়া দশমীতে সমস্ত বৎসরের যাত্রা করিয়া রাখার কথাও সকলেই জানেন। উল্লিখিত মতানুসারে যাহারা যাত্রা করিয়াছে তাহাদের কার্য্যে অশুভ খুব কমই ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই মনে হয় তিথি নক্ষত্রের হাজার ক্ষমতা থাকিলেও মন বুঝান হইলে সে সকলে কিছু করিতে পারে না, অর্থাৎ এ প্রকার মনকে চোখ ঠারিতে পারিলে তাহাদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়।

নবদ্বীপের একজন পণ্ডিত এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাপু, বার-নক্ষত্রাদি ওসব কিছুই নয়, "ক্ষণ" বলিয়া একটা জিনিস আছে, সেইক্ষণে পা বাড়াইলেই শুভ বা অশুভ ঘটিয়া থাকে।" সেই ক্ষণ আবার কতটুকু? না, গরুর শৃঙ্গের উপর সরিষা ধরিবার যতটুকু সময় সেইটুকুর মত। কিন্তু এই "ক্ষণ" যে কোথায় থাকে তাহা পঞ্জিকা-কারও দেখিয়া যাত্রা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তা যদি পারিতেন তাহা হইলে সকল পঞ্জিকাকারই রাজা বাদশাহ হইয়া পড়িতেন, আমরা এ সকল পঞ্জিকা আর কেহ দেখিতে পাইতাম না।

যাঁহারা পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রা করার বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহারা কতকগুলি বড় বড় উদাহরণ দেন তাহারই দুই একটা নিম্নে দেখাইতে ইচ্ছা করি।

যশোহর জেলায় কি কোথায় একটা নীলকুঠী ছিল। কুঠীর সাহেব একদিন অনেক টাকার নীল নৌকায় করিয়া চালান দিতে-ছিলেন। তিলককাটা দেওয়ানজী বলিলেন, "সাহেব আজ মঘা, আজ নীলটা না চালান দিলেই হইত।" সাহেব সে কথায় উপহাস করিয়া নীল পাঠাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে নৌকা ডুবিয়া বিস্তর টাকা লোকসান হইয়া গেল। সেই হইতে যখনই সাহেব নীল পাঠাইতেন, তখনই খোঁজ লইতেন, "দেখো তো শালা মঘা কাঁহা হায়?"

অল্প দিন হইল জলপাইগুড়িতে 'ত্রিস্রোতা' নদী পার হইতে গিয়া ঝড়ে তিন চারি জন সাহেব নৌকা ডুবিয়া মারা গেল। মাঝিরা বলিতেছিল, "যাইব না, বিপদ ঘটিবে," সাহেবেরা বলিতেছিল, "জরুরী কাজ যাইতেই হইবে।" নৌকা খোলা হইল, কিন্তু মাঝখানে যাইতে না যাইতে দুই দিকের ঢেউ এক হইয়া নৌকা গিলিয়া ফেলিল। একজন পণ্ডিত-গোছ লোক না কি বলিলেন যে "ক্ষণ"টা বড়ই অশুভ ছিল।

লর্ড মেয়ো কখন্ কিরূপ পদবিক্ষেপ করিয়া মরিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নাই কিন্তু লোকে বলে লর্ড মেয়োকে যখন হত্যা করে তখন একজন 'ভটচাজ্জি' ধরণের লোক (সে সময়ে কোন 'ভটচাজ্জি' ধরণের লোক সেখানে ছিলেন কি না জানি না) নাকি বলিয়াছিলেন, "এই রে সর্ব্বনাশ করলে, আর একটু পরে পা বাড়ালে কখনই মরিত না।"

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ 'তনটীর ন্যায় আরও অনেক উদাহরণ আছে। আশা করি বাঙ্‌লা দেশের সকলেই তাহার একটা-না-একটা অবগত আছেন। যাঁহারা দিন দেখাইয়া যাত্রা করার বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহারা অন্য পক্ষের সহস্র যুক্তি থাকিতেও শুধু এই গুলিকেই পঞ্জিকা মানিবার অকাট্য যুক্তি বলিয়া মানিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে বিচার করিলে এ প্রকার সমস্ত গল্প গুলিই কি অপরিণামদর্শিতা বা বা অদৃষ্ট ঘটনার (Chance) ফল নহে? ভূমিকম্প কবে হইবে কেহ জানেনা, সুতরাং আপন আপন ঘরে শুইয়া থাকিবার জন্য কেহ পঞ্জিকাও দেখেনা যে কবে চাপা পড়িয়া মরিব ও কোন্ কোন্ তারিখে ঘরে শোয়া উচিত; আর পঞ্জিকাও সে কথা বলে কিনা সন্দেহ; কিন্তু এমন দিন ঘটিতে পারে যে দিন ভূমিকম্প হইয়া ঘর চাপা পড়িয়া দুই চারিটা লোক মারা গেল। ইহার কারণ বোধ হয় 'নেহাৎ অদৃষ্ট' বা Chance ছাড়া কেহ আর কিছু বলিবেন না। ইহা যেমন Chance, উল্লিখিত উদাহরণগুলিও সেইরূপ Chance; লোকে হাজার পঞ্জিকা-নুসারে চলুক, ক্ষণভঙ্গুর শরীরে Chanceএর হাত কেহই এড়াইতে পারে না।

আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, "আমরা হাতে হাতে ফল পেয়েছি, হাজার যুক্তি দেখাও, আমরা কারু কথায় বিশ্বাস করি না।" তাঁহারা হয়ত কখন বৃহস্পতিবার বারবেলা ন হয়

অসামান্য কোন অনিষ্টও ঘটিয়া থাকিবার সম্ভাবনা; সুতরাং সেই জন্য তাঁহাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও অচল হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যের শরীরে বা কার্য্যে অল্প বা অধিক অনিষ্ট পদে পদেই ঘটিয়া থাকে; সুযাত্রায় গেলেও ঘটে, কুযাত্রায় গেলেও ঘটিতে পারে। সুযাত্রায় গেলে যদি কিছু ঘটে তাহাকে যাত্রার কারণ কেহই বলে না কিন্তু কুযাত্রায় গেলে মানুষে যদি হোঁচট খায় তাহাকেও ঐ কুযাত্রার জন্যই ঘটিল বলিয়া নিজের কুসংস্কারকে আরও দৃঢ়তর করিয়া থাকে।

এক যাত্রায় একই সময়ে যদি বাঙালী, মুসলমান ও খ্রীষ্টান বা চীনদেশীয় লোক যাত্রা করে তাহা হইলে প্রায়ই দেখা যায় বাঙালীরই অনিষ্ট ঘটে অন্য কারো ঘটে না। অতি বাল্যকাল হইতে বাড়ীর ও সমাজের লোকের কুসংস্কার বশতঃ এই যাত্রার খট্‌কা আমার মনে লাগিয়া যায়; তাহাতে আমি সর্ব্বদাই দিন দেখিয়া গিয়াছি এবং সকল অনিষ্টকেই অদিনের জন্য বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছি, কিন্তু সুদিনে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহার কারণ স্থির করিতে পারি নাই। শুধু ইহাই নহে, যে লোকটা অদিনে গিয়াছে তাহারও কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। আমার সংগ্রহ তালিকার মধ্যে এমন উদাহরণের অভাব নাই যাহাতে একই যাত্রায় গিয়া বাঙালীর অনিষ্ট ঘটিয়াছে মুসলমান বা খৃষ্টানের কিছুই হয় নাই। ইহার কারণ এই যে অতি সামান্য অনিষ্টও ব্যাখ্যা করিবার কারণ বাঙালী বাবুর আছে কিন্তু অন্য জাতির নিকট তাহা নাই।

যদি ইহাও কেহ বিশ্বাস করিতে না চাহেন এবং বলেন যে তাহাদেরও নিশ্চয় অনিষ্ট ঘটে তখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে পরমেশ্বর বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত পঞ্জিকায় লিখিত যাত্রার তালিকা দেন নাই সুতরাং বাঙালী ভিন্ন অন্য সকল জাতিকেই কি

উৎসাহই কার্য্যের ভিত্তি। যাহার যে প্রকার উৎসাহ সে সেইরূপ কার্য্যে ফলবান হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই যদি তুমি একজনকে বলিয়া রাখ এ যাত্রায় তোমার অনিষ্ট ঘটিবে, তবে যে লোকটা যাইবে তাহার আর কোন উৎসাহই থাকিবে না এবং থাকিলেও বলিবে যখন অনিষ্টই লিখিত আছে তখন আর কাজ কি ?

সুযাত্রার লক্ষণে যে সকল শুভদর্শনের তালিকা আছে, তাহাতে পূর্ণ কুম্ভ, সুন্দরী নারী, প্রভৃতি অধিকাংশ গুলি হইতেই এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে মনকে উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত করাই সে সকল লক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য। মন উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত থাকিলে মনুষ্যের কার্য্যের ফলাফলের বিষয় চিন্তা করিতে হয় না ; হাজার কুযাত্রা হইলেও কার্য্য সুন্দর হইয়া থাকে।

লোকে ঠাকুরের ফুল বিল্বপত্র চাদরে বাঁধিয়া লইয়া যাত্রা করে, কিন্তু আমার বোধ হয় পঞ্জিকা ছিঁড়িয়া মনুষ্য যদি সুযাত্রা হউক কুযাত্রা হউক সব সময়েই ভগবানের নাম করিয়া ও ভগবানের উপর স্থির বিশ্বাস রাখিয়া যাত্রা করে তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা কম, এবং অনিষ্ট ঘটিলেও তাহার যথার্থ কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তুমি বলিবে বার, তিথি নক্ষত্র প্রভৃতির অসীম ক্ষমতা, কার সাধ্য অযাত্রায় গেলে তাহা উল্লঙ্ঘন করে। আমি বলি যে, যে অনন্তশক্তি, বার, তিথি, ও নক্ষত্রের স্রষ্টা ও পরিচালক, তুমি যদি তাঁহারই শরণাপন্ন হও তাহা হইলে আর ভয় কি ?

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দে।

কৃষ্ণকান্তের উইল।*

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বলিলে সাধারণ পাঠকের মনে গ্রন্থের আখ্যান-ভাগের ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠেনা; একটী ক্ষুদ্র গল্পের বা কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেকটিভ্ কাহিনীর নাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইলে মানাইত বটে! গ্রন্থকার, ইচ্ছা করিলে, গ্রন্থের নাম 'ভ্রমর' বা 'গোবিন্দলাল' রাখিতে পারিতেন; কিন্তু যখন সাহিত্য সম্রাটের 'পলিতকেশ,' তখন আমরা তাঁহার পরিণত চিন্তার অমৃত-ফল,—এই গ্রন্থখানি লাভ করিয়াছি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের রচনাগুলি আমাদের অতি সতর্কতার সহিত, অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'!—এই অনাড়ম্বর নাম-করণেও, মনে হয়, নাটকীয় প্রতিভার একটী মনোজ্ঞ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইলের ফলে, কোনও জ্ঞাতিবর্গে তুমুল বিবাদ-বিসম্বাদ, লাঠা-লাঠি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। গুপ্তহত্যা, মোকদ্দমা করিয়া দুইটি সংসার 'উচ্ছন্ন' যায় নাই, অথচ হইয়াছে সব;—সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। এই উইলের পরিণামে, একটী সংসার উচ্ছিন্ন; একটী সুন্দর-প্রাণ বিসর্জ্জিত; একটী পাপ-জীবন বিনষ্ট; একটী পুণ্যচরিত্রের পতন ও বিরামহীন প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে! মনে হয়, লেখকের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যে, অতি ক্ষুদ্র কারণ-বীজ হইতে, আমাদেরি গৃহ-প্রাঙ্গনে, অতি বিশাল মহীরুহের সৃষ্টি হইতে পারে;—এই সরল সত্যের প্রতিপাদন করা। বস্তুতঃ, নিবিষ্ট চিত্তে গ্রন্থখানি পর্য্যালোচনা করিলে,—তাহাতে নাটকীয় ত্বরিত পরিণতির অনুধাবন করিলে, প্রতি পদেই দেখিতে পাই,—অতি সামান্য কারণের অন্তরালে অতি বিরাট কার্য্য, ব্যগ্র

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

প্রতীক্ষায়, আত্ম-গোপন করিতে পারিতেছে না ;—একটু অসতর্ক ভাষা, এতটুকু করুণার অভিব্যক্তি, নিত্যকার সংসার-রঙ্গমঞ্চে-অভিনীত পুরাতন ভ্রূ-বিলাস,—অতি সামান্য-সামান্য উপাদানে কি বিপুল-বিশাল পরিণামের দ্রুত বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মহা-বিচ্ছেদের মূলে, সেই অন্ধ-মৌন অভিমান; রোহিণীর একটী বিলোল কটাক্ষের ফলে, মৃত্যু; হরলালের প্রতারণা ও অন্তর্দাহী লোভ ;—ইহাই কৃষ্ণকান্তের উইলের ক্রমবিকাশের এক-একটী স্তর।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' অসংযমের রূপান্তর-চিত্র। যৌবন এই অসংযম বহ্নিতে ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। সৌন্দর্য্য-পিপাসা, তাহার অতৃপ্তি, সংশয়, সম্মোহ প্রভৃতি অনুচরগুলি, যৌবন-দেবতা প্রণয়ের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; কিন্তু, পরিণামে, প্রণয়ের দেবকান্তি অতি উজ্জ্বল হইয়া সমস্ত কালিমা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে!

এই গ্রন্থের ঘটনাগুলির অনুসরণে আর একটী প্রকৃতির 'নিয়মের' পরিচয় পাই। দেখিতে পাই, সংসারে আমরা স্ব স্ব কার্য্যের ঈশ্বর নহি; প্রকৃতির ক্রীড়নক্ মাত্র! গীতার সেই পুরাতন কথা—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারাবমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম্মের মধ্যে, যাহা বুঝিয়াও বুঝিনা, দেখিয়াও দেখি না, তাহা আর একবার সুস্পষ্ট হইয়া যায়। গোবিন্দলাল কখনই জানিত না, সে ধীরে ধীরে কিরূপে পতনের পিচ্ছিল সোপানে পদক্ষেপ করিতেছে; চির-সোহাগময়ী ভ্রমর জানিত না, যে তাহার অতি-বিশ্বাস-ভরা অন্ধ-প্রণয় তাহার স্বামীকে পাপের পথে প্রয়াণ করিতে সুযোগ আনিয়া দিতেছে!

গ্রন্থমধ্যে তিনটী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত

হইয়া যায় ;—রোহিণী, গোবিন্দলাল ও ভ্রমর। যেমন একটী পুষ্প-গুচ্ছের আশে-পাশে লতাপাতার সুসন্নিবেশ তাহার নির্ম্মল শোভাটির বিকাশ মধুর করিয়া তোলে ;—তাহার নগ্নতা আবৃত করিয়া, তাহার অসীম পরিপূর্ণতার সীমা-সৃজন করিয়া, সুন্দর করিয়া তোলে, গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্রগুলি,—তাহাদের স্ব স্ব স্বাধীন শোভা থাকিলেও,—তেমনি, এই তিনটী বৃহৎ চরিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছে। গ্রন্থমধ্যে, সে গুলির সুবিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কতদূর কৃতিত্ব, সে সম্বন্ধে অতি-বিস্তারে প্রয়োজন নাই ; এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণকান্ত ও দেওয়ানজীর এক একটী কথায় গোবিন্দলালের চরিত্রের মূল-সূত্রটী ধরা পড়িয়া যায়।

প্রথমে, রোহিণীর প্রতি চাহিয়া দেখি।—তাহার প্রতি যেমন একটা তীব্র ঘৃণার উদয় হয়, তেমনি, গোবিন্দলালের মত, আমাদেরও যেন অন্তর্গূঢ় সহানুভূতির উদ্রেক করে। রোহিণী বালবিধবা ;—সমাজের অবহেলিত সুকুমার কুসুমদাম ! একদিন যত্নে, সেবায়, পুণ্যে ও সুগভীর প্রেমে যাহা দেবার্চ্চনার অর্ঘ্য রচিত হইতে পারিত, তাহা আসুরিক প্রবৃত্তি-পিশাচের নিষ্ঠুর পদতাড়নে বিমর্দ্দিত হইয়াছে ! উদার হৃদয়ে চিন্তা করিলে, তাহার অনুকূলে একটু করুণা (pity) আসে বৈকি। পাপের প্রতি যেমন সকলের ঘৃণা নিত্য জাগ্রত রহিয়াছে, তেমনি নিঃসহায় পাপীর প্রতিও প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি, সমাজের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া, স্বতঃই উচ্ছল হইয়া উঠে। যদি আমরা গোবিন্দলালের শোচনীয় পরিণামের সহিত সহানুভূতি দেখাই, তবে রোহিণীর পরিণামের সহিতও সহানুভূতি দেখাইতে কতকাংশে বাধা ;—অবশ্য মাত্রানুপাতে !

প্রথম সংস্করণে, গ্রন্থকার গোবিন্দলালের পরিণাম ভিন্নরূপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইলে পাপ-পুণ্যের বৈচিত্র-গণ্ডী অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত। অথবা গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরকে পুনরায় লাভ

করিতেন, তাহা হইলেও সংসারে পুণ্যের মর্য্যাদারক্ষিত হইত না। ভ্রমর বাঁচিতে পারিত; কিন্তু দুইটা তপ্ত অনল-শিখার প্রখর তাপে তাহার কুসুম-কোমল প্রাণটুকু দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার বাঁচিবার উপায়—উপায় থাকিলে স্বার্থকতা—ছিল না; মরণ তাহার পুণ্য সৌরভ চির দিন সদ্য নূতন রাখিবে। মৃত্যুর বিনিময়ে, রোহিনী আপনার প্রায়শ্চিত্ত না কিনিলে, গোবিন্দলালের মুক্তি বিলম্বিত হইয়া পড়িত। রোহিণীকে মরিতে হইল বলিয়া, অনেক নীতিবিদ্ সমালোচক মনঃক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু টেনিসনের দুই ছত্রে সে আপত্তির খণ্ডন পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়;

"That not a moth with vain desire
Is shrivell'd in a fruitless fire,
Or but sub-serves another's gain.

রোহিণীর ফিরিবারও পথ ছিল না,—সে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং রোহিণীর পরিণাম ভিন্নরূপ করিতে হইলে, একটা অশোভন অস্বাভাবিকতায় গ্রন্থখানি অসঙ্গত-ছায়া-ম্লান হইয়া থাকিত।

রোহিণী ও গোবিন্দলাল—এ দুটা চরিত্রের মেরুদণ্ড, অসতর্কতা ও অসংযম। রোহিণী অসংযতা ও তপস্যাহীনা; গোবিন্দলাল অসতর্ক ও তপস্যা-গর্ব্বিত। উভয়ের স্থানই অভিন্ন। যে অসংযত, সে হয়ত সতর্কতা অবলম্বনে রক্ষা পায়;—রোহিণী এ কথা বুঝিয়াছিল। তাই সে গোবিন্দলালকে কাতর অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইতে। যে অসংযমী সে হয়ত অসতর্কতার ফলে মার্গভ্রষ্ট হইয়া যায়; গোবিন্দলাল এ কথা বুঝেন নাই। তিনি জানিতেন ভ্রমরের প্রতি তাঁহার গভীর প্রণয়, রোহিনীর তপ্ত-গৌর তনিমা ও তাহার অতৃপ্তি-বিহ্বল বিলাস-দৃষ্টির সম্মোহজাল অবলীলায় ছিন্ন করিতে পারিবে! গোবিন্দলাল ধর্ম্ম জানিতেন মাত্র, সাধনা ছিল না। তাঁহার

রোহিণীর প্রতি সহানুভূতি হয়—তাহার পরিণামের জন্য। কিন্তু পাপ তাহার শিরায়-শিরায় সর্প-বিষের মত, তাহাকে তাহার অজ্ঞাতে, আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রোহিণী বিধবা,—কিন্তু "বৈধব্যের অনুপযোগী কতকগুলি দোষ তাহার ছিল।" সে 'দোষ'গুলি আমাদের "উদার"চক্ষে তাদৃশ গুরুতর ঠেকিতে না পারে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী-ঋষিগণের চক্ষে প্রকট প্রতীয়মান হইত। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য এক পরিচ্ছেদে এই তত্ত্বের অতি বিবৃত ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন; দেখাইয়াছেন, বহিঃ ও অন্তঃ প্রকৃতির বীণায় সুর ঠিক এক পরদায়, এক গ্রামেই বাঁধা আছে। একটীতে মৃদুতম আঘাত পড়িলেই উভয়টী একত্র বাজিয়া উঠে। রোহিণী বিধবা, জীবনের একরূপ সকল সুখ হইতে নির্ব্বাসিতা; কিন্তু ভোগের মুগ্ধ প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেনা। তাহার প্রাণের অন্তর্মূলে, বিষের জ্বালা লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, রোহিণী তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। বরং তাহার প্রকৃতি ক্রমশঃ বিলাস-বাহুল্যে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার অন্তরের নিদ্রাহীন অতৃপ্তির আলোড়ন—তাহার শুণপণা, সৌখিন-শিল্প-কলায় ফুটিতে চায়। বিধবার পরম তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য; রোহিণী, প্রথম হইতেই, তাহার পবিত্র অঙ্গন হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে। একটা কথা; রোহিণীর মার্জ্জনার একটী কারণ, গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন;—"রোহিণীর আর কেহ সহায় ছিলনা বলিয়া, সে ব্রহ্মানন্দের বাটিতে থাকিত।" ব্রাহ্মানন্দ কিরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণ অভিভাবক, গ্রন্থকার সে পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই; কেননা হরলাল একবার তাহার চরিত্রের রহস্য-যবনিকা উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা হইতেই তাহাকে চিনিতে কোন বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরাণী

ছিল, জয়ন্তীর তপঃপ্রভাব ; কল্যাণীকে মহীয়সী করিয়াছিল, মহেন্দ্রের প্রেম-প্রভাব। রোহিণীকে ব্রহ্মচর্য্য-তপস্থায় দীক্ষিত—করিবে কে ? যতদিন পাপ তাহাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় নাই, রোহিণী ততদিন, কোনমতে, আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল মাত্র। হরলাল পাপের প্রথম-লঘু প্রলোভনরূপে রোহিণীর সম্মুখীন হইলে রোহিণী সেইখানেই একান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রথমে চুরা করিতে অস্বীকার করা, একটা ভাণ-মাত্র ; বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গে রোহিনীর জীর্ণ চিত্ত-দুর্গ একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল !

এই গ্রন্থে, রোহিণীর জল-আনয়ন ব্যাপারটী অতি গুরুতর। ইহা যেমন স্বাভাবিক তেমনি সত্যপূর্ণ। ইহাতে জটীল মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কাব্যের বিচিত্র আলোক-পাতে কি অপূর্ব্ব শোভায় প্রতিফলিত হইয়াছে ! অন্য কোনও সাহিত্যে, দর্শন ও কাব্যের এমন মিলন-বিচিত্র, মনোজ্ঞ চিত্র আছে কি জানি না, কিন্তু এমন সুন্দর জিনিস দেখিয়া বঙ্গের গীতি-কবির একটী চির-সুন্দর কবিতায় ইহার আভাষ মনে পড়ে ! "সোণার তরীর" 'হৃদয়-যমুনা,' মনে হয়, এ চিত্রখানির যুগল (Counter-part)। হৃদয় যমুনা সুগভীর ও স্রোতস্বিনী ; বারুণী পুষ্করিণী ; স্বচ্ছতোয়া, স্রোতোহীন! রোহিণী যখন 'কলস ভাসায়ে জলে' কাঁদিতে থাকে, তখন 'বিকশিত বনস্থলে একাকিনী'কে স্মরণ হয়। হৃদয়-যমুনায় আহ্বান ও আবেগ গৃহ-হীন স্রোতে অনন্ত-সুন্দরের পানে ভাসিয়া যায় ; বারুণীতে আবেগ সসীমে প্রতিষ্ঠিত হয়, মর্ত্তের সৌন্দর্য্যের সেবা করিতে চায়! হৃদয়-যমুনা গান ; বারুণী ছবি।

যাহাই হউক্, আমরা স্থূলভাবে বলিতে পারি না কি, এই বারুণীই প্যারাডাইস লষ্টের ইডেন-উদ্যান ! সেটান পুণ্য-চরিত গোবিন্দলালকে কেমন অজ্ঞাতে, আপনার প্রলোভন-জালে মুগ্ধ আকর্ষণ করিতেছে। বোধ হয়, এই স্থানেই গোবিন্দলাল, মোহের স্বর্ণশৃঙ্খলে

আপনাকে ধরা দিলেন। আবার, এই বারুণীতে নিঃসঙ্গ জল-আনয়ন, নির্জ্জন বনভূমির অজস্র-পুষ্পিত শোভা, গোবিন্দলালের অনিন্দ্য-সুন্দর যৌবন-কান্তি রোহিণীর পতনের অন্যতম কারণ।

কবি বলিতেছেন, রোহিণী 'কলস জলে ভাসাইয়া' কাঁদিতে বসিল। কেন? কবি সে কথা একান্ত সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত না করিয়া, পর্য্যাপ্ত কুসুম-স্তবক-আনম্র অশোক-শাখাসীন বসন্তের পাখীটির পানে অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। তারপর, তিনি যেমন বারুণীর বর্ণনা লইয়া গোলে পড়িয়াছেন, নিরীহ পাঠককেও তেমনি গোলে ফেলিয়াছেন! আমরা পড়িয়াছি,—প্রথম বসন্ত-উদ্গমে, তাহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও শোভা-সমারোহের মধ্যে, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের হৃদয় করুণার অশ্রুজলে বিগলিত হইয়াছিল;—নিদাঘ-প্রভাতের বিকশিত সৌন্দর্য্যের সম্মুখে শেলী অকারণ কাঁদিয়াছিলেন (Revolt of Isalm—উৎসর্গপত্র)। তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন, বিশ্বের জন্য, বিশ্বের সুগভীর মর্ম্ম-কাতরতার জন্য। কিন্তু রোহিণী কাঁদে কেন? সহজ কথায় বলা যাইতে পারে, তাহার প্রাণের সুগভীর তৃষা, নিরাশার প্রবল প্রতিঘাত ও অসীম শূন্যতার তাড়নায় তাহার 'কান্না' আসিয়াছিল। চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, মানব-প্রকৃতি সকল অবস্থায়, বাহ্য প্রকৃতির স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ নয়। যে অসুন্দর ও পাপী সে সুন্দর ও পুণ্যকে পূজা করিবার অধিকারে বঞ্চিত। একদিন ইডেনের অতুল শোভা ও শান্তি দেখিয়া, সেটান্ প্রাণের জ্বালায় বলিয়া উঠিয়াছিল;—

> But I in none of these
> Find place or refuge; and the more I see
> Pleasures about me so much more I feel
> Torment within me...

সেটান্ আবার বলিতেছে,—

All good to me becomes
Bane and in heaven much worse would be my state.
But neither here seek I, no nor in heaven to
Dwell unless by mastering Heaven's Supreme ;
Nor hope to be myself less miserable
By what I seek, *but others to make*
Such as I.
For only in destroying I find.
Ease to my relentless thoughts.

"আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য চাহিনা—তাহার লুব্ধ প্রত্যাশায় আপনাকে গভীরতর অসুখী করিতে চাহি না,—চাই শুধু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত করিতে।—চাই, সুন্দরকে, সুন্দরের অধীশ্বরকে নিষ্ঠুর পদাঘাতে নির্জ্জিত করিতে।—হিংসা ও সংহার আমার প্রাণের একমাত্র তৃপ্তি!" সেটানের এই তীব্র জ্বালাময়ী উক্তি, রোহিণীর মুখে আরোপ করা যায়। কবি বলিয়াছেন. রোহিণী ভাবিতেছিল, 'গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী আমাপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী……' ইত্যাদি। এখানে একটা পৈশাচিক হিংসাই তাহার বিষাদের মূল। তাই, কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন, "তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি!" বাস্তবিক, তার প্রবৃত্তি নিরাশামুখী নহে বরং আশান্বিত। রোহিণীর এই প্রবৃত্তির সহিত, গুটীকত কার্য্যের বেশ সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। যে ভ্রমর একদিন তাহাকে কৃপা ভিন্ন অকরুণা দেখায় নাই সে তাহাকে জ্বালাইতে, সপত্নীর অসূয়া-বৃত্তির উদ্রেক করিতে গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ যখন নিশাকরের অভিসারে গিয়াছিল, তখন তাহার উন্মদ বাসনার অঙ্কুশ-তাড়নায় যায় নাই। আপনি জ্বলিয়া চারিদিক জ্বালাইবে, ভোগের ইচ্ছা নাই, ভোগের বিষয়-দর্শনে বাসনার সৃষ্টি করিবে;—
…বঙ্কিম বাবু বুঝিয়াছেন—"অনেকে পাখী মারে,

—শিকারের জন্য"! ইহাই রোহিণী-চরিত্রের মূল সূত্র; এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য পরম্পরায় তাহার চরিত্রজাল কিরূপে রচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা একরূপ সহজে বুঝিতে পারা যায়।

গোবিন্দলালের যেমন, একধারে, অনেক গুণ, অপরদিকে, তেমনি অনেক দোষ। তিনি ধর্ম্মবিৎ, কিন্তু সাধনা নাই; তিনি প্রেমিক—কিন্তু প্রেমের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা নাই; তিনি বিচার-নিপুণ কিন্তু সর্ব্বত্র সাবধান ন'ন; তিনি শক্তিমান ও চরিত্রবান্—কিন্তু সংযমহীন ও চরিত্র-গর্ব্বিত, তিনি দয়াবান্—কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিচার নাই। তবুও গোবিন্দলাল সাধনা-বলে মানুষের-মত মানুষ হইতে পারিতেন। কিন্তু এক অসতর্কতা তাঁহার গুণরাশি-নাশী হইয়াছে। রোহিণীর প্রতি তাঁহার সহসা উচ্ছ্বসিত করুণা ঠিক সুপথে চালিত হয় নাই। মহাপুরুষের মত গোবিন্দলাল তর্ক করিলেন, "সচ্চরিত্রা হোক দুশ্চরিত্রা হোক এওতো সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ যদি ইহার দুঃখ মোচন করিতে পারি, করিব না কেন?" কিন্তু গোবিন্দলাল এই তর্কের পূর্ব্বে আপনার হৃদয়ের প্রত্যন্তদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন নাই,—তিনি রোহিণীর দুঃখ নিবারণে সমর্থ কি না! তাহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিগুলির সহন-শীলতা কতদূর,—সাবধানীর মত গোবিন্দলাল তাহার কথা একবারও চিন্তা করিলেন না। বোধ হয় ইহাও তাঁহার একটী ক্ষুদ্র ভুল।

Sympathy স্বর্গীয় বৃত্তি;—দার্শনিক ও নীতিবেত্তাগণ বলেন, ডাক্তারের ছুরিকার মত! ঠিক কোন্ স্থানে, কি ভাবে চালনা করিলে বিস্ফোটকের গাত্রভেদ হইবে, তাহা অতি নিপুণভাবে বিচার করিতে হয়। নতুবা তাহাতে রোগীর অভ্যন্তরস্থ শিরা কাটিয়া যাইতে পারে, এমন কি 'সেপটীক্ পয়জনে' (Sceptic poison) ডাক্তারেরও প্রাণ-বিয়োগ ঘটিতে পারে। গোবিন্দলাল সেই সংক্রামক বিষ অসাবধানে ও অজ্ঞাতে আপন শরীরে মিশাইয়া ছিলেন। পরিণাম, তাই, বড় ভীষণ

হইয়াছিল। পাপ, চোরের মত, সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করে। সে কখনো বড়-একটা বলপ্রকাশে ইচ্ছুক নয়। সে যদি জা'নতে পারে, তাহার 'শিকার' তাহার সাড়া পাইয়াছে, তবে আপনিই আপনার পথ দেখিতে ব্যস্ত হয়।

ভ্রমর চরিত্র সম্বন্ধে, উপস্থিত প্রবন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না। সুবিধা হইলে,প্রবন্ধান্তরে তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিব। তবে প্রবন্ধের অঙ্গহানি-আশঙ্কায় সামান্য উল্লেখ করিয়া যাইতে চাই। "যে চরিত্রটী যেমন, তাহাকে ঠিক সেইভাবে দেখাই যথার্থ সাহিত্যিক সমালোচনা"।* বাস্তবিক, ভ্রমর কেমন-লোক, আমাদের তাহাই জানা প্রয়োজন। কিরূপ ঘটনাধীনে, কি উপাদানে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই আ'বিষ্কার করা প্রয়োজন। তাহা হইলে ভ্রমরকে আমরা অযথা গৌরব বা গ্লানিতে বিকৃত করিয়া দেখিব না।

আমাদের মনে হয়, ভ্রমর চরিত্র-অঙ্কনে, অপর দুইটীর অনুপাতে, শিল্পীকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। সে চরিত্র অতি স্বাভাবিক, অতি পুণ্যময়, তাই অতি প্রাঞ্জল। ধনীর গৃহে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, যাহা ঘটিতে পারে, চিত্রকর তাহার সহজ উপাদান লইয়া লোক-ললামভূতা ভ্রমর-প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন কেবল একটু নিপুণ তুলিকায় ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র! প্রেম, আবাল্য সংবর্দ্ধিত কৈশোর প্রেম, বিশ্বাস, পরস্পর-অবিচ্ছিন্নতা ও ধর্ম্ম; ইহাই না ভ্রমর চরিত্রের উপাদান? আশৈশব—প্রেমের শৈশব ভিন্ন আর কি বলিব—পরস্পর-বিজড়িত প্রণয় বন্ধন, উভয়কে-উভয়ের-বিশ্বাস, তাহার অনুভূতি ইহাই না অভিমান? ভ্রমরের অভিমান যদি প্রাকৃত ক্রোধের বা

* ম্যাথু আরনল্ড।

তন্নিম্নবৃত্তির ফল মনে করি, তাহা হইলে আমরা যেন ভ্রমর চরিত্রের অনুশীলন করিতে উদ্যত না হই।

এদিকে গোবিন্দলালের চরিত্র-জাল ক্রমশই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দিন ভ্রমর সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তোমার কথার স্বর আজি ভিন্নরূপ কেন?' সে দিন যদি গোবিন্দলাল সকল কথা সহজে হাসিতে হাসিতে ব্যক্ত করিয়া আপনার হৃদয়-ভার লঘু করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, ব্যাপারটা এত গুরুতর হইত না! ইহাও গোবিন্দলালের দোষ;—দোষ না ভুল? গোবিন্দলাল বলিতে পারিলেন না;—সে দিন তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে পাপ-স্পর্শ ঘটিয়াছে। যে দিন আদম ও ইভ্ প্রথম-পাপে আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়াছিলেন, সে দিন তাঁহারাও বিধাতার তেজঃপুঞ্জ কলেবরের সম্মুখীন হইতে এমনি সন্দিগ্ধ, এমনি সকাতর সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন!

যাহারা চিরদিন এক-মন, এক-প্রাণ, তাহাদের উভয়ের মধ্যে এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে—তাহা গোপন থাকে না। ভ্রমর ফুটিল না বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে সন্দেহের একটা উদ্‌লা বাতাস বহিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা বীজ ছড়াইয়া গেল! তাহাই ক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া গেল! নারী-সুলভ চপলতার দাবানলে তাহাতে অগ্নি-সংযোগ হইল। ভ্রমরের দুর্জ্জয় 'অভিমান' গোবিন্দলালের ঔদ্ধত্য উভয়ের সংঘর্ষণে সেই দাবানল অতি-প্রবল হইয়া উঠিল। ভ্রমর, যদি কোনরূপে আপনার ক্ষুব্ধ চিত্ত-বেগ রোধ করিয়া, গোবিন্দলালকে স্ব-দোষ-নিষ্কাশনের অবকাশ দিত, তাহা হইলে সোণার সংসার সুখের হইত! কিন্তু তখন গোবিন্দলালের হৃদয়ে ভয়ানক যুদ্ধ চলিয়াছে;—'ভ্রমরকে বলিব কি? না, কি জানি যদি সে অসম্ভব আন্দোলনে সহজকে জটিল করিয়া তোলে, যাক্;'—এ যুদ্ধে গোবিন্দলাল, যদি শক্তিমানের মত, পূর্ব্বের মত, আপনার

প্রেমের শক্তিতে ভ্রমরকে জয় করিয়া ফেলিতেন! হায়, তখন গোবিন্দলাল আর সে গোবিন্দলাল নাই! যেরূপে হউক, নাটকের অভিনয় অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল। আরম্ভে বলিয়াছি—কেহই জানিত না যে তাহাদের স্ব-স্ব কার্য্যের পরিণাম এতদূর অচিন্ত্য-পূর্ব্ব বিস্তার লাভ করিবে। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি গ্রন্থকার কেমন সুন্দর বুঝাইয়া গিয়াছেন!

ভ্রমরের হঠকারিতা সহজেই গোবিন্দলালকে বিপথগামী করিয়া দিল;—তখন তাহার পুরুষ-হৃদয় নার্য্যুচিত দৌর্ব্বল্যে জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। গোবিন্দলালের দোষের মূল, এইখানে। গ্রন্থকার তাঁহাকে এখানে অভিযুক্ত করিয়াছেন; 'শেষ দুর্ব্বুদ্ধি ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায় রোহিণীর চিন্তা"।—হায়! এই গোবিন্দলাল একদিন ভ্রমরের প্রতি আপনার প্রণয়-গভীরতার গর্ব্বে, রোহিণীর প্রাণ-মন-বিমোহন প্রলোভন তুচ্ছ করিয়াছিলেন;—কিন্তু আজ তিনি ভ্রমরের সামান্য চপলতা-অপরাধ মার্জ্জনা না করিয়া, তাহাকে ভুলিতে গেলেন,—কি দুর্ব্বুদ্ধি! এই দুর্ব্বুদ্ধির কারণ ও আদি কোথায়?—পাপ! রোহিণী যেমন একদিন ভ্রমরকে জ্বালাইয়া গিয়াছে গোবিন্দলালও তেমনি ভ্রমরকে জ্বালাইতে উদ্যত হইলেন; পাপ তখন তাঁহার অন্তরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। পাপ,—প্রথমে, লোভরূপে, পরে, বুদ্ধিভ্রংশ; শেষে ক্রোধ ও মোহরূপে গোবিন্দলালকে নিবিড়ভাবে ঘিরিয়া ফেলিল। এ পাপ তো তিনি স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। তাই, কবি বলিয়াছেন, "গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন"। প্রথমে রোহিণীর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে ফুটিয়াছিল আরো বোধ হয়, ছিল এই স্মৃতির সহিত মাখানো একটু অতৃপ্ত; কারণ, তাহার ফলেই হইল দুঃখ, দুঃখ বাসনায় মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। পুষ্প-বাটিকায় গোবিন্দলাল সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন;—কখন?

—কেমন সময়? নির্জ্জন, মেঘান্ধকার বর্ষা-সন্ধ্যায়; উপবনে! তাঁহার পতন অতি দ্রুত-গতিতে সাধিত হইতে লাগিল, কবি তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

রূপ-তৃষ্ণা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। যতদিন তিনি ভ্রমর-ময় ছিলেন, ততদিন তাঁহার হৃদয় প্রেম-মন্দাকিনী ধারা সিক্ত ছিল;—কিন্তু তাহা ধীরে ধীরে শুখাইয়া আসিতেছিল। প্রদীপ তৈলহীন হইলে সহসা যেমন উজ্জ্বল হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে, গোবিন্দলালের পতন ঠিক সেইভাবেই সাধিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় এতদিনে 'জমিয়া' উঠিল, যে দিন মৃত্যু-কালে বৃদ্ধ সম্পত্তি গোবিন্দলালকে না দিয়া ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল যদি ভ্রমরকে ঠিক্ পূর্ব্বের-মত দেখিতেন, তাহা হইলে এ প্রসঙ্গে ভ্রমরকে আবার বক্ষে ফিরিয়া পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখন ভ্রমরকে ভিন্ন চক্ষে দেখেন—এই উইলের ফলে উভয়ের মধ্যে বিষম মনোমালিন্য পুষ্ট হইতে লাগিল—এখানে ভ্রমর গোবিন্দ-লালকে আপনার আলয়ে—উভয়ের বহু দিনের সুখ-দুঃখে, হাসি-অশ্রু-রচিত প্রেমনীড়ে ফিরিবার অবকাশ দিয়াছেন—গোবিন্দলাল তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই! ভ্রমরের এক দোষ, সে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার জন্য সে যথেষ্ট ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে! ক্ষমা-ভিক্ষার কি কিছু মূল্য নাই! একটী কথা। ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছিল; কেন? সে কি গিয়াছিল, ক্রোধে বা ঘৃণায়? পাছে সে স্বামীর মর্য্যাদা না রক্ষা করিতে পারে! পাছে সে হৃদয়-দেবতার পূজার যথেষ্ট আয়োজন না করিতে পারে!—পাছে তাহার প্রেম-ললিত বাহুবল্লী পূর্ব্বের মত নিবিড় বেষ্টনে গোবিন্দলালের গলে আলিঙ্গন রচনা করিতে না পারে! পাছে, সে সোহাগ-স্ফুরিত অধর, পূর্ব্বের মত একটী সম্পূর্ণ চুম্বন সহজ

পাছে সে নিবিড় ভ্রূযুগের ছায়ায় নিবিড়তর কালো আঁখির পাতে তেমনি সলীল অসঙ্কোচ হাসিটী না ফুটাইয়া তুলিতে পারে!—এই কারণে, না? মেরি করেলীর, 'ডেলিসিয়ার হত্যা' উপন্যাস কতকাংশে কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুবর্ত্তী। সেথানে ডিলিসিয়া অপরাধী স্বামীর মর্য্যাদা পাছে অতিক্রম করিয়া ফেলে এই আশঙ্কায়, ভ্রমরের মত, সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। টলষ্টয়ের 'এনাকরিলীনা' গ্রন্থেও সেইরূপ, এমন কি স্বদেশী 'বিষবৃক্ষে'ও বর্ত্তমান। মানব-প্রকৃতি দেশকাল-ভেদেও কতকাংশে অনুরূপ—এই কথা উল্লেখের কারণ, ভ্রমরের এই ব্যবহার একেবারে অস্বাভাবিক হয় নাই। পক্ষান্তরে গোবিন্দলাল "স্বামী-দেবতাত্বের" গর্ব্বিত সিংহাসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অনেকের মত, একটা ভুল করিয়াছিলেন—প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাই প্রকৃতিও পরিশোধ লইতে ছাড়েন নাই। গ্রন্থের উনত্রিংশ অধ্যায়ে কবি, ভ্রমর ও গোবিন্দলালের অপরাধ অতি সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ভ্রমরের অপরাধটী গুরু হইলে গোবিন্দ[illegible] অপরাধ 'তর' নহে, গুরুতম। পুরুষকেই জগতে অনেক দুরূহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয়।

সংসারে পাকা গৃহিণীর প্রযোজন। সংসার-যন্ত্রের বিকল হইবার পূর্ব্ব-সূচনা-মাত্রেই, নিপুণ-হস্তে সেটী যথাবিধি মেরামত করিয়া লইবার ক্ষমতা বহুদর্শিনী গৃহিণীর নিজস্ব। সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা বঙ্গের আর এক কবির উপন্যাস—'চোখের বালিতে' সুস্পষ্ট হইয়াছে। মহেন্দ্রের মাতা যদি বিচক্ষণ গৃহিণী হইতেন তাহা হইলে সংসারে অতটা অশান্তি আসিত না। কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা এথন থাক।

এইরূপে কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথমার্দ্ধে উভয়ের অভিমান কেবল একটি প্রত্যাসন্ন, উৎসুক সুখ-মিলনকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছে!

উত্তরার্দ্ধে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে বিশেষ কোনও জটিলতা নাই। পূর্ব্বে যে চরিত্রটী যে ভাবে, যে পথ খুঁজিয়া লইয়াছে তাহারি নির্দ্দিষ্ট পথে যে যাহার কার্য্য করিয়া গিয়াছে ; কোনও বাধা নাই, বৈচিত্র্য ও নাই! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অতি কৃতিত্বের সহিত সে-গুলির অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ, গোবিন্দলালের মাতার কাশী-যাত্রা ও গোবিন্দ লালের গৃহত্যাগ—এই খানেই গ্রন্থের সমাপ্তি করিলে কিছু হানি হইত না। ট্রাজেডির এইখানেই শেষ যবনিকা-পাত হইয়া গেল। এই খানেই তো ভ্রমর মরিয়া গেল,—মনে করিতে পারি ভ্রমর বিষ খাইল।

কিন্তু সংসারে দুইটী জিনিষ পাশাপাশি কাজ করিয়া যাইতেছে,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম! এখানে যেন, দেখিতে পাই, অধর্ম্মই জয়লাভ করিতেছে, অধর্ম্মই যেন প্রতিনিয়ত গর্ব্বস্ফীত বক্ষে সংসারে শান্তি সুখ দলিয়া পৈশাচিক আনন্দে বিহার করিতেছে! ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম পরিণামে! টেনিসন ধর্ম্মহীন সভ্যতার অঙ্কে বসিয়া, জগতে অবিরাম রক্তপাত ও অধর্ম্মের উদ্দাম লাস্য-লীলায় সন্ত্রস্ত হইয়া ধ্যানযোগে আশান্বিত হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছিলেন,—"তবুও বিশ্বাস হয়, অশিবের পরিণাম কোন-মতে ভালো হইবে!" বাস্তবিক ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, অতি মন্থর, অতি সুদূর। ন্যায়ের বিচার অতি দূর-পরিণাম-ব্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া পাপ ও দুষ্কৃতির পরিণাম দেখাইয়াছেন। দীর্ঘ সাত বৎসরের পর ভ্রমর মরিয়াছিল। রোহিণী শীঘ্রই মরিয়া গেল। কবি তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। দুটী পাপ পরস্পর বাস করিতে পারেনা। দুইটী পুণ্যের মিলনে শান্তি, দুইটী পাপের সংঘর্ষণে দাবানল উৎপন্ন হয়। ভ্রমর মরে নাই; কেন? এ সম্বন্ধে কবি আমাদের সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া দেন নাই। ভ্রমর না মরিবার সূক্ষ্ম কারণ ও সার্থকতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা ভিন্ন অন্য একটী কারণ আছে। কবি বাইরণ একস্থলে বলিয়াছেন ;

"বনস্পতি ভূতলশায়ী হইবার বহুপূর্ব্বে মূলে-মজ্জায় শাখা-প্রশাখায় জীর্ণ হইতে থাকে; জলমগ্ন তরীর মাস্তুল ও হাল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও, তাহার ভগ্নাবশেষ বহুকাল ধরিয়া সমুদ্রে ভাসিতে থাকে; সৌধ-প্রাসাদের চূড়া-শীর্ষ ছাদ ভিত্তি ভূমিসাৎ হইয়া গেলেও বিশাল-দিগন্ততায় ইষ্টকস্তূপ দাঁড়াইয়া থাকে; দিন মেঘে ঢাকা থাকিলেও প্রহর হাঁটিয়া যায়।" কেন? কবির ভাষায় বলা যাক,—

> "There is a very life in our despair
> Vitality of poison.—A quick root
> Which feeds these deadly branches."

বাস্তবিক্ বিষের একটা সঞ্জীবনী শক্তি আছে। নিরাশা মানুষকে অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখে কিন্তু প্রতি অহরহ পলে পলে মৃত্যুর জ্বালা মন ও শরীর অধিকার করিতে থাকে। ভ্রমর নিরাশা-বিষের সঞ্জীবনী-প্রভাবে জীবিতা ছিল, মনে হয়।

এদিকে, বিলাস-চর্চ্চায় গোবিন্দলালের পাপ চরম সীমায় উপনীত হইয়া আসিতেছিল। সুকৃতি (পুণ্য) তাহাকে প্রতিগ্রহ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। যেদিন, যেক্ষণে গোবিন্দলালের পাপচক্রের বিবর্ত্তন পূর্ণ হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রোহিণীকে হত্যা করিলেন,—তখন তাঁহার মোহ-কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গোবিন্দলালের পুনর্জন্ম আরম্ভ হইল। যতদিন পাপের শেষ সীমারেখাটী পর্য্যন্ত ভরিয়া না উঠে, ততদিন পুণ্য পাপীকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। যেমন অগ্নি-সংযোগে জল যতক্ষণ না উত্তাপের নির্দ্দিষ্ট ক্রমটাতে (২১২ ডিগ্রিতে) পৌঁছায় ততক্ষণ তাহা কোন মতে বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না। গীতার কথা আবার স্মরণ হয় 'ক্ষিপ্রাং ভবতি ধর্ম্মাত্মা' ইত্যাদি! গোবিন্দলাল এতদিনে পাপকে নষ্ট করিয়া সাগ্রহে

surrection। এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল লেখক টলষ্টয়ের Resurrection উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। তাহার নায়ক অতি দীর্ঘকাল পাপের জটিল পথ অনুসরণ করিতেছিলেন—কতকটা মোহে, কতকটা বুদ্ধি ভ্রংশ হেতু (অবশ্য গোবিন্দলালের মত পঙ্কিল পথ-যাত্রায় আপনাকে কলঙ্কিত করেন নাই)। একদিন সহসা তাঁহার কর্ম্মভোগ সমাপ্ত হইয়া আসিল; সহসা, অতি ক্ষিপ্র গতিতে, তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। নবজীবন-প্রভাবের তরুণ অরুণ তাহার সর্ব্বাঙ্গে কি-এক দিব্য স্পর্শ বুলাইয়া গেল! সহসা তাহার জ্ঞানোদয় হইল। টলষ্টয় ইহাই তাঁহার নায়কের পুনর্জন্ম বা Resurrection প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ভ্রমর পুষ্প শুখাইয়া গেল;—আপনার মৃত্যুর দ্বারা অপরকে নব জীবন দান করিয়া শুখাইয়া গেল। সত্যের জয় পরিণামে অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দলাল যখন পুণ্যচরিত ছিলেন তখন সহজে ভ্রমরকে হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ভ্রমরকে হারাইয়া যখন পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন, তখন গত-কল্মষ হইয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্তের শান্তি ধারায় অভিষিক্ত হইয়া পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন।

গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, মানস-নেত্রে সংসারে প্রতিনিয়ত পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব, উত্থান-পতন—চিরদিনের সেই অবিরাম অভিনয় দর্শন করিয়া কাবর সেই স্নিগ্ধ-মধুর, আশ্বাস ও বিশ্বাস-ভরা শিক্ষা আমাদের হৃদয়ে অতি গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া যায়:—

> Behold, we know not anything.
> I can but trust that Good shall fall
> At last,—far off—at last, to all
> And every Winter change to Spring.

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

তরু-লতা।

১

সুবিশাল শান্তি-সুখ-তরুচ্ছায়া-তলে,
প্রজা-কুল-স্নেহ-লতা-বন্ধনের বলে,
শাসন করিয়া দেশ দিক্-পূর্ণ-যশে,
লভিলেন নরপতি প্রবীণ বয়সে,
তরু, লতা, দুটী মেয়ে প্রার্থনার বলে।
রাজার স্নেহের কোলে, এত দিন পরে ;—
কঠিন ধরার শুষ্ক, রূঢ় নির্ম্মমতা,
ভেদিয়া উঠিল যেন তরু আর লতা—
প্রমোদ-কানন-শোভা! ব্যথা-দুঃখ-শোকে
কান্তিহীন অন্ধকারাবৃত ঘরলোকে,
নিরানন্দ রাজগৃহে দেব-কক্ষ-চ্যুত,
দুটী শিশু এল, যেন সরলতা-পূত,
সদা নির্ম্মলতামাখা অমর-পুরের
হাসির আলোক ঢালি রাজার ঘরের
আঁধার করিতে দূর, কান্তি ফুটাইতে
সংসারের ক্লিষ্ট-মুখে,—যেন ধু'য়ে দিতে
আনন্দের সুধা-স্রোতে মানব-মনের
নিরানন্দ-মসিরাশি!
রাজার প্রাণের
একান্ত বাসনা দুটী তরু আর লতা

চির-অমানিশা-ঢাকা রাজ-হৃদয়ের
নিস্তারা আকাশ-পথে শুভ্র শরতের
যুগল পূর্ণিমাশশী! মরণের তীরে
রাজার যুগল স্বর্গ;—অন্তিম তিমিরে
উজ্জ্বল প্রদীপ দুটী স্বর্গের দুয়ারে!—
আশার বন্ধন দুটী শূন্য এ সংসারে!

২

ভবিতব্য!—ভবিতব্য লিপি বিধাতার
অমর অক্ষরে! সে ত' তোমার আমার
ইচ্ছার অধীন নহে।—সিংহাসনাসীন
তুমি নরপতি, আর আত দীন-হীন
দরিদ্র ভিখারী প্রজা, ভবিতব্য' পরে
কাহারো ত নাই অধিকার।—কে কাহারে
ব'লে দিবে কার ভাগ্যে কি আছে ঘটনা?
মঙ্গল থাকে ত ভাল;—ব্যর্থ হইবে না
রাজ্য-বিনিময়ে, যদি থাকে অমঙ্গল।
ভবিতব্য তবে হায় জানিয়া কি ফল?
প্রবোধ মানে না তবু!—অস্থির হৃদয়
প্রাণ-পুত্তলির ভাগ্য জানিবে নিশ্চয়।

রাজাদেশে সভাসদ দৈবজ্ঞ আসিয়া
যুগল শিশুর ভাগ্য গণনা করিয়া
কহিল মলিনমুখে—"ষোড়শ বৎসরে
প্রণয়ে বিপদ হবে দেখিনু গণিয়া।
বিষম যৌবন-কাল যদি যায় কেটে,

দূরে যাবে শোক-দুঃখ। ষোড়শ বৎসর
সাবধানে কন্যাদুটী রে'খো নিরন্তর।"
শুনিয়া রাজার প্রাণ বিষাদ-ব্যথায়
উঠিল ব্যাকুলি। যেন পূর্ণিমা নিশায়
দুষ্ট-রাহু পূর্ণ-শশী সহসা গ্রাসিল,
আনন্দ-জোছনা-আলো সহসা নাশিল
নিরানন্দ-মসীঢালি! সহসা থামিল
কলস্বনা সুখ-স্রোত, মুহূর্ত্তে ডুবিল
হৃদয়-দুকূল রুদ্ধ-ভাবনা-প্লাবনে!
আকুল হৃদয়ে রাজা ভাবে মনে মনে,—
'বিষম যৌবন-কালে প্রণয়ে বিপদ!—
অতুল আমার এই বিভব-সম্পদ,
অসীম ক্ষমতা হেন বিপদ হইতে
কখনো পারিবে না কি উদ্ধার করিতে
বালিকা দুটীরে? যদি শিখিতে না পারে
প্রেম কারে বলে; যদি সদা থাকে দূরে
পুরুষ-সংস্রব হ'তে,—তা হ'লে নিশ্চয়
রহিবে না আর কোন বিপদের ভয়।
যা'তে অদৃষ্টের লক্ষ ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
আজি হ'তে তার আমি চিন্তিব উপায়।"
উত্তাল তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাগরের তীরে
সুদৃঢ় পর্ব্বত-শ্রেণী অভ্রভেদী শিরে
বিরাজিত থরে থরে,—তারি শীর্ষদেশে
শোভিল সুন্দর দুর্গ রাজার আদেশে

রত্ন-সৌধ-মালা উচ্চ শৈলের শিখরে
জ্যোতি-বিমণ্ডিত,—দীপ্তদিনকর-করে
উজ্জ্বল,—শোভিল যেন কিরীট সুন্দর।
প্রস্তর-গ্রথিত উচ্চ দুর্ভেদ্য প্রাচীর
বেষ্টিল প্রাসাদ-দুর্গ; খাত সুগভীর
ঘিরিল প্রাচীর-শ্রেণী,—বক্র প্রবাহিনী
বহিল চৌদিকে যেন সলিল-সাপিনী
জড়ায়ে দুর্গের কটি আঁকিয়া বাঁকিয়া
করিতে লাগিল খেলা নিখাত বহিয়া।
এই কারাগার মাঝে, নিভৃত নিলয়ে
রাখিলেন মহারাজা তনয়া দুটীরে
অবরোধি চির-নিরজনে। নিশিদিন
দুটী প্রাণী রবে হেথা চির সঙ্গিহীন!
ষোড়শ বৎসর কাল হেথায় রহিবে।
বুঝি তাহা হ'লে প্রেম শিখিতে নারিবে!

৪

নির্জ্জন সাগর-কূলে, শৈল-শীর্ষ পরে
সুরক্ষিত দুর্গ-মাঝে, সুনিপুণ করে
সৌন্দর্য্যের প্রাণ দিয়া গড়িল প্রকৃতি
তরু আর লতা, দুটি ষোড়শী যুবতী।
জানেনা সংসার এরা, শুধুই কোমল
প্রকৃতির শিশু দুটী, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল!
নীরবে হৃদয় দুটী প্রকৃতির মত
প্রাণের একান্ত আশা, সুখ, দুঃখ যত

বহিয়া বাঁচিয়াছিল। বাসনা-পিয়াস
নীরবে উঠিত প্রাণে, পেতনা প্রকাশ,
শূন্য হতে শূন্য মাঝে প্রাণের ভিতর
নীরবে মিলায়ে যে'ত। আকাঙ্ক্ষাকাতর
দুটী নিরুপায় প্রাণ চাহি দোঁহা মুখে
নীরবে জানাত দোঁহে পরাণের দুখ!
নীরবে উদিত রবি সাগরের পারে,
নীরবে যাইত অস্তে গিরির শিখরে।
নীরবে হাসিত চাঁদ, পড়িত ঢলিয়া
নীরবে রজনী-শেষে। হেলিয়া দুলিয়া
নীরবে ফুটিত ফুল, পড়িত ঝরিয়া
নীরবে শুকায়ে প্রাণে। হৃদয় ভরিয়া
আকুলতা নিয়ে এসে সমীর-হিল্লোল
নীরবে তুলিয়া দিত বাসনা-কল্লোল
হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে! তরু আর লতা
দেখিত চাহিয়া শুধু, কহিত না কথা।
প্রকৃতির শিশু এরা, প্রেমের রহস্য
কিছুই ত নাহি জানে, তবে কেন হায়
এত আকুলতা, এত বাসনা-পিয়াস,
অজানা রহস্যে ভরা সুখ-দুঃখ আশ!
এ যে শিক্ষা প্রকৃতির কে রোধে তাহারে!
কপোত-কপোতী, পুণ্য স্বভাব-প্রীতির
দিয়াছে প্রথম শিক্ষা সুন্দর কোমল,
প্রাণে-প্রাণ-গাঁথা-প্রেম, পবিত্র, নির্ম্মল!

প্রাণের একান্ত সুখ আত্ম-বিসর্জ্জনে
হৃদয় ঢালিয়া দিয়া, বাসনা মরণে—
শিখেছে ফুলের কাছে ;—এত টুকু প্রাণ,
তারি যত গন্ধ-মধু, অকাতরে দানি,
তার পরে ঝরে পড়ে হাসি হাসি মুখে
জীবন-সন্ধ্যায় !—পরম আনন্দে, সুখে,
সাগরের প্রান্ত হ'তে এসে ঢেউ গুলি
কূলের চরণ-মূলে লুটে অবিরর
ধুয়ে দিয়ে পদধূলি, মৃদু কল হাসি
হৃদয়ের সুনির্ম্মল হরষ বিকাশি
শিখায়েছে সেবা, শুধু প্রীতি হৃদয়ের।
সুনীল আকাশ, নীল বক্ষে সাগরের
চাঁদের পুর্ণিমা-ছবি, দিয়াছে ঢালিয়া
স্বচ্ছ নির্ম্মলতা প্রাণে। চাঁদিমা হেরিয়া
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি ফুল্ল কুমুদিনী
প্রিয়-সন্দর্শনাতৃপ্ত-তৃষা প্রণয়িনী,
দিয়াছে আভাষ প্রাণে, প্রেমের মিলনে
বিমল আনন্দ কত ! অতৃপ্ত পরাণে
হু-হু বহি শিখায়েছে বসন্ত বাতাস
প্রণয়-বিরহ-ভরা আকুল নিশ্বাস !
চির-উথলিত যেই সঞ্জীবনী-সুধা
মিটাইতে বিশ্বব্যাপী মহা প্রেম-ক্ষুধা
বিশাল প্রকৃতি মাঝে বহে অবিরত।

অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ দুটী শিশুপ্রাণ
পেয়েছে প্রেমের শিক্ষা অনন্ত মহান,
সেই মহাপ্রেম-স্রোত হ'তে! দয়াময়ী
প্রকৃতি দিয়াছে প্রাণে প্রেম সুধাময়ী!

৫

এমনি কাটিয়া গেল কত দীর্ঘ দিন
প্রশান্ত, নীরব, স্তব্ধ, জন-প্রাণি-হীন
ক্ষুদ্র, রুদ্ধ পৃথিবীতে! তরু আর লতা,
যেন দুটী পরস্পরে-পূর্ণ-নির্ভরতা,
এ উহারে জড়াইয়া হৃদয়ের বলে
ধরিয়া রহিল শুধু! হৃদয়ের তলে
গভীর সীমান্ত দেশে উছলি উছলি
ছুটে কি আবেগ-উৎস! আকুলি বিকুলি
কিসের লাগিয়া যেন হিয়া কেঁদে মরে
পরাণ নুইয়া পড়ে কি অভাব-ভরে—
জানে না, বুঝে না, শুধু উদাস নয়নে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ প্রাণে নীল শূন্য-পানে।

৬

এই ত উত্তীর্ণ-প্রায় ষোড়শ বৎসর,
ভাবে বৃদ্ধ নরপতি হরষ অন্তর!
বুঝি তাঁর সুকৌশলে ব্যর্থ হ'য়ে গেল
অদৃষ্টের ক্রূর লক্ষ্য; শেষ হ'য়ে এল

বিপদ-ভয়ের কাল, নির্ভয়ে এখন
ফিরিয়া আসিবে ঘরে প্রাণ-প্রিয়-ধন,
এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর শেষ কটা দিন
কাটিবে শান্তির মাঝে শোক-তাপ-হীন।
অলক্ষ্যে অদৃষ্ট, তীক্ষ্ণ, ক্রূর হাসি হাসে!

৭

রজনী তিমিরাবৃত, স্তব্ধ চরাচর ;—
অনন্ত নিবিড় মসি বিশ্বের উপর
দিয়াছে ঢালিয়া, তাই মহারোষ-ভরে
ছাড়িছে প্রকৃতি যেন দিগ্‌ দিগন্তরে
শব্দহীন হুহুঙ্কার! ভয়ে তারাকুল
পরিয়াছে ঘনকৃষ্ণ জলদ-দুকূল
লুকাইতে ছোট মুখ গুলি! জলধির
তুমুল তরঙ্গ, মত্ত প্রলয় সমীর—
থামিয়াছে সব ; ভীম মেঘমন্দ্র নাদ
যাহা শুনি জীবকুল বিষম প্রমাদ
গণেছিল সন্ধ্যা-সমাগমে, নিভিয়াছে
সুতীক্ষ্ণ চমক তার, থামিয়া গিয়াছে
করাল ঘোষণা। এবে ঘোর নীরবতা
দশদিকে বিরাজিত, ধরা নিদ্রাগতা।

ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড ধরি, ধীরে ভাসি ভাসি
হেন নীরবতা মাঝে বেলাভূমি আসি

পরশিল মহাঝড়ে ভগ্ন তরণীর
আরোহী যুবক এক, অবসন্ন দেহ
মৃত্যুমুখে সমর্পিত শ্রান্ত প্রাণ-মন।
যুবক ধরণীস্পর্শে চমকি উঠিয়া,
আশায় বাঁধিয়া বুক, দেখিল চাহিয়া—
বিষাদ-সাগর-মাঝে কূল মূর্ত্তিমান—
নিশ্চিত-মরণ হ'তে ধ্রুব-পরিত্রাণ!
সঁপিয়া সমগ্র প্রাণ বিধাতৃ-চরণে,
নূতন জীবন লভি, উদ্বেলিত প্রাণে
উত্তরিল উপকূলে আসি নব-আশা
শ্লথ হৃদয়ের কাণে কি উৎসাহ-ভাষা
কুহরিল সুমধুর! হ'ল অগ্রসর
দৃঢ় পদভরে যুবা প্রফুল্ল অন্তর।
আঁধার বন্ধুর পথে অতি সন্তর্পণে
নবজন্ম-তীর হ'তে গিরিশীর্ষ-পানে
উঠিতে লাগিল যুবা। আপন হৃদয়
আপনারে যত বলে—"আশ্রয় নিশ্চয়
হেথা ওই গিরিশিরে আছে তোমা তরে"—
শ্রান্ত যুবা অগ্রসর নবশক্তিভরে
উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধপরে! কোন মতে শেষে
পঁহুছিল যবে সেই উর্দ্ধতম দেশে—
বিস্ময়ে হেরিল যুবা শিখর বেষ্টিত
সমুচ্চ প্রাচীরে প্রবেশিতে নাহি পথ।

অবশেষে যেন দৈববলে, সুবিক্রমে
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর * দুর্গ-অভ্যন্তর-ভূমে
উত্তরিল যুবা মৃতপ্রায় শ্রান্ত দেহে।
"প্রেম অদৃষ্টের সনে একসূত্রে গাঁথা!"
ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নিশি গেল পোহাইয়া;
কাননে বিহঙ্গকুল উঠিল গাহিয়া
জাগাইয়া সুপ্ত ধরণীরে। তরু লতা
শয্যাপরে নিশীথের সুখ-স্বপ্ন কথা
স্মরি এ উহার পানে রহিল চাহিয়া!
ক্ষণপরে দুই জনে বাহিরে আসিয়া
চলিল কানন-পানে;—প্রভাত সেথায়
এঁকেছে সুন্দর ছবি!—

ও কে ও হোথায়?—

চমকি সহসা আসি দেখিল চাহিয়া,—
আর ফিরিলনা আঁখি!—চাহিয়া চাহিয়া
উঠিতে লাগিল হিয়া উচ্ছ্বাসে উথলি,
সারাটি পরাণ শুধু আকুলি বিকুলি
করিতে লাগিল আহা, অপূর্ব্ব সুন্দর!
এস তুমি তোমা তরে এ শূন্য অন্তর
ব'সে আছে সিংহাসন পাতি! এ হৃদয়
সকলি ঢালিয়া দিবে শুধুই তোমায়!—
"এ কি হ'ল" ভাবে তরু,—"আপনা হারানু,—
পিঞ্জর-মাঝারে রুদ্ধ প্রাণ ছেড়ে দিনু!—

* Love in sequel works with Fate.—Ibid.

এ কি এ উচ্ছ্বাস স্রোত হৃদয় ফাটিয়া
হেন বেগভরে কেন চলিল ছুটিয়া
ওই অজানার পানে ?—অজানা ?—না যেন,
উহারে আজন্ম চিনি, মনে হয় হেন !
এত সুখ !—কোন্ রাজ্য হইতে ছুটিয়া
অদ্ভুত রহস্য ওই এনেছে বহিয়া ?
পারি নাকি সেই রাজ্যে ওর সাথে সাথে,
নব নব পৃথিবীতে নব নব পথে
ছুটে চ'লে যেতে ? কত সুখ ! কোন্ দেশে,
কোন্ স্বপ্নরাজ্যে, কোন্ সৃষ্টিপ্রান্ত-শেষে
এত সুখ !—"

মুগ্ধা তরু ভাবিতে লাগিল ;
লতা শুধু স্তব্ধ হয়ে চাহিয়া রহিল !

তরুর সে উছলিত রূপরাশি হেরি
যুবকের সর্ব্ব হিয়া উঠিল শিহরি !
ধন্য মানি আপনারে ভাবে মনে মনে,—
"এই কি সে রাজ-কন্যা হেরেছি স্বপনে
যার রূপরাশি ?—মোর চঞ্চল হৃদয়
সঘনে কাঁপিছে শুধু, শান্ত নাহি হয় !
এই ত সে ধ্রুবতারা আমার প্রাণের
ফিরিয়াছি পথে পথে যার চরণের
শরণ-লালসে এত দিন !—"প্রাণপ্রিয়ে,—"
উচ্চ স্বরে কহিল যুবা—"এ দগ্ধ হৃদয়ে

কনক চরণ দিয়া এস গো নামিয়া,
তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ অমিয়া ঢালিয়া
এ দীপ্ত হৃদয়-জ্বালা করহ নির্ব্বাণ!
প্রভাত-শিখর হ'তে রবির সমান
দূর কর হৃদয়ের আঁধার-কালিমা
উচ্ছ্বাস-আপ্লুত-ভক্তি উদ্বেলিত প্রাণে
হৃদয়-মন্দির মাঝে কত যে যতনে
বসাইয়া নিশিদিন শুধু পূজিয়াছি
শুভ্র ফুল্ল প্রেম-ফুলে,—আজ পাইয়াছি
শুভ অদৃষ্টের বলে প্রসন্না দেবীরে
হৃদয়ের কাছাকাছি; যাইব কি ফিরে
শূন্যমনে নিরাশ হৃদয়ে? বল প্রিয়ে,
প্রাণ-ভরা এ প্রেম কি যাব ফিরে নিয়ে?"
—তরুর পশ্চাতে লতা মুখ লুকাইল,
রুদ্ধকণ্ঠে তরু সুখে উচ্ছ্বাসে কহিল,—
"স্বপনে হেরেছি আমি জ্যোতির মণ্ডলে
ওই মুখচ্ছবি! আজি স্বপন সফল!
হে বিদেশি, স্বপ্নে তুমি চেয়ে নিয়েছিলে
আমায় সারাটি প্রাণ! যদি নিজে এলে
দেখা দিতে এ দীনারে, করুণা করিয়া
আমারে লহগো তবে! যাইব চলিয়া
তব সাথে তোমার সে স্বপনের দেশে।
অপূর্ব্ব রহস্য-সখি! কোথা হ'তে এসে

আঁধার এ হৃদিমাঝে হইলে উদয় ?
দয়া ক'রে, প্রিয়তম, দেহ পরিচয় !"
"হিয়া-অধিষ্ঠাত্রী-দেবী, রাজপুত্র আমি।
হেথা হ'তে বহুদূরে মোর মাতৃভূমি
পূজ্য-পাদ পিতৃদেব করেন শাসন।
রাজ্য ছাড়ি, শুধু এই অমূল্য রতন
লভিবারে, বহুদিন ধ'রে কত দেশে,
অজানা নগরে, পথে, তোমারি উদ্দেশে
ভ্রমিয়াছি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে ! হেরেছিনু
আমিও স্বপনে তোমা, প্রিয়ে ; দিয়েছিনু
আমিও ঢালিয়া সব তোমার চরণে ;—
তোমারি একান্ত চিন্তা জীবনে মরণে
ক'রেছিনু সাথী মোর ! ওই মুখখানি
হেরিতাম হাসি-ভরা, মধুর চাঁদনি
হাসিত আকাশে যবে ! কুহরিয়া পিক্
উথলিত গীতমধু পূর্ণ করি দিক্
যখন ঢালিয়া দিত,—তোমারি সুস্বর
ঝঙ্কারি শ্রবণে মোর মোহিত অন্তর !
ফুটন্ত নিকুঞ্জতলে বসি নিরজনে
ভাবিতাম আনমনে ;—মৃদু সমীরণে
তোমারি অলক-গন্ধ, সুরভি নিশ্বাস
হিল্লোলে ভাসিয়া আসি, সায়াহ্ন আকাশ
এ মুগ্ধ বিহ্বল হিয়া, ব্যস্ত ক'রে দিয়ে

কলস্বনা স্রোতস্বিনী যাইত বহিয়া
দু'কূল মধুর রবে ধ্বনিত করিয়া—
শুনিতাম কূলে বসি, ভাবিতাম মনে,
যে প্রেমের ধারা বহে ও কোমল প্রাণে,
সে অনন্ত সুধাস্রোত ও হৃদয় হ'তে
নদীরূপে নেমে এসে মোরে ঝাঁপ দিতে
ডাকিতেছে কলস্বরে !—

"ভেসেছিনু তাই
উদ্দেশে অজানা-পথে—যদি কভু পাই
একবার দেখা তার, শুধু একবার
দেখে মরি হাসি ভরা মুখ-খানি তার,
এই আশে বাঁধি বুক ! যাত্রী-তরণীতে
উঠিয়া আসিতেছিনু—ভীম ঝঞ্ঝাঘাতে
হতভাগ্য তরীখানি চূর্ণ হ'য়ে গেল,
অতল জলধিগর্ভে সকলি ডুবিল !
শুধু আমি একা, শুভ-অদৃষ্টের বলে
উত্তরিনু আসি এই গিরিপাদমূলে
ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড ধরি। তার পরে
অদৃষ্ট এনেছে পথ দেখাইয়া মোরে
হেথা এই স্বর্গমাঝে !—

"আপনা ভুলিয়া
দিয়াছি এ হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া,
রেখেছি পাতিয়া সেথা প্রেমের সোপান !—
এস তুমি, এস মোর প্রাণের সম্মান

উন্মুক্ত এ হৃদি মাঝে !—

"লইয়া তোমারে

যাব চলি দূরে, মহাসাগরের পারে,
অদ্ভুত রহস্য-ময় স্বপনের দেশে।
নব-বসন্তের উষা, সন্ধ্যাসনে মিশে
নিশি-দিন ধ'রে সেথা ভাসে চারি পাশে !
প্রফুল্ল কুসুম সেথা অক্ষয় সুবাসে
পরাণ পাগল করে ! দক্ষিণ মলয়
প্রেমাবেশে ঢলি ঢলি চিরদিন বয়
মৃদুল-মধুর সেথা !

"ফুলের শয্যায়

তোমারে হৃদয়ে ধ'রে বিভোর নিদ্রায়
রহিব অনন্তকাল সেই স্বপ্ন-ভূমে !
এত সাধ, এত সুখ, এস প্রিয়-তমে !"
"তুমি মোর প্রাণপ্রিয়—যেথা ইচ্ছা তব,
সেথা শুধু সুখ মোর,—সেথা আমি যাব !"

"ধন্য আজি আমি, প্রিয়ে ! অর্দ্ধরাত্রে, তবে,

নিশ্চিন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে
সমস্ত বসুধা যবে, মোরা দুইজনে
রুদ্ধ এ পৃথিবী ছাড়ি মুক্ত রাজ্য পানে
ছু'টে চ'লে যাব !"

"তাই হবে, হে সুন্দর,"—

কহিল বিস্মৃতা তরু মুগধ অন্তর !

৯

"আয় লতা, আয়, ওই যুবকের সাথে
দুইজনে চ'লে যাই !—গভীর নিশীথে
লতারে কহিল তরু বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
উদ্দাম আবেগ-ভরে,—"আয় ত্বরা করে
নিষ্ঠুর এ অবরোধ ছাড়ি !"—"না গো দিদি,"
কাঁদিয়া কহিল লতা—"কেঁদে ওঠে হৃদি
থাকিয়া থাকিয়া যেন !—আমি যাইব না !
শূন্য হ'য়ে গেছে প্রাণ, মোরে ডাকিয়ো না !
যদি যাবে, যাও তুমি ;—পিতারে ফেলিয়া,
চিরদুঃখসাগরের মাঝে ডুবাইয়া
এ বৃদ্ধ বয়সে তারে, আমি নাহি যাব !
যেথা তুমি যাও বোন্, যেন সুখে থাক,'
এ প্রাণের এই শুধু একান্ত বাসনা !—
দিদি গো, জন্মের শোধ লতারে ভুল'না !"
    বাঁধি বাহুপাশে, বুকে চাপিয়া লতারে,
বিদায়ের কালে তরু চুমি স্নেহভরে
কহিল কাঁদিয়া,—"লতা, কহিস্ পিতারে,
তরু তাঁর ম'রে গেছে, সাগরের পারে
বহুদূরে আছে শু'য়ে অনন্ত নিদ্রায় !
চিরদিন দিস্ তুই সান্ত্বনা তাঁহারে !
যাই তবে—দেলো বোন্ অনন্ত বিদায় !
যাই—আর বাঁধিস্নে কঠিন-মায়ায় !"

অন্তিম চুম্বন নিয়ে তরু চ'লে গেল,
ব্যথিতা মূর্চ্ছিতা লতা ভূতলে পড়িল!
রাজার ক্ষমতা দর্প ব্যর্থ করি দিল
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট!—চাপিয়া হৃদয় মাঝে
কত স্মৃতি, কত ব্যথা, কত আকুলতা,
ধীরে ধীরে যৌবনের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
নিরাশা-আঁধার-ধরি জীবনের মাঝে,
ধীরে শুকাইল লতা বিজন আলয়ে।

শ্রীইমদাদল।

সলোমন্।

সভ্য জগতে জ্ঞানী সলোমনের নাম সকলেই অবগত আছেন। হিব্রু ভাষায় তাঁহার প্রণীত প্রবাদাবলী (Book of Proverbs) এবং গীতাবলী (Psalms) জগতে অদ্যাবধি তাঁহার অতুল কীর্ত্তি এবং অমানুষিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইনি খৃষ্ট জন্মিবার ১০৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বাথশেবার (Bathsheba) গর্ভে এবং ডেভিডের (David) ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ডেভিড্ খৃষ্টীয় শতাব্দির ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে, অপর ষোড়শ জন পুত্র বিদ্যমানেও, সলোমন্‌কে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি জিহোবার পূজার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন করিতেছিলেন কিন্তু উক্ত মন্দির নির্ম্মাণরূপ সৌভাগ্য তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। সেই-জন্য তিনি সলোমন্‌কে বলিয়া যান যে ঈশ্বর তাঁহার রক্তপিপাসু স্বভাবের শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে মন্দির উৎসর্গরূপ সুখে বঞ্চিত করিয়া-ছেন কিন্তু ভরসা দিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিবেন এবং তাঁহারই বংশ যতদিন সত্যধর্ম্মালম্বী থাকিবে ততদিন ইস্রেলের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে। মৃত্যুশয্যায় ডেভিড্ সলোমন্‌কে বহুবিধ রাজনৈতিক উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এবিএথার (Abiathar), এডোনিজা (Adonijah) এবং (Joab) সলোমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। প্রথমটী এনাথথে (Anathoth) নির্ব্বাসিত হন, দ্বিতীয় জন হত হন এবং তৃতীয়টী ভীত হইয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু বাহিরে আসিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় সেই স্থানে নিহত হন।

সলোমনের রাজত্ব ইহুদীয় ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে।

বাস্তবিক ইহার রাজত্বকালে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ইহুদীয় ক্ষমতা ক্ষণকালের জন্য উৎকর্ষ লাভ করিয়া নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। ডেভিড্ বাহুবলে যে রাজত্ব বিস্তার করেন, সলোমন্ তাহা নিজ অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করেন এবং অতিরিক্ত সুখপ্রিয়তার দ্বারা পতনের পথও পরিষ্কার করিয়া দেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৯ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন। সিংহাসনে আরোহন করিয়াই তিনি বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে নিজরাজ্য উন্নত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ রাজনীতি পূর্ব্বে কেহ অবলম্বন করেন নাই, ফলতঃ ইহাতে অনেকে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মিশরের ফেরোর (Pharaoh) সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মিশরের সহিত এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি যে কেবল ইস্রেলাইট্‌দিগের সমাজ-নীতিগর্হিত কর্ম্ম করেন তাহা নহে, ইহার দ্বারা তিনি প্রাদেশিক রাজনীতিরও অবমাননা করেন। ফলতঃ এই বিবাহের বিষময় ফল-স্বরূপ তাহার অন্তঃকরণে পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। সলোমন্ অতিশয় উদারচেতা ছিলেন এবং মোজেস্ (Moses) ও তাঁহার পিতা ডেভিডের প্রতিষ্ঠিত ঐশ্বরিক নিয়মসমূহ মান্য করিতেন। ডেভিডের রাজত্বকালে ভয়ানক মড়ক হয় এবং মুক্ত তরবারি হস্তে ঈশ্বরের দূতগণকে আকাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দেখা যাইত। এই ভয়ানক সময় গ্যাড্ (Gad) নামক জনৈক মহাত্মা যে স্থানে দেবযোনি সকল বিচরণ করিতেন ডেভিডকে সেই স্থানে জিহোবার উদ্দেশে একটী বেদী নির্ম্মাণের পরামর্শ দেন। ডেভিড্ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দেশের শান্তিকামনায় আহুতি প্রদান করিলে স্বর্গ হইতে একটী অগ্নিশিখা অবতরণ করতঃ পূজার সামগ্রী আলেহন করিয়া অন্তর্হিত হইল। এই

সময় হইতেই জিবিয়ন (Gibeon) পর্ব্বতস্থিত উক্ত বেদী * ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত পূজার স্থান বলিয়া প্রচলিত হয়। এই স্থান ব্যতীত পূরাকাল হইতে অন্যান্য অনেক স্থলে ঈশ্বরের পূজা সমাধা হইত। এই সকল মন্দিরে পূজা প্রচলন স্থাপিত না করায় সলোমনের চরিত্রের বাহ্য নির্ম্মলতার উপর কলঙ্কপাত হইয়াছে।

একদা তিনি ঈশ্বরাধনার প্রধান স্থানে ("the great high place") স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বহুসংখ্যক বলিদানের দ্বারা জিহোবাকে সন্তুষ্ট করেন। রাত্রে জিহোবা সলোমনের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। সলোমন্ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন যে তিনি পিতার নিকট হইতে যে গুরুভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বহনে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং যাহাতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং হিতাহিত বিবেচনায় সক্ষম হইয়া ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁহার প্রজাবর্গের সুখসচ্ছন্দ বর্দ্ধনে পারগ হন সেইরূপ জ্ঞান ও ক্ষমতা তিনি প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থিত জ্ঞানকে কেহ কেহ আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন, কিন্তু সলোমন্ যে জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর এবং আত্মতত্ত্ব লাভ করা যায়, তাহা যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে যে তিনি পিতার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে, বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা জনসমূহের মনোভাব অবগত হওয়ার শক্তি এবং তৎকালিক রাজনীতির কূটতত্ত্বরূপ গাঢ় আবরণ অপনয়নের ক্ষমতাই তিনি প্রার্থনা করেন। তিনি যে নিঃস্বার্থভাবে প্রজাবর্গকে সুখী করিবার ক্ষমতা প্রার্থনা করেন তাহা বড় তাঁহার অল্প মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে। এই নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষার পুরস্কারস্বরূপ

* Chronicles, i. 3.

তিনি ধন, মান, দীর্ঘজীবন প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বিষয় মনুষ্যকে সুখী করিতে পারে সকলই প্রাপ্ত হন। এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া জেরুসালেমে (Jerusalem) প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বিধিমত জিহোবার পূজা করিয়া অনুচরবর্গকে একটি ভোজ প্রদান করেন।

এই সময় এরূপ একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায় এবং সুবিচারের যশ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হয়। দুইজন স্ত্রীলোক একটী মৃত আর একটী জীবিত বালক লইয়া তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণে বিচারের জন্য উপস্থিত হইল। প্রথম স্ত্রীলোক বলিল যে তাহারা দুইজনেই এক বাটীতেই সন্তান প্রসব করে এবং রাত্রিকালে তাহার নিদ্রাবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নিজের মৃতবালক তাহার নিকট শয়ন করাইয়া প্রথম স্ত্রীলোকের জীবিত বালকটী লইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটী বলিল যে সে এরূপ কোন কর্ম্মই করে নাই জীবিত বালকটী তাহারই গর্ভজাত সন্তান। ইহা লইয়া উভয়েই মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। সলোমন বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। অবশেষে তাহাদের মাতৃস্নেহ পরীক্ষা করিয়া বিচার করিতে মনস্থ করিলেন। একজন অনুচরকে একখান অসি আনিয়া জীবিত বালকটীকে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই জনকেই প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটী—যাহার নিকট জীবিত বালক ছিল—এই নির্ম্মম বিচারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রার্থনা করিল যে তিনি বালকটী জীবিত রাখিয়া অপর স্ত্রীলোককে দিউন তাহাতে তাহার আপত্তি নাই কিন্তু যেন তাহাকে দ্বিখণ্ড না করেন। বালক বাঁচিয়া থাকিলেই সে সুখী হইবে। প্রথম স্ত্রীলোক এই বিচারের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না, বস্তুত বালকটীকে দুই খণ্ড করিতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। এখন আর

সলোমানের বিচার করিতে কোন কষ্টই রহিল না। বালক যে প্রথম স্ত্রীলোকের নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এই বিচারে সকলেই আনন্দিত হইল এবং কি শত্রু, কি মিত্র সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, এবং সকলেই বুঝিল যে ঈশ্বর বাস্তবিকই তাঁহাকে সুবিচারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

সলোমন তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজসভার নিয়মাদি এবং কর্ম্মচারিগণকেও যতদূর সম্ভব রাখিয়াছিলেন। প্রধান রাজকর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে দুই জন "Princes" অথবা প্রধান শাসনকর্ত্তা, দুই জন "Scribe" অথবা লেখক, একজন "Recorder" অর্থাৎ রাজসভার কাগজপত্র রক্ষক এক জন "Captain of the Hosts" অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং "Officers" বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ ছিল। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে প্রধান, "The Kings Friend" কিম্বা রাজবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। জেডক্ (Zadok) এবং এবিএথার্ (Abiathar) নামক তাঁহার দুইজন পুরোহিত ছিলেন। রাজসভার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দ্বাদশ জন কর্ম্মচারী রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে করসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এক একটী জেলা হইতে এক মাসের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে হইত। * সামন্ত রাজ্য হইতে কর সংগ্রহ করিয়া তিনি রাজস্ব প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। ৩০ মেজার্ (measure) মিহি ময়দা, ৬০ মেজার্ মোটা ময়দা, ৩০টী হৃষ্টপুষ্ট বৃষ, ১০০টী মেষ, ইহা ব্যতীত মৃগমাংস এবং কুক্কুট সলোমনের দৈনিক খরচ। যুডা (Judah) এবং ইস্রেলের জন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ড্যান্ (Dan) হইতে বীরশেবা (Beersheba) পর্য্যন্ত প্রজাবর্গ শান্তি সুখে বাস করিত। † সৈন্য বিভাগেরও তিনি যথেষ্ট

---

* Book of Kings, vi. 1—6.   † Book of Kings, iv. 20 etc.

উন্নতি সাধন করেন। যে সকল কার্য্যদ্বারা দেশের উন্নতি এবং প্রজাবর্গের শান্তিলাভ হইত সে সকল কার্য্য, তাৎকালিক প্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত হইলেও, সলোমন সমাধা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার ১৪ শত যুদ্ধযান (Chariat) ও ১০ সহস্র অশ্ব, এবং ১২ শত অশ্বারোহী ছিল। * সৈন্যবিভাগের রসদ্ পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ কর্ম্মচারীগণকে সরবরাহ করিতে হইত। মিসর্ হইতে সলোমন্ এবং হিটিটিস্ (Hittites) ও সিরিয়ার (Syria) রাজা অশ্ব এবং যুদ্ধযান আনয়ন করিতেন। প্রতি যুদ্ধযানের মূল্য ৬০০ এবং অশ্বের মূল্য ১৫০ রৌপ্য শেকেল্ (Shekel), কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য এবং যুদ্ধযান জেরুজালেমের রাজার নিকট থাকিত এবং অপরগুলিকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নগরে রাখা হইত। এই নগরগুলিকে "Chariat Cities" কহিত। মিশর হইতে বস্ত্রের আমদানী হইত। এই ব্যবসায় সলোমনের একচেটীয়া ছিল। এই সকল ব্যবসা এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হেতু দেশে অপর্য্যাপ্ত ধনবৃদ্ধি হইল। জেরুসালেমে প্রস্তরের ন্যায় লেবাননে (Lebanon) সিডারের (Cidar) ন্যায় এবং প্যালেষ্টাইনে (Palestine) সিকামোরের (Sycamore) ন্যায় সলোমনের রাজ্যে প্রচুর ধন ছিল। †

সলোমনের শারীরিক সৌন্দর্য্যের কোন উল্লেখ না পাওয়া যাইলেও তিনি যে Saul, David, Absalorm, Adonijah প্রভৃতির ন্যায় সুপুরুষ ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্য এবং মনোহর গুণের দ্বারা যাবতীয় লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ বিচার ক্ষমতার দ্বারা সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে তাঁহার সুবিচারে প্রজাবর্গ সুখী হইবে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১১ বৎসর মাত্র একজন ক্ষেত্রস্বামী অভিযোগ

---

* Kings iv. 26.

† 2 Chronicles, i. 14—17.

করিল যে জনৈক মেষপালকের অনুপস্থিতির জন্য একটী মেষ তাহার ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করিয়াছে। ক্ষেত্রস্বামী তাহার শস্যের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত মেষগুলি লইতে চাহিল। সলোমন্ বলিলেন যে সে উক্ত মেষের লোম, দুগ্ধ এবং শাবক ব্যতীত আর কিছুই পাইতে পারে না; ইত্যবসরে যে মেষপালকের অসাবধানতায় তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে সে নিজব্যয়ে ক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। ইহার পর যাহার মেষ তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।* ডেভিড্ এই বিচারে আহ্লাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং এরূপ বিচারে অক্ষম। এই সকল গুণে মোহিত হইয়াই তিনি সলোমন্‌কে রাজা নির্ব্বাচন করেন। মহম্মদ বলিয়াছেন যে ঐশ্বরিক অনুগ্রহই তাঁহার বিচার-ক্ষমতার প্রধান কারণ। কোরাণে কথিত আছে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বায়ু তাহার বশবর্ত্তী ছিল। বায়ু সলোমনের ইচ্ছায় দ্রুত বা মন্দগতিতে তাঁহার সিংহাসন ইতস্ততঃ বহন করিয়া লইয়া যাইত। তাঁহার ইচ্ছায় প্রেতযোনি সমুদ্র হইতে মুক্তাদি আনয়ন করিত। কোনও কোনও লেখক বলেন যে তাঁহার এক খণ্ড বৃহৎ হরিদবর্ণের আস্তরণ ছিল। স্থানান্তরে গমনের প্রয়োজন হইলে এই আস্তরণের মধ্যস্থলে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত হইত এবং মনুষ্যগণ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং প্রেতগণ তাঁহার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত এবং পক্ষিগণ মস্তকের উপর উড্ডীয়মান হইয়া আতপতাপ নিবারণ করিত এবং পবন তাঁহাকে ইপ্সীত স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সলোমন্ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতে পারিতেন। মহম্মদ্ বলিয়াছেন পর্ব্বত এবং পক্ষিগণ তাঁহার সহিত ঈশ্বরের গুণগানে যোগ দিত। বাস্তবিক প্রকৃতির সকল দ্রব্যের ভাষাই তিনি বুঝিতে

* অল্ বেদুই, জলালুদ্দিন ইত্যাদি।

সক্ষম ছিলেন। * স্বভাবের উপর তাঁহার এত অধিক আধিপত্য থাকিলেও প্রকৃতি বিজ্ঞানের জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। সেই সময়কার জ্ঞানিগণের কার্য্যপ্রণালী অনুসারে তিনি স্বভাবের নিয়ম সকল অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন এবং নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ সেই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। রাব্বিদিগের (Rabbis) মতে এরিষ্টটল্ (Aristotle) সলোমনের প্রণীত একখানি পুস্তক হইতেই তাঁহার পশ্বাদিজ্ঞানের সার সংগ্রহ করেন। এই প্রবাদ যে অলীক তাহাতে আর সন্দেহ নাই; অতএব সলোমন্ যে কোন সময় পশুতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি প্রণয়ণ করেন এবং এখন সে গুলি আর পাওয়া যায় না, এ প্রবাদের উপর বিশ্বাস করা যায় না। সলোমন্ ৩ সহস্র প্রবাদ এবং ১ সহস্র ৫টী গীত প্রণয়ণ করেন। এই গুলিতেই তাহার প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। এই গুলি ব্যতীত তাঁহার আর কোনও উপদেশাদি লিপিবদ্ধ হয় নাই, কারণ সে সময় মৌখিক উপদেশ দিবার রীতি ছিল। তাঁহার অনেক দিন পরেও বৃদ্ধ লোকেরা গৃহে কিম্বা দুর্গে (বস্ত্রাবাসে) তাঁহাদের বংশধরদিগকে জ্ঞানী সলোমনের উপদেশ সকল বলিয়া কত আহ্লাদিত হইতেন এবং এইরূপে পুরুষপরম্পরায় পিতা হইতে পুত্রাদিতে সেই সকল প্রবর্ত্তিত হইত এবং অবশেষে বক্তার স্বভাবানুরূপ পরিবর্ত্তনাদির পর যাহা পাওয়া যাইত তাহা কেবল বাস্তবিকের ছায়ামাত্র। বিলাস-প্রিয় রাজাদিগের মধ্যে এরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন অতি অল্পলোকেই করিতে পারেন, কিন্তু সলোমনের পক্ষে ইহা অসম্ভব নয় দেখিয়া তাঁহার উপর প্রজাগণের অচলা ভক্তি ছিল।

এই সময় তিনি তিনটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। পিতার

আজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ, তাঁহার নিজের জন্য একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং জেরুসালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ। মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজনের সময় তাঁহার পিতা টায়ারের (Tyre) রাজা হিরামের (Hiram) নিকট হইতে অনেকাংশে সাহায্য প্রাপ্ত হন। সলোমান্ সিংহাসনে আরোহন করিলে হিরাম্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পাঠান এবং সলোমন্‌ও তদুত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া নিজ সমৃদ্ধির কথা লেখেন এবং মন্দির নির্ম্মাণে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিরাম্ লিবানন্ হইতে সিডার্ এবং ফার্ বৃক্ষ দিতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করাইলেন; সলোমন্ তাঁহার লোকদ্বারা কাষ্ঠাদি পরিষ্কার করাইয়া মন্দিরের যথাস্থানে সংলগ্ন করাইবার উপযোগী করাইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় লোকের আহারাদি সলোমন্ সরবরাহ করিতেন। কাষ্ঠগুলি এইরূপে পরিষ্কৃত হইলে সমুদ্রতীরে আনীত হইত এবং জলপথে Joppaয় প্রেরিত হইত। সলোমনের রাজ্যমধ্যে ১৫৩, ৬০০ জন বিদেশীয় লোক বাস করিত, ইহাদিগের মধ্য হইতে তিনি ৭০,০০০ লোককে কাষ্ঠ আনয়ন, ৮০,০০০ জনকে বৃক্ষছেদনাদি, ৩৬০০ জনকে তত্ত্বাবধারকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন।* ইহা ব্যতীত ইস্‌রেল হইতে ৩০ সহস্র শ্রমজীবি নিযুক্ত করেন। ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতি বিভাগ একমাস কার্য্য করিয়া দুই মাসের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।† ইহাদিগকে ভিত্তির জন্য বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড কাটিয়া জেরুসালেমে প্রেরণ করিতে হইত। এই সকল উপলখণ্ড জেরুসালেমে আনীত হইলে "বহুমূল্য প্রস্তর" (costly stone) এই আখ্যা প্রাপ্ত হইবার উপযোগী হইত।‡ অদ্যাবধি তথাকার

* Kings v. 15, 16, & 2 Chronicles, ii 17-18.
† Kings v. 13, 14.
‡ Kings, v. 17.

মন্দিরে যে সকল বৃহৎ প্রস্তর দেখা যায়, সেই গুলিই বোধ হয় "বহুমূল্য প্রস্তর"।

কাষ্ঠ এবং লোক ব্যতীত হিরাম্ একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী সলোমন্‌কে দেন। ইহার নামও হিরাম্ এবং রাজা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং "পিতা হিরাম্" (Hiram my father) বলিতেন। * পিতা হিরাম্ একজন টায়ার দেশীয় শিল্পীর পুত্র। পিত্তলাদির কর্ম্মই তাঁহার পৈতৃক ব্যবসা হইলেও তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, কাষ্ঠ, প্রস্তর, বস্ত্র ইত্যাদির কার্য্যও অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ কারুকার্য্যে তিনি অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার অধীনে সলোমনের নিযুক্ত শিল্পীসমূহ কার্য্য করিতে লাগিল।

সলোমনের রাজ্যভার গ্রহণের চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১০১২ খৃষ্টাব্দীর পূর্ব্বে জিফ্ বা জায়ার্ (Zif বা Jyar) অর্থাৎ এপ্রিল বা মে মাসের ২রা তারিখে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং সাড়ে আট বৎসরে নির্ম্মাণ সমাধা হয়।† জেচিন্ এবং বোয়াজ (Jachin Boaz) নামক দুইটী স্তম্ভ তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে। পুরোহিতদিগের ব্যবহারের জল রাখিবার জন্য একটী ধাতুময় বৃহৎ পাত্র প্রস্তুত করেন। এই জলপাত্রের নাম "Molten Sea," ইহার পরিধি ৩০ হস্ত, ব্যাস ১০ হস্ত, গভীরতা ৫ হস্ত। ইহাতে দুই সহস্র বাথ (Bath) জল থাকিত। প্রতি দিকে তিনটী করিয়া দ্বাদশটী বৃষের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার উপরিভাগ পদ্মের ন্যায় গঠিত হইয়াছিল। এই জলপাত্রে হিরম অধ্যবসায় ও শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

---

* Hiram এবং Huram একই শব্দ এবং রাজা এবং শিল্পী উভয়কেই বলা হইয়াছে, Chronicle, xiv, 2 Chronicle, ii 3, 11, 12, viii 2, 18. ix vo. 21.

এই মন্দির সলোমন্‌ মহাসমারোহের সহিত উৎসর্গ করেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার পিতাকেও করিতে হইত। টিস্‌্রি অথবা ইথেনিম (Tisri or Ethanim) অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ইহুদীদিগের একটি পর্ব্বের (Feast of Tabernacles) সময় এই উৎসর্গ-কার্য্য সমাধা হয়। তাঁহার বিস্তৃত রাজত্বের সকল অংশ হইতে জেরুসালেমে দর্শকবৃন্দ আগমন করিতে লাগিলেন। যাবতীয় পুরোহিতবর্গ যথেষ্ট সমারোহের সহিত ডেভিডের পুরাতন নগর হইতে আর্ক (Ark) নূতন মন্দিরে আনয়ন করিলেন। লেভিটিগণ (Levities) শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের গুণগান আরম্ভ করিলেন। যখন গায়ক ও বাদকগণ একত্রে চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া জিহোবার অনুগ্রহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, সেই সময় ঈশ্বরের আবির্ভাবের চিহ্ন প্রতীয়মান হইল। সমস্ত মন্দির বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল, যাজকগণ সে স্থানে থাকিতে অক্ষম হইলেন কারণ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য মন্দির পূর্ণ করিয়াছিল। * যখন এই স্বর্গীয় বাষ্প চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল সলোমন্‌ বলিতে লাগিলেন, যে ঈশ্বর এই স্থানে অন্ধকারে আবৃত হইয়া অনন্তকাল থাকিবেন। অতঃপর সমবেত প্রজাবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে ইস্‌রেলের দেবতা জিহোবা ডেভিডের এবং তাঁহার নির্ম্মিত মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়া তাঁহার জীবনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি জানু পাতিয়া ভক্তি এবং ভাবপূর্ণ হৃদয়ে একান্ত মনে প্রার্থনা করিলেন। যে ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন সে স্থান যেন পতিত মনুষ্যদিগের মুক্তির উপায় হয় এবং তিনি যেন তাঁহার স্বর্গীয় আবাস হইতে তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, কারণ

তাঁহার অনুগ্রহ এবং ক্ষমা ব্যতীত পাপী মনুষ্যের মুক্তি নাই। এই প্রার্থনা খৃষ্টধর্ম্মের ভিত্তির ভবিষ্যৎ বাণী।

এই প্রার্থনার পর ঈশ্বরের অধিষ্ঠানের আর একটী নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল; হইতে একটী অগ্নিশিখা আসিয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পুনরায় সমস্ত মন্দির ঐশিক বাষ্পে এরূপ গাঢ় ভাবে আচ্ছন্ন হইল যে অন্য কাহারও প্রবেশ ক্ষমতা রহিল না। অতঃপর সলোমন্ প্রজাপুঞ্জের সহিত ২২ সহস্র বৃষ এবং ১ লক্ষ ২০ সহস্র মেষ বলিদান প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দশ দিবস ব্যাপিয়া বিরাট ভোজ হইল, সপ্ত দিবস টেবরনেকল্এর ভোজের জন্য এবং অপর সপ্ত দিবস মন্দির উৎসর্গ উপলক্ষে। এই ভোজের পর প্রজাগণ ঈশ্বর, ডেভিড, সলোমন এবং তাহাদিগের উপর যে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন তজ্জন্য ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এবং হৃষ্টান্তঃকরণে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।*

মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্তির চারি বৎসরের মধ্যে রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ শেষ হয়। এই প্রাসাদের আনুমানিক অবস্থা মিঃ ফার্গুসন্ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। রাজপ্রাসাদ ("King's own house") কয়েকটী হর্ম্ম্য সমাবেশ মাত্র। লম্বায় ১০০ হস্ত, পরিসরে ৫০ হস্ত এবং উচ্চে ৩০ হস্ত একটী হর্ম্ম্য সভাগৃহস্বরূপ ছিল। ইহার নাম "The House of the Forest of Lebonon"। সম্ভবতঃ লিবানন দেশীয় সিডার কাষ্ঠের চারি শ্রেণীস্তম্ভ হইতেই এই গৃহের এরূপ নামকরণ হয়। ইহার সম্মুখে "Porch of Judgment" নামক চারিটী স্তম্ভদ্বারা সংরক্ষিত একটী-গৃহ অবস্থিত ছিল। তৃতীয় হর্ম্ম্যের নাম "Porch of Pillars"। এই স্থানে রাজা সাধারণ আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিতেন এবং সামান্য

* Kings ... iii. 26, 66; 2 Chronicles vii.

কার্য্যাদি সমাধা করিতেন। অন্তশ্চত্বর এবং বহিশ্চত্বর (Inner and Outer Courts) নামক দুইটী সুন্দর উদ্যান এবং প্রস্রবণাদি শোভিত দুইটী আরাম ভবন ছিল। ইহা ব্যতীত স্ত্রীলোক এবং ভৃত্যবর্গের বাসোপযোগী গৃহাদি লইয়াই রাজপ্রাসাদ গঠিত হয়। সলোমানের রাজপ্রাসাদের আনুমানিক চিত্র Dr. Smith তদ্দেশীয় ভবনাদি দেখিয়া বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। মৌখিক বিবরণ অপেক্ষা চিত্র দর্শনে সুন্দর উপলব্ধি হয়। জোসিফাস (Josephus) বলেন ফেরোর গর্ব্বিতা কন্যার আবাসস্থান "Hall of the Judgment"এর সন্নিকটেই ছিল। তিনি মনে করিতেন যে পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলা-দিগের সহিত এক ভবনে বাস করিলে তাঁহার অপমান হইবে। এই নিমিত্ত প্রাসাদ নির্ম্মাণ সমাপ্তির পর মহাসমারোহের সহিত তিনি নূতন আবাসে আনীত হন।*

সলোমনের প্রাসাদ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত মৃত্তিকার নিম্ন দিয়া প্রায় ৮৪ হস্ত দীর্ঘ একটী পথ ছিল। এই পথের ধ্বংশাবশেষ অদ্যাপও দৃষ্টিগোচর হয়।† সলোমন নির্ম্মিত অন্যান্য হর্ম্ম্যের মধ্যে লিবাননের গ্রীষ্মাবাস এবং ইথামের (Etham) উদ্যান প্রসিদ্ধ।

এই সকল কার্য্য সমাধার পর ঈশ্বর সলোমনের নিকট পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলেন যে তিনি পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং যতদিন ডেবিডের বংশ তাঁহার আজ্ঞা অমান্য না করিবে ততদিন তিনি ডেবিডকে যে বিষয়ে বাগ্দত্ত হইয়াছিলেন তাহা সফল হইবে, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিলে ডেভিডের বংশ এবং সমস্ত ইস্‌রেল অচিরাৎ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে।‡ সলোমন ডেবিড কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

* I. Kings vii. 1—12.

† I. Kings x. 5.

‡ I. Kings ix. 1—9 ; 2 Chornicles vii. 12—22.

পূজা পদ্ধতি প্রচলন করিলেন এবং রবিবারে ও অমাবস্যায় এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষে বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।*

খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে ১০১৫ হইতে ৯৯৬ পর্য্যন্ত তিনি মন্দির নির্ম্মাণাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। টায়ারের রাজার উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ সলোমন গেলিলির (Gaillee) সমুদ্রতীরবর্ত্তী ২০টী নগর তাঁহাকে অর্পণ করেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া হিরাম একটির নাম কাবুল (Kabul) প্রদান করেন। ফিনিসিয় ভাষায় কাবুল শব্দে ময়লা বুঝায়। কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেও তাৎকালিক প্রথা অনুসারে হিরাম সলোমনকে ১২০ স্বর্ণ ট্যালেণ্ট (Talent) উপঢৌকন প্রদান করেন।

সলোমন তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্য এবং রাজ্যের অপরাপর অংশের উন্নতি সাধনে উৎসর্গ করেন। জেসর (Geyer) নামক একটী নগর মিশরের ফেরো ধ্বংশ করিয়া জয় করেন। এই নগর তিনি কন্যার যৌতুক স্বরূপ সলোমনকে প্রদান করেন। ইহা সলোমন পুনরায় নির্ম্মাণ করেন। তিনি ব্যলাথ্ (Baalath), বেথ-হরণ (Beth-horn) প্রভৃতি যে যে স্থানে যুদ্ধযান রাখিতেন, সেগুলিকে তিনি পুনর্নিম্মাণ করেন।† তিনি কেবল একটী মাত্র দেশ জয় করেন, তাহার নাম হামাথ্-জোবা (Hamath-zoba)। এই নগর টোই (Toi) রাজ্যের রাজধানী হামাথ্ কি না তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে অরন্টিস্ ও এন্টিয়ক্ (Orontes & Antioch) উপত্যকা যে সলোমনের অধিকৃত হামাথের মধ্যবর্ত্তী এবং তিনি যে ইহাতে অনেকগুলি "Store Cities" নির্ম্মাণ করেন তাহাতে সন্দেহ

* I. I Kings IX.23 ; 2 Chronicles VIII. 12—16.

নাই।* এইরূপে নগরগুলির উন্নতিসাধন করিয়া তিনি হিরামের সহযোগে ভূমধ্যসাগরে এবং ভারতমহাসাগরে বাণিজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। "Kings" এবং "Chronicles"এ এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় যে তিনি থারশিশের (Tharshish) সহিত বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি তৃতীয় বৎসরে বাণিজ্যতরী প্রেরণ করিতেন। এই থারশিশ দক্ষিণ স্পেনের একটী বাণিজ্যপ্রধান নগর। "Ship of Tharshish" অর্থে যে কেবল যে সকল তরণী উক্ত নগরের সহিত বাণিজ্য করিত তাহাদিগকে বুঝায় এমন বোধ হয় না; আধুনিক "East Indiamen"এর মত ঐ সকল প্রদেশের সহিত যে তরণীগুলি ব্যবসায় করিত সম্ভবতঃ তাহাদিগকে বুঝায়। ইডম্ (Edom) জয় করিয়া লোহিতসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ইথাল এবং ইজিয়ন-জেবার (Ethol & Ezion-geber) নামক যে দুইটী নগর লাভ করেন, তথা হইতেই সমুদয় বৈদেশিক দ্রব্যাদি আভ্যন্তরিক প্রদেশে প্রেরিত হইত। এই স্থান হইতেই হিরামের শিল্পিগণ সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিয়া অফির (Ophir) প্রদেশে ব্যবসা করিতে গমন করিত। এই অফির সম্ভবতঃ আরব দেশের পূর্ব্বতীরস্থিত একটী নগর বিশেষ, এই স্থান হইতেই গজদন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর এবং কাষ্ঠাদি এবং বানর যুবর আনীত হইত।†

কথিত আছে যে সলোমনের বাণিজ্য-পোত প্রতি বৎসর ৪২০ হইতে ৪৫০ স্বর্ণ ট্যালেণ্ট আনয়ন করিত। রৌপ্য এত অধিক পরিমাণে আমদানী হইত যে মূল্যবান্ ধাতু বলিয়া আর পরিগণিত হইত না রাজার তৈজসপত্র স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং সুবর্ণের দ্রব্যাদির দ্বারা

---

* I. Chronicles VIII. 3, 4. খাদ্যসংগ্রাহক নগর।
† I. Kings ix. 26—28. 2 Chronicles viii. 17, 18.

গৃহ শোভিত থাকিত। সলোমনের সিংহাসন গজদন্ত এবং সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ছয়টী সোপান আরোহণ করিয়া সিংহাসনে উঠিতে হইত এবং প্রতি সোপানের দুই পার্শ্বে এক একটী সিংহ শোভা পাইত। দুইটী সিংহের উপর রাজার হস্ত সংরক্ষিত হইত।

এই বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিয়া তিনি বিদেশীয় দুতগণের অভ্যর্থনা করিতেন এবং বিচার কার্য্য করিতেন। কোরাণে কথিত আছে যে একদা তিনি পশু, পক্ষী, প্রেত ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় ল্যাপউইং (Lapwing) পক্ষীকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন এমন সময় উক্ত পক্ষী আসিয়া নম্রভাবে কহিল যে সে শেবার (Sheba) রাজ্ঞীর নিকট হইতে আসিতেছে। আরবীয়গণ বলেন যে তাঁহার নাম বল্‌কিস্ এবং তিনি ইয়ামানের রাজ্ঞী। মিঃ পোকক্ (Mr. Pocock) তাঁহাকে ইয়ামানের রাজবংশের মধ্যে ষড়বিংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উক্ত পক্ষী আরও বলিল যে সেই দেশের লোক ঈশ্বর ব্যতীত সূর্য্যেরও আরাধনা করে এবং তাহারা অবিলম্বে সত্যধর্ম্মাবলম্বী না হইলে সয়তানের করকবলিত হইবে। ইহাতে সলোমন্ তাহাকে উক্ত রাজ্ঞীর নামে একখানি পত্র লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। জলালুদ্দিন বলেন যে যখন তিনি সৈন্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন সেই সময় উক্ত পত্র পক্ষীকর্ত্তৃক তাঁহার বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু অল্ বেজুইর মতে রাজ্ঞী যখন দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন তৎকালে গবাক্ষ পথে একটী পক্ষী আগমন করিয়া পত্র প্রদান করে। কোরাণের মতে সলোমন্ এই লেখেন :—"পরম কারুণিক ঈশ্বরের নামে বলিতেছি যে আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইও না, বরং আমার নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ কর।" জলালুদ্দিন্ বলেন যে সলোমন নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :—"ঈশ্বরের অনুচর এবং

ডেবিডের পুত্র সলোমনের নিকট হইতে সেবার রাজ্ঞী বল্‌কিসের নিকট পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি যে যিনি সত্যপথ অবলম্বন করুন তিনি শান্তি প্রাপ্ত হউন। আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইও না; বরং আমার নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ কর।" জেলালুদ্দিন আরও বলেন যে উক্ত পত্র মৃগনাভি সংযুক্ত এবং সলোমনের মোহর করা ছিল। এই পত্র পাইয়া রাজ্ঞী বল্‌কিস্ সভাসদ্‌গণের সহিত পরামর্শ করিয়া সলোমনকে সামান্য উপঢৌকন লইয়া একদল দূত প্রেরণ করিলেন। দূতকে সলোমন্ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা তাঁহাকে ধন দিতে প্রস্তুত আছে কিনা। তিনি সভাসদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেবার রাজ্ঞীর বশ্যতা স্বীকার করিতে আগমনের পূর্ব্বে কে তথাকার সিংহাসন আনিতে সক্ষম। ইহাতে একটী প্রেতযোনী উত্তর করিল যে সে নিমেষ মধ্যে আনিতে সক্ষম। অল্‌বেজুইএর মতে এই প্রেতযোনীর নাম ধক্‌ওয়ান্ বা সখর্।

বাইবেল্‌এ এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় যে সলোমনের কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া সেবার রাজ্ঞী তাঁহার বিচার দেখিতে ব্যগ্র হইলেন। সেই নিমিত্ত তিনি বহুসংখ্যক উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, মসলা বোঝাই করিয়া জেরুসালেমে আগমন করিলেন। স্বদেশে রাজ্ঞী গভীর জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, সেই জন্য তিনি বিচারে সলোমনকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে তাৎকালিক অনেকগুলি কূট প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সলোমনের জ্ঞানগর্ভ উত্তর এবং মীমাংসা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর দর্প চূর্ণ হইল এবং সলোমনকে মহামূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আরবায় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে জেরুজালেম মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিয়া সলোমন্ মক্কায় তীর্থ করিতে গমন করেন। তথায়

কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ইয়ামান অভিমুখে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে মক্কা ত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহরের সময় সানায় পৌছিলেন এবং সেই স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি করিবার পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জল আনয়ন করিবার জন্য ল্যাপউইং পক্ষীর অনুসন্ধান করিলেন। আরবেরা ইহাকে অল্‌হদ্‌বদ্‌ বলে। কথিত আছে যে এই পক্ষীর মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কোন স্থানে জল আছে জানিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। ইহারা চঞ্চুদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে প্রেতগণ জল বাহির করিত। অল্‌হদ্‌বদ্‌ জল বাহির করিবার জন্য নিম্নে অবরোহণের সময় অপর একটী হদ্‌বদ্‌ তাহার সঙ্গে নীচে নামিল। দ্বিতীয় পক্ষীর মুখে শেবার রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া সলোমন উভয়কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎপরে যাহ ঘটিল তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র।

একদিন প্রত্যূষে কলিকাতা কদমতলার ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। প্রায় ৩০০ শত যাত্রী ও ২০০ শত গো-মেষাদি সহ শুক্রবার প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে "লুধিয়ানা" কলিকাতা ত্যাগের উদ্যোগ করিল। কিন্তু কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন বামে বা দক্ষিণে হেলিতে দুলিতে 'লুধিয়ানা' বেলা প্রায় ১॥০ প্রহর অতীত করিয়া দিলেন। নানারূপ অঙ্গসঞ্চালনের পর ১২ ঘটিকার সময় বন্দী নবাব ওয়াজেদালীর সুপ্রসিদ্ধ কারাগার প্রাসাদের নীচে আসিয়া নোঙ্গর নামাইয়া দিল। যাত্রীগণ যে যাহা আনিয়াছিল বাহির করিয়া

উদরানল নির্ব্বাণের ব্যবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হইল। কলিকাতা হইতে যে সকল ফেরিওয়ালা নৌকা করিয়া খাদ্যদ্রব্য সহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, সুযোগ বুঝিয়া তাহারাও যতদূর সম্ভব বঙ্গভূমিত্যাগোন্মুখ ব্যক্তিবর্গের ঘর্ম্ম শোষণ করিতে যত্নের ত্রুটি করিল না। এ দিকে সাহেবদের দিনমানের প্রথম ভোজের প্রভূত আয়োজন হইয়াছে। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল, শশব্যস্তে সাহেব মেম ও বিলাতি পোষাকপরিধারী দেশীয়গণ, জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য সাহেবরাও ভোজনাগারে কোমরকাটা কোট পরিয়া উপস্থিত হইলেন। মাথায় পাগড়া, চাপকানপরা খানসামাগণ খাবার লইয়া পৌছিল। চারিদিক ঘট্ ঘট্, ঠন্ ঠন্ শব্দে পরিপূরিত হইল, প্রায় ১ ঘণ্টা বসিয়া সাহেবরা ভোজন শেষ করিলেন এবং আহারান্তে পুনরায় উপরে যাইয়া নানা ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা ডেকের যাত্রী, জাহাজে স্থানাভাব বশতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট মিলে নাই, অথচ ভ্রাতা ব্রহ্মে চাকরী করেন সেখানে যথা সময়ে না পৌছিলে নয়। তাই এই কষ্টকর ডেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

জাহাজ ছাড়িবার সময় হইয়াছে দেখিয়া জনৈক সাহেব কর্ম্মচারী আসিয়া নোঙ্গর তুলিতে হুকুম দিলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। গ্রাম, প্রান্তর, নগর অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ 'সাগরদীপমঞ্চের' নিকট পুনরায় নোঙ্গর নামাইয়া দিল। সেইখানেই আমাদের প্রথম রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি আমরা কর্দ্দমবিন্দু (Mud point) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কখন জাহাজ ছাড়িয়া তথায় আসিয়াছে তাহা কিছুই জানি না। কর্দ্দমবিন্দু জ্যামিতির বিন্দু নহে, অতি বিস্তীর্ণ জলরাশির নাম কর্দ্দমবিন্দু। যে স্থানের নাম কর্দ্দমবিন্দু সে স্থান সাগরের অতি নিকট। কিন্তু ভৌগোলিকগণ সে স্থান সাগরের অংশ বলিয়া গণনা করেন; এবং

ভাগীরথীর শেষসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাগরের অংশ না হইলেও সে স্থান অতীব প্রশস্ত, কোন দিকে কিছু দেখা যায় না। কিছু দেখা না গেলেও, সাগর হইতে চতুর্দ্দিকে যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা হইতে এ স্থানের দৃশ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ—সাগরের জল প্রকৃত শ্যামবর্ণ তাই সাগরের নাম কালাপানি; আর কর্দ্দমবিন্দুর জল সাধারণ গঙ্গাজলের ন্যায় পঙ্কিল। দ্বিতীয়তঃ—কর্দ্দমবিন্দু হইতে ভূম্যাদি কিছু না দেখা গেলেও অতি দূরে যে কিছু আছে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সাগরে আসিয়া পৌঁছিলে কোনদিকই লক্ষ্য হয় না—চতুর্দ্দিকে কেবল অগাধ অনন্ত সলিলরাশি। সেই পঙ্কিল জল ছাড়িয়া নির্ম্মল সাগরজলের দর্শন পাইতে প্রায় ২ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে সুরধুনীর সাগরসঙ্গম দেখিতে পাইলাম। সেই মিলনস্থান অতি সুন্দর—সহস্র যোজন পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত শরীরে সুরধুনী যে স্থানে সাগরের প্রশান্ত বক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা সেই স্থান অতিক্রম করিয়া বঙ্গভূমির সহিত শেষ সংস্রবসূত্র ছিন্ন করিলাম। ভাগীরথীর পতি-সম্মিলন ও আমার স্বদেশের সীমা-অতিক্রমণ এই দুই বিপরীত বিষয়ের বিচিত্র বিকাশ ক্ষণকাল আমার নির্জ্জীব হৃদয়কে আলোড়িত করিল। মনে হইল "কারো পৌষ মাস কারো সর্ব্বনাশ"। চারিদিকে অন্বেষণ করিলাম যদি একবার বঙ্গদেশের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই; বিফল মনোরথ হইয়া কি-যেন ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একদল পক্ষী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কখনও তাহারা জাহাজের অগ্রে পথ-প্রদর্শকের ন্যায় যাইতেছিল, কখনও বা জাহাজের পশ্চাতে থাকিয়া যেন জাহাজকে পথপ্রদর্শক মনে করিয়া তাহার অনুগমন করিতেছিল; আবার কখনও বা শ্রান্তক্লান্ত হইয়া সাগরের জলে আশ্রয় লইতেছিল, কিন্তু জলের তারল্যহেতু সাহস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছিল না, তাই উড়িয়া গিয়া জাহাজের নানাস্থানে বসিতেছিল

—কিন্তু নিজের স্বভাব দোষে কোথাও শান্তি পাইতেছিল না! পক্ষীদল প্রায় দিবা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিল, তাহার পর কোথায় চলিয়া গেল আর দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে হইল যেন তাহারা আমাদের আত্মীয়, বিদেশে আসিতেছি বলিয়া কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। সমুদ্রে পাখী দেখা ভূখণ্ডের নিকট থাকার পরিচায়ক। নাবিকেরা ইহাকে "Within a bird's flight" বলেন। তাঁহারা সাধারণতঃ পাখী দর্শনে এক দিবস মধ্যে কোন-না-কোন দেশ পাওয়া সম্ভব মনে করেন।

ক্রমে আমরা সাগরজলে বহুদূর আসিয়া পড়িলাম। দুই একখানি করিয়া জাহাজ এদিক সেদিক দিয়া যাইতে লাগিল। সমুদ্রে এক জাহাজ অন্য জাহাজ দেখিলে উভয় জাহাজের কর্ম্মচারীবর্গের সাঙ্কেতিক আলাপ হইয়া থাকে এবং সেই সকল সাঙ্কেতিক আলাপের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কোন্ জাহাজ কোন্ স্থানে, কি ভাবে অন্য কোন জাহাজকে দেখিয়াছে বন্দরে আসামাত্র তাহার খবর দিতে হয়। এটি একটী সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক নৌ-নীতি। এই উপায়েই কখনও কোন জাহাজের আপদ বিপদ হইলে তাহার সংবাদ পাওয়া যায়। যে জাতীয় জাহাজই হউক না কেন উপরিউক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য, নতুবা সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক সমিতির নিয়মানুসারে দণ্ডনীয়।

জাহাজে চাপিয়া সমুদ্রে আসা এই আমার প্রথম নয় তাই সাগরের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হই নাই, তবে অনন্যগতি হইয়া কেবল চারিদিক নিরীক্ষণ করিতাম, আর মনে কত কি ভাবনা আসিয়া জমাট বাঁধিত।

দেখিতে দেখিতে তিন দিন সাগরবাস হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসও প্রায় যায় যায় এমন সময় দাদামহাশয় আসিয়া বলিলেন, "এখন আরাকাণ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিবার সময় হইয়াছে।" তিন দিন দিবা

রজনী অনাচ্ছাদনে পাটাতনের উপর থাকিয়া থাকিয়া চতুর্থ দিন আমার একটু জ্বরবোধ হইল। কিন্তু তবুও আমি আরাকাণ পর্ব্বত দেখিবার জন্য আমার ভ্রাতা ও জনৈক বন্ধুর সহিত জাহাজের অগ্রভাগে এক উচ্চস্থান অধিকার করিলাম। তথায় থাকিয়া আমরা সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর, সূর্য্যদেবের সাগরস্নান দেখিলাম। সাগরে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়, তাই নিরাশ-হৃদয়ে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

ক্রমে রজনীর ঘনান্ধকার চারিদিক হইতে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই অন্ধকারে আনমনে থাকিয়া কেবল শুনিতে ছিলাম,—জাহাজ-প্রতিহত জলরাশির অবিরাম কল্লোলধ্বনি, আর আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম, অনন্ত কোটী নক্ষত্ররাজির মিটি-মিটি আলো। ইতিমধ্যে আমাদের সম্মুখে নক্ষত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের একটী আলো দেখা গেল—প্রথমতঃ সকলে সেটিকে দীপমঞ্চ মনে করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম আলোটি স্থির নহে। তখন তাহাকে জাহাজের আলো বলিয়া ধরিয়া লওয়া গেল। কার্য্যতঃও তাহাই প্রকাশ পাইল। অতি অল্পকাল মধ্যে জাহাজ খানি আমাদের সম্মুখীন হইল। সাঙ্কেতিক আলাপে জানা গেল, ইহা রেঙ্গুন হইতে ডাক লইয়া কলিকাতা যাইতেছে। পরস্পর সঙ্কেত করায় দুই জাহাজ কিছুকাল একস্থানে দাঁড়াইল। আমাদের জাহাজে কলিকাতা হইতে যে পথ প্রদর্শক (Pilot) আসিয়াছিলেন তিনি সেই অনন্ত সমুদ্রে তৃণবৎ একখানি জলি বোট করিয়া স্বীয় আসবাবাদি লইয়া পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য জাহাজ বদলাই করিলেন। জলি বোট ফিরিয়া আসিল। উভয় জাহাজই ছাড়িয়া দিল। আমি তখন নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিবস প্রাতে উঠিয়া দেখি জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছে। স্থানের নাম জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, তখন আমরা ঐরাবতবিন্দু হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে রেঙ্গুন নদীর মধ্যে হেষ্টিংস নামক স্থানে আছি। ঐরাবত শব্দ শুনিতেই মনে হইল নিশ্চয়ই আমরা রেঙ্গুনের নিকট আসিয়াছি। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, অনতিদূরে সর্ব্বোপরি সুপ্রসিদ্ধ কনককায় বৌদ্ধকীর্ত্তিস্তম্ভ, চতুর্দ্দিকে গৃহাদি পরিবেষ্টিত হইয়া, পারিবারিক কেন্দ্রে পিতামহ দেবের ন্যায়, ব্রহ্ম-রাজধানী রেঙ্গুন সহরের অভিভাবক স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

এখন আমাদের চারিদিকে স্থল দেখা যাইতেছে। স্থল দেখিয়া আর আমার জলে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু জাহাজ ঘাটে আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, শুনিতে পাইলাম। প্লেগ ডাক্তার আসিয়া যাহাকে যাহাকে যাইতে আজ্ঞা করিবেন, তিনি সহরে অবতরণ করিতে পারিবেন, আর সকলে প্লেগ ছাউনীতে কিছুকাল বাস করিয়া তৎপরে সহরে পদার্পণ করিতে পাইবেন। ডাক্তার সাহেবের অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয়পোত আসিয়া ডাক লইয়া গেল। প্রায় দিবা দুই প্রহরের সময় একখানি জাহাজ আসিল। শুনিলাম ঐ জাহাজে ছাউনীর যাত্রীগণকে যাইতে হইবে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব তখনও আসিলেন না। কিছুকাল পরে ডাক্তার আসিলেন। জাহাজের লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সাহেব বাহাদুর প্রায় সকলকেই ছাউনি বাসের হুকুম দিলেন! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ, জ্বর সত্ত্বেও আমাকে সহরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন! ডাক্তারী অভিনয় শেষ হইলে ৩০০ শত যাত্রীর মধ্যে কেবল মাত্র ৩০।৪০ জন যাত্রীসহ জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরাভিমুখে রওয়ানা হইল। রেঙ্গুন বন্দর অতি সুন্দর। প্রশস্ত নদীবক্ষে অগণন বাণিজ্যজাহাজ ভাসমান। উভয়তীরে শ্রেণীবদ্ধ গৃহাদি। মাঝে মাঝে, অভ্রভেদী

নলসমূহ অনর্গল ধূমোদ্গীরণ করতঃ পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ের আনুরক্তি প্রকাশ করিতেছে! পর্ব্বতপ্রমাণ কাষ্ঠস্তূপাবলী ব্রহ্মদেশের অধঃপতনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!

সাগর হইতে বন্দরে প্রবেশ করিতে লক্ষ্যাবধি * B. B. T. C. L. বর্ণ পঞ্চক দৃষ্ট হইল। ঐ পঞ্চভূতে ব্রহ্মে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। অদূরে B. B. T. C. L. অঙ্কিত এক সৌধোপরি প্রকাণ্ড লোহিত পতাকা শ্বেত ঐরাবত খচিত হইয়া সমগ্র বৃটন দ্বীপের একপ্রাণতার পরিচয় দিতেছে। যে শ্বেত ঐরাবত ভূমণ্ডলের অন্য স্থানে অপ্রাপ্য বলিয়া, ব্রহ্মরাজ স্বীয় পদবীভুক্ত করিয়াছিলেন, হায়, আজ সেই শ্বেত ঐরাবত কাষ্ঠব্যবসায়ী বণিকের হস্তগত হইয়াছে!

প্লেগ ডাক্তার অনুগ্রহ করিয়া ছাউনীতে লইয়া যান নাই বটে, কিন্তু শুনিলাম তখনও উৎপাতের শান্তি হয় নাই। ডাক্তার সাহেবের সহিত কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ করিয়া, শারীরিক বিষ নির্ব্বিষ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বস্ত্রাদির বিষ তখনও রহিয়াছে, তাই সহরে প্রবেশের পূর্ব্বে বস্ত্রাদির বিষ মোক্ষণ আবশ্যক। এ বিষ কেবল নিম্নশ্রেণীর যাত্রীগণের বস্ত্রাদিতে থাকে! অধিক ভাড়া বলিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট বিষ যাইতে পারে না। অথবা উচ্চশ্রেণীর যাত্রীগণের বস্ত্রাদিতে বিষ থাকিলেও, তাহা আর্থিক উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়; ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মোক্ষণ করিতে হয় না। যাহা হউক সরকারী হুকুম মান্য করিতে হইবে, তাই মুটিয়া ডাকাইয়া বাক্স ইত্যাদি যাহা কিছু আসবাব ছিল, পাঠাইয়া দিলাম। জেঠীর উপর একটী

* Bombay Burma Trading Corporation Ltd.এর সহিত উচ্চ ব্রহ্মের রাজা থিবের কাষ্ঠব্যবসায় সম্বন্ধে যে রাজীনামা ছিল, তাহার সর্ত্ত ভঙ্গ করা অপরাধে, রাজনীতি-কুশল লর্ড ডফরীন ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিয়া উচ্চ ব্রহ্ম অধিকার

যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পীয় প্রক্রিয়ায় এই বিষ-মোক্ষণ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে! যন্ত্রের নিকট বাক্স লইয়া গেলে, জানিনা কেন—হয়ত আসবাব গুলির চেহারায় তুষ্ট হইয়া—বিষ-মোক্ষণকারী সাহেব মহাশয় আমাদের বস্ত্রের বিষমোক্ষণ আবশ্যক মনে করিলেন না। আমরা নিজ গ্রহকে ধন্যবাদ করিতে করিতে তীরে অবতীর্ণ হইলাম।

দাদামহাশয়ের উপদেশানুসারে, একজন সুলতানপুরী ভৃত্য আমাদের জন্য তীরে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া ভৃত্যটি একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিল। অতি অল্পকাল মধ্যে আমরা আসবাবাদি সহ বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। গাড়ীতে সামান্যকাল থাকিয়া রেঙ্গুন সহরের যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই ব্রহ্মে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপন বিষয়ক ঐতিহাসিক জ্ঞান কিছু পরিমাণ লাভ হইয়াছিল এবং তাহাতে ত্রিগুণাত্মক ইংরাজজাতির অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সহরে প্রবেশ করিয়া রেঙ্গুনের রাস্তা ও গৃহাদিই প্রথম দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাহারই বর্ণনা প্রথম আবশ্যক। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও বরাবর সোজা। আঁকা-বাঁকা কোথাও নাই। সব রাস্তায় পদ-পন্থা (foot path) নাই। কলিকাতা ও রেঙ্গুনে প্রায় একই মসলায় রাস্তা প্রস্তুত হয়, তবে কলিকাতার রাস্তার ন্যায় এখানকার রাস্তায় তত বেশী চলাচল নাই, তাই এখানকার রাস্তাগুলি একটু পরিষ্কার। যদি কলিকাতার মত এখানকার রাস্তায় গাড়িঘোড়ার আমদানী থাকিত, তাহা হইলে পদব্রজে গমনকারিগণের রাস্তাচলা ভার হইত; একরশি পথ চলিলে তবে একখানি গাড়ীর সহিত দেখা হয় তাহাতেই পাহারাওয়ালা প্রভুরা "বগল পাকড়," "ফুটপাত পাকড়" শব্দে পথিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। পাহারাওয়ালাদের বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, তাহাদের পোষাক ও বেশ আমাদের দেশের

দারোগা বাবুদের ন্যায় অনেকটা ; আর কাযের মধ্যে কেবল "বগল পাকড়," "ফুটপাত পাকড়' শব্দ উচ্চারণ-করা। কয়েকটী রাস্তা ব্যতীত এখানকার সমস্ত রাস্তাতেই এক একটী নম্বর আছে, ঐ নম্বর অনুসারেই রাস্তাগুলি অভিহিত হয়। যে কয়েকটী রাস্তার নাম আছে তন্মধ্যে একটী ব্যতীত অপর সমস্তগুলি সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী-বর্গের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। যদি বর্ষব্যাপী যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইত, তাহা হইলে বোধ করি রাস্তার নাম-করণে আজ কষ্টানুভব করিতে হইত না। রেঙ্গুনের গৃহগুলি বাহির হইতে দেখিতে বেশ সুন্দর। বৃহৎ বৃহৎ বাড়ী, কতক ইষ্টক ও কতক কাষ্ঠে নির্ম্মিত, তবে কাষ্ঠ ব্যবহার করিতে পারিলে আর ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। এখানে একতালা বাড়ী প্রায় দেখা যায় না। গৃহে ইষ্টক নির্ম্মিত চাতাল ছাদ নাই। এখানকার জল বায়ুতে চাতাল ছাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তাই লোকে অবস্থানুসারে থাপড়া বা অন্ত দ্রব্যে ঢালু ছাদ প্রস্তুত করে। এক বাড়ীতে বহুলোকের বাস। কেবল বহুলোক বলিলে চলিবে না, বহুজাতীয় লোকের বাস। ছোট ছোট পায়রার খোপের ন্যায় কামরা লইয়া এক-একটি গৃহস্থ বাস করে। বহুজাতীয় লোক এক বাড়ীতে বাস করে বলিয়াছি, বোধ করি, তাহার একটি উদাহরণ দিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। যথা আমাদের বাড়ীর একতালায় দুইটী গৃহস্থের বাস—একটী মান্দ্রাজী ফিরিঙ্গি ও একটী কাফ্রি। দ্বিতলে একটী গোয়ানিজ ও একটী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান, ত্রিতলে আমরা (বাঙ্গালী হিন্দু) ও একজন মান্দ্রাজী স্বামী ও ব্রহ্মস্ত্রী-গঠিত একটি খৃষ্টান পরিবার। এইরূপ এক বাড়ীতে নানা জাতীয় লোকের বাস, আর কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহ। রেঙ্গুন সহরে যত বিভিন্ন জাতির বাস এত আর ভারত রাজ্যের কোথাও নাই।

যে হঠাৎ কোন যাত্রী রেঙ্গুন সহর মান্দ্রাজ অন্তর্গত মনে করিতে পারেন। ব্রহ্মদেশের নগর বলিয়া পরিচয় দিতে সহরের মধ্যস্থলে স্থলে প্যাগোডা (Soolay Pagoda) নামে একটি বৌদ্ধস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রেঙ্গুনের পার্শি বাজার উল্লেখযোগ্য। পার্শিবাজার ঠিক কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল বাজারের ন্যায়, বরং তাহা অপেক্ষা অনেক বড়। দোকানী প্রায়ই ব্রহ্ম স্ত্রী-লোক। অন্য যে কয়েকটি বাজার আছে, তাহাও মন্দ নহে।

সহরের মধ্যে একটী মিউনিসিপ্যাল উদ্যানে, সন্ধ্যার সময় অনেক লোক বায়ু সেবনের জন্য সমাগত হয়েন। ডালহৌসি স্কোয়ার নামে আর একটী উদ্যান আছে। এটী অতি মনোহর উদ্যান। একটী হ্রদের উপর অবস্থিত। সে স্থানের মনোহারিত্ব না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

সহরটি আয়তনে ২২ বর্গ মাইল। ১৮৯১ সালের আদম সুমারি অনুসারে, তৎকালে রেঙ্গুনে ২৮,৩৪৭টী গৃহস্থ বাস করিত এবং ১৮০,৩৪০ জন অধিবাসী ছিল। রেঙ্গুনে সাহেবপাড়া, বাঙ্গালিপাড়া নাই। সকল জাতীয় লোকই সকল স্থানে বাস করে, তবে অনেক বড়লোক ক্যান্টনমেণ্টে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা অধিকাংশই সাহেব; অন্যান্য জাতীয় লোকও আছেন।

শ্রীপ্রেমদানন্দ সেন।

করিমা।*

পারস্যসাহিত্যাকাশে সেখ সাদি অন্যতম অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। ফার্শীভাষাসুন্দরীকে কমনীয়া, রমণীয়া এবং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা করিবার জন্য যাঁহারা সুদীর্ঘ কাল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জগতে অমরত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ সাদি সাহেব তাঁহাদেরই অন্যতম সহযোগী। ইনি কিশোর অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ এবং নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া অল্প বয়সেই মহা তপস্বী এবং মহা পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ইঁহার সমস্ত জীবন, ত্যাগ-স্বীকার এবং বৈরাগ্য ব্রতেই যাপিত হয়। ধন, মান, ভূষণ, রাজপদলাভে, বিবাহ প্রভৃতি সাংসারিক কোনও বিষয়েই সেখ সাদির মতিগতি ছিলনা; গ্রন্থ-পাঠ, ধর্ম্মালোচনা, সুনীতি প্রচার, নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে অধমের সংস্কার, গ্রন্থ রচনা, তপস্যা এবং পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যেই ইঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। মুসলমান সমাজে, এই মহাত্মা অতি প্রাচীণ কাল হইতে মহাযোগী এবং দেবানুগৃহীত মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিয়াছেন। সেখসাদির বিরচিত কাব্য ও কবিতা মালা প্রত্যেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানের নিকট পরিচিত; "সেখসাদির কলাম (কবিতা) যে পড়ে নাই, সে লেখা পড়া জানেনা" ইহাই মুসলমানের ধ্রুব বিশ্বাস ও দৃঢ় সংস্কার। সাদির 'গোলেস্তা' ও "বোস্তা' এই দুই গ্রন্থ জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু মূল্যবান্ রত্ন। গোলেস্তা একখানি বৃহৎ চম্পূ

---

* Karima (Pand Nama) : Urdu translation with explanatory notes in English, by Sir M. Bhownagree, M. P. (Donaldson & Co.,

কাব্য, ইহা বাস্তবিকই নানা ফল ফুলের প্রশস্ত এবং রমণীয় উদ্যান। সাদি বলিয়াছেন

"গুলে খোসবুয়ে দর্ হমাম্ রোজে।"

বাস্তবিক গোলেস্তা তাহাই বটে। তাঁহার গোলেস্তার

"নয়শোরোমা নমূর্দ্ নাম নেকো কজা অস্ৎ"

এই কবিতা তাঁহার সম্বন্ধেই প্রয়োজিত হইবার যোগ্য। কাব্যের মঙ্গলাচরণে মহাকবি লিখিতেছেন—

"বনামে জাঁহাদর্ যাঁ আঁফ্রি॥"

বাস্তবিক, তাঁহারই কণ্ঠে স্বয়ং বাগেদবী উপবেশন করিয়া যে মহাকাব্য সৃজন করিয়াছেন তাহা কেবল সাদির নামেরই যোগ্য। ভাষা, ভাব, নীতি, ছন্দ, অলঙ্কার, মাধুর্য্য, গভীর চিন্তাশীলতা, ইত্যাদি সেখ সাদির কাব্যমালার ভূষণ। সেখ সাদির প্রতি কবিতা এবং প্রতি কাব্যেরই পদন্যাসে প্রথমেই মন মোহিত হয়।

গোলেস্তা, বোস্তা, নানাবিধ কবিতা এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য রচনা ব্যতীত, সেখ সাদি আর একখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র কাব্য, কিন্তু জগতের ইহা অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি বোধ হয় সাদি সাহেবের সর্ব্ব প্রথম রচনা, ইহার নাম "করিমা"; পান্দেনামা নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার আদ্যন্ত পারস্য ভাষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় পরিপূর্ণ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান বালকেরা এই "করিমা" পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। করিমা বালকের পাঠ্যপুস্তক বটে, কিন্তু অনেক বৃদ্ধেরও ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই পুস্তক অতীব মনোহর এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ। ইহার সর্ব্বত্র সুনীতিতে ভরা; ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে, অলঙ্কারের আশ্চর্য্য সংযোজনায়, "করিমা" অতীব সুপাঠ্য গ্রন্থ বলিয়া

২৪টি কবিতা আছে, যথা (১) এবাদৎ অর্থাৎ প্রার্থনা বা মঙ্গলাচরণ (২) সেফৎ-এ-রসুল অর্থাৎ মহম্মদের প্রশংসা (৩) খতাব নফ্‌স্‌ অর্থাৎ সংসারে মানবের অবস্থা (৪) মদে করিম অর্থাৎ দয়ার গুণ (৫) সেফৎ সখাবৎ অর্থাৎ দাতব্যতার প্রশংসা (৬) মদামৎ বখিল অর্থাৎ কৃপণতার নিন্দা (৭) তোয়াজে অর্থাৎ বিনয় (৮) তকবুর অর্থাৎ অহঙ্কার। (৯) এলেম অর্থাৎ বিদ্যা (১০) সহবৎ জাহেলান অর্থাৎ মূর্খের সংস্রব! (১১) অদল্‌ অর্থাৎ ন্যায় (১২) জুলুম অর্থাৎ অত্যাচার (১৩) কণায়েৎ অর্থাৎ সন্তোষ (১৪) হরশ্‌ অর্থাৎ ঈর্ষা। (১৫) তায়ৎ ও এবাদৎ অর্থাৎ প্রার্থনা ও ব্রহ্মচিন্তা (১৫) সয়তান অর্থাৎ পাপ (১৭) সরাব অর্থাৎ সুরাপান (১৮) বফা অর্থাৎ বশ্যতা (১২) সুকর অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা (২০) সবর্‌ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা (২১) রাস্তি অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলা (২২) কদব্‌ অর্থাৎ মিথ্যা বচন (২৩) হকতালে অর্থাৎ ন্যায়বান ভগবানের প্রশংসা এবং (২৪) মজ্‌লুকাৎ অর্থাৎ সংসারের মায়া ও ক্ষণভঙ্গুরতা। এই চতুর্ব্বিংশতিটি কবিতা লইয়া সেখসাদি এই করিমা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সাদির বিরচিত এই মধুচক্র হইতে পারস্য ভাষা উদ্যানের মধুমক্ষিকারা নিত্য মহানন্দে সুধাপান করিতেছে; কিন্তু এ উদ্যানে উর্ণনাভেরও সংখ্যা কম নহে। যে প্রসূন হইতে মহাসুখে গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি করিতে করিতে অলিকুল অমৃততুল্য মধু সঞ্চয় করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, সেই প্রসূন হইতেই উর্ণনাভ বিষ সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহার মুখে মধুর সংযোগ হইলেই মধুর মধুত্বের নাশ হয় এবং ঐ মধু বিষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্যই সেখ সাদি বলিয়া রাখিয়াছেন।

"চশম্‌ কুজা বাসদৎ দীদায়ে মানী বেয়ার্‌"

শ্রীব্রহ্মানন্দ মহাভারতী।

সহযোগী।

সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৪। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "প্রাচীন পুণ্ড্রাজ্য" জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ উপাদেয় রচনা। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর "দাঠাবংশো" প্রবন্ধে সিংহলে বুদ্ধদেবের দন্তপূজা বিষয়ক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। "রুদ্ধকণ্ঠ" শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের গল্প। গল্পটির স্থানে স্থানে অনবধানতা লক্ষিত হইল। লেখক আর-একটু অবহিত হইলে গল্পটি বেশ জমিত। শেষাংশে করুণ রসের অবতারণাটুকু তেমন সফল হয় নাই, অথচ 'প্লট' টুকু মন্দ ছিল না। "সহযোগী সাহিত্যে" প্রাচীন ভারতের চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যের কথা সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রবন্ধবৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। সম্পাদক মহাশয়ের যেন কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটিতেছে।

অঙ্কুর, ভাদ্র। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের "যোগ্যতমের জয়" একটি গুরুগম্ভীর গবেষণাত্মক প্রবন্ধ। ভাষায় বিলাতী গন্ধ ভরপুর। শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্যের "সূর্য্যদেবী ও পরিমলদেবীর" মুখবন্ধে প্রকাণ্ড জমকালো 'footnote' থাকিলেও ভিতরে রাবিশ! পাঠ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষের "প্রাণ-সমর্পণ" সনেট—কারণ এটি চতুর্দ্দশপদী ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর স্যান্যালের "অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্য" ইংরাজী রিপোর্টাদির সার সংগ্রহ এ সংখ্যা অঙ্কুরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ! "রাজকন্যা ও শৃগালের কথা" শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষের খেয়ালি রচনা

মহাশয়ের খেয়াল নহে কি! "রত্নমালা" সংস্কৃত কবিবচনের অনুবাদ "গঙ্গারাম" শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। ইহাতে "প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার" 'অতুল ঐশ্বর্য্য,' 'দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ' ইংরাজ রাজত্বের আবির্ভাব কাল' দেখিয়া "চন্দ্রশেখর" মনে পড়িতেছিল, কিন্তু সহসা দেখা গেল ইহাতে 'খঞ্জনী বাজাইয়া' 'ভিখারিণীর' গানও আছে—

"শ্যাম সোহাগিনী রাই বিনোদিনী কাহে গরবিনীরে
তুয়া পদ পরি লুঠত মুরারি কাহে উদাসিনীরে!"

আবার "কিরূপ পেখনু সহ যমুনাকূলে—যমুনাকূলে কদম্বমূলে" গানেরও তরঙ্গ আছে; তবে আমাদের কথা, যে ভিখারিণী গিরিজায়া নহে, মঞ্জরী এবং 'হিরো' মহাশয় হেমচন্দ্র নহেন—রুদ্রনারায়ণ রায়! অনুকরণ নিন্দার সামগ্রী নহে স্বীকার করি, কিন্তু ইহা ত অনুকরণ নয় ইহা নির্লজ্জ ধৃষ্টতা। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের "উৎসর্গ" কবিতার সেই 'অশ্রুভার গহনকানন' তরঙ্গিনীর ভীষণ গর্জ্জন কিন্তু "ভাবের মাথায় লাঠি মারলেও দেয়নাক সে সাড়া" "স্বদেশমাতা" কবিতার তলদেশে 'শ্রীমতী নীতি কবিতা রচয়িত্রীর' ছাপে বোধ হয় পাঠকসম্প্রদায়কে নীতি উপদেশ দেওয়াই সম্পাদক ও লেখিকার উদ্দেশ্য। সাধু!

নিবেদন।

সম্পাদক দূরে থাকিলে সম্পাদন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সেইজন্য আগামী ১৩১৫ সালের বৈশাখ হইতে ভারতী পুনরায় পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তে সমর্পিত হইতেছে। ইহাতে শ্রীমতী সরলাদেবীর সহিত পত্রিকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। কার্য্য-সুশৃঙ্খলার জন্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব হইতে মুক্তি গ্রহণ করিলেও তিনি দূরে থাকিয়া ভারতীর মঙ্গল সাধনে যথাসাধ্য যত্নশীলা থাকিবেন।

নববর্ষ হইতে ভারতী প্রকাশে আর কোন অনিয়ম ঘটিবে না। মাসেমাসে সুখপাঠ্য সুললিত উপন্যাস কবিতাদি এবং মনোজ্ঞ প্রবন্ধাবলী পূর্ণ হইয়া, ভারতী যথাসময়ে যথানিয়মে বাহির হইবে। আকারেও ভারতী আগামী বৎসর হইতে পুরাতন রূপ ধারণ করিবে। আট পেজি রয়াল ফর্ম্মার সুবিধা এই, এক বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা একত্র বাঁধাইলে ইহা হস্তের আয়ত্তাভূত বেশ একখান নাতিস্থূল পুস্তক হয়।

এ বৎসরে বৈশাখ হইতে আশ্বিনের ছয় খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতেই ১৩১৪ সালের ভারতী সমাপ্ত হইল। নববর্ষে আর পুরাতনের জের টানা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না। যাঁহারা এ বৎসরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ছয় আনা দিয়াছেন, তাঁহাদের হিসাবে আগামী বর্ষে অর্দ্ধমূল্য জমা করিয়া লওয়া হইবে।

কলিকাতার গ্রাহকগণ বিলম্বে পত্রিকা পান বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করেন। সহরে ভারতী লোকদ্বারা বিলি হয় বলিয়া এরূপ ঘটিয়া থাকে। নববর্ষ হইতে অন্যান্য পত্রিকার ন্যায় ভারতী সহরে মফঃস্বলে সর্ব্বত্র ডাকে পাঠান হইবে। অতএব সর্ব্বস্থানেই ইহার মূল্য ৩।৵ হইল। এখন হইতে বিনিময়পত্র এবং প্রবন্ধাদি [redacted] সম্পাদকের নিকট নিম্নঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। চিঠি পত্র এবং পত্রিকার বাকী ও অগ্রিম মূল্য মনিঅর্ডারে আমার নামে পাঠাইলেই হইবে। যাঁহারা ভি,পি,তে পত্রিকা পাইতে চাহেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া জানাইবেন, নহিলে আমরা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৪৪ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা।

বৈশাখ সংখ্যার লেখকগণ।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

,, প্রমথনাথ চৌধুরী

,, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

,, দীনেশচন্দ্র সেন

,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

,, শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী

,, ,, প্রিয়ম্বদা দেবী

,, ,, সরোজকুমারী দেবী ও সম্পাদিকা

শরতে।

আবার শরৎ এল, গ্রাম-সীমা ভরে গেল
ফল-শস্য-ভরে
আকাশে নীলিমা-হাসি আবার সরমে ফুটে
শুক্ল মেঘ-থরে!
বর্ষাশেষে পাখীগুলি গাহিল প্রমোদ-গান
নব জীবনের,
রৌদ্র-পীত পত্রপুঞ্জে শ্যামলিমা ঝলকিছে
সাড়া পেয়ে নব পবনের!

২

কোমল শিশির-জলে শেফালিকা আঁখিকোণে
ফুটে উঠে ভাষা!
বলে, মৌন শতছলে, ব্যর্থ-জীবনের কথা
দুরাকাঙ্ক্ষ আশা!
সবুজ লতার আড়ে ফুটেছে বেগুনি-ফুল
মুখ-ঢেকে চায়!
রাঙা জবা প্রাণপণে মাধুরী বিকশি' তোলে
ঢেলে দিতে কার্ রাঙা পায়!

৩

মন্দ-স্রোতা ক্ষুদ্রা নদী নাই ত্বরা কল্-কল্
শুধু কুল্-কুল্,
স্নান-শেষে গ্রাম-বৃদ্ধা ভাসাইয়া দেন ধীরে
পূজা-অর্ঘ্যফুল।

নদী শুনে মুগ্ধ কাণে ঘাটে-ঘাটে কল-হাস
বধূর কাঁকণ,
পাড়ার মুখরা মেয়ে পরিহাস করে, যার
প্রত্যাসন্ন পতি-আগমন!

৪

আবার ভিখারী এসে দ্বারে-দ্বারে গেয়ে যায়
আগমনী-গীতি!
সঞ্চারিছে, ধীরে ধীরে, অন্তর্গূঢ় মার বুকে
পুণ্য কন্যা-প্রীতি!
আবার ভক্তের গৃহে ভৈরবী উঠিছে বাজি
সারা বর্ষ পরে,
উঠিছে বোধন-গীতি পূজার মণ্ডপ ভরি
ব্রাহ্মণের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে!

৫

কোলের ছেলেটি নিয়ে বর্ষ-শেষে পিত্রালয়ে
মেয়ে এল ফিরে!
শৈশব-সখীরা এসে প্রশ্ন করে হাসি-হাসি,
চারিদিক্ ঘিরে!
হাসি-মুখে, ছেলে-মেয়ে চলে যায়, দল-বেঁধে
পরি নব সাজ,
আজ বটে এসেছে রে প্রসন্না শরৎ-বধূ
আমাদের শান্ত পল্লী-মাঝ!

৬

চারিদিকে হেরি, ভাই, কি শান্তি, কল্যাণ-ধারা

কি জানি কি বেদনায়　প্রভাত-বাতাসে আজি
নেত্র আসে ভরে !
তবু, আজ, কে বলিবে এ শরৎ, সেই মোর,—
সেই পুরাতন !
যখন সে কাছে বসে,　বলেছিল মৃদু ভাষে,
অশ্রু-আর্দ্র বিনয়-বচন !

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পরাজয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বড়দিনের বন্ধে নীরজা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল ছিলি নিরু! এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? মোহিত ভাল আছে?" সে মুখ ভার করিয়া অভিমানের সহিত উত্তর করিল, "হ্যাঁ।" পিসিমা খুসী হইয়া প্রতিবেশিনীদিগের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রীর গহনা দেখাইয়া ও জামাতার ঐশ্বর্য্যের গল্প করিয়া তাঁহাদিগকে সবিশেষ ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর গহনা-বস্ত্রের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য তাহাকে একটু তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না।

জুঁই আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, "নিরুদিদি, তোমাদের কথা সব বলো, না বল্লে ছাড়বো কি না! আমার কথা সব শুনে নেওয়া হলো, নিজের কথা বলবেনা বুঝি, বাঃ?"

নীরজা ঠাট্টা করিয়া বলিল, "সে তুই শুনে উঠতে পার্ব্বি না; সে সব আমাদের অনেক কথা।" "আচ্ছা, বেশি না হয় কিছুতো বলো?" "এই মিসেস্ রায় তোমায় যেতে অনুরোধ করেছেন, শুনেছ বোধ হয় জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ চিফ্-জষ্টিস্ হলেন, সুরেন্দ্রবাবু কাল যা বল্লেন সে বিষয়ে তোমার কি মত? আমার মতের সঙ্গে খুব মিলে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, আর কিছু শুনবি?" জুঁই হাসিয়া বলিল, "যাও।"

যামিনী অমর দুজনেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ দত্ত যে এলেন না?" "কে জানে"—বলিয়াই নীরজা সামলাইয়া লইল, "তিনি কাপড়ের কল দেখতে গেছেন।"

ছুটী ফুরাইলে নীরজার শাশুড়ি বলিলেন, "বৌমা মহি একলা আছে—আমরা যাই চলো।" "সে বলিল "তুমি তো যাচ্চো, আমি এখন এখানেই

থাকবো, পুষ্প বরং আমার কাছে থাক।" মাতা ফিরিয়া গিয়া পুত্রকে বলিলেন। শুনিয়া পুত্র কহিলেন, "বেশ তো"; এই প্রেমহীন বন্ধন তাঁহার যেন ক্রমেই কষ্টের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। নিজের স্ত্রীকে পরের মতন ব্যবহার করা, আবার লোকের কাছে আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া চলা তাঁহাকে ক্রমশঃই যেন ক্লান্ত করিয়া ফেলিতেছিল। তাই হুদিন জিরাইতে পাইয়া তিনি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন!

কিন্তু সে হুদিনের জন্য মাত্র! হুদিন পরেই এক অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাঁহাকে তাহার দিকে টানিতে লাগিল। সেখানে আর তিনি তিষ্ঠাইতে পারিলেন না। নীরজা তাঁহাকে দেখিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বলিল না; তাঁহার শ্বশুর খুব খুসী হইলেন, শ্যালকেরাও সন্তুষ্ট হইল।

এখানে হুদিন সেখানে হুদিন করিয়া মোহিতকুমারের কাজকর্ম্মের খুব ক্ষতি হইতে লাগিল। কিন্তু স্ত্রীকে তো কিছু বলিতে পারেন না, কেননা মহাভারতের শান্তনু রাজার মত তিনি স্ত্রীকে যে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নিজেকে নীচু করিয়া ফেলিতে তাঁহার অপমান বোধ হয়! আর যে স্ত্রী স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিল না, তাহার কাছে আবার কিসের জন্য লাভ-লোকসানের হিসাব দাখিল করা! কাজেই মুখ বুজিয়া ক্ষতি সহ্য করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া কয়-মাস কাটিয়া পূজার বন্ধ আসিয়া পড়িল, তিনিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যতীন্দ্রনাথের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল! তিনি এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে লক্ষ্মণপুরে বাটি কিনিয়াছেন। বেশভূষারও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই অমরনাথের বাসায় ও নীরজার পিত্রালয়ে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তিনি পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় রাজেন্দ্রনাথের চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

একদিন মোহিতকুমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাকরেরা দেখলেম

পশ্চিমের ঘর সাফ করচে, বল্লে মেমসাহেব হুকুম দিয়েছেন ; একজন বাবু আসবেন। কে আসবেন জানতে পারি কি ?”

নীরজা হস্তস্থিত বোনার প্যাটার্ণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এক কাঁটা হইতে অন্যে তুলিতে তুলিতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিল, “যতীন্দ্র বাবু।”

অকস্মাৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া মোহিত বলিয়া উঠিলেন, “কেন, আমার বাড়ী তিনি কেন ?” নীরজা যথেষ্ট সংযতভাবে হাতের কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল, “কেন আসতে নেই ? দিন আষ্টেক থাকবেন বল্লেন, বারণ করতে তো পারি না। প্রতিবার অমর দাদার বাড়ী আসতে তাঁর লজ্জা বোধ হয়, তাই—”

রুষ্ট বিদ্রূপের সহিত মোহিতকুমার দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “তাঁর যদি লজ্জা থাকতো তাহলে তিনি এখানে মুখ দেখাতেন না, আর তুমিও তাঁকে—” সক্রোধে মুখ তুলিয়া নীরজা গর্জ্জিয়া বলিল, “দেখো তুমি আমায় মিথ্যে অপমান করো না, তোমার অমন ছোট মন কেন ? আমার ছোট বেলার বন্ধুকে যদি আমি দুদিন আমার বাড়ি নিমন্ত্রণই করে থাকি আর সে ভদ্রলোকও যদি নিজে আমার অতিথি হইতেও বা চায়, তাতে উভয়তঃ নির্লজ্জতা তুমি কি দেখলে শুনি ? তাঁর মতন ভদ্র যদি তুমি হতে তাহলে রক্ষা ছিল না ; তিনি তোমার করেছেন কি যে তুমি তাঁকে দেখতে পার না ?” “সবাই কি সবাইকে সমান চোখে দেখে ? একজন হয়তো যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, আর একজন হয়তো তাকে ঘৃণা করে চেয়েও দেখে না।”

“যতীন্দ্রবাবুর জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝি নিজের পূর্ব্বাবস্থা মনে পড়ে, তাই তাঁকে দেখতে পার না ?” তীব্র শ্লেষের সহিত মোহিতকুমার হাসিয়া উঠিলেন, “ওঃ অমন বড়লোকের ছেলে হয়ে না জন্মে দরিদ্র ঘরে জন্মাতে

নীরজা নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। পরে বলিল, "কিন্তু আমি যে তাঁকে আটদিন থাকবার মত দিয়েছি সে কথা এখন আমি কেমন করে ফেরাবো ? আমার লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না।"

সে কথার উত্তর না দিয়া মোহিতকুমার দৃঢ়ভাবে কহিলেন, "নীরজা! আমি বলচি তাঁর এখানে আটদিন থাকা হবে না। একদিন, একবেলা, একঘণ্টা, যত অল্প হয় ততই মঙ্গল, কোনমতেই বেশীক্ষণ হতে পারে না। তোমার কাজের উপর কথা কইতে আমার ইচ্ছা হয় না, আমি সহজে কইওনা, তাকি তুমিও বুঝতে পার না ? কিন্তু সেই যে কুক্ষণে কয়টা মন্ত্র পাঠ করেছিলুম, তারই জন্য সময়-বিশেষে চুপ করিয়া থাকা চলে না, তাই বল্‌তে হচ্চে যে যতীন ঘোষ আমার বাড়িতে আট-দিন থাকতে পাবেনা, কিছুতেই না—"

নীরজা স্বামীর সজোর আপত্তির বিরুদ্ধে বেশি তর্ক-বিতর্ক করা যুক্তিসঙ্গত নয় বুঝিল; সে মুখ নিচু করিয়া মনের উচ্ছ্বসিত ক্রোধ ও অভিমান রোধ করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "আমি বল্‌তে পার্ব্বো না, আমি তো জানতেম না, যে এ বাড়ীতে আমার কোন অধিকার নেই, তাহলে"—এ কথার যে সহজ উত্তর ছিল, সে কথা না তুলিয়া মোহিত-কুমার কহিলেন, "আচ্ছা না হয় আমিই বলবো এখন, যে কাল হঠাৎ আমায় কল্‌কাতায় যেতে হবে। কি বলো ?"

"যা ভাল বোঝ করো, আমি কি জানি—" বলিয়া সে রুদ্ধ রোষে হাতের বোনা ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া চোখের জল চাপিতে চাপিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শরতের মেঘে দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে না পড়িতেই থামিয়া গিয়া অস্তগমনোদ্যত সূর্য্যের ঝিক্‌মিকে রশ্মি প্রকাশ হইয়া পড়িল। বৃষ্টির জল গাছের পাতা হইতে টুপটাপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! তেমনি করিয়া বোঁটাখসা সিউলীফুল খসিয়া পড়িয়া গাছের তলায় যেন হল্‌দে ফুলকরা সাদা চাদর বিছাইয়া দিয়াছিল! বৃষ্টির জন্য এখনও পাড়ার মেয়েরা আসিতে পারে নাই, এখনি তাহারা ছোট ছোট ডালা হাতে লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া ছোট ছোট হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ঝুরো-ফুল কাপড় রং করিবার জন্য কুড়াইয়া লইয়া যাইবে!

মোহিতকুমার, যতীন্দ্রনাথ আসিবার কিছু পরেই কোথা বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন; নীরজা উত্যক্ত মনে রাগে রাঙা হইয়া কোনমতে অতিথিসৎকার করিতেছিল, তাহার মনে আর সে উৎসাহ ছিল না। বৃষ্টি থামিলে যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এসো আমরা বাগানে একটু বেড়াইগে— মিষ্টার দত্ত বাগানটার খুব উন্নতি করেছেন যে দেখচি।"

নীরজা নিরুদ্যম-ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল। যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল,—"আমি তোমায় আপনি বলতে পারি না বলে কি তুমি বিরক্ত হও? আমার মুখে আপনি বল্‌তে আটকে যায়। চিরকালের অভ্যাস, তাই তুমি বলে ফেলি, কিন্তু যদি তুমি পছন্দ না কর, তাহলে আপনি বলতে চেষ্টা করবো, কি বল মিসেস্ দত্ত!"

নীরজার আকণ্ঠ-ললাট লাল হইয়া উঠিল। সে ধীরেধীরে উত্তর করিল, "না, আমি আপনি বলা পছন্দ করি না, আমাদের তো আজকের দেখা প্রথম নয় যতী বাবু! চিরপরিচিতের কাছে অপরিচিত ব্যবহার কি কেউ ভালবাসে?" বলিয়াই পূর্ব্ব-কথা-স্মরণে তাহার গোলাপি গণ্ড আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কথা বদলাইবার চেষ্টায় নিরুৎসাহ মনেও

উৎসাহ আনিবার চেষ্টা করিয়া একটা ফুটন্ত গোলাপ ছিঁড়িয়া লইয়া সাগ্রহে কহিল, "দেখ যতীবাবু এ ফুলটা কত বড় হয়েচে!"

ফুল লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া বুকের বোতামে গুঁজিয়া যতীন্দ্র নাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, "এই গাছের প্রথম ফুল ফুট্‌তে আমি তোমায় তথনি গিয়ে দিয়ে আসি, মনে আছে?"

আবার সেই পূর্ব্ব-কথা! আবার সে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া সে আপাদমস্তক-পুষ্প-খচিত কামিনী গাছের একটা শাখা নাড়া দিয়া তাহা হইতে বৃষ্টির জল ও ফুলের পাপড়ি-ভাঙ্গা ঝরাইয়া ফেলিল; "চলো আমার Conservatory তে বেড়িয়ে আনিগে, যাবে?"

"যাবো বই কি, এসোনা—বাঃ বেশ সুন্দর হয়েচে তো এটি—এটা কি ফুল? এ পাতাটার তো বেশ বাহার! মিসেস দত্ত, তোমরা কাল কলকাতা যাচ্চো?"

যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ নীরজাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়া তাহার উত্তর আশা করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। নীরজার মন হইতে অল্পে অল্পে যে বিরক্তির দাগ মুছিয়া আসিতেছিল, এই কথায় তাহা আবার প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার প্রসন্ন ললাটে রেখা টানিয়া দিল। সে বুঝিল স্বামী অতিথিকে এ কথা বলিতে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন নাই। ঈষৎ তীব্রভাবে উত্তর করিল, "কে জানে—"! চতুর যতীন্দ্রের ব্যাপার বুঝিতে বাকি ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা জান না সে কি রকম কথা? আচ্ছা মিসেস্ দত্ত, তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না?"

"না, মোটেই না।" স্বামীর আজিকার ব্যবহার নীরজার অঙ্গে কাঁটার মত ফুটিতেছিল। তিনি যে তাহার নিমন্ত্রিত বাল্য-বন্ধুকে এমন অবহেলার সহিত, অপমানের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন, ইহাতে সে

"নিরজ! আমি তোমার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত! আমারও সেই সন্দেহ ছিল, কিন্তু সাহস করিয়া একথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই! কিন্তু ছোটবেলা থেকে যে তোমার খেলার-পড়ার-সুখের সঙ্গী ছিল, আজ কি সে তোমার দুঃখে একটু সহানুভূতি জানাতে পারে না?" নীরজার হৃদয়োত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে বাহিরের বাতাসে মিশাইয়া গেল। "যতীবাবু! আমি তোমায় প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু একজন।"

যতীন্দ্রনাথ নীরজার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি আমার কথা মনে কর? তবে তুমি আমায় ভোলনি? আমায় চিরকাল কি মনে থাকবে নিরো! না দুদিন পরে আমায় ভুলে যাবে?"

নীরজা দোদুল্যমান লতা হইতে একটা ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া সেটা ছিন্ন করিতে করিতে উত্তর করিল, "সংসারে এমন কি আমি পেয়েছি যে তোমাদের মতন বন্ধুদের ভুলে যেতে পারি! অমর দাদা ও তোমাকে আমি দাদার মতনই প্রায় সমান চোখে দেখি। সকল সময়েই আমি তোমার কথা মনে করি—"

যতীন্দ্রনাথ আরো একটু কাছে আসিয়া তাহার একটী হাত ধরিল, "নিরো নিরো! মিষ্টার দত্ত আমাদের চিরদিনের আশা ভঙ্গ করে দেবার জন্য কোথা থেকে আমাদের মাঝখানে দস্যুর মত এসে পড়ে আমাদের দুজনকে ছিন্ন করে দিলে! আমাদের জীবন চিরকালের মতন দুঃখের—"

এক-মুহূর্ত্ত নীরজা স্থির হইয়া রহিল! কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে ভাব চলিয়া গেল; হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "তোমার কি রকম সাহস! এ কি—"

মধুরস্বরে কহিল—“সাহস, হাঁ নিরো, আমাদের ভালবাসাই আমাকে সাহস দিয়াছে। ওঃ নিরো! শুধু আমাদের ভালবাসা—”

একটা উত্তপ্ত রক্তস্রোত নীরজার মাথার ভিতরে ঢেউয়ের মত আছড়াইয়া গিয়া পড়িল। তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। “আমাদের ভালবাসা, ছি ছি যতীবাবু! ছি ছি, আমি স্বপ্নেও—”

“হাঁ, আমাদের ভালবাসা,” কম্পিত নিশ্বাসে সে বলিল, “নিরো আমি তোমার”—“তুমি আমায় নিরো বলোনা, আমি মিসেস্ দত্ত। নিরো বলবার অধিকার তোমার নেই।” নীরজা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল—

“যখন তুমি ওকথা বলতে সাহস করেচো, তখন দেখচি একটা মস্ত ভুল মনে পুষে নিজের স্পর্দ্ধা বাড়াচ্চো! আমি এক-সময় তোমাকে পছন্দ করেছিলুম বটে, এখনও করতুম, সে তোমায় ভাল ভেবে, বন্ধু ভেবে! কিন্তু এখন,” গর্ব্বিতভাবে মাথা তুলিল—“বুঝেছি যে তুমি কি, তুমি কত নীচ, আমার ভালবাসা আমি যাঁকে দিয়ে—” যতীন্দ্রের মুখে একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ পাইল,—“তিনি কে? তোমার স্বামী অবশ্যই নন?” নীরজার দিকে চাহিয়া সে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল।

ক্রোধে নীরজার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাগে-দুঃখে মনে পড়িল, স্বামী কত করিয়া তাহাকে ইহার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! নহিলে সে-তো ইহাকে দেবচরিত্র জানিয়া মনে মনে বরণ করিয়াই-ছিল সে-ত দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিলেও ইহাকেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিল! তিনিইতো নিজে কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাহাকে চিরদিনের সে দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! আজও আবার এই অপমান হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে আসিয়া নিজেই অপমানিত হইয়া গিয়াছেন! কি স্বামীকে সে কি অগ্রাহ্য করিয়া চাহিয়া দেখে নাই! উত্তর দিল,

ঈর্ষায় যতীন্দ্রের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, "তোমার ক্রেতা, তোমার প্রভু মোহিত দত্ত!" উদ্যত-ফণা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীরজা দ্বারের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল, "যাও, তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও, তাঁর বাড়ীতে বসে কি সাহসে তাঁর অপমান করচো? তিনি তোমায় চেনেন, তাই তোমায় বাড়ী ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমায় চিনতেম না, তাই এই—"

"আমি তোমার প্রভুকে উল্লেখ-যোগ্য বলে মনেও করি না; তার কথায় আমার কি দরকার? সে তোমার স্বামীই হোক্ আর প্রভুই হোক্ তুমি তার স্ত্রীই হও আর ক্রীতদাসীই হও, সে খোঁজে আমার আসে যায় না; আমি তোমার ভালবাসা তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি, পূর্ব্বের একটু স্মৃতিমাত্র মনে করিয়ে দিতে চাই। দত্ত এসে কেড়ে না নিলে ত তুমি আমারি হতে।" সভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া নীরজা সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, তমি এখনি দূর হও! নিজের অপমান আমি নিজেই ঘটিয়েছি। কোন সাহসে তুমি আমাকে এমন কথা বলতে পারলে? আমি এখন অন্যের স্ত্রী, তুমি এখন আমার কে? শুধু ছোট-বেলার সঙ্গী বলে মায়া হয়, স্নেহ হয়, তাই থেকে এতদূর হবে তা আমি—ঈশ্বর জানেন,—আমি স্বপ্নেও জানিনা—"

যতীন্দ্র আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া আবেগের সহিত বলিল—"নিরো, নিরো, পায়ে ধরি আমার উপর রাগ করো না, যেওনা, আমায় যেমন ভালবাসতে তেমনি বেসো, আমি তার চেয়ে বেশী চাইবো না। কিন্তু তুমি একেবারে নিষ্ঠুর হলে আমি বাঁচবো না—"

"কি, আমি তোমায় ভালবাসতেম? কখনো না, কখনো না—ছেড়ে দাও আমার হাত! চুপ কর তুমি এ জন্মে আর আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বার কথা কইবার চেষ্টা করো না—"

করিয়া নীরজা ছুটিয়া লতাগৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে নিজের শয়ন কক্ষে আশ্রয় লইল।

জল দিয়া, সাবান দিয়া, নিজের দুই হাত বারবার করিয়া সে ধুইয়া মুছিল। স্পর্শের কালিমা যেন সেই শুভ্র অকলঙ্ক হাতে দাগ মাখাইয়া দিয়াছে! থাকিয়া থাকিয়া সেই নির্জ্জন গৃহে তাহার পাণ্ডু কপোল আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল!

নবম পরিচ্ছেদ!

নীচের ঘড়িতে আটটা বাজিয়া যাইবার পর অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল, ও পরক্ষণে তাহার গৃহদ্বারে আঘাত পড়িল। নীরজা বিস্মিত হইল। উঠিয়া বসিয়া কাপড়-চোপড় ভাল করিয়া গুটাইয়া লইয়া বলিল, "এসো।" বলিয়াই চমকাইয়া উঠিল, যতীন্দ্রনাথ নয়তো! নাঃ এত সাহস কি কখনো তার হতে পারে? দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, আগন্তুক তাহার স্বামী!

রাত্রে নির্জ্জনে স্বামীর সহিত তাহার এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ! সে সভয়ে দেখিল, তাঁহার মুখ অসাধারণ গম্ভীর! তিনি ভিতরে আসিয়া পর্য্যঙ্কের অনতিদূরে দাঁড়াইলেন; "তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। শোনবার সময় হবে কি?"

কথার স্বরেও ভাবে নীরজা ভীত হইল, কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "কি বল?"

তিনি তাহাকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি আমায় কিছু বলবার আছে?"

"না, না"—ভয়ে লজ্জায় নীরজা যেন একেবারে মরিয়া গেল। সে দৃশ্য ইনি কি তবে দেখিয়াছেন? ছি ছি, কি ঘৃণা, কি লজ্জা! সে কি করিয়া এ লজ্জাকর ব্যাপার তাঁহাকে জানাইবে, তাহা এতক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না; কিন্তু যখন সে সুযোগ উপস্থিত হইল,

তখন ঘোর লজ্জায় যেন তাহার মাথা মাটিতে মিশিয়া গেল। আচমকা বলিয়া ফেলিল, "না, না।" মোহিতকুমার তাহার আরক্ত মুখের দিকে নির্দ্দয়ভাবে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তেমনি নিষ্ঠুর স্বরে কহিলেন,—"কিছুই বলবার নাই? বেশ! আমি কল্‌কাতা যাচ্চি; কাল সেখান থেকে মুসৌরি যাবো; তোমার ইচ্ছে হয় এখানে থেকো, ইচ্ছে হয় বাপের কাছে গিয়ে থেকো, আমার সঙ্গে আর তোমার বাহ্যিকও কোন সম্পর্ক রাখবার প্রয়োজন নাই! সে কষ্ট থেকেও আমি তোমায় আজ থেকে মুক্তি দিতে চাই। আমার এই বাড়ী আমি তোমায় দানপত্র লিখে দিব, আর একশত টাকা মাসিক তুমি পাইবে।"

মোহিতকুমার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। নীরজা ঘোর লজ্জা, ততোধিক ভয়ের তাড়নায় সরিয়া গেল। সে খাট হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল,—"না না, তুমি যেও না, আমায় একলা ফেলে যেওনা—"

মোহিতকুমার হাত ছাড়াইয়া লইলেন, মুখ ফিরাইয়া শ্লেষের সহিত রুষ্টভাবে কহিলেন, "একলা কেন? যতীন্দ্র ঘোষকে আটদিন ছাড়িয়া আট মাস এখানে আনিয়া রেখো! আমার সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধ নাই—"

"না না! আমায় এখানে একলা ফেলে যেওনা, তোমার পায়ে ধরি,—তোমার পায়ে ধরি আমায় নিয়ে যাও—"

চিরগর্ব্বিতা নীরজা স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আমায় পায়ে ঠেলোনা, একবার যখন পায়ে স্থান দিয়েছিলে, তার হাত থেকে রক্ষা করেছিলে, তখন আজ আবার আমার সব দোষ দয়া করে ক্ষমা করো! আমায় স্ত্রী বলে না নাও, দাসী বলে পায়ে স্থান দাও, ফেলে যেওনা—"

কেন, আমিতো তোমায় বুকে স্থান দিয়েছিলেম, তুমি নিষ্ঠুর আঘাতে সে বুক ভেঙে চূর্ণ করে দিয়েছ। বোঝনি কি, সে অবহেলা আমার ততো ভালবাসার পরিবর্ত্তে আমায় কি-রকম নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করেচে ? তাও কষ্টে সয়েছিলাম, কিন্তু নীরজা, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর্ত্তে হয়েচে, সে যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়, তা'হলে কেমন করে তা সহ্য করা যায় ! আমার স্ত্রী যতীন ঘোষকে—"

কম্পিত হস্তে লজ্জিত মুখ ঢাকা দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে নীরজা বলিয়া উঠিল, "দয়া করো, একটু দয়া করো ! যদি সব দেখে থাকো তাহলে দেখেচো তো আমি কতোটুকু দোষী ? আমি তোমার কাছে অবশ্য অপরাধিনী, কিন্তু তা বলে উঃ ! অমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলো না ! আমি তাকে চিনতেম না, ছোটবেলার বন্ধু বলে বড়ই বিশ্বাস কর্ত্তাম !"

"নীরজা ! আমি তোমার ভালবাসা না পেয়েও তোমায় শ্রদ্ধা করতেম, বিশ্বাস করতেম, কিন্তু আর তা নেই ! যখন প্রথম এসে আমি তোমায় জিজ্ঞেস করলেম, আমায় কিছু বলবার আছে কি না ? তুমি কেন "না" বল্লে ?"

নীরজা দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "আমি —আমি লজ্জায় হঠাৎ বলতে পারছিলাম না, ঈশ্বর জানেন তুমি না জিজ্ঞেস করলেও আমি তোমায় লুকিয়ে রাখতাম না ! তা না হলেও তুমি কি নিজেই আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাও নাই ?"

মোহিতকুমার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। পরে গম্ভীর-স্বরে ডাকিলেন,—"নীরজা !" নীরজা তাহার অশ্রুপ্লাবিত করুণ মুখ তুলিয়া দীন-নেত্রে তাহার কঠিন অবিচলিত-হৃদয় বিচারকের পানে তাকাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

মোহিতকুমার নিকটস্থ একখানা সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন।

কি তোমায় আমি বারণ করিনি ?" নীরজা নতমুখে উত্তর দিল, "হাঁ—" "তবে ? তবে তুমি নিজেকে নিরপরাধিনী বলে কিসে প্রমাণ কর্‌তে চাও ?" নীরজা আবার ভূমে পড়িয়া স্বামীর পা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল, কহিল,—"ক্ষমা করো, আমি তোমার উপর রাগ করে তোমার আদর্শ হীন করে যাকে বন্ধু ভেবেছিলাম সে তার উচিত পুরস্কার দিয়েচে ! না হলে আমি তোমার স্ত্রী, কার সাধ্য আমায় এমন অপমান করে ? নিজের অল্পবুদ্ধিকে বেশী ভেবে আমি এই করেছি। আমি তোমায় চিনিনি ! আমার পাপের শাস্তি হয়েচে—"

মোহিতকুমারের মুখের ভাব নরম হইয়া আসিল ; "ওঠো নীরজা, শোন, তোমার বাবার কাছে শুনে তখনি আমি বুঝেছিলাম যতীন ঘোষই খাজনার টাকা ও কলের টাকা চুরি করেছে। তারপর সেই টাকায় তোমার বাবার সব সম্পত্তি কিনে নেবে বলে খাজনার জন্য সময়ে খপর দেয় নাই। তোমার বাবারও সেই সন্দেহ হয়, আর তিনি সেইজন্য তোমার এই সূত্রে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক হন। যতীন ঘোষের উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস তুমি যদি আপত্য করো সেইজন্য আমাকে দোষী করেছিলেন। যাহোক এতদিনের চেষ্টায় আমি সব প্রমাণ-পত্র যোগাড় করেছি, দু তিন দিনের মধ্যেই যতীন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হবে ; সেইজন্য তোমায় তাকে বাড়িতে আনতে বারণ করেছিলেম—"

শুনিয়া সর্পদষ্টের মত নীরজা আড়ষ্ট হইয়া রহিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার মস্তক স্বামীর পায়ের উপর নত হইয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া মোহিতকুমার পদলুণ্ঠিতা পত্নীকে উঠাইয়া শোয়াইয়া দিলেন। পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে সে সামলাইয়া লইয়া চোখ চাহিল। স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই তাহার চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মোহিতকুমার ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "কেঁদোনা" !

নীরজা উঠিয়া বসিয়া করুণ চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিল, সকাতরে বলিল, "আমায় ক্ষমা করতে পারবে?" মোহিতকুমার মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "যদি চাও তো কেন কর্ব্বোনা?" নীরজা আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি প্রাণের সঙ্গে ক্ষমা চাইছি। আমায় বিশ্বাস কর্ব্বে? বলো, আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস নেই? বলো, তুমি আমায় সত্য-সত্যই অবিশ্বাস করোনি?"

মোহিতকুমার মৃদু আবেগের সহিত উত্তর করিলেন, "তা করলে নীরজা, বোধ হয় আমি এতক্ষণ বাঁচতুম না, বোধ হয়—"

"আঃ, আমি বাঁচলেম। তবে আমায় ক্ষমা করলে?"

"হাঁ"; নীরজা কাছে আসিয়া তাঁহার হাত নিজের কম্পিত হস্তে ধারণ করিল, "আমায় ভালবাসিবে?" মোহিতকুমার চেষ্টার সহিত হৃদয়ের প্রবল আবেগ রুদ্ধ রাখিয়া ঈষৎ-ব্যথিত ঈষৎ অভিমান-জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তুমি তো আমার ভালবাসা চাওনি, নিরু! বড় আদর করে সেদিন যখন আমার প্রেমপুষ্প নিয়ে তোমার কাছে—" "আর যদি আমি এখন ভিখারীর মত তোমার পায়ে ধরে তোমার ভালবাসা ভিক্ষা করি—যদি আমি সেদিনকার অনাদৃত আদর নিজে যেচে সেধে বুকে তুলে নিই, তাহলে আর সে—"। "তাহলে? তাহলে আবার আমি সব ভুলে যাই! আমার লাঞ্ছিত হৃদয় সমস্ত অনাদরের সমস্ত অপমানের ব্যথা ভুলে গিয়ে আদর করে আবার নীরজা—"

নীরজা স্বামীর কথায় সাগ্রহে বাধা দিল। "না আমায় নীরজা বলোনা, তেমনি করে নিরো বলে ডাকো। যদি ক্ষমা করে থাক, তবে এ ব্যবধান রাখবে কেন?"

"তুমি আগে বলো তাহলে সত্যই তুমি এখন আমায় ভালবাসো? আমার তাহলে সে কথা মনে পড়ে সেদিন দুঃসাহস হয়নি? মনে আছে কোন কথা? সেই ভালবাসার কথা!"

নীরজা সজল চক্ষু তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল, "এখনও সন্দেহ কচ্চো? এখনও আমায় বিশ্বাস হয়নি? তবে আর কখনো আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে ভালবাসতে পার্ব্বে না?"

প্রবল আবেগের সহিত তিনি নীরজার হাত ধরিলেন, "নিরো তবে আমারি জিৎ? এ সর্ত্তটা দেখচি আমার বজায় রইলো?"

লজ্জায় লাল হইয়া নীরজা স্বামীর অঙ্কে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট মৃদুস্বরে কহিল, "আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই নিজের মনও এতদিন বুঝিনি! তোমায়ও কষ্ট দিয়ে নিজেও কষ্ট পেয়েছি। আমারি কি কোন স্বস্তি ছিল? চোখের মোহ যে প্রেম নয় তা এবার বিলক্ষণই বুঝতে পেরেছি"। "নিরো! নিরো! তা হলে আমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত—"

"আঃ! তুমি কেবলি আমায় লজ্জা দেবে?" এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্নেহের বাহু সে সগর্ব্বে কণ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আজ স্বেচ্ছায় পুষ্পমাল্যের মত আদর করিয়া সে সেই বাহু-বন্ধন নিজেই কণ্ঠে তুলিয়া লইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমি তো হার মান্‌চি; আজ থেকে আমি তোমার চির-বিশ্বস্তা পত্নী, চির-স্নেহার্থিনী দাসী—" মোহিত-কুমারের জ্যোতি-বিস্ফারিত নেত্রে যেন জয়ের আনন্দ ফুটিয়া উঠিল!

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

———০———

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য।

নবম অধ্যায়।

They (the Portuguese) boldly struck into the wars and intrigues of the native Princes from Africa to the Moluccas, securing substantial returns for their support and finding in each dynastic claimant, a stepping-stone to power.—*Sir. W. W. Hunter.*

ফিরিঙ্গি বণিকগণ যত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে যেরূপ প্রতি-পত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস হয় না! মনে হয়, ফিরিঙ্গি বণিকের বিজয়লাভ ও প্রতিষ্ঠা বুঝি একটা কাল্পনিক উপকথা-মাত্র—ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাস বুঝি একখানি উপ-ন্যাস-মাত্র, কঠোর সত্য নহে! কিন্তু ফিরিঙ্গির ইতিহাসই আমাদিগকে প্রথমে দেখাইয়া দিয়াছে যে আমরাই আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি, আমরাই আমাদিগের 'মণিময় রম্য হর্ম্ম্য উপাড়িয়া' ফেলিয়াছি, আমরাই আমাদিগের বিরুদ্ধে কৃপাণ ধরিয়াছি—ধর্ম্মের বন্ধন মানি নাই, আপনার দেশকে চিনি নাই, নিজের ইষ্টানিষ্ট ভাবি নাই! সিংহ স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছে, শৃঙ্খল পরিয়াছে—নহিলে কাহার সাধ্য যে তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে!

ফিরিঙ্গি বণিক যখন এদেশে প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহাদিগের সঙ্গে মুষ্টিমেয় যুদ্ধার্থী ছিল মাত্র। সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাধ্য ছিল না যে তাহারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করে; তাহারা হয়ত ফুৎকারে উড়িয়া যাইত! কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিক এখানে আসিয়া এদেশীয়-দিগকে

আপনাদিগের সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত করিয়া লইল। ১৫০৪ খৃঃ অব্দে ফিরিঙ্গি পাকিও যখন কোচিনের যুদ্ধ করেন, তখন তাঁহার দলে ১৫০ ফিরিঙ্গি ও ৩০০ মালাবারী সৈন্য ছিল। এই মালাবারী সৈন্যই সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে! ১৫১০ খৃঃ অব্দে আল্‌বুকার্ক যখন গোয়া-বিজয়ের চেষ্টা করেন তখন তাঁহার অধীনে দুইশত জন মাত্র এদেশীয় সৈন্য ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে সেই গোয়া-রক্ষার্থ যুদ্ধে তাঁহারই অধীনে এক-সহস্র দেশীয় সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছিল—গোয়ায় ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠার জন্য অকাতরে আত্মবলি দিয়াছিল! অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বজনের কণ্ঠে শাণিত কৃপাণ বসাইয়া দিয়া তাহার শোণিত পান করিয়াছিল! গোয়ার সৈন্যই আল্‌বুকার্কের প্রধান ভরসা ছিল। আল্‌বুকার্ক যখন গোয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার অধীনে এক-সহস্র-মাত্র ফিরিঙ্গি সৈন্য ছিল, কিন্তু এদেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল দুই সহস্র!

এদেশীয় সৈনিকদিগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য পর্ত্তুগীজগণ কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল কিনা, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে ইতিহাস-পাঠে শুধু এইটুকু জানিতে পারি যে কি জলযুদ্ধে অথবা কি স্থলযুদ্ধে সেকালে আসিয়া-নিবাসী সৈন্যগণই পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান ভরসা ছিল! ১৫১৩ খৃঃ অব্দে যখন আল্‌বুকার্ক আদেন আক্রমণ করেন তখন তাঁহার সঙ্গে ১৭০০ ফিরিঙ্গি ও ৮৩০ দেশীয় সৈন্য ছিল। দুইবৎসর পরে যখন তিনি হরমুজে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন ৭০০ দেশীয় সৈন্য তাঁহার পতাকানিম্নে সমবেত হইয়াছিল। জলযুদ্ধের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ফিরিঙ্গি সর্দ্দার সোয়ারেজ যখন ১৫১৬ খৃঃ অব্দে লোহিত-সাগরে গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত ৮০০ ভারতবর্ষীয় নাবিক ছিল, এতদ্ভিন্ন ৮০০শত সৈন্যও ছিল! এ-দেশীয় সৈনিকগণ প্রতিনিয়তই ফিরিঙ্গিদিগের দলপুষ্টি করিত। অশ্বারোহী সৈনিক-বিভাগে

এদেশীয় সৈনিক ছিলনা—এদেশীয়গণ সেকালে কেবল পদাতিক সৈন্যেরই কার্য্য করিত।

তখন ভারতবর্ষে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। ফিরিঙ্গিগণ সেই দাস ব্যবসায়-লব্ধ এদেশীয়দিগকে সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত করিত। সেকালে চারি শিলিং (তিন টাকা) হইলেই বাঙলায় একজন দাস ক্রয় করিতে পারা যাইত—একটী সুন্দরী যুবতী লাভ করিতে হইলেও তিন টাকার অধিক লাগিত না! তাই আমরা দেখিতে পাই যে ১৫৩০ খৃঃ অব্দে যখন নানো ডা কুন্‌হা এদেন-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই বিপুল বাহিনী-মধ্যে ৮০০০ দাস নিযুক্ত ছিল! * কিন্তু কালক্রমে ফিরিঙ্গি ঔপনিবেশিকগণ অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী পদাতিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বিচক্ষণ আলবুকার্ক আলেকজান্দার বা হাসিল্‌কারের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া এদেশীয় রমণীদিগের সহিত ফিরিঙ্গি পদাতিকদিগের পরিণয় ঘটাইতেন। লিসবন-রাজকোষ সেই সকল নববিবাহিত দম্পতীদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্যও করিত। এইরূপে ক্রুশের ধর্ম্মও প্রতিদিন বিস্তৃতি-লাভ করিতেছিল। ধর্ম্মযাজকগণ এই প্রথার একান্ত অনুকূল ছিলেন; এবং এইরূপে-পরিণীত ব্যক্তিগণই অধিক সময়ে রাজানুগ্রহ লাভ করিত।

কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ফিরিঙ্গিগণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ক্ষুধা সর্ব্বদাই বিচক্ষণ মন্ত্রীর ন্যায় কার্য্য করে। সেই ক্ষুধা শেষে এই সকল অসবর্ণ দিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুর জলদস্যুর দলে আশ্রয় প্রদান করিল। তাহারা তখন পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিদিগের নিকট আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিয়া লুণ্ঠনব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া পড়িল!

ফিরিঙ্গিগণ সর্ব্বদা তাহাদিগের রণপোতের উপরই নির্ভর করিত।

* Portuguese in India. *Danvers.*

ফিরিঙ্গির রণপোতই তাহাদিগকে ভারত-বাণিজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট করিয়া তুলিয়াছিল। পর্ত্তুগাল হইতে যে সকল জাহাজ আসিত, সে সমুদয় ভিন্নও গোয়া এবং দামনে সুন্দর ও সুদৃঢ় জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া ফিরিঙ্গির শক্তি বৃদ্ধি করিত। এমন কি, কনষ্টান্‌টাইনা নামে একখানি এদেশীয় অর্ণবযাণ সপ্তদশবার উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়াছিল এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরিয়া অতিশয় সুদৃঢ় অর্ণবপোত বলিয়া পরিচিত ছিল! *

ফিরিঙ্গিগণ এসিয়ার উপকূলে পঞ্চদশ সহস্র মাইল স্থান অধিকার করিয়া বিচরণ করিত। সুতরাং যে কোন স্থান হইতেই তাহারা শত্রুদমনে অগ্রসর হইতে পারিত। সুবিশাল অনন্ত সমুদ্র সর্ব্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করিত। সেই সাগরের আশ্রয়ে থাকিয়া ফিরিঙ্গিগণ মেঘনাদের ন্যায় যুদ্ধ করিত, শত্রুদিগকে পরাজিত করিত, আবার তিলমাত্র অসুবিধা বুঝিলেই দিক্‌চক্রবালের সান্নিধ্যে অনন্ত নীলিমামধ্যে লুক্কায়িত হইত! তাহারা যেখানে যুদ্ধে জয়ী হইত, সেইখানেই দুর্গনির্ম্মাণ করিত, দুর্গ সুরক্ষিত করিত এবং কোথাও অমানুষিক অত্যাচারে, কোথাও বা ভীতিপ্রদর্শনে, এ দেশীয়দিগকে বশীভূত করিয়া অধীনতা-পাশে বদ্ধ করিত! লোহিত-সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া একান্ত পূর্ব্বের দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানই ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত ছিল। তাহাদিগের দুর্ণিবার্য্য গতি রোধ করিতে পারে এমন শক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না! ফিরিঙ্গির নৃপতি ভারতবর্ষের তীরবর্ত্তী প্রতি বন্দর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একটী হইতে অপরটীর দূরত্ব, প্রতি বন্দরে জাহাজ ভিড়াইবার সুবিধা ও অসুবিধা প্রভৃতি সকল তথ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন; আফ্রিকা হইতে চীন এবং চীন হইতে জাপান পর্য্যন্ত কোন স্থানই পর্ত্তুগালের তীক্ষ্ণ পরীক্ষা হইতে

---

* এ দেশীয় রণপোতের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে লেঃ কঃ ওয়াকারের Considerations on the affairs of India দেখ।

অব্যাহতি পায় নাই। এই সকল তথ্য শেষে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিষ্ঠার পথে একান্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাহারা অবিলম্বে বুঝিয়াছিল যে লোহিত-সাগরের মুখে, সিংহলের সিংহদ্বারে এবং মালাক্কা প্রণালী-মুখে সতর্ক প্রহরী রাখিলেই এসিয়ার বাণিজ্য চিরদিনের জন্য পর্ত্তুগালেরই পদানত থাকিবে। ফিরিঙ্গিদিগের সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। দুর্গে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, সমুদ্র-মধ্যে অসংখ্য রণপোত ছিল—সেই সকল পোত হইতে অগ্নিমুখ কামান ডাকিয়া উঠিয়া শত্রুহৃদয় বিকম্পিত করিয়া দিত; ইহার সহিত তাহাদিগের সাহসও আবার অতুলনীয় ছিল। ফিরিঙ্গিগণ কৌশলে যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—সাহস-বলে তাহা সম্যক রক্ষাও করিয়াছিল। কেবল কৌশল-বিস্তারে কার্য্য-সিদ্ধি হয় না!

ইংরাজ বণিক যে নীতির অনুসরণ করিয়াছিল, পর্ত্তুগীজগণ বহু পূর্ব্বেই সেই নীতি অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ভারতের অন্তর্ব্বিবাদে মধ্যস্থতা করিয়া অথবা এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া ফিরিঙ্গিগণ সর্ব্বদাই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইত। ফিরিঙ্গির ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এই সকল চেষ্টার ভিতরে, কি ইংরাজ, কি ফিরিঙ্গি, সকলেরই সেই এক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়,—সে মন্ত্র আর কিছুই নহে, জন্মভূমির গৌরববৃদ্ধি! কি ফিরিঙ্গি, কি ইংরাজ কেহই নিজের স্বার্থের জন্য কোন কার্য্য করে নাই। তাহাদিগের কৃত কার্য্য ভাল হউক অথবা মন্দ হউক, সমস্তই জন্মভূমির চরণে অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইত! লর্ড ক্লাইব যে জাল করিয়াছিলেন তাহাও সেই জন্মভূমির জন্যই—আল্বুকার্ক যে ভ্রাতৃহত্যার পরামর্শ দিয়া কালিকটের জামোরীণকে নিহত করাইয়াছিলেন, তাহাও সেই জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায়! স্বার্থ-সাধনের জন্য নহে!

ঐতিহাসিক মেকলে তাঁহার ক্লাইব-চরিতে বলিয়া গিয়াছেন যে ফরাসী ড্যুপ্লে ভারতের অন্তর্ব্বিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং এদেশীয়

লোকদিগকে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়া গিয়াছেন যে এই অমোঘ উপায়ে য়ুরোপীয় শক্তি এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল! কিন্তু প্রশংসা ফরাসী ডুপ্লের প্রাপ্য নহে। ফরাসী-দিগের এদেশে আগমনের দুই শতাব্দী পূর্ব্বেই ফিরিঙ্গিগণ উক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এমন কি আল্‌বুকার্ক পর্য্যন্ত এই কৌশল-উদ্ভাবনের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়েন নাই—কারণ তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে উক্ত উপায় প্রচলিত ছিল! তিনি কেবল তাঁহার পূর্ব্বগামী ফিরিঙ্গি-দিগের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। ভারতবাসী চিরদিনই সুপ্ত, তাই তাহারা কোনকালেই এই নীতির কথা জানিতে পারে নাই। বৈদেশিকগণ বাধ্য হইয়াই এদেশে আসিয়া এদেশীয়দিগকে সামরিক বিভাগে গ্রহণ করিত—তাহা না করিলে চলিতই না! ফিরিঙ্গিগণ যে দিন হইতে মালাবার উপকূলে দাঁড়াইবার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহাদিগকে এদেশীয় দ্বারা সামরিক বিভাগ পুষ্ট করিতে হইয়াছিল। তাহার পর মোগল-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে যে অরাজকতা ও বিপ্লব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল, ফিরিঙ্গিগণ তাহারই সহায়তা লাভ করিয়া ভারতীয় সৈন্যে স্বীয় দলপুষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু মোগল-শক্তি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈদেশিকদিগের এ কৌশল আর পূর্ব্ববৎ ফলপ্রদ রহিল না! পুনরায় মোগলের পতনের পর হইতে ইংরাজগণ উক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া অভীষ্ট-সাধনে সফল হইয়াছিল।

———o———

দশম অধ্যায়।

The plunder of the Moslem ships, tributes and ransoms from the Coast Chiefs, and above all, sea-trade, formed from first to last the revenue of Portugal in the East.—*W. W. Hunter.*

বহুশত-যোজন-দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ত্তুগাল প্রতি বৎসর এদেশে রণতরী প্রেরণ করিত—প্রতি বৎসর যুদ্ধোপকরণাদি প্রেরণ করিত, উচ্চবৃত্তিভোগী পর্ত্তুগালবাসীগণ প্রতি বৎসর এদেশে আসিয়া বাণিজ্য-বৃদ্ধির প্রয়াস করিত। এই সকল ব্যাপারে এবং দুর্গাদি-নির্ম্মাণে পর্ত্তুগালের যে পরিমাণ ব্যয় হইত, ভারতীয় বাণিজ্য-লব্ধ ধনরাশি তাহার অনেক অধিক ছিল। পর্ত্তুগালের নিজের আয় যে পরিমাণ ছিল, তাহাতে এই সকল গুরু ব্যয়-ভার বহন করিবার শক্তি তাহার ছিল না। ১৪৯৭ হইতে ১৬১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত শতাধিক বর্ষেই ৮০৬খানি পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য-তরণী বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। ভারতাভিযানের উপযুক্ত করিয়া একখানি বাণিজ্য-তরণী প্রস্তুত করিতে এবং নাবিক প্রভৃতির বেতনাদি ধরিলে সে কালে প্রতি জাহাজের জন্য ৪০৭৬ পৌণ্ড অথবা প্রায় ৪২৭৯৮ মুদ্রা ব্যয় হইত! এতদ্ভিন্ন ফিরিঙ্গিগণ যুদ্ধ করিয়া অনেক জাহাজ জয় করিয়া লইত, এবং কতক বা ভারতবর্ষেও প্রস্তুত হইত! যদি হিসাব করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে শতবর্ষে প্রায় সহস্র বাণিজ্যপোত ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা-কল্পে সমুদ্র-পথে বিচরণ করিত!

এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে ভারতের অনন্ত রত্ন-রাজি লুণ্ঠন করিয়া কিরূপে ফিরিঙ্গি-বণিক ধনকুবের হইয়াছিল। ভাস্ক-ডা-গামা যখন প্রথমবার এদেশ হইতে পর্ত্তুগালে প্রত্যাগমন করেন তখন এদেশে ফিরিঙ্গির কিছুই ছিল না। তথাপি ডা-গামার অভিযানে

পর্ত্তুগালে উপস্থিত হইয়াছিলেন! ১৫৫১ খৃঃ অব্দে ক্যাবরাল যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন তাঁহার সঙ্গেও বহুপরিমাণ হীরক-মুক্তাদি ছিল বলিয়া ফিরিঙ্গি বণিকের ইতিহাস গর্ব্ব করে। তিন বৎসর পর আল্‌বুকার্ক অর্দ্ধমণ মুক্তা এবং চারি শত হীরক-খণ্ড লইয়া দেশে গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য-ত ছিলই!

সরল এবং সাধু উপায়ে, শুধু বাণিজ্য-ব্যাপারে, ফিরিঙ্গি-বণিকগণ যাহা প্রাপ্ত হইতেন, লুণ্ঠন করিয়া তাহার অধিক পরিমাণ লাভ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত ছিল না। মুসলমান অথবা হিন্দু বাণিজ্য-তরণী দেখিলেই ফিরিঙ্গিগণ তাহা লুঠিয়া লইত। ইতিহাসে দেখা যায় যে সেকালের এক খানি ক্ষুদ্র কালিকট-তরণী লুণ্ঠন করিয়াই ফিরিঙ্গিগণ অন্যান্য অমূল্য দ্রব্য-সহ দেড় সহস্র বহুমূল্য মুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল! তিন বৎসর পরে, ১৫০৩ খৃঃ অব্দে ফিরিঙ্গিগণ একখানি তরণী-মধ্যে একটী দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিল। সে মূর্ত্তি স্বর্ণ-নির্ম্মিত ছিল। সেই স্বর্ণ-মূর্ত্তি ওজনে প্রায় ১৫ সের ছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে! মূর্ত্তির নয়নদ্বয় ভাস্বর মণিময় ছিল—বৃহৎ এক খণ্ড মণি কৌস্তুভ মণির ন্যায় দেবতার বক্ষদেশে বিলম্বিত ছিল; তাঁহার হস্ত পদাদি সমস্তই মণিমুক্তা-খচিত কনক-নির্ম্মিত অঙ্গাবরণে সুসজ্জিত ছিল! ভারতের হীরক, মণি, মুক্তা, চন্দন, এলাচ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগাল এদেশে রৌপ্য প্রেরণ করিত। রৌপ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাচ, মুকুর, প্রবাল, ছুরি, কাঁচি, রঙিন্ বস্ত্রাদিও সে দেশ হইতে এদেশে আসিত! কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাইত হীরক, মণি, মুক্তা, রেশম, চন্দন, এলাচ! আরও কত কি যাইত কে তাহার ইয়ত্তা করে?

আরব এবং মিসর হইতে পর্ত্তুগাল অহিফেনের ব্যবসায়ে যৎপরোনাস্তি লাভ করিত। চীন দেশের সহিত অষ্টম শতাব্দী হইতে অহিফেনের ব্যবসায়। আল্‌বুকার্কের সময় মলাক্কা হইতে যে সকল চীন-

থাকিত। আল্‌বুকার্ক দেখিলেন যে ভারতবর্ষেও অহিফেন উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি অমনি সিদ্ধান্ত করিলেন—হয় এবারও অহিফেন বাণিজ্য রুদ্ধ করিয়া দিবেন, না হয় উহা ফিরিঙ্গিবণিকের একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া তুলিবেন! কিন্তু আল্‌বুকার্কের বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তিনি শেষে আজোর্সের ঢেঁড়ী পর্ত্তুগালে আবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন যে ভারতবাসীগণ অহিফেন ভিন্ন এক দিবসও বাঁচিবে না! পর্ত্তুগাল হইতে এদেশে অহিফেনের আমদানী হইলে প্রতি বৎসর এক জাহাজ অহিফেন যে ভারতে বিক্রীত হইয়া যাইবে, ইহা চতুর আল্‌বুকার্ক বুঝিয়াছিলেন!

পর্ত্তুগালের সহিত ভারতবর্ষের যে বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল, তাহা সত্ত্বেও ফিরিঙ্গি বণিকগণ মালাবারতীর হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্য উপসাগর এবং মলাক্কা হইতে সুদুর জাপান পর্য্যন্ত, সকল স্থানেই বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করিয়া বিচরণ করিত। সেই বাণিজ্য-লব্ধ ধনও বড় অল্প ছিল না। পর্ত্তুগাল-ভারত-বাণিজ্যে একখানি জাহাজেই পর্ত্তুগাল অধিপতি ১৫০,০০০ পৌণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! ইহা ভিন্ন যে পরিমাণ মণি-মাণিক্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন হিসাবই নাই! ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে গোয়া হইতে চীনে একবার গমনেই একজন পোতাধ্যক্ষ একখানি জাহাজে ২২,৫০০ পৌণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, —গোয়া হইতে মোজাম্বিক গমনে তাহার লাভ হইয়াছিল ৫৪০০ পৌণ্ড! পোতাধ্যক্ষের নিজস্ব বাণিজ্য হইতেও সে ব্যক্তি প্রায় অনুরূপ লাভই করিয়াছিল।

এখন দেখা যাউক লুণ্ঠন-বৃত্তি করিয়া ফিরিঙ্গি বণিকগণ কিরূপ লাভ করিত। পিক্রু ভাফারিয়া নামক জনৈক পোতাধ্যক্ষ দুই বৎসরের লুণ্ঠন-লব্ধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া প্রায় ১১০,০০০ পৌণ্ড লাভ করিয়াছিল! *

* Portuguese in India.—*Danvers.*

এ কাহিনী শুনিলে সহসা প্রত্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এ কাহিনী বিধাতার নিষ্ঠুর অভিশম্পাতের ন্যায় সত্য!

সমুদ্রতীরবর্ত্তী নৃপতি-বৃন্দ সর্ব্বদাই অর্থদানে ফিরিঙ্গি বণিকদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। কেবল গোয়া, দিউ এবং মলাক্কা হইতে লব্ধ শুল্ক ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী নৃপতি-বৃন্দ প্রদত্ত অর্থেই ১২০,০০০ পৌণ্ড আহরিত হইত! পর্ত্তুগাল-অধিপতি ইহার বাবদে বৎসরে ২২৫০০০ পৌণ্ড গ্রহণ করিতেন। পর্ত্তুগীজ-লিখিত পর্ত্তুগালের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ফিরিঙ্গি রাজ প্রতি বৎসর ইহার দ্বিগুণ অর্থই পাইতে পারিতেন, কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গের চাতুরীতে তাহা ঘটিয়া উঠিত না! সকলেই শেষে ভারতবর্ষ হইতে অনায়াস-লব্ধ ধনরাশি-লাভে চেষ্টিত ছিল। সেইজন্যই পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের আয় পরে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নরপতি ইমান্যুয়েল যখন প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপের পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া ভারতীয় বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ লাভ হইত, তাহার এক-চতুর্থাংশ লইয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতেন। পরে যখন দেখা গেল যে প্রজাসাধারণ এই গুরুতর বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হইতে পারিতেছে না, তখন নরপতি স্বয়ং উহা স্বনামে গ্রহণ করিলেন। মসলাদি হইতেই প্রতিবর্ষে ৪৫০০০ পৌণ্ড আসিতে লাগিল, সাধারণ বাণিজ্য হইতে আয় হইল বৎসরে ১৫০০,০০ পৌণ্ড! লুণ্ঠন-লব্ধ ধন ও শুল্কাদির অংশ লইতেও নৃপতি স্বয়ং কুণ্ঠিত ছিলেন না! সে কারণে তিনি বৎসরে ২২৫০০০ পৌণ্ড পাইতেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ হইতে পর্ত্তুগাল-নৃপতি বৎসরে ৪২০০০০ পৌণ্ড প্রাপ্ত হইতেন! ফিরিঙ্গি ঐতিহাসিক বলেন যে যুদ্ধাদির ব্যয় বহিতেই নৃপতির অনেক অর্থ ফুরাইয়া যাইত! [ক্রমশঃ]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

রত্নাবলী।

যে দিন ঐন্দ্রজালিকের মায়া-বিদ্যা প্রমাণিত করিল যে পরিচারিকা সাগরিকাই সিংহলরাজ বিক্রমবাহুর দুহিতা এবং বৎসদেশের ভাবী রাজমহিষী রত্নাবলী, সে দিন জগতের সম্মুখে রত্নাবলী-চরিত্রের কি বৈচিত্র্যই না অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল! এতদিন সাগরিকার অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পদই কেবল বাসবদত্তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল, এতদিন তাহার অসামান্য লাবণ্য তাঁহার হৃদয়ে কেবল ঈর্ষ্যার অগ্নিই প্রজ্বালিত করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই দিন রত্নাবলীর গুণগ্রাম তাঁহার মনে এক অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার করিল ও স্বকৃত-পূর্ব্ব অকরুণ আচরণ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মে-মর্ম্মে দারুণ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এতদিন সাগরিকার অনিন্দ্য রূপলাবণ্যই উদয়নের চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল,—কিন্তু তাহার অন্তরে যে এত মাধুরী, এত সৌরভ, এত সৌন্দর্য্য নিহিত ছিল,—তাহা সেই দিনই তিনি প্রথম অনুভব করিতে পারিলেন! সেই দিন তাঁহার রূপের মোহ—উন্মাদ গুণের মোহ—নির্ম্মল স্নেহে পরিণত হইল। সেই দিনই বৎদেশবাসী সকলে বুঝিতে পারিল, রত্নাবলী-চরিত্রের কি অপূর্ব্ব চমৎকারিতা!

অভিজ্ঞ সমালোচকের সহিত অসঙ্কুচিত চিত্তে এক-কথায় বলা যাইতে পারে যে ইনি বাস্তবিকই রূপে-গুণে লক্ষ্মী—"শ্রীরেষা"। যে কবির মায়াময়ী লেখনী এই অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার আসন কালিদাস-ভবভূতির অপেক্ষা অধিক নিম্নে নহে। তিনিও একজন সামান্য ঐন্দ্রজালিক নহেন। তিনি তাঁহার 'সম্বর-সিদ্ধি'র ন্যায় ধরণীতে মৃগাঙ্ক, আকাশে মহীধর, জলে জ্বলন দেখাইতে পারেন!

"কিং জল্পিদেণ বহুণা ইচ্ছসি জং দিট্ঠুং। তং তং দংসেমি অহং।"

"বেশী জল্পনা বৃথা, যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর আমি তাহাই দেখাইব।"

হীরকাদি রত্নাবলী অগ্নিসন্তাপে অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয় ইহাই আমরা জানি, ইহাই বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু এই রত্নাবলীর চারিদিকে সম্বর-সিদ্ধি কবি শ্রীহর্ষ কত অগ্নির সমাবেশ করিয়াছেন—যাহাতে সকল দিক্ সম্যক্‌রূপে দগ্ধ হয় তজ্জন্য রত্নাবলীকে নিয়ত নিগড়ে সংযত রাখিয়াছেন—ভাগ্যের নিগড়, প্রেমের নিগড়—সে কত কঠিন নিগড়! আবার কবি রত্নাবলীকে কি অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক প্রভাব দিয়াছেন—সে নিয়ত সেই সকল নিগড়ের মধ্যে থাকিয়াও অগ্নি-সম্পর্কে অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, কোনবার একটুও মলিন না হইয়া প্রতিবার অধিকতর স্নিগ্ধ দীপ্তির অচঞ্চল প্রভা-বিকাশে আমাদিগকে যুগপৎ মুগ্ধ ও পুলকিত করে!

সিদ্ধের আদেশ, রত্নাবলীর পাণি-গ্রহীতা সার্ব্বভৌম সম্রাট হইবেন! প্রভুর শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলীর সহিত উদয়নের পরিণয়-সংঘটন-কল্পে সিংহলে রত্নাবলীর পিতা বিক্রম-বাহুর সভায় দূত প্রেরণ করেন। দূতমুখে রাজা শ্রবণ করেন, এক অগ্নিকাণ্ডে উদয়নের মহিষী—তাঁহার নিজ ভাগিনেয়ী বাসবদত্তা—প্রাণ হারাইয়াছেন। বৎসরাজের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া তিনি উদয়নকে জামাতৃত্বে বরণ করিবেন স্থির করেন এবং বাগ্দত্তা কন্যা রত্নাবলীকে সমুদ্র-যানে বৎসদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথে বিপ্লব ঘটে; যান সমুদ্রমধ্যে ভগ্ন হয়।

যে সার্ব্বভৌম সম্রাটের মহিষী হইবে এবং যাহাকে মহিষীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহার পতি সার্ব্বভৌম সম্রাট হইবেন, সে আজ তাহার ক্ষুদ্র দেহের সমস্ত বল সঞ্চয় করিয়া দুইটী কাতর ভুজবল্লীতে একটী

যুদ্ধ করিতে বাধ্য—আপনার উদ্ধারের জন্য একজন সামান্য বণিকের কৃপার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য ; এবং পরিশেষে যৌগন্ধরায়ণের দ্বারা তাহারই পিতৃষ্বস্রীয়া বাসবদত্তার নিকট নীত হইয়া, সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় অবস্থান করিতে বাধ্য ! ভাগ্য-দেবীর কি নিদারুণ পরিহাস ! কিন্তু কবিই না বলিয়াছেন :—

"দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতম্॥"

"দ্বীপান্তর হইতে—সমুদ্রের মধ্য হইতে—দিগন্ত হইতে আনয়ন করিয়াও অনুকূল বিধি ত্বরায় অভিমত সংঘটন করিয়া থাকেন।"

অনেকে হয়ত বলিবেন যে নাটিকার প্রথমাঙ্কের আরম্ভ করিতে না করিতেই একটী নিরপরাধিনী বালিকাকে অর্ণববক্ষে ভাসাইয়া করুণ-রসের অবতারণা করিয়া শ্রীহর্ষ কি এমন নিপুণতা দেখাইয়াছেন ! এতদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে রত্নাবলী বৎসদেশে যেমন আসিল অমনি তাহার সহিত উদয়নের বিবাহ সংঘটন করিলে শ্রীহর্ষদেব বেশ ভাল ঘটক বলিয়া হয়ত নাম কিনিতেন—আর নাটিকা লিখিবার পরিশ্রম, সমস্ত না হউক, অনেকটা লঘু হইয়া যাইত। কিন্তু যিনি সার্ব্বভৌম সম্রাটের মহিষী হইবেন, তাঁহার চরিত্র কিরূপ দোষ-স্পর্শশূন্য গুণ-সমূহে মণ্ডিত হওয়া উচিত—কিরূপ সম্পূর্ণভাবে সেই সকল গুণ সেই চরিত্রে পরিস্ফুট থাকা উচিত, তাহা শ্রীহর্ষদেব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাই এত ঘটনারাশির উদ্ভাবন—সাগরিকার এত পরীক্ষার উপর পরীক্ষা—নিকষের এত ব্যবহার, সুবর্ণের এত কষণ ! কষণ না হইলে কিরূপে অসন্দিগ্ধভাবে মহামূল্যতার যাথার্থ্য নিরূপিত হইবে—পরীক্ষা না হইলে কেমন করিয়া গুণের বাস্তব-মহত্ত্বের অখণ্ড পরিচয় প্রাপ্ত হইব—কেমন করিয়া জানিব যে রত্নাবলী আলঙ্কারিকদিগের অর্থেও নাটিকার নায়িকা এবং ইংরাজীতে Heroine বলিলে যাহা বুঝায় সে অর্থেও

নায়িকা—কেমন করিয়া বুঝিব, রত্নাবলীই নাটিকার প্রধান উপজীব্য চরিত্র, তাই নাটিকার নামও রত্নাবলী !

এই পরীক্ষা কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই না গৃহীত হইয়াছে !

বসন্তকাল ! বৎসরাজ্যে মদনদেবের মহোৎসব, সকলেই প্রমোদে রত ! সাগরিকার অন্তরে আজ কতই না কষ্ট জন্মিবার কথা—তাহার যৌবন মুকুল সবে উদ্ভিন্ন হইতেছে, কিন্তু যাহার পূজার জন্য মুকুলের বিকাশ, কোথায় সে জীবন-দেবতা ! সে কিন্তু অধীরা নহে ! তাহার নিজের ব্যথিত হৃদয়ের মধ্যে যতকিছু বেদনা সব রুদ্ধ করিয়া রাখিতে জানে ! দেবী বাসবদত্তা রক্তাশোকতলে অনঙ্গ-দেবের পূজার জন্য মকরন্দোদ্যানে উপস্থিত, অপর পরিজনের সহিত পরিচারিকা সাগরিকাও পূজার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত। সাগরিকা পাছে রাজার দৃষ্টি-গোচর হয়, এই ভয়ে বাসবদত্তা বলিলেন, "হাঁলো সাগরিকা, আজ সবাই কাজে ব্যস্ত, তুইও সারিকে ফেলিয়া আসিয়াছিস্। তা যা শীঘ্র—এ সব পূজার জিনিস কাঞ্চনমালার হাতে দে—" পরিচারিকা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভর্ত্রীর আদেশ শিরোধার্য্য করিল। কিছুদূর গমন করিয়া তাহার মনে পড়িল যে সারিকা তাহার সখী সুসঙ্গতার কাছে আছে, প্রত্যাবর্ত্তন না করিলেও তাহার কর্ত্তব্যের হানি হইবে না, অথচ বৎস-দেশে সিংহল দেশীয় প্রথায় অনঙ্গ-দেবের অর্চ্চনা হয় কি না অলক্ষিত-ভাবে তাহা সে দেখিতে পাইবে ! পূজার তখনও বিলম্ব আছে, সাগরিকা স্বয়ং অনঙ্গ-দেবের উদ্দেশে দিবার জন্য পুষ্প-সংগ্রহ করিবে, স্থির করিল। পুষ্পচয়নে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে বাসবদত্তা অনঙ্গদেবের পূজা সমাধা করিয়া স্বামী উদয়নের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। সরলা সাগরিকা আসিয়া দেখিল, রক্তাশোকতলে এক অপূর্ব্ব কন্দর্প বিরাজমান ! সত্যই ত উদয়ন মূর্ত্তিমান কন্দর্প ! এত রূপ-সম্পদ কি কখন অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে ! মুগ্ধা বালিকা কুসুমগুলি প্রক্ষিপ্ত করিয়া বলিল :—

"পুনো দে ভঅবং কুসুমাউহ। সুহদংসণোমে ভবিসসি। দিঠ্ঠং যং দিঠ্ঠব্বং। অমোঘদংসণোমে ভবিসসি। অক্করিঅং অক্করিঅং। দিট্ঠোবি পুনপেক্‌খিদব্বো।"

বাস্তবিকই অনঙ্গদেব সাগরিকার প্রণাম গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিকই সাগরিকা যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছে। বাস্তবিকই সে যাহা দেখিয়াছে তাহা পুনরায় দ্রষ্টব্য।

সাগরিকা পূজা শেষ করিয়া ফিরিতেছিল। বৈতালিকের স্তুতি শ্রবণে জানিতে পারিল যে তদ্দৃষ্ট মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গদেব বৎসরাজ উদয়ন ব্যতীত অপর কেহই নহেন। এত কষ্টের মধ্যেও তাহার মুখে একবার হাসির রেখা দেখা দিল। তাহার অপূর্ব্ব রসাভিভূত চিত্ত বিষয়টীর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই তাহার সস্পৃহ নয়নযুগল উদয়নকে বার-বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। উদয়ন কে! উদয়ন তাহার সর্ব্বস্ব—তাহার পিতা উদয়নের হস্তে পূর্ব্বেই তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন আর সে-ও এইমাত্র পুনর্ব্বার উদয়নকে অনঙ্গদেব ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল; সাগরিকা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল "পরপ্পেসণদূসিদং বি মে সরীরং এদস্স দংসণেণ দাণিং বহুমদং সংবুত্তং" পরের ভৃত্যভাবে দূষিত হইলেও আমার শরীর ইঁহার দর্শনে আজি পবিত্র হইল।

এ কথার পরও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে সেই দীর্ঘ-নিশ্বাসের অর্থ কি, সাগরিকার দুঃখ কত গভীর, প্রেম কত ব্যাপক পর-ভাগ্যোপজীবিতায় তাহার জীবনের প্রতি কিরূপ ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিতে পারে ও কিরূপ সহিষ্ণুতা-সহকারে সে সকল ভাগ্যবিপাকই সহ্য করিতে পারে!

সাগরিকা কতক্ষণ রাজাকে সেরূপ ভাবে দেখিত বলা যায় না। কিন্তু রজনী সমাগত হইল। সকলে আবাস-প্রত্যাগমনে উদ্যোগী হইলেন। সাগরিকা দেখিল বাসবদত্তা প্রস্থান করিলেন। সে ত্বরিত পদে নিষ্ক্রান্ত হইল। কেবল যাইবার পূর্ব্বে আর একবার প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তমকে দেখিয়া লইল। হায় মন্দ-ভাগিনী কিছুক্ষণের জন্য যে প্রিয়-

তমকে চক্ষের দেখা দেখিবে তাহাও ঘটিল না। সাগরিকা আবার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল তাহার পর চলিল।

এ দিকে সুসঙ্গতা সাগরিকার অন্বেষণে ব্যস্ত। সাগরিকা কোথায়! চিত্র-শালায়!

সে আপনার হৃদয়কে বশে রাখিতে পারিল না, তাহাকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ করিল, বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে সে যাহার জন্য ব্যাকুল সে ব্যক্তি অতি-দুর্লভ, বিশেষতঃ যাহাকে একবার দেখিতে না দেখিতে এত সন্তাপ পুনরায় তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করা! নিতান্ত মূঢ়তা। তাহার পর সাগরিকা ভাবিল তাহার হৃদয়ের ত দোষ নাই, দোষ অনঙ্গের শরের—অনঙ্গের! সে সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে জানু পাতিয়া বলিল "ভগবান্ কুসুমায়ুধ, আপনি সমস্ত সুরাসুরকে জয় করিয়াও কি একজন রমণীকে প্রহার করিতে লজ্জা বোধ করেন না!"

সত্যই ত অনঙ্গদেবের একি আচরণ! সাগরিকা অবলা—সহিষ্ণুতা তাহার একমাত্র বল—অনঙ্গদেব! তাহারও ত সীমা আছে! বালিকা যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে তাহা ত' তোমারই পূজার জন্য করিয়াছে!

অধোমুখে নিবিষ্ট মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সাগরিকা সজল নয়নে উদয়নের চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। পশ্চাতে সুসঙ্গতা আসিয়া সব দেখিল। চিত্র হইতে সাগরিকা মুখ তুলিয়া অশ্রু নিবারণ করিতে করিতে দেখিল পশ্চাতে সুসঙ্গতা। ফলক প্রচ্ছন্ন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে সুসঙ্গতাকে হাতে ধরিয়া বসিতে বলিল। সুসঙ্গতা উপবেশনান্তে বলপূর্ব্বক চিত্রটা গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আলিখিত ব্যক্তি কে?" সাগরিকা সলজ্জভাবে বলিল, "প্রবৃত্ত-মদন-মহোৎসব ভগবান্ অনঙ্গ!"

প্রিয়সখির সহিত সাগরিকার আচরণ তাহার সুন্দর চরিত্রকে কেমন পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে! প্রিয়সখি যাহা দেখিয়াছে তাহাতে সমস্ত

গোপন করিবার উপায় নাই—ইচ্ছাও নাই। অথচ সে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতেও পারে না,—ওগো এইমাত্র যাহার জন্য আমার চক্ষে জল দেখিতেছিলে, এ সেই আমার সর্ব্বস্ব রাজা উদয়ন! সে রাজা উদয়নের ন্যায় শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছ্বাসে, উদ্বেল চিত্তে শ্লোক-তরঙ্গে সন্নিহিত জনগণের মানস প্লাবিত করিতে জানে না—সে 'ভালবাসি' বলিতে শিখে নাই, ভালবাসিতে শিখিয়াছে—প্রকাশ্যে কথা কহিয়া কিছু জানাইতে পারে না, অন্তরেই শুধু অনুভব করিতে পারে! বস্তুতঃ তাহার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। ইহারই জন্য প্রিয়সখি সুসঙ্গতার নিকট ধরা পড়িয়াছে জানিয়াও সে ধরা দিতে পারিল না।

সুসঙ্গতা তুলিকা লইয়া উদয়নের চিত্রের পার্শ্বে সখির চিত্র অঙ্কিত করিল। সাগরিকা কোপের ভাণ করিয়া বলিল, "ও কি!" সুসঙ্গতা বুঝাইয়া দিল যে সখী যেমন মদনকে চিত্রিত করিয়াছে সে-ও তদনুরূপ রতি চিত্রিত করিয়াছে। সুসঙ্গতা ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাহিল। হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইয়া গেল। তখন সাগরিকা নয়ন জলে ভাসিয়া সখির আশ্বাস-বাণীতে, আপনার মনের কথা বলিয়া ফেলিল। সুসঙ্গতা বলিল, "যোগ্য পাত্রেই তুমি আত্মসমর্পণ করিয়াছ।" এই প্রকার আশ্বাসে তাহার সন্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। প্রেমের বন্যা সাগরিকার লজ্জার বাঁধটুকু কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল! সুসঙ্গতা সন্তাপ-নিবারণের চেষ্টা করিলে, সাগরিকা তাহাকে বৃথা কষ্ট করিতে বারণ করিল।

বলিল,—"দুল্লহজনঅনুরাও লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং প্রেম মরণং সরণং ণু বরমেক্কং॥"

"দুর্লভ জনে (আমার) অনুরাগ, লজ্জা অতিগুরু, আত্মা পরবশ। প্রিয়সখি, এ বিষম প্রেম। মরণই আমার একমাত্র শরণ।"

সাগরিকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই স্থলে, উদয়নের প্রতি সাগরিকার যেরূপ প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ সখির প্রতি গভীর ভালবাসা ও সরল ব্যবহারও স্পষ্ট দেখা যায়। বস্তুতঃ আলাচনা করিলে দৃষ্ট হয়, সুসঙ্গতার উপর সাগরিকার যত-কিছু নির্ভর, যত-কিছু কোপ, যত-কিছু অভিমান, সে সমস্ত তাহার সখি-ভাবের ও অপূর্ব্ব নারী-চরিত্রের সুন্দর উদাহরণ। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেই সাগরিকাকে সুসঙ্গতার সহিত চিত্রশালা ত্যাগ করিতে হইল, কারণ এক বানর মন্দুরা হইতে বাহির হইয়া উপদ্রব করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। ব্যস্ততায় চিত্র-ফলক ও সারিকা পড়িয়া রহিল।

বানর চলিয়া যাইলে উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সাগরিকা চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত হইল। সুসঙ্গতা দেখিল বানর পিঞ্জরোদ্ঘাটন করায় সারিকা পলাইয়াছে। চিত্র-গ্রহণ আর হইল না। উভয়ে সারিকার উদ্দেশে চলিল। এই সময়ে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটী ঘটিল তাহা হইতে আমরা সাগরিকা চরিত্রের দুইটী দিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই।

বিদূষক মহাশয়ের কণ্ঠ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইতেছিল, তিনি একটু উৎফুল্ল চিত্তে হাস্য করিয়া বলিতেছিলেন, "হী হী, ভোঃ অক্করিঅং অক্করিঅং।" সাগরিকা ভয়ে অস্থির। ঐ বুঝি পুনরায় দুষ্ট বানরটী ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়! সাগরিকার এই নারী-সুলভ ভীতি-প্রবণতা কত স্বাভাবিক ও সুন্দর। সুসঙ্গতা যখন বলিল, "ভয়ের কারণ নাই, উনি রাজার পার্শ্ববর্ত্তী বিদূষক আর্য্য বসন্তক!" সাগরিকা বলিল, "দংশণী ওক্খু অঅং জণো।" সাগরিকার এমনই প্রেম! বসন্তক উদয়নের বয়স্য, তাহার হাস্য বানরের শব্দ বলিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি!

ইহাকেই বুঝি মনো-বিজ্ঞানে বলে, আরোপ বিধি (Law of Transfererce)। সুসঙ্গতার আশঙ্কা হইতেছিল পিঞ্জর-মুক্তা সারিকা পাছে কাহারও নিকট তাহাদের উভয়ের কথোপকথন আবৃত্ত করে। বসন্তকের

অপেক্ষা না করিয়া উভয়ে সারিকার অনুসরণে চলিল। অনুসরণ বিফল হওয়ায় যখন চিত্রফলক লইবার জন্য তাহারা ফিরিল তখন দেখিল, রাজা চিত্র-শালায় বয়স্যের নিকট আলিখিতা রমণীর রূপ-বর্ণনে ব্যস্ত! কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যে উদয়ন "প্রদ্যোতস্য সুতা" বলিতে অজ্ঞান হইতেছিলেন তিনি এক্ষণে একখানি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ! হইবারই ত কথা! কারণ সে চিত্র অলোক-সামান্যা সাগরিকার! তাহার উপর আবার সুসঙ্গতার নিপুণ হস্ত তাহার সজল নয়নে তাহার মধুর হাস্যে সমগ্র মুখমণ্ডলে রাজার প্রতি পরিস্ফুট প্রেম অবিকল অঙ্কিত করিয়াছে।

বিদূষক রাজাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপি সুখয়তি তে লোচনং ন বেতি!" সাগরিকা সে প্রশ্ন শুনিল। তখন তাহার মনের কি বিষম অবস্থা! সে মনে মনে বলিল, "হা ধিক্! জানি না এখন কি ঘটিবে—সত্যই এখন মরণ ও জীবনের অন্তরে রহিয়াছি!" তাহার পর রাজা যখন বিদূষককে অনুকূল উত্তর প্রদান করেন, সাগরিকার তখন কত আনন্দ! সে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়কে শুধু বলিল, "প্রসীদ! প্রসীদ!"

Mirandaও একদিন প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিল, তাহারও এমন একদিন আসিয়াছিল, যে দিন সে মরণ ও জীবনের মধ্য-পথে ছিল। সে কিন্তু সাগরিকার ন্যায় দুঃখে ও সুখে আপনার হৃদয়কে বশে রাখিবার চেষ্টা করিতে জানিত না। অপরের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান—এমন কি পিত্রাদেশ-পালনও তাহার মনে স্থান পাইত না। সে Fernandoকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত,—

"I am your wife, if you will marry me ;
If not, I'll die your maid !"

সাগরিকার প্রেম Miranda র অপেক্ষা অল্প ছিল না। তবে তাহার লজ্জা, তাহার মৃদুতা, তাহার সঙ্কোচ Mirandaর অপেক্ষা অনেক

যখন বলিল "তোমার হৃদয়বল্লভ তোমার বর্ণনা করিতেছেন", সাগরিকা তখন কোনও মতে লজ্জা-জড়িত বচনে "সখি, পরিহাস করিয়া এই জনকে লঘু করিতেছ কেন?" এই কয়েকটী কথা বলিয়াই মৌন রহিল। তাহার পর সুসঙ্গতা যখন রাজাকে তাহার নিকট লইয়া আসিল সে Mirandaর ন্যায় কথা কহিবে কি, তাহার কম্প উপস্থিত, লজ্জায় ফিরিয়া আসিবে কি, পা ফেলিয়া একটুও চলিতে পারিতেছে না! ইহার নাম কি সুসঙ্গতার চিত্রফলক আনয়ন? সাগরিকার একটু রাগ হইল। পরিহাস-রসিকা সখীর-হিতাকাঙ্ক্ষিণী সুসঙ্গতা রাজাকে বলিল, "আমার সখী বড় কোপনা, আপনি উহাকে হাতে ধরিয়া প্রসন্ন করুন।" রাজাও প্রস্তুত—তাহাই করিলেন। সখীর উপর সাগরিকার বড়ই ক্রোধ হইল। সে বলিল, "তোমার সহিত আর কথা কহিব না।" কিন্তু সে কোপের কৃত্রিমতা তখনই প্রমাণিত হইয়া গেল। তাহাকে তখনই সখীর সহিত কথা কহিতে হইল। সাগরিকার কোপে বিস্মিত হইয়া বিদূষক যেই বলিলেন "এ যে দেখি দেবী বাসবদত্তা", অমনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য দেবীর ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে সখীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইল। পরামর্শে ও কার্য্যে বিলম্ব হইল না। দুই সখীতে মিলিয়া তখনই পলায়ন করিল।

ইত্যবসরে বাসবদত্তা সত্য-সত্যই তথায় আসিয়া উপস্থিত। রাজা ও রাণীর মধ্যে একটী পণ ছিল, তাহাতে রাজার জয় হওয়ায় উল্লসিত বসন্তক হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে থাকে ও তাহার কক্ষ হইতে প্রাচ্ছন্ন চিত্রফলক ভূমিতে পতিত হয়। চিত্র দেখিয়া বাসবদত্তা 'শিরঃপীড়া হইয়াছে' বলিয়া প্রস্থান করেন ও সাগরিকাকে সুসঙ্গতার হস্তে সমর্পণ করিয়া সুসঙ্গতাকে আপনার পরিধেয় একটী পরিচ্ছদ পারিতোষিক প্রদান করেন। সখীর প্রতি সুসঙ্গতার দৃঢ় অনুরাগ। বিদূষক

সজ্জিত করিয়া সঙ্গিনীরূপে স্বয়ং কাঞ্চনমালার বেশ ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-কালে গোপনে রাজার নিকট গমন করিবে। কিন্তু পরামর্শ বাসবদত্তার অবিদিত রহিল না। তিনি স্বয়ং সাগরিকার পূর্ব্বেই কাঞ্চনমালার সহিত সঙ্কেত-স্থলে গমন করিয়া বিদূষক কর্ত্তৃক সাগরিকা-ভ্রমে উদয়ন-সমীপে নীত হইলেন ও তথায় তাঁহারই মুখে সাগরিকার প্রতি অনুরাগ বাণী শ্রবণ করিলেন। খণ্ডিতা রমণী মান-ভরে চরণে পতিত রাজাকে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহার প্রেমের অনল ও ঈর্ষ্যার অনল যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সাগরিকা যখন বাসবদত্তার বেশ ধরিয়া উদয়নের সমীপে গমন করিতেছিল তখন সংবাদ পাইল যে দেবী সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুসঙ্গতাকে বিশেষরূপে অপমানিত করিয়াছেন। সেরূপ অপমান সাগরিকার অসহ্য! "মাধবীলতা-পাশে উদ্বন্ধন দ্বারা সেই অপমানের আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে স্থির করিল।" অনাথা, অশরণা, মন্দভাগিনী সাগরিকার জীবলীলা বোধ করি এইরূপেই শেষ হইত। কিন্তু সেই সময় কুপিতা দেবীকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাগরিকার আর মরা হইল না। সে মনে মনে বলিল, "সত্যই, ইঁহাকে দেখিয়া আমার পুনরায় জীবিতাভিলাষ হইতেছে। অথবা ইঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থা হইয়াই জীবন ত্যাগ করিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "স্বামিন্ আমাকে ত্যাগ করুন! পরাধীন জন মরিবার এরূপ অবসর আর পাইতে পারে না। আপনিও দেবীর নিকট আপনাকে আর অপরাধী করি-বেন না।"

একখানি প্রসিদ্ধ বাঙলা উপন্যাসের নায়িকার জন্য তাহার রচয়িতা রত্নাবলীর নিকট কতদূর ঋণী, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। আমরা

"স্বচ্ছ বাপী শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?"

কোপের উপশম হইলে দেবী রাজার প্রতি স্বকৃত আচরণ স্মরণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে অতর্কিতে কণ্ঠ-গ্রহণ দ্বারা চিত্তবিনোদনার্থ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, সেখানে সাগরিকা! সাগরিকা তখন বলিতেছে, "নাথ, অলীক দাক্ষিণ্যে প্রয়োজন কি? জীবন হইতেও প্রিয়তর দেবীর নিকট পুনর্ব্বার আপনাকে অপরাধী করিতেছেন কেন?" রাজা উত্তর দিলেন, "দেবীকে সেবা করি, তোমাকে ভালবাসি।" অনলে ইন্ধন পড়িল। বাসবদত্তা সাগরিকাকে লইয়া অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিলেন; আর প্রচার করিলেন যে, সে উজ্জয়িনীতে প্রেরিত হইয়াছে!

এইস্থলে সাগরিকা-চরিত্রের ঔদার্য্য ও মহানুভাবতা স্পষ্টই উপলক্ষিত হয়! সে-ত স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারিত, "দেবি আমি তোমার ভগিনী, তোমার স্বামীর বাগ্দত্তা স্ত্রী।" তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে এ দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ না ঘটিতেও পারিত, কিন্তু সে নিজের দুঃখ অপেক্ষা পরের দুঃখ বেশী বুঝে—আপনার কষ্ট অপেক্ষা দেবীর সপত্নী-যন্ত্রণা অধিক ক্লেশদায়ক বলিয়া মনে করে, তাই সে আত্মপরিচয় দিল না। কেবল জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত জানিয়া গলদশ্রু-লোচনা সুসঙ্গতার হস্তে আপনার কণ্ঠ হইতে রত্নাভরণ খুলিয়া দিল—বলিল, "কোন ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ করিও।" সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করিল, "এ মহামুল্য মালা কোথায় পাইলে?" দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সাগরিকা উত্তর দিল, "সে কথায় কাজ নাই।" অবসর পাইয়াও আর একবার সাগরিকা আত্ম-পরিচয় দিল না।

সুসঙ্গতা মালা প্রদান করিবার জন্য আর্য্য বসন্তক ভিন্ন সদ্ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাইল না। আর্য্য বসন্তকও সে মালা বয়স্যের আশ্বাসের জন্য

কিন্তু অধিকক্ষণ মালার আশ্বাসের প্রয়োজন হইল না। উজ্জয়িনী হইতে আগত ঐন্দ্রজালিক অন্তঃপুরে মায়া-অগ্নির সৃষ্টি করিল। নারীহত্যা ভয়ে ভীতা বাসবদত্তা রাজাকে অন্তঃপুর-বদ্ধা সাগরিকাকে পরিত্রাণ করিতে বলিলেন। অনল-বেষ্টিতা সাগরিকা তখন আপন মনে বলিতেছিল, "আজ হুতাশন-প্রসাদে আমার সকল দুঃখের অবসান—আজ আমার বড় সৌভাগ্য!"—মৃত্যু যখন তাহার অভিমুখে বিভীষিকাময় কর প্রসারিত করিতেছিল, তখন ভয়ে একবারও তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে নাই, কারণ—

"রিক্ত যারা সর্ব্ব-হারা,
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা;
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর—
নয়ক তারা ক্রীতদাস!
হাস্য-মুখে করে তারা
অদৃষ্টেরে পরিহাস!"

সহসা অগ্নির মধ্যে সাগরিকা রাজাকে দেখিল! আবার বাঁচিতে সাধ হইল! সে বলিয়া ফেলিল, "ভট্টা, পরিত্তাহি পরিত্তাহি।" বিভ্রান্ত রাজা রত্নাবলীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। চকিতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। উদয়ন বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন যে তিনি স্বয়ং—সাগরিকা—দেবী বাসবদত্তা—বয়স্য বসন্তক—কঞ্চুকী বাভ্রব্য—সিংহলরাজের নবাগত অমাত্য বসুভূতি—এবং পরিজনবর্গ যাঁহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন—সকলেই অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান!

সাগরিকা কি তাহার পিতার প্রধান অমাত্য এবং সমুদ্রযাত্রার অভিভাবক বসুভূতিকে চিনিতে পারে নাই?—এখানেও দেখিতে পাই আত্মপরীক্ষা দিয়া বাসবদত্তার প্রাণে কষ্ট দিতে সাগরিকার সেই সঙ্কোচ!

বসুভূতি যখন জানিতে চাহিলেন, “এ কন্যা কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে ?” তখনও রত্নাবলী কোন কথা বলেন নাই, দেবীর নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৃত-নিশ্চয় বসুভূতি যখন সাগরিকাকে “আয়ুষ্মতি, রাজপুত্রি রত্নাবলি, তোমার এ দশা !” বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন আর নীরব থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে সাশ্রুনয়নে বলিল, “কে ! অমাত্য বসুভূতি !” “হায় মন্দভাগিণী আমি”—বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

বাসবদত্তার ঈর্ষ্যানল অনুতাপানলে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি রত্নাবলীকে কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া উদয়নকে তাহার বন্ধন মুক্ত করিতে বলিলেন। বসুভূতি আশ্বস্তা রত্নাবলীকে বলিলেন, “জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার দুঃখ দূর কর।” রত্নাবলী নিস্পন্দ। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, “দেবীর কাছে কতই অপরাধ করিয়াছি, কেমন করিয়া মুখ দেখাইব ?” সে অধোমুখে রহিল। তাহার পরও বাসবদত্তা তাহাকে উদয়নের করে সমর্পণ করিলে যখন বসুভূতি বলিলেন “রাজপুত্রি, বাসবদত্তাকে প্রণাম কর।” তখন লজ্জা-জড়িতা রত্নাবলী কেবল মাত্র একটী প্রণাম করিল, এখানেও কি রত্নাবলীর মনে-মনে কল্পিত, দেবীর নিকট কৃত অপরাধের আশঙ্কা-জাত সেই সঙ্কোচেরই ছায়া পড়ে নাই ! তাহার এই মৌন ভাব, ভাষা অপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে আমাদিগের সমীপে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে !

এমন সময় আসে যখন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশিত হইতে পারে না—তখন মৌনাবলম্বনই অধিক শোভনীয়।

জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত্ত ঘটে যখন আমাদিগের সকল দুঃখ-সুখের স্মৃতি একেবারে জাগ্রত হইয়া উঠে। এই সকল বিষম মুহূর্ত্তে যে সংযম তরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভাবের বন্যা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে

অসদ্ভাব ঘটে নাই, আত্ম-সংযমও তাহার ছিল—তাই সে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এমনই রত্নাবলীর চরিত্র! এমনই তাহার উদার প্রেম—ক্ষমাশীল ধৈর্য্য—তাহার সরল সঙ্কোচ! এমনই তাহার গুণ-গ্রাহিতা, তাহার দোষত্যাগিতা, তাহার আত্মত্যাগ, তাহার আত্ম-সম্মান! এ চরিত্রের মূল্য কত—নাটিকার নায়িকা হইবার উপযুক্ত কি না—সার্ব্বভৌম সম্রাটের মহিষী হইবার যোগ্য কি না, সে বিচার আপনারা করিবেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জাতিভেদ-আধুনিক ও পৌরাণিক।*

গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে "জাতিভেদ—আধুনিক ও পৌরাণিক" শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। লেখক যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শাস্ত্র, পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থ হইতে বহুল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে পৌরাণিক সময়ে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। যে যে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতানৈক্য হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত করিতেছি।

১। লেখক কেবল মুনি, ঋষি, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর ব্যবহারে প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ জাতি জাত্যন্তরে আহার ব্যবহার করিতেন। কিন্তু রাম, শ্যাম, কি যদু সেরূপ করিতেন কি না তাহা দেখান নাই। মুনি-ঋষিগণের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে তাঁহাদের স্পর্শে

---

* জাতিভেদ-প্রথা এখন আমাদের মধ্যে একটী গুরুতর, সামাজিক প্রশ্ন অপেক্ষা রাজ-নীতিক প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম জন্মান্তর-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিভেদও কতকটা জন্মান্তরের মুখাপেক্ষী। জন্মান্তর আবার সংস্কারের অনুগামী। সংস্কার-শিক্ষাও সাধনার (অনুশীলনের) অধীন। বর্ত্তমান যুগে পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্ব কারণগুলিও এখন অকর্ম্মণ্য। কালক্রমে নূতন নূতন কারণ সমুদ্ভূত হইয়া প্রাচীন সমাজের প্রাচীরে আঘাত করিতেছে। সে সকল কারণ গুলিও একেবারে উপেক্ষা করা চিন্তাশীলের পক্ষে উপযুক্ত নয়। একটা অতি প্রাচীন প্রথার মূলে সহসা কুঠারাঘাতের পূর্ব্বে অতি-ধীর বিচারের প্রয়োজন। যদি জাতিভেদ-প্রথা উন্নতির বিঘ্ন সম্পাদন করে তখন সমাজ আপনার যোগ্য উপায় আপনি সন্ধান করিয়া লইবে। যদি জাতিভেদ রাখিতে হয় অথবা উঠাইতে হয় তবে উভয় পক্ষেই জ্ঞানবৃদ্ধি বা শিক্ষা-প্রচারের প্রয়োজন। কারণ জ্ঞানহীন সমাজ, প্রাচীন বা আধুনিক কখনই শান্তিময় বা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না

শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন। মহারাজ বীতহব্য ভৃগু-মুনির বাক্য-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মুসলমানের উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে কি বলিতে হইবে জাতিভেদ নাই?

২। তাহার পর বিজ্ঞ লেখক শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি **গুহক চণ্ডালের** অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই কেন, তিনি শবরী নাম্নী চণ্ডালিনীর অর্দ্ধভুক্ত ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে কি প্রমাণ হইতেছে যে সকলেরই ঐরূপ করা কর্ত্তব্য? জাতিভেদ সামাজিক মনুষ্যের নিকট; ভগবানের নিকট নহে। শ্রীক্ষেত্রে এখনও জাতিভেদ নাই। ভক্তির কি জাতি আছে?

৩। তাহার পর লেখক মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৬১ অধ্যায়ের বিবরণ দিয়াছেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যখন দ্রৌপদীসহ বনে বাস করিতেছিলেন, তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা দশ-সহস্র শিষ্যসহ দ্রৌপদীর কুটীরে অতিথি হইলেন। দ্রৌপদীর অন্ন-পাত্রে অন্ন নাই, তাই দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর পাকস্থলী-সংলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন ভোজন করিয়া কহিলেন, ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন এবং ভীমসেনকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।" দুর্ব্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভোজন না করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন।

লেখক কহিতেছেন "এখানে তো দেখিতেছি, দুর্ব্বাসা ঋষি একজন গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ হইয়াও দশহাজার ব্রাহ্মণ শিষ্যসহ দ্রৌপদীর হস্তের অন্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতার! দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে

তাঁহার দশ সহস্র ব্রাহ্মণগণকে আহার করিতে বলিলেন। লেখক ইহা হইতে প্রমাণ করিতেছেন যে দুর্ব্বাসা এবং দশ সহস্র ব্রাহ্মণের জাতিনষ্ট হইবার আশঙ্কা না করিয়াই যখন দ্রৌপদীর ভুক্তান্ন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন জাতিভেদ কোথায় রক্ষিত হইল ? ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে লেখক "জাতি" কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"—অবতার, দেবদেবী, মুনি-ঋষির আচরণের আলোচনা এরূপ সাধারণভাবে করিতে যাওয়া সঙ্গত কি ?

পুনর্ব্বার বলিতেছি জাতিভেদের নিয়ম সাধারণ, সংসারী মনুষ্যের জন্য ; অবতার বা গৃহহীন মুনি-ঋষির জন্য নহে !

৪। তাহার পর লেখক বলিতেছেন,—"এখন আমরা দেখাইব তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং নিকৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও শূদ্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।" লেখক ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু প্রমাণ না দিলেও এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু কিরূপ "কর্ম্ম" এবং "তপস্যা" দ্বারা নিকৃষ্ট-বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন ? মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ হয় ?" ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন ! ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; জীব বারম্বার জন্ম-মৃত্যু-লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"জীব তির্য্যক্-যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডাল-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া সহস্র বৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শূদ্রতা লাভ করে ; তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত

বৎসর অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব-লাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শ কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র-জীবী ব্রাহ্মণের কূলে; তৎপরে চতুঃষষ্টি সহস্র অষ্টশত কোটি বৎসর অতীত হইলে গায়ত্রী-সেবী ব্রাহ্মণবংশে এবং পরিশেষে ঐ বংশে দুই শত ঊনষষ্টি লক্ষ বিংশতি সহস্র কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রোত্রিয় গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করে। ঐ শ্রোত্রিয় বংশে পরিভ্রমণের সময় হর্ষ, শোক, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও বৃথা বাগ্বিতণ্ডা তাহাকে আক্রমণ করে। ঐ সময় যদি সে হর্ষ-শোকাদি শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার সদ্গতি লাভ হয়; আর যদি সে ঐ সকল শত্রুর বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার এককালে অধোগতি লাভ হইয়া থাকে। হে মতঙ্গ! এক্ষণে আমি তোমার নিকট যে কথা কীর্ত্তন করিলাম ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্য অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মণ্য-লাভের লোভ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন।" ব্রাহ্মণ হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া মতঙ্গ নামে এক চণ্ডাল অতি-কঠোর তপস্যা করিতে-ছিলেন এমন সময়ে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া উপর্য্যুক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

আজকাল যাঁহারা মনে করেন যে বি এ, এম, এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইবার যোগ্য তাঁহাদের উপর্য্যুদ্ধৃত মহাভারতের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ করা উচিত। 'কর্ম্ম' অর্থে শাস্ত্র সঙ্গত কর্ম্ম, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্ম নহে। অনেকের মত বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই।

৫। তাহার পর লেখক বলিতেছেন যে জাতিভেদ উঠাইয়া যোগ্যতা অনুসারে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ না দিলে এবং ইউরোপ

হইবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য যে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইলেই যে সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি হইল এমন নহে। মনুষ্য যাহাতে ক্রমোন্নতি দ্বারা দেবত্ব ও পরিশেষে মুক্তি পাইতে পারে, ইহাই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই জাতিধর্ম্ম। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের ৩৬ অধ্যায়ে ধর্ম্মাবতার বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন "যনি অর্থ-সিদ্ধির অভিলাষ করেন তিনি অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেন।"

লেখকের বিশ্বাস আমাদের দেশে বিলাতের ন্যায় কলকারখানা না স্থাপন করিলে আমাদের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে না। এইরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। কলকারখানার সাহায্যে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয় এবং ধনী অর্থাৎ মূলধনী আরও ধনবান হয়। আমাদের দেশে কলকারখানা প্রবেশ করিলে শিল্পীকূল, তাঁতীকূল প্রভৃতির যে অন্ন উঠিবে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং তাহাতে সমাজে যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে সে সমস্যার কথা একেবারে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যন্ত্র-শিল্প ইউরোপে হস্ত-শিল্পের বিলোপ করিয়া দেশময় যে অশান্তিও অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে—আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে তাহা দেখিতে পাই না। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাঁহার প্রণীত "দেশের কথা"য় স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন (সুলভ সংস্করণ ১৯৯-২০১ পৃঃ) যে কলকারখানা অপেক্ষা হস্ত-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের দেশে অধিকতর শিল্পোন্নতি হইবে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরও ঐ মত। কিন্তু সে জটিল প্রশ্ন এখন থাক্।

৬। তাহার পর লেখক দেখাইতেছেন যে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে আছে যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করে

ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার পর হইতে লেখকের কয়েকটি কথা আমি স্বীকার করি, এবং ভাগবতেও আছে যে যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাবান্ ইত্যাদি সত্বগুণান্বিত হন্, তবে তিনি **ব্রাহ্মণের তুল্য,** কিন্তু তাই বলিয়া সমাজে তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। কারণ 'সংস্কারাৎ দ্বিজোঽচ্যতে' অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ হন। নিম্ন জাতির প্রতি অবজ্ঞার উপর যে প্রাচীন কালের জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বোল্লিখিত রাম ও গুহক চণ্ডালের বৃত্তান্তে তাহা দ্রষ্টব্য। লেখক মনুসংহিতায় যে সকল কঠোর নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সামাজিক শাসন-মাত্র এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিশুদ্ধ রাখাই উহার উদ্দেশ্য। অবশ্য কালক্রমে যে ঐ সকল নিয়মের ব্যত্যয় হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

৭। লেখক মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"ভীষ্ম কহিলেন, 'ধর্ম্মরাজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত শূদ্রের অন্ন ভোজন করা কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে।" ইহার অর্থ আমি এইরূপ বুঝি, "ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্ন ভোজন করিতে পারেন।" কিন্তু "অন্ন" অর্থে যে স্পৃষ্টান্ন বা উচ্ছিষ্টান্ন বুঝিতে হইবে, ইহা কোন অভিধানে খুঁজিয়া পাই নাই।

৮। লেখক মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন ঃ—"চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, এবং যে বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে রাজার সরকারী ভৃত্য, যে পশুপালক, যে নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে সমুদ্র যাত্রা করে,—নক্ষত্রাদি গণনা করা যাহার উপজীবিকা, যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য—ইহাদিগকে দৈব ও পৈত্র্য, উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ

যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি", অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই ছয়টি সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এতদতিরিক্ত কর্ম্ম হয় রাজসিক না হয় তামসিক। কর্ম্মের মধ্যে যে ইতর-বিশেষ আছে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা চর্ম্মের ব্যবসায় করেন তাঁহাদের স্বভাব এবং যাঁহারা বিদ্যাদান করিবেন বা পূজা করিবেন তাঁহাদের মনোবৃত্তি কখনও সমান হইতে পারে না। আজকাল অনেক ভদ্রলোক তাঁহাদের সন্তানগণকে পুলিশে যাইতে দেন না কেন ? পুলিশের কাজে প্রায়ই প্রকৃতি মনোবৃত্তি কঠোর হইয়া যায়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার স্বভাব তদনুরূপ হয়। যাহার পাটয়ারী বুদ্ধি বেশী, তাহাকে সকলেই উপহাসছলে বলে "ও বেণে"! সেইরূপ যাহার বুদ্ধি কিছু স্থূল তাঁহাকে সকলে "হলধর" আখ্যা দিয়া থাকে! বিভিন্ন জাতির গুণ-বৈষম্য ও প্রকৃতি-বৈষম্য সত্বেও যে তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব নাই এ কথা স্বীকার করিতে পারি না।

৯। লেখক দেখাইয়াছেন যে আজকাল লোকে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারের নিয়ম অনুসারে চলেন না। অতএব জাতিভেদের বা শাস্ত্রের আবশ্যকতা কি ?

যাহাতে মত-বৈষম্য না হয় এবং সকলে স্ব স্ব প্রধান না হয় এই জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন, নিয়মের প্রয়োজন। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সমাজের হিতের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই সকল নিয়ম পালন করেন তাঁহারা আপনারও মঙ্গল করেন সমাজেরও মঙ্গল করেন। কিন্তু সকলেই যে পালন করিতে পারিবেন এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম পালন করিতে অক্ষম হন তবে সে তাঁহার দোষ, নিয়মের দোষ

করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সেই সকল নিয়ম দুষ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। যাঁহারা যতটুকু মানিয়া চলেন ততটুকুই ভাল। উত্তরকালে সকলে যে শাস্ত্রানুসরণ করিতে পারিবেন না তাহা মানবতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তাহা কিছু নূতন নহে। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ 'কলিকালের' জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরাশর সংহিতায় বিধান আছে যে ব্রাহ্মণগণ কলিকালে কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন যে যদি ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন জাতি স্বধর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হন, তিনি তৎপরবর্ত্তী নিকৃষ্ট বর্ণের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। ভাগবতে আছে "বিপদ্‌কালে সকলেই সকলের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে" (শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ)।

জাতিভেদ এবং শাস্ত্র উঠাইয়া স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিলে ঐক্যের সম্ভাবনা কোথায়? বৈষম্য মানবের প্রকৃতিগত, এ সম্বন্ধে শুকদেব ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বলিতেছেন "হে মহারাজ! এই সংসারে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবানুসারে যাহার যে ধর্ম্ম উপযুক্ত হয়, তাহার সেই ধর্ম্ম ইহ বা পরকালে কল্যাণকর হয়। বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের ইহাই মত"। অতএব জাতিভেদ বৈষম্যের কারণ নহে। যে সকল দেশে জাতিভেদ নাই সেই সকল দেশেও দলাদলী যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আজ প্রায় অশীতি বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দেখিতেছি তিনটি দল হইয়াছে।

এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন মনুষ্যের মতি স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-প্রবণ না হইয়া স্বতঃই ধন, মান, ঐহিক সুখের প্রতি ধাবিত হইবে। তাই পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের এত মনোহারী হইয়াছে এবং আমাদের সনাতন শান্তিময় ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম প্রভৃতি আমাদের চক্ষুশূল

রূপ যষ্টির উপর ভর না দিয়া এক পা চলিতে পারি না। কিন্তু ধর্ম্মের ন্যায় জটিল বিষয় শুধু তর্কের দ্বারা আয়ত্তাধীন হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" এখন ধর্ম্মকে science অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞানের ন্যায় না বুঝাইতে পারিলে লোকে গ্রহণ করিবে না। জাতি-ভেদকে science এর ছাঁচে ঢালিলে এক প্রকার উপলব্ধি হইবে এবং সূক্ষ্মভাবে দেখিলে আর এক প্রকার মনে হইবে। যাঁহারা ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধিতে দেখিবেন তাঁহাদের নিকট জাতিভেদ পৌরাণিক সময়ের সমাজ-সংস্কার বলিয়া বোধ হইবে এবং ঋগ্বেদোক্ত কথা * প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

জনৈক এম্. এ.।

---

* অর্থাৎ সৃষ্টিসময়ে, ব্রাহ্মণ আদিপুরুষের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহুযুগল হইতে, বৈশ্য উরুযুগল হইতে, এবং শূদ্র পদদ্বয় হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২।

বেতিয়া রাজবংশ।

বিহার অঞ্চলে যতগুলি জমিদার আছেন তন্মধ্যে দ্বারভঙ্গ, বেতিয়া, টিকারী হাতোয়া, ও ডুমরাঁওই প্রসিদ্ধ। আজ আমরা বেতিয়ার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। এখন আর বেতিয়ার পূর্ব্ব গৌরব নাই; এখন বংশ পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে!

যুবরাজ ক্ষুরম যখন বঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন সেই সময় গজসিংহ নামে একজন ভুঁইহার তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে, জগদ্বিখ্যাত নুরজাহান্ আপন পুত্র সেরিয়ারকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু যুবরাজ ক্ষুরম তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া সম্রাট শাহ জাহান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এ বিষয়ে গজসিংহ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছলেন। তিনি (সম্রাট শাহ জাহান) সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই গজসিংহকে পঞ্চ হাজারীর পদে অভিষিক্ত করেন এবং চম্পারণ ও সারণ নামক জেলাদ্বয় ইজারা স্বরূপ দান করেন। গজসিংহই বেতিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি প্রথমে সারণে রাজধানী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন, পরে কোনও কারণ বশতঃ তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। অবশেষে তিনি চম্পারণে হারহা নদীতীরে বেতিয়ায় রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই জেলার চম্পারণ নাম কেন হইল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রথম,—ইহা পূর্ব্বে চম্পকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল; চম্পারণ তাহারই অপভ্রংশ।

দ্বিতীয়—বেতিয়ার ৮ ক্রোশ উত্তরে চম্পাইপুর নামে এক নগর ছিল। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যের সময় এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাহা হইতেই নাকি জেলার নাম চম্পারণ হইয়াছে। এখনও চম্পাই,

পুরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে ও তথায় একটি স্তম্ভের গাত্রে অশোকের কীর্ত্তির বিষয় লিখিত আছে।

গজসিংহের তিন পুত্র। ধুলীপ সিং, অনিথ সিং ও শত্রুজিৎ সিং। পিতার মৃত্যুর পর ধুলীপসিং "রাজা" উপাধি লাভ করেন। অপর দুই সহোদরকে তিনি শিউহর ও মধুবাণী নামক প্রদেশদ্বয় দান করেন। অদ্যাবধি উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ বিদ্যমান আছে এবং তাঁহাদের বংশধরগণ উক্ত প্রদেশগুলির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। রাজা ধুলীপ সিং ১৬৯৬ খ্রীষ্ট অব্দে পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র ধ্রুপসিং রাজপদে অভিষিক্ত হন। ধ্রুপসিংএর পুত্র সন্তান ছিল না কেবল মাত্র বেঙ্গাবাবুই ও চেঙ্গাবাবুই নামে দুইটি কন্যা ছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর বেঙ্গাবাবুইয়ের পুত্র যুগলকিশোর সিং মাতামহের রাজ্যে, (১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজ্যকালে মোগলদিগের অধঃপতন হয়। যুগলকিশোরের মৃত্যুর পর বীরকিশোর ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন। সে সময় বাঙলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। মীর কাশেম তখন ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধসজ্জা করিতেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর যখন বৃদ্ধ মীরজাফর পুনরায় নবাব হইলেন, সে সময় চারিদিকে অরাজকতা দেখিয়া বীরকিশোর স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পাটনার নবাবকে কর না দেওয়ায় নবাব তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঁচ শত ফৌজ ও একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। রাজধানী পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাদের গতিরোধ করে না। তাহারা রাজবাটীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া, রাজাকে নীচে নামিয়া আসিতে বলে। রাজা কয়েকটি বন্ধু লইয়া সেইস্থলে উপস্থিত হন। নবাব কর্ম্মচারী যেমন তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন অমনই তাঁহার একজন পারিষদ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিল। রাজার সৈন্যেরা রাজবাটিতে গোপনে উপস্থিত ছিল, সঙ্কেত

করিবা-মাত্র তাহারা সহসা সেই স্থলে উপনীত হইয়া পাঁচশত সৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং সকলকে বিনাশ করিল। * যে পারিষদ রাজাকে নবাব কর্ম্মচারীর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার বংশ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে এবং রাজবংশ যতদিন বর্ত্তমান ছিল ততদিন তাঁহারা রাজ্যমধ্যে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

যখন পাটনাতে সংবাদ পৌঁছিল যে রাজা বীরকিশোর নবাবের সমস্ত সৈন্য ধ্বংশ করিয়াছেন তখন নবাব পুনরায় ২৫০০ সৈন্য ও ১০টি কামান বেতিয়ার রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাহারা বেতিয়া পৌঁছিবার অগ্রেই বীরকিশোর পলায়ন করেন। নবাব-সৈন্য আসিয়া রাজকোষ ও রাজবাটী লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। বীরকিশোর কিন্তু আর বেতিয়ায় ফিরিতে সাহস করিলেন না। তিনি ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এ সময় শিউহরে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এই সময়, কতিপয় পাদ্রী বেতিয়ায় আসিয়া রাজবাটির পার্শ্বেই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করে এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। হিন্দু রাজবাটির পার্শ্বেই গির্জ্জা, বোধ হয়, আর কোনও স্থানে নাই। বীরকিশোর যখন শুনিলেন যে ইংরাজ বাঙ্‌লার রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন তখন আবার তিনি বেতিয়ায় ফিরিলেন। ১৭৯১খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাঝোয়া ও সিমরাওন পরগণা দান করেন; তিনিও বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন্। ১৮১৬খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আনন্দকিশোর সিং পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হন্। তাৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" খেতাব প্রদান করেন। তাঁহার কোনও

* Vide, History of fhe Bettiah Raj, Vol I.

সন্তানাদি ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা নবাল কিশোর সিং ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন্। ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনটি পুত্র রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্র সিংই পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্র অতিশয় খারাপ ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। মধ্যম ভ্রাতা সকলের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। কনিষ্ঠ কিন্তু জ্যেষ্ঠের ছায়া-স্বরূপ ছিলেন। জ্যেষ্ঠের কোন কথাই তিনি অমান্য করিতেন না। মধ্যমের মৃত্যু-সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম,—জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর, মধ্যম কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া দুষ্ট লোকের পরামর্শে তাঁহার প্রাণনাশ করিবার জন্য চেষ্টা পান। তিনি মহারাজার নাপিতকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু নাপিত মহারাজার নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া বলে। মহারাজও পূর্ব্ব হইতে মধ্যমের প্রতি বিরূপ ছিলেন, তিনিও গোপনে মধ্যমকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন্। তিনি স্থির করেন, যে মধ্যম যখন নিদ্রিত থাকিবেন সেই সময় স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করিবেন। মধ্যমের এক বিশ্বাসী ভৃত্য প্রভুকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করে। সে রাত্রে মধ্যম ভ্রাতা আপনার শয্যার উপর একটা কদলীবৃক্ষ এরূপভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন যাহাতে লোকে দেখিলেই মনে করিতে পারে, বিছানায় একজন নিদ্রা যাইতেছে। মহারাজ গৃহে প্রবেশ করিয়াই তরবারি দ্বারা বৃক্ষের উপর আঘাত করিলেন। মধ্যম অন্তরাল হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া নিজের আশু বিপদ বুঝিলেন এবং একটি অশ্ব লইয়া বাহির হইলেন। মহারাজ যখন বুঝিলেন যে মধ্যম পলায়ন করিয়াছে তখন কনিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। নগরের মধ্যে জ্যেষ্ঠের হস্তে মধ্যমের শিরশ্ছেদন হইল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দেহটি

আজি পর্য্যন্ত স্থানীয় অধিবাসীগণ বৎসরে একবার করিয়া সেই দুই স্থলে সমবেত হইয়া তাঁহার স্মৃতি পূজা করিয়া থাকেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে তখন সিপাহী বিদ্রোহের প্রচণ্ড অনল ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রকিশোরের নিকট হইতে ভ্রাতৃবধ সম্বন্ধে কোনও কৈফিয়ৎ চাহিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা তখন আপনাদিগকে লইয়াই বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যখন সুগৌলিতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে তখন কনিষ্ঠ সহোদর সিপাহীদিগকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ইংরাজদের জয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া স্থির করিলেন যে যদি তিনি ইংরাজদিগকে এ সময়ে সাহায্য করেন তাহা হইলে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার ভ্রাতৃবধের দোষ মার্জ্জনা করিবেন এবং পরে তাঁহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃতও করিতে পারেন। তিনি কনিষ্ঠকে বুঝাইলেন এবং পরে উভয় ভ্রাতা মিলিয়া সুগৌলির বিদ্রোহ-দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এ সময়ে নেপালরাজও ব্রিটিশদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর দেশে যখন শান্তি সংস্থাপিত হইল, তখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রকিশোরকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিলেন না। সুতরাং ভ্রাতৃহত্যার জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র দায়গ্রস্ত হইতে হইল না। ইংরাজকে অধিকতর সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নিজে শরীররক্ষক ভিন্ন অন্য কোনও সিপাহী রাখিলেন না, এবং সমস্ত কামান-বন্দুকাদি ইংরাজদিগকে দান করিলেন। পরে তিনি নীলকরদিগকে অনেক জমি ইজারা স্বরূপ দান করেন। একমাত্র পুত্রকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত পুত্র হরেন্দ্রকিশোরকে 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব ও কে, সি, এস, আই, উপাধিতে ভূষিত

মেম্বর ছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে বেতিয়ার রাজবংশ লোপ পায়।

হরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী যোগ্যতার সহিত রাজ্যাদি পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাজের কনিষ্ঠা পত্নী রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্তা হন। কিন্তু তিনি প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করায়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ৫০০০৲ টাকা পেন্সন দিয়া রাজ্যটি Court of Wards এর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন।

সিউহরের রাজা রামনন্দন সিং বেতিয়ার বংশ-সম্ভূত। তিনি বেতিয়ার রাজ্য পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে বৎসর বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে (Privy Council) তিনি হারিয়া গিয়াছেন। যত দিন কনিষ্ঠা মহারাণী জীবিতা থাকিবেন ততদিন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ই (Court of Wards) বেতিয়া রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিবেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কে রাজা হইবে সে বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পুরস্কৃত।

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী-বিয়োগে আমি যখন বলিলাম "দ্বিতীয় বিবাহ আমার পক্ষে অসম্ভব" তখন আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই মুখ টিপিয়া অলক্ষ্যে একটু হাসিয়া লইয়াছিলেন। সে হাসির অর্থটা যেন ঠিক এইরূপ,—একবারেই অসম্ভব হইতে পারে না! সেই ঈষৎ পরিহাস মিশ্রিত অতি সূক্ষ্ম সূচির মত হাসি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আমার সংকল্পকে আরো দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। আমি বরাবরই নিজেকে সাধারণের চেয়ে অনেকখানি তফাৎ করিয়া দেখিতাম। সাধারণে যেখানে স্ত্রী-বিয়োগের অল্প পরেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে এবং পুত্র-কন্যাদির লালন কিম্বা সাংসারিক অসুবিধার উল্লেখ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত রাখিতে চায় সেখানে ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে!

আমার প্রথমা স্ত্রী শৈলবালাকে আমি যথেষ্ট ভাল বাসিতাম। আমার বিশ্বাস ছিল সে ভালবাসা "অনন্ত, অসীম, অপরিমেয়!" উপন্যাসের নায়ক তাঁহার প্রণয়িনীকে যেমন করিয়া ভালবাসেন অনেকটা সেইরকমই আর কি!

আমার ১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। শৈলের বয়স তখন ১০ বৎসর। আমি তখন কলিকাতায় একটি ছোট বাসায় থাকিয়া এফ এ'র জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। একজামিনের পড়া কতদূর অগ্রসর হইতেছিল তাহা একজামিনাররাই বলিতে পারেন। কিন্তু বড় বড় সম্বোধন দিয়া সোণালি ঝক্‌ঝকে কাগজে যথেষ্ট ভালবাসা ও সেন্টের সৌরভ মাখাইয়া প্রেমপত্র লিখিতে যে অনেকখানি সময়ের সদ্ব্যবহার

আমার এক জ্ঞাতি খুল্লতাত-পুত্র অনুকুলও এফ এ পড়িতেছিল। কিন্তু নিজের উপর সে বেচারার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। আমার জ্ঞান বুদ্ধি বহুদর্শিতার নিকট সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিত। এক কথায় সে আমায় একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিল। কালে আমি যে একজন দ্বিতীয় "ম্যাটসিনি" "গ্যারিবল্‌ডি" অন্ততঃ-পক্ষে সুরেন বন্দ্যো, বিপিন পাল হইতে পারিব সে সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না!

অনুকূল যে কেবল আমায় ভালবাসিত তা নয়, সে আমায় দেবতার মত ভক্তি করিত, আমার কথা বেদ-বাক্যের মত বিশ্বাস করিত। এই সময় সহসা কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। কার্ত্তিকের দারুণ শীতে মাথার কাছের জানালা খুলিয়া দিয়া আমি যখন "অন্ধকারের ভাষা" কিম্বা "প্রতিপদের চাঁদ" লইয়া কবিতা লিখিতাম তখন বেচারা অনুকূল আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া হিমের হাত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিত। আশ্চর্য্য, একদিনের জন্যও আমার কার্য্যে প্রতিবাদ করিত না। কবিতা লিখিয়াই শুধু তৃপ্তি হয় না! পাঠকের প্রয়োজন! অনুকূল অকৃত্রিম উচ্ছাসে আমার কবিতার প্রশংসা করিত। আমায় মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের উপরে আসন দিত! আমিও যে অতি সহজে তাহা গ্রহণ করিতাম এ কথা বলা বাহুল্য।

এইরূপে একজামিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে "ফেল" হইতে বেশী ক্লেশ পাইতে হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনুকূলটা ফাষ্ট ডিবিসনে পাস হইয়া গেল। বাবা খুব রাগ প্রকাশ করিলেন। আত্মীয় বন্ধুরা দিন কতক কবিতা ও চিঠি লেখা সংক্ষেপ করিতে উপদেশ দিলেন। কেবল দুইটী ভক্ত হৃদয় আমার মহিমা গৌরবে বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করিতে দিল না। অনুকূল বলিল, পাসতো সবাই করে, এতে আর

সকলের থাকে না” ইত্যাদি। স্ত্রী শৈলবালা তাহাতে সম্পূর্ণ মত দিলেন। কিন্তু এই দুইটী ভক্ত হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস সত্বেও নিজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেক খানি কমিয়া গেল। লজ্জিত ভাবে পূর্ণবেগে পড়ায় মন দিলাম।

পর পর একজামিন দিয়া যখন “এমে” পড়িতে আরম্ভ করিলাম, সেই সময় একদিন বসন্তের প্রভাতে বসন্ত মঞ্জরীর মতই কোমল লাবণ্য ভরা দেহলতা, পরিপূর্ণ হৃদয়-ভরা প্রেম লইয়া, আমার ষোড়শী স্ত্রী আমারই চক্ষের সম্মুখে তাহার অসম্পূর্ণ ঘরকন্নার মধ্যে অসম্পূর্ণ জীবন-যাত্রায় বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রথম আমার সংসার শূন্য, পৃথিবী তিক্তস্বাদ, জীবন ধারণ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইয়াছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট, বৃন্তচ্যুত, শুষ্ক পত্রের মত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু মানুষ চিরদিন শোক বহিয়া বেড়াইতে পারে না, আমিও আমার রসায়নের যন্ত্রগুলার উদ্ধার সাধন করিয়া বিজ্ঞানের বই খুলিয়া বসিলাম ; দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমার পুনরায় বিবাহের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ—এমন কি অশ্রু-জলবর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে জানাইলাম যে এরূপ উৎপীড়ন করিলে অগত্যা বাধ্য হইয়া আমাকে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন এক মুহূর্ত্তে চারি দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

আমার স্ত্রী-বিয়োগের দুই বৎসর পরে অনুকূলের এক শ্যালিকার বিবাহে অনুরুদ্ধ হইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে অনুকূলের শ্বশুর বাড়ী তারাপুরে গেলাম। তারাপুর একখানি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে সহরের অবিশ্রান্ত কার্য্য-স্রোত জন-স্রোত সমস্ত সহরকে জাগাইয়া রাখে না। এখানে ঘোড়ার গাড়ী কদাচিৎ দেখা যায়। প্রকৃতির শ্যাম স্নিগ্ধ অতলতলে সমস্ত গ্রামখানি যেন সুখসুপ্ত। বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গেলে অনুকূল প্রস্তাব করিল, একদিন শিকারে যাইতে হইবে। শিকারে আমার

বরাবরই উৎসাহ ছিল। এক দিন দ্বি-প্রহরে আহারাদির পর দুই বন্ধুতে নিস্তব্ধ পল্লী মধ্যে বন্দুক হস্তে আম্র ও অশোক বৃক্ষের ছায়াচ্ছন্ন মেটে রাস্তা দিয়া শিকার যাত্রা করিলাম। মনে পড়িল পঠদ্দশায় যখন আমরা কলিকাতায় থাকিতাম, গ্রীষ্মের ছুটীতে বাটি আসিয়া, দুই বন্ধুতে এমনি করিয়াই শিকারে বাহির হইতাম। তখনকার সে দিন গুলি কি মধুর কি শোভনীয়ই না ছিল! বয়সের ও অবস্থার সঙ্গে মানুষের মনেরও কি পরিবর্ত্তন ঘটে! আমাদের গন্তব্য স্থান অধিক দূরবর্ত্তি ছিল না। অনুকূলের শ্বশুরবাড়ীর অনতিদূরে পশ্চিম প্রান্তে জমিদার বাবুদের একটা খুব বড় রকম আম বাগান ছিল। তাহারই খানিক অংশ বড় বড় কালকাসুন্দে সেওড়া প্রভৃতি নীচ জাতীয় বৃক্ষে জঙ্গলের মত করিয়া রাখিয়াছিল। যদিও সে জঙ্গলে ব্যাঘ্র ভল্লুক কি কোন হিংস্র জন্তুর লুক্কায়িত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব তথাপি আমরা ঐ স্থানটীকেই শিকারের জন্য মনোনীত করিয়াছিলাম। বাগানের ভিতর মধ্যে মধ্যে দুই একটা সংস্কার-হীন পঙ্কিল পুষ্করিণী, কোথাও শৈবালাচ্ছন্ন ডোবা। তাহাতেই রৌদ্র-কাতর জলচর পক্ষী ও গোটাকত কর্দ্দমাক্ত পাতিহাঁস মহা কলরব তুলিয়া সাঁতার কাটিতে ছিল। আমাদের পদশব্দে দু-একটা খরগোশ ও কাঠ বেরালি শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলাইল। একটা জাম গাছের উপর এক ঝাঁক ডাক্ পাখী দল বাঁধিয়া কোলাহল তুলিয়া স্তব্ধ মধ্যাহ্নকে সজাগ করিয়া তুলিতেছিল। তাগ্ করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম, পরক্ষণেই একটা অস্ফুট কাতর কণ্ঠের চীৎকার শুনিতে পাইলাম। আমরা অতি মাত্র বিস্ময়ের সহিত অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অপূর্ব্ব! জীবনে এমন কখনও দেখি নাই। দেখিলাম আমাদের হাত পাঁচ সাত দূরে একটা অপরিচ্ছন্ন ডোবার ধারে একটা হেলিয়া-পড়া জাম

স্বরূপ সেই রক্তাক্ত আহত পক্ষীটিকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া অঞ্চল দিয়া তাহার রক্ত মুছিয়া দিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজলে পাখীটীর রক্তস্রোত ধৌত হইয়া গিয়াছে। মেয়েটীর পায়ের কাছে চারিদিকে রাশীকৃত জাম পড়িয়া আছে, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে তিনি ফল সংগ্রহ করিতেই আসিয়াছিলেন। আমার মনে পড়িল "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমঃ গমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" যে নিষ্ঠুর দৃশ্যে দস্যুকে মহাকবির আসন দিয়াছিল আজ যেন দিবালোকে সেই চির অতীতের যবনিকা উত্থান করিয়া আমার চক্ষে এক অপূর্ব্ব মায়া-লোক সৃজন করিল। আমিই যে সে নিষ্ঠুর দৃশ্যের এক মাত্র অভিনেতা তাহাও যেন ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল এ বুঝি কাব্যজগতে আসিয়াছি, এখানে শুধু স্নেহ, শুধু করুণা, আর এই যে করুণাময়ী নারী—এ বুঝি চিরদিন অমনি আর্ত্তের শুশ্রূষা করিবার জন্য অবতীর্ণা! আজ যে ঠিক কি ভাবিয়াছিলাম তাহা নিজেই বলিতে পারি না, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শিকার কার্য্যটাকে যে এত বীভৎস বলিয়া বোধ হয় নাই তাহা নিশ্চয়। বন্দুক হস্তে আমাদের দুই শিকারীকে দেখিয়া মেয়েটী এমন গভীর ঘৃণা-পূর্ণ অবজ্ঞার সহিত চাহিয়া দেখিল যেন আমরা কোন ভয়ানক দুষ্কৃতকারি রাজদণ্ড-প্রাপ্ত অপরাধী! অনুকূল কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি কমলা, তুমি এখানে! তা কি আমরা জানতুম, জান্‌লে কখনই এত বড় বেয়াদপি করতে সাহস করতুম না!" কমলা উত্তর দিল না, সে উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম "যদি বিশ্বাস করে পাখিটী আমায় দেন একবার চেষ্টা করিয়া দেখি যদি বাঁচাইতে পারি!" কমলা বিনাবাক্যে পাখিটী আমার হাতে ফিরাইয়া দিল, একবার কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, আমিও

কমলা লজ্জিত ভাবে মুখ নত করিল। মনে হইল ঐ দৃষ্টির বিনিময়ে শত সহস্র পাখীর জীবন দানও তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু হায় মনুষ্যের ক্ষুদ্র শক্তিতে সেই তুচ্ছ ব্যাপারও বৃহৎ হইয়া উঠে। আমার প্রাণপণ যত্নে ও চেষ্টায় পাখিটার ভবযন্ত্রণা শীঘ্রই অবসান হইয়া গেল! আশ্চর্য্যের বিষয় অনুকূল আমার কার্য্যে সাহায্য না করিলেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিল না। সে বালিকার সযত্ন-সঞ্চিত স্তূপীকৃত জাম হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাহার ভক্ষণে মনোনিবেশ করিল :

সেই দিন বাড়ী ফিরিয়াই অনুকূলের কাছে কমলার পরিচয় লইলাম। কমলা অনুকূলেরই এক জ্ঞাতি খুড় শ্বশুরের কন্যা। কমলার পিতা রামতারণ বসু একজন দরিদ্র স্কুল মাষ্টার, মাত্র ১০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সংসার চলে। কমলা পিতার বড়ই আদরের কন্যা। মেয়েটি দেখিতে যেমন সুন্দরী, গৃহকার্য্যে আচার-ব্যবহারে তেমনি সুশীলা, আর পল্লিগ্রামের মেয়েদের পক্ষে যাহা অনেকটা অসম্ভব, তেমনি ভাবে সুশিক্ষিতা। পিতা স্বহস্তে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু শুধু রূপ বা গুণ থাকিলে সংসারে মেয়ের বিবাহের যথেষ্ট সার্টিফিকেট হয় না। মেয়ের রং কাল হইলে সাবান পাউডার সংযোগে, চুল না থাকিলে জবজবে করিয়া তৈল লেপিয়া, চোখ ছোট হইলে সুর্‌মা লাগাইয়া কোনরূপে কাজ সারিয়া লওয়া চলে, কিন্তু কন্যার পিতার অর্থাভাব থাকিলে বিবাহ একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। তাই মেয়েটির বয়স অধিক হইলেও বিবাহ ঘটিয়া উঠে নাই। সম্প্রতি পাড়াপড়সীর নিদ্রা-হীনতায় ও গৃহিণীর গঞ্জনায় রামতারণ তাঁহার কমলার জন্য নারায়ণের আশা ত্যাগ করিয়া এক ৫০ বৎসরের প্রৌঢ়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। পাত্রটী কোন্ পাটের কলের গুদাম সরকার, মেয়েটির রূপ দেখিয়া পাত্র অমনিই বিবাহ করিতে

পারে, যুবারা তাহা পারে না ! অনুকূলের বক্তৃতা কতক্ষণ চলিয়াছিল বলিতে পারি না, আমি তখন ভাবিতেছিলাম, "আহা, এমন মেয়েটী শেষ কিনা একটা গণ্ডমূর্খ বৃদ্ধ গুদাম-সরকারের সুখ দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তাহার ব্যর্থ জীবন বহন করিবে। করুণায় আমার চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কোন লোক অর্থ সাহায্য করে তাহাতে মেয়েটির কোন সুপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না ! অনুকূল মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহাতেও আশা নাই ! কারণ দরিদ্র রামতারণ বোস অর্থহীন হইলেও তাহার সম্মানবোধ কিছু অধিক, সে কাহারও নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তবে যদি কোন পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ বা কোন বিপত্নীক দয়া করিয়া মেয়েটিকে গ্রহণ করেন সে আলাদা কথা; উপসংহারে বিশেষ করিয়া জানাইল যে কমলার অদৃষ্ট অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাহার উদ্ধারের কোন আশাই নাই। অনুকূল চলিয়া গেল।

ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, দূরে ঝিল্লি ও ভেকের কলরব স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, বাগানে গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। বৃষ্টির ছাঁট আমার গায়ে আসিতে লাগিল। একটা অকারণ বেদনায় আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল !

কমলাকে বিবাহ করিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিলাম। বলা বাহুল্য, উভয়পক্ষের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইলেন না। কেবল দুই একজন পরিহাসপ্রিয় বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্বিতীয় বিবাহটা কিরূপ অনুমান হইতেছে ?" অনুকূল বার বার করিয়া সকলকে বুঝাইতে চাহিলেন যে 'এ বিবাহ শুধু অনাথার প্রতি করুণা, ইহাতে হৃদয়ের ব্যাপার কিছুই ছিল না।' কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কথাগুলা আমার ভাল লাগে নাই, অপরাধ করিয়া তাহা স্বীকার করিবার বল আমার আছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কার্য্যে আমি কোন দোষ দেখি নাই, এবং কেহ কখনও দেখে নাই।

বধূ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। মা আসিয়া "এস আমার ঘরের লক্ষ্মী" বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। দেখিলাম তাঁহার সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিয়াছে। মনে পড়িল,—আর একদিন এমনি উৎসব-কোলাহলের মধ্যে, একখানি নোলকপরা, অশ্রুভরা, লজ্জাবনত, সুন্দর মুখ এমনি করিয়াই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—সে আজ কোথায়!

অল্পদিন পরেই বুঝিলাম, আমি ভুল করিয়াছি। কমলাকে সুখী করিতে গিয়া দারুণ অসুখী করিয়া তুলিয়াছি,—যদিও আত্মীয় স্বজন হইতে দাস দাসী পর্য্যন্ত সকলেই কমলাকে ভালবাসিত, বাবা কমলাকে "মা লক্ষ্মী" বলিয়াই ডাকিতেন, আমার বোন নীরুর মতই তাহাকে স্নেহ যত্ন করিতেন। আর আমি? সে কথা না বলাই ভাল। তথাপি কমলা অসুখী। ভালবাসা মানুষকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করে। তাই আমি বুঝিয়াছিলাম এ বিবাহে কমলা সুখী হইতে পারে নাই। বাহ্যিক ব্যবহারে তাহাকে দেখিলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কমলা গরীবের ঘরের মেয়ে, সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে তাহার শ্রান্তি বা আলস্য নাই। অল্প দিনের মধ্যেই সে তাহার ধনীগৃহদুর্লভ কর্ম্ম-পটুতায়, মিষ্ট কথায়, মিষ্ট হাসিতে সকলকেই বশ করিয়া লইয়াছিল। কমলার স্বাস্থ্যপূর্ণ, সরল সুন্দর মুখে এমনি-একটি শান্ত শ্রী, স্নিগ্ধ লাবণ্য মণ্ডিত ছিল যাহা একবার মাত্র দেখিলেই মনের মাঝে মুদ্রিত হইয়া যায়! কমলার ব্যবহারে এমন কোন অপরাধ দেখা যায় না, যাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু তাহার অনলস সেবা-যত্নে, আদেশ-পালনে যেন জীবন্ত ভাব নাই। তাহা যেন সুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধে! আমি যেন কন্যাদায় হইতে তাহার পিতাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই সে আমার নিকট কৃতজ্ঞ; শুধু এইটুকু মাত্র, আর কিছু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী কি শুধু ঘর-কন্নার কাজ করিবার যন্ত্র! আমার এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটাকে

আমি কিছুতেই নিজের আয়ত্তাধীন মনে করিতে পারিতাম না। কাঁচের বাসন যেমন একবার ভাঙিয়া গেলে আর ঠিক খাঁজে খাঁজে জোড়া লাগে না, লাগিলেও জোড়ের দাগ থাকিয়া যায়; আমাদের হৃদয়ের খাঁজেও জোড়ের দাগ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। যে জিনিষ পাওয়া যায় না তাহাতে আগ্রহ অধিক, আমার সমস্ত হৃদয় ভালবাসার আগ্রহে, কবিত্বে, ফুলে ফুলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মনে হইত হঠাৎ একটা বসন্তের দমকা হাওয়া আসিলে একদিন সহসা উচ্ছ্বসিত, উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে। বসন্তের হাওয়া আসে, আমার রুদ্ধ হৃদয় বেদনায় টন্ টন্ করিতে থাকে। দূরে থাকিয়া মনে হয় কমলাকে এই কথা বলিব, এরূপে আদর করিব। কাছে আসিলে সে গুলা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, হাস্যজনক বলিয়া মনে হয়। যদিই বা কোনদিন হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কোন ভালবাসার কথা বলিয়া ফেলি, আমার স্ত্রী এমনি আগ্রহ-শূন্য অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহা গ্রহণ করেন যে মনে হয় আমার সমস্ত আদর সোহাগ তাঁহার বর্ম্মাচ্ছাদিত মনের বাহির হইতেই স্খলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। প্রথম প্রথম তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভাল ভাল কাব্য উপন্যাস আনিয়া পাঠ করিতাম। অনেক হা-হুতাশ অশ্রুজলসিক্ত কবিতা লিখিয়া অসাবধানে তাহার চোখের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিতাম। আবার কখন বা কোন সৌখীন দ্রব্য আনিয়া উপহার দিতাম। পাথরে যেমন দাগ বসে না, তাঁহার অবিচলিত মুখে তেমনি কোন ভাব আনিতে পারিত না। সাংসারিক অন্যান্য কাজ কর্ম্মের সহিত তিনি আমার আদর ও উপহার গ্রহণ করিতেন। সাধারণতঃ আমার স্ত্রী আমার সহিত খুব অল্প কথা কহিতেন, যেখানে হাঁ কিম্বা না বলিলে চলিত সেখানে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিতেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি নীরুর সহিত কিম্বা আমাদের দাসীর সহিত তাহার ওজন-করা কথার দাঁড়ি অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িত।

একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে, শয়নকক্ষে ইজি-চেয়ারের উপর শুইয়া ভাবিতেছি—আমার হাত হইতে ইতিপূর্ব্বে-পঠিত সংবাদ-পত্রখানা বাতাসে উড়িয়া মেজের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। খোলা জানলা দিয়া শীতের বাতাস আমার শরীরে একটা স্নিগ্ধতা আনিয়া দিতেছিল। এমন সময় মৃদু পদসঞ্চারে কমলা গৃহে প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর পানের ডিবে রাখিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে টানিয়া আমার পাশে বসাইলাম। তাহার সুবাসিত কেশগুচ্ছ নাড়িয়া দিয়া, একটু আদরের সুরে বলিলাম, "তুমি বড় নিষ্ঠুর!" কমলা কথা কহিল না; মুখ নত করিয়া কি-একটা দেখিবার ভাণ করিল। জ্যোৎস্নালোক তাহার নিটোল সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। শীতের বাতাস, জ্যোৎস্নার আলো কমলার কেশের মৃদু গন্ধ.—সমস্তগুলা মিলিয়া মিশিয়া আমায় কেমন বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা বলিয়া উঠিলাম, "কমলা তুমি জান না তোমায় আমি কত ভালবাসি, হৃদয় যদি দেখাবার হ'ত"—সহসা সচকিত হইয়া দেখি কমলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে সজোরে আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া মনোভাব গোপন করিতে চাহিল। বুঝিলাম, তাহার অত্যন্ত বেদনার উপর আঘাত দিয়াছি, কিন্তু কিসে? আমার ভালবাসা কি কমলার বেদনার কারণ? সেই দিন ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া মনে মনে বলিলাম, "তাই হোক্, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমা হইতে দূরে থাকিয়া যদি তুমি শান্তি পাও আমি তাহাতে বাধা দিব না; স্বামীর অধিকার লইয়া কোন দাবী রাখিব না। ইহাতে যদি আমার সমস্ত জীবন দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া যায়,—তাহাও আমি সহ্য করিব।"

এই সময় স্বদেশী আন্দোলন দেশে নব-জীবন আনয়ন করিয়াছিল। আমার লক্ষ্যশূন্য কর্ম্ম-হীন জীবনে আমি নূতন পথ দেখিলাম। কার্য্য-

স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিলাম। সে কি মুক্তি! সে কি স্বাধীনতা! মনে মনে বলিলাম,—"ভগবান্ তুমি আমায় মুক্তি দিয়াছ ভালই করিয়াছ, আমার যখন বিশেষ করিয়া কাহারও জন্য ভাবিবার নাই, তখন যেন জগতের জন্য ভাবিতে পারি। আমার ভালবাসা যেন সমস্ত সংসারকে দিতে পারি।" সৎকার্য্যে মন দিলে কাজের অভাব হয় না। আমি প্রথমেই বরিশালের দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট মৃতপ্রায় নরনারীর সাহায্যে অগ্রসর হইলাম। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু পারি নিজে এবং বড় ছোট সকল লোকের নিকট চাঁদা তুলিয়া বুভুক্ষুদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময় অনেক স্বেচ্ছাসেবক এবং অনেক দানশীল সহৃদয় মহাপুরুষ আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। বরিশাল হইতে ফিরিয়াই শুনিলাম আমাদের জমিদারীতে জন-কয়েক পাদরি-বেশধারী খৃষ্টান প্রজাদের নিকট হইতে সমস্ত ধান্য ক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। বাড়ীতে এক দিনও বিশ্রাম না লইয়া জমীদারীতে উপস্থিত হইলাম। সে গ্রামের প্রজারা অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষিজীবি। তাহারা জটিল সংসারের কুটিল রহস্যের কোন খপরই রাখে না! একদিন সকালে আমাদের কাছারি বাড়ীতে সমস্ত প্রজাদের আহ্বান করিয়া সরল ভাষায় পরিষ্কার রূপে দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দিলাম। বিদেশী বণিকেরা যে কিরূপে আমাদের শস্যশ্যামলা ধন-ধান্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী জননীকে ভিখারিণী সাজাইয়া অবশেষে আমাদের বহু কষ্টের অন্ন, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুরের মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাও নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নয়, আমাদের জব্দ করিবার জন্য, আমাদের উৎপীড়নের জন্য, সেই দিন তাহারা পরিষ্কাররূপে আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিল! বিদেশী বণিকদের সম্বন্ধে চারিদিক হইতে অসন্তোষের কল-কল ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই দৃঢ় সংকল্পের সহিত পুনরায় বিদেশীবর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিল। সভাস্থলে দেশের

অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ছিল, গ্রামের নিকটে কোন দেবালয় না থাকায় গ্রামবাসী সকলের পূজার্চ্চনায় দেব-মন্দিরটী গ্রামের মধ্যে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। একদিন সংবাদ পাইলাম, দুইজন মোল্লাবেশী মুসলমান মন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া লোক জড় করিয়া মুক্তকণ্ঠে হিন্দুর দেবতা মাটির ঢেলা, এবং হিন্দুর উপর অত্যাচার রাজার আদেশ, ধর্ম্মের আদেশ এবং নবাবের আদেশ বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল! হিন্দু বিধবাকে নিকা করিবার কথাও ছিল! হিন্দু প্রজারা ক্ষেপিয়া গিয়া আমার আদেশ প্রার্থনা করিল। তাহারা একবার মোল্লাদের রক্ষা-কর্ত্তার সম্বন্ধে হাতে হাতে প্রমাণ চায়! অনেক কষ্টে সেদিন তাহাদের শান্ত করিয়া পরদিন পুনশ্চ সভা করিয়া বক্তৃতা দিয়া সকলকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিলাম।

যখন ওজস্বিতা-পূর্ণ বক্তৃতায় চারিদিকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হইল, হিন্দু মুসলমান সমস্বরে একতাবদ্ধ হইতে, বিদেশী বর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, সেই সময় সহসা পুলিশ ইনস্পেক্টর আসিয়া আমায় রাজ-বিদ্রোহিতা প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন!

আমি স্বদেশীর একজন নেতা, স্বদেশীর পক্ষপাতী এবং বন্দে মাতরম্ উচ্চারণকারী সুতরাং আমার বিরুদ্ধে অপরাধ-প্রমাণের কোনই অভাব হইল না। সকল কথা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, বিচারে আমার ছয় মাস সপরিশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল! বাবা সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আপোষে মোকদ্দমা মিটাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহাতে কিছুতেই রাজী হই নাই। অবশেষে বিচার ফল প্রকাশ হইলে তিনি হাইকোর্টে আপিল করিলেন, তাহাতেও আমি যথেষ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "বিচারের নামে অবিচারের প্রহসন দেখিবার আর আবশ্যক নাই!" তিনি কোন কথাই

শুনিলেন না। মোকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিল। সেখানকার বিচারে আমার পরিশ্রম বাদ দিয়া পূর্ব্ব রায়ই বাহাল রহিল। আত্মীয় বন্ধুদের অশ্রুজল হাহাকারের মধ্য দিয়া ভয়ানক-অপরাধে-অপরাধীর দণ্ডভূমি, সুদৃঢ় লৌহ-কবাটযুক্ত জেলখানায় চলিলাম! সে দিন আদালত গৃহের শান্তি রক্ষা অসম্ভব ব্যাপার হইয়াছিল। চারিদিক হইতে অবিচারের অসন্তোষ ও সুগভীর বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমি জেলখানায় প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমার সান্ত্বনা আছে,—আমি জানি আমি স্বদেশের জন্য আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির জন্য শাস্তি গ্রহণ করিলাম, তাহা আমার পক্ষে শাস্তি নয়, পুরস্কার!

জেলখানা হইতে যেদিন বাহির হইলাম, সে দিন আমায় মহা-সমারোহে অসংখ্য লোকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে পনের আনাই যে স্কুল কলেজের ছাত্র তাহাতে অনুমানেরও আবশ্যক করে না! অনুকূল অগ্রসর হইয়া আমার গলায় এক ছড়া বেলফুলের মালা পরাইয়া দিল। চারিদিক হইতে ফুল ও খই ছড়াইয়া ভক্তেরা আমার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। প্রণাম, আলিঙ্গনের ধূম পড়িয়া গেল। আজ যেন আমি বিদেশী রাজাকে জয় করিয়া আমাদের দ্বিখণ্ডিতা, পদ-দলিতা, বিদেশীর ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা অন্নকৃষ্টা বঙ্গমাতাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছি! গগনভেদী বন্দে মাতরম্ শুনিতে শুনিতে শকটারোহণে বাটী ফিরিলাম। আমার ভক্তমণ্ডলী গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা টানিতে চাহিয়াছিলেন, আমি কিছুতেই তাহাতে রাজী হই নাই।

বাড়ী আসিলাম। বাবা তখন একটা মোকদ্দমার কাগজ খুঁজিতে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া কাগজ খুঁজিতে লাগিলেন! বোধ হয় অশ্রুজল গোপন করিলেন! বৃদ্ধ দেওয়ান বলে যে এই ছয় মাস রাত্রে বাবুকে ঘুমাইতে সে দেখে নাই! সমস্ত রাত ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন! পাছে আমায় উৎসাহ দেওয়া

হয়, তাই বোধ হয় এ গাম্ভীর্য্যের ভাণ! মা আমায় দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন, আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া ছোট ছেলেটীর মত বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন। সংসারে মা-ই শুধু অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন! অনেক দিন পরে আবার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকে দেখিতে পাইব! সে আমার দুরাশা! বেহারা ঘরে আলো দিয়া গেল, একখানা বই লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম, ভাল না লাগায় রাখিয়া দিলাম। বার বার মনে মনে বলিলাম, "পাষাণী!"

আমি সেই হৃদয়হীনার ধ্যানে দুর্ভেদ্য কারাগৃহে নিকৃষ্ট শয্যায় বসিয়া স্বর্গ-লোকের স্বপ্ন দেখিয়াছি! হাঁ, সেই পাষাণ-প্রতিমারই ধ্যানে! সে তখন বোধ হয় পরম নিশ্চিন্ত মনে সখী সঙ্গে রহস্যালাপে, তাস খেলিয়া, নভেল পড়িয়া কাটাইয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি স্পর্শমণি পাথরকে সোণা করিতে পারে। কিন্তু আমার এই হৃদয়ভরা প্রেম, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, এই ২৬বৎসরের রূপ যৌবন, কিছুই সেই হৃদয়হীনা বালিকাকে সচেতন করিতে সক্ষম হইল না। 'কমলা, কমলা, তুমি জান না তোমায় কত ভালবাসি, ভালবাসি তাই জোর করিয়া স্বামী-গৌরব আদায় করিতে চাহি নাই।' সমস্ত সংসারটা ধূলিমলিন জীর্ণ চীরখণ্ডের মত আমার চক্ষে একান্ত অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া, পানের ডিবা হাতে কমলা পূর্ব্বের মতই গৃহে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, কমলা কিছু কৃশা হইয়া গিয়াছে! তাহার স্বাভাবিক গৌরবর্ণে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভায় ঈষৎ পাণ্ডুতা প্রকাশ পাইতেছিল। বোধ করি ইতিপূর্ব্বে তাহার পীড়া হইয়া থাকিবে! আহা, সে সময় যদি আমি কাছে থাকিতাম! কমলাকে দেখিয়াই আমার বিদ্রোহী হৃদয় ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আমার সম্মান-জ্ঞান আমায় অবিচলিত রাখিয়াছিল।

কমলা টেবিলের উপর পানের ডিবে রাখিয়া আমার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া আমার পাশে বসাইলাম। তাহার মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। আজ কমলা তাহাতে বাধা দিল না, সে যেন একান্ত নির্ভরপূর্ণ ভাবে আমার বুকে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। মনে হইল আজ আর যেন কোন বাধা-ব্যবধান নাই, সে যেন আজ একান্ত-ভাবে আমারি! সহসা স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় বলিলাম, "কমলা, জান না তোমায় আমি কত ভাল বাসি"—বলিয়াই চকিতভাবে চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, কমলা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল না, আমার বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল না, সুধু দুটী করুণ অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই, তোমার গভীর হৃদয়ে সন্দেহ করিয়া তোমায় অসুখী করিয়াছি।"—বলিতে বলিতে আবার সে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অতি কোমল করুণ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিল,—"ঈশ্বর জানেন, আমি নিজে কত কষ্ট পাইয়াছি। তোমায় অবিশ্বাস করিয়া, তোমার স্নেহে সন্দিহান হইয়া আমার সমস্ত জীবন ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। জানিতাম না পুরুষের ভালবাসা কত বিস্তৃত! আপনাকে লোকের খেলিবার পুতুল, বিলাসের উপাদান, সখের সামগ্রী মনে করিয়া শতবার ধিক্কার দিয়াছি। এই হেয় ঘৃণিত জীবন স্বহস্তে নষ্ট করিতে চাহিয়াছি। তুমি যখন অকপটে ভালবাসা ব্যক্ত করিয়াছ, তখন তোমায় ছলনাকারী প্রতারক মনে করিয়া মাটীর সহিত মাটী হইয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি আর একদিন আর একজনকেও ঠিক এমনি করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছ! ভালবাসাকে আমি সঙ্কীর্ণ পঙ্কিল পুষ্করিণী মনে করিয়াছিলাম, জানিতাম না তাহা মহাসমুদ্র! জানিতাম না তুমি কত মহৎ! তুমি আমার দেবতা!"

কমলা,—সেই কমলা, সেই স্বল্পভাষিণী নিয়মচারিণী হৃদয়হীনা কমলা! আমি তাহাকে উঠাইয়া হৃদয়ে ধারণ করিলাম। আমার অশ্রু-জলে কমলার কেশরাশি আর্দ্র হইয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আজ পাষাণে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে! আমার সকল কষ্ট সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে! লাঞ্ছিতের শিরে আজ রাজমুকুট শোভা পাইতেছে, তোমরা সকলেই প্রাণ ভরিয়া বল, "বন্দে মাতরম্!"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পরমাণুতত্ত্ব।

পরম ও অণু এই দুই শব্দ যোগে উৎপন্ন পরমাণু শব্দের অর্থ অতি সূক্ষ্ম। কেবল আমাদের দেশের ভাষাতেই মাত্র নহে, অপরাপর দেশের ভাষা হইতেও দেখা যায়, দ্রব্যের বিভাজ্যতার ধারণা হইতেই পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। ইংরাজী Atom শব্দটী Greek ভাষার ধাতু হইতে আসিয়াছে, তাহার ইংরাজী ল্যাটিনজাত প্রতিশব্দ হইতেছে Individual অর্থাৎ যাহার আর ভাগ নাই। আমাদিগের দেশের বৈশেষিক দর্শনের মতে কোন বস্তুকে ভাগ করিতে করিতে যখন তাহা এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর ভাগ করা যায় না, তখন ইহার পরমাণুত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু দ্রব্যের বিভাজ্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ না থাকিলেও এই বিভাজ্যতার সীমা কোথায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। পরমাণুবাদীগণ পরমাণুকে এই বিভাজ্যতার শেষ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই মতের প্রতিবাদকারীগণ বলেন যত ক্ষুদ্রই হউক পরমাণুর আকার আছে স্বীকার করিলেই তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারের বস্তুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়, আর যদি পরমাণুর আকার নাই বলা হয় তবে নিরাকার পদার্থ হইতে সাকারের উৎপত্তির কল্পনা করা হয়। সুতরাং বস্তুর বিভাজ্যতা অসীম অর্থাৎ এই বিভাগ প্রক্রিয়ার কোন সীমাই থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে পরমাণুবাদ বৈশেষিক গণের মতসিদ্ধ, বৈদান্তিকগণ এই মত খণ্ডন করিয়া মায়াবাদের স্থাপনা করিয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্রের পরিভাষায় পরমাণু অপর কয়েকটী নামে কথিত হইয়াছে, যথা তন্মাত্র (কেবল সেইটুকু) মূল ধাতু (Alchemist গণের

নৈয়ায়িকগণের মতে আকাশ যেরূপ অসীম ও অনন্ত, পরমাণু সেইরূপ অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত। মহাপ্রলয়ে গ্রহ নক্ষত্র তারকা প্রভৃতি বিশ্ব বিনাশ প্রাপ্ত হইলে সেই সকলের পরমাণু আকাশ গর্ভে লুক্কায়িত থাকে। কনাদ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া স্থলে বলিয়াছেন—পরমাণু সকল প্রলয়াবস্থায় নিশ্চল থাকে, যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন ঐ সকল পরমাণু জীবাত্মার প্রভাবে সচল হয়, যেই সচল হয় অমনি সংযুক্ত হইতে থাকে, পরে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতি রূপে সমুদয় জড় জগৎ উৎপন্ন হয়। এই মতে গিরি নদ সমুদ্রাদি বিশিষ্ট এই জগৎ সাবয়ব। এই মতের সহিত পাশ্চাত্য কবি Dryden এর সময়ে সৃষ্টির আরম্ভের ধারণার মিল দেখাইবার জন্য তাঁহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: When nature underneath a heap of jarring atoms lay, and could not heave her head a tuneful voice was heard from high. Arise, ye more than dead, then cold and hot and moist and dry in order to their stations leap, And ... ... this universal frame began.

এই মতে পদার্থের লয় নাই (Matter is indestructible) এটাও প্রকারান্তরে স্বীকৃত। পাঞ্চ ভৌতিক মতের বা মায়াবাদের চর্চ্চা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

হিন্দুশাস্ত্রের পরমাণুবাদের ন্যায় পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের ইতিহাস ঘটনা শূন্য নহে। ইউরোপে গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রিটস্ সর্ব্ব প্রথমে পরমাণুবাদের প্রচার করেন। তাঁহার মতে সকল দ্রব্যই অতি ক্ষুদ্র ও অবিভাজ্য পরমাণুসমূহের সমষ্টি মাত্র; ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরমাণুর আকার ও উক্ত দ্রব্যের মধ্যে উহার অবস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম একইরূপ কি না সে বিষয়ে কোন কথা তিনি না বলায় উহা লইয়া

প্রথমে দ্রব্যের অসীম বিভাজ্যতার কথা প্রচার করেন। পরমাণুবাদী লুক্রেসিয়স্ তাঁহার সমুদয় তর্ক খণ্ডিত করিয়াছেন। ইঁহার মতে পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান ও বিভিন্ন বেগে গতি হইতেই সকল দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কি তাঁহার মতে আত্মাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকগণের পর Descartesই আবার এক নূতন পরমাণু বাদের প্রচলন করিলেন। "অবিভাজ্য" পরমাণু হইতে যে সমস্ত পদার্থের ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন না। বলিলেন, বড় জোর এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহা কোন নর শক্তি দ্বারা বিভাজ্য হইবার নয়, কিন্তু তিনি স্বয়ংও যে এ গুলিকে বিভাগ বা বিনষ্ট করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াই তিনি স্বীয় ক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে অক্ষম। ইহার পরই লিবজিক্ তাঁহার Monad কেই সর্ব্ব পদার্থের মূল বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞান কেবল পরমাণুর অস্তিত্ব ও তাহা হইতেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি পর্য্যন্তই স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। এই সময়ে পরমাণুবাদীগণের মধ্যে যে মত ভেদ হইয়াছিল তাহা পরমাণুর সহিত কোন দ্রব্যের পরিমাণের (Quantity) সম্বন্ধ লইয়া। একদল বলিতে লাগিলেন, পরমাণু সংখ্যা হইতে দ্রব্যের পরিমাণ হইতে পারে, পরমাণু সকলের পরস্পরের মধ্যে যে শূন্য থাকে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। অপর পক্ষ বলেন, যখন পরমাণুর সংখ্যা করা যায় না, তখন কেবল পদার্থ-দর্শনের সুবিধার জন্য ও কথা স্বীকার করা যায় না। Avogadro প্রথমেই বলিলেন, একই অবস্থায় একই পরিমাণের বাষ্পে সমান সংখ্যক অণু (molecules) থাকে। একই অবস্থায় এই কথায় একই চাপ ও একই উত্তাপ বুঝায়। ইহার সহিত Boyle ও Charles এর নিয়মের

উপায় বাহির হইল। বিজ্ঞানে প্রকৃত সংখ্যা বা গুরুত্ব অপেক্ষা এই আপেক্ষিক সংখ্যা বা গুরুত্বই অধিক প্রয়োজনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ এইরূপ ছিল, কোন রসায়নিক পরিবর্ত্তনে কোন রূঢ় পদার্থের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে অংশ পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই তাহার পরমাণু। সুতরাং পরমাণু অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু সাধারণতঃ পরমাণু অযুক্তভাবে (Nascent State) অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না। ভিন্ন প্রকারের পরমাণুর সহিত মিলিত না পাইলে দুই বা ততোধিক একই প্রকারের পরমাণু পরস্পরে মিলিত হইয়া একটি রূঢ় অণু (Elementary Molecule) সৃষ্টি করে। কোন কোন ধাতুর পরমাণুই অণু সেখানে একটি পরমাণুও পৃথক থাকিতে পারে। একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ঠিক একই আকারের, একই ওজনের ও একই ধর্ম্ম বিশিষ্ট ও সেই বস্তুর গুণ তাহার পরমাণুসমূহের গুণের সমষ্টি মাত্র। পরমাণুর আকার কত বড় সে সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু পরমাণুর ধর্ম্ম ও আকার সম্বন্ধের জ্ঞানের প্রতি এরূপ অনাদর পূর্ব্বে ছিল না। দার্শনিক লিবনিজকে ছাড়িয়াও দেখা যায় বৈজ্ঞানিক Alchemist গণের সকলেই যে সকল পদার্থের মূল একই পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লৌহ হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার তাঁহারা যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারও কারণ তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস। এক সময়ে Prout ত স্পষ্টই বলিয়াছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু উদজান (Hydrogen) পরমাণুই সকল পদার্থেরই মূল। মিলিত পরমাণুর সংখ্যার ভিন্নতাই দ্রব্যের গুণের ভিন্নতার কারণ। Vant' Hoff দেখাইয়াছিলেন ভিন্ন ভিন্ন যৌগিক মূলের (Compound Radicle) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের Lactic ও Tartaric

বিভিন্ন পদার্থের নাম Stereo-isomer দেওয়া হইয়াছে। Proutএর মতের পোষণার্থ Regnault, Stas প্রভৃতি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার মতের ভ্রমই ধরা পড়িল। ইহার পর সকল রূঢ় পদার্থের মূল একই, এ কথা অনেক দিন শুনা যায় নাই। কিন্তু কেহ কেহ তখনও বলিতেন an atom is something which is not divided in certain cases that we are considering. Cliffordও স্পষ্টই বলিয়াছিলেন পরমাণুবাদ পদার্থ দর্শনের গবেষণার সুবিধার জন্য বস্তু সকলের একটি কল্পিত অবিভাজ্য অংশের কতকগুলি গুণের "কল্পনা" মাত্র।

Prout এর মতের ভ্রম দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে সাহস করিয়া Mendeleeff এর প্রচারিত Period law বা পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার গুণের সম্বন্ধের নিয়মের সত্যতা প্রথমে কেহই বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কথিত অনাবিষ্কৃত ধাতুর উক্ত নিয়মানুযায়ী গুণ সমূহের সহিত পরে আবিষ্কৃত Gallium আদি ধাতুর গুণের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া সকলকেই আশ্চর্য্য হইতে হইল। এই সময়ে Sir William Crookes তাঁহার Vacuum tube ও cathode rays এর পরীক্ষা করিতেছিলেন ও রেখালোক চিত্র (spectroscopic picture) সকল অঙ্কিত করিতেছিলেন। একদিন দেখিলেন নলের মধ্যস্থ বাষ্পের চাপ খুবই কম (বায়ুর চাপের লক্ষ ভাগের এক ভাগ) করিয়া দিলে নলের মধ্যের সমস্ত বাষ্পই আর বিভিন্ন প্রকারের চিত্র না দেখাইয়া একই নূতন প্রকার চিত্র দেখায়। কিন্তু চাপের অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেও পৃথক্ পৃথক্ বাষ্প আবার পৃথক্ পৃথক্ চিত্র দেখায়। চল্লিশবৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছিল যে কেবল একই প্রকারের পদার্থ এক প্রকার রেখালোক চিত্র দেখাইতে পারে, দুইটী বিভিন্ন পদার্থের এক প্রকার চিত্র হয় না। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় সকল

পদার্থই এক এ কথা অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ও এই অবস্থাকে ultra-gaseous নামক নূতন অবস্থারূপে ও এই অবস্থায় সকল প্রকারের পরমাণুই একই ion এ পরিণত হয় বলিয়া বর্ণনার আরম্ভ হইল।

আবার didymia মৃত্তিকার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া Crookes দেখিলেন, উহার মধ্য হইতে প্রায় ২৫০ প্রকারের পদার্থ পাওয়া যায় যাহাদের বর্ত্তমান রাসায়নিকশাস্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী রূঢ় পদার্থ বলিতে হয়। উহাদের মধ্যের কতকগুলির পরমাণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হইলেও প্রত্যেকেই কোন না কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, Crookes ইহাদের নাম Meta-element দিয়াছেন। যখন Mendeleeffএর Periodic lawও Crookes এর ২৫০ প্রকারের মূল ধাতু রাসায়নিকগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সময়ে উপর্য্যুপরি Crookes actinium, মুসে কুরি Radium ও ম্যাডাম কুরি Polonium নামক তিনটি Radio-active মূল ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই ধাতুগুলির কয়েকটি অতি আশ্চর্য্য গুণ শীঘ্রই দেখা গেল, ইহাদের মধ্য হইতে বিভিন্ন কিরণ বিকিরণই ইহাদের নামকরণ করিল। Radium ধাতু লইয়া পরীক্ষাকালে Ramsay উক্ত মূল ধাতু যে ক্রমে uranium ও helium নামক অপর দুইটী বিভিন্ন রূঢ় পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে, তাহার প্রমাণ পাইলেন। আবার গত বৎসরে উইলিয়ম র‍্যাম্‌সে প্রকাশ করেন যে রেডিয়মের নিকট রাখিলে তুঁতের তাম্রাংশ হইতে লিথিয়ম ও সম্ভবতঃ সোডিয়ম ধাতুর উৎপত্তি হয়, ইহা তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। অনেকে আজও এই কথায় বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণ আর ইহা একেবারে আশ্চর্য্য মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, যখন radium হইতে selleum, তাম্র হইতে Mendeleeff এর একই শ্রেণীর লিথিয়ম argon neon ইত্যাদি যদি উৎপন্ন হইতে পারে তবে

হয়, তখন তাম্র হইতে লিথিয়ম সোডিয়ম আদির উৎপত্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? এইরূপে একটী পরমাণুর ধ্বংস ও তাহা হইতে অন্য পরমাণুর সৃষ্টি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে নূতন আলোক আনিয়া দিল।

এই সকল আবিষ্কার হওয়ার কিছু পূর্ব্বে Kelvin তাঁহার Vortex theory প্রচার করেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক পরমাণুই ঈথরে (শূন্যে) এক একটি ঘূর্ণি মাত্র। ঈথরের মধ্যে বন্ধুরত্ব (friction) নাই, সুতরাং এই ঘূর্ণিরও লয় নাই। ঐ ঘূর্ণির গতির বেগও ইহাঁর মধ্যস্থিত ionএর সংখ্যার ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হয়, সুতরাং ইহা বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে বলা যায়। উপরি-উক্ত Radio active ধাতুগুলির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই Kelvin দেখাইলেন এই মতে সকল ধাতুই radio-active হওয়া উচিত, তবে কম ও বেশী পরিমাণে হইতে পারে। এই বিষয় প্রমাণের জন্য তিনি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য অতি জটিল অঙ্ক-শাস্ত্রের সাহায্য লইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অনুমান সত্য কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হইতেছে। সম্প্রতি প্রমাণ হইয়াছে, প্রায় সকল ধাতুরই এই radio-active গুণ আছে।

পরমাণুর আকার কত বড় তাহাও অনেক দিন হইতে স্থির করার চেষ্টা হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে আলোক-মার্গে যে অণু দেখা যায় প্রত্যেক পরমাণু তাহার ষষ্ঠাংশ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরমাণুর আকার এরূপ ভাবে কোথাও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু পরমাণুর আকারের কল্পনা যে উহা অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি Boyle এর নিয়মে এবং Vanidar Waals এর কৃত সংশোধন হইতে অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে Lord Kelvin পরমাণুর আকারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে যদি কোন অণুবীক্ষণের সাহায্যে এক ফোঁটা শিশিরকে পৃথিবীর ন্যায় বৃহদাকারের করিয়া দেখা সম্ভব হয় ও যদি তাহার

ভিতর প্রত্যেক অণু স্থির হইয়া থাকে তাহা হইলে জলের প্রত্যেক অণুকে বন্দুকের গুলি হইতে ক্রিকেটের বলের মধ্যে যে কোন আকারের বলিয়া দেখা যাইবে। উদজনের পরমাণুর আকার কাহারও কাহারও মতে জলের অণুর আকারের অর্দ্ধেক; অনেকের মতে তাহা অপেক্ষাও অনেক ক্ষুদ্র। Kelvin দেখাইয়াছেন প্রতি উদজনের পরমাণু অন্ততঃ ৭০০ ion এর সমষ্টিতে উৎপন্ন। সুতরাং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরমাণুগুলি এই ion এর আকার কত ক্ষুদ্র!

কিছুদিন হইল Scientific American পত্রে একজন বিখ্যাত আমেরিকান পণ্ডিত লিখিয়াছেন:—আমাদের বিজ্ঞানের পরমাণু সম্বন্ধে ধারণা এক্ষণে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:—সমুদয় বিশ্ব যেমন আমাদের সৌর জগতের ন্যায় বিভিন্ন গতিশীল সৌর জগতের সমষ্টি মাত্র, প্রত্যেক সৌর জগৎ যেমন পৃথিবীর ন্যায় গতিশীল গ্রহ-সমূহের সমষ্টি-মাত্র সেইরূপ প্রত্যেক দ্রব্য গতিশীল পরমাণু বা অণু সমূহের সমষ্টি; ঐ পরমাণু সমূহ আবার ion সমূহের সমষ্টি; ঐ ion সমূহ আবার কোন আজও-আমাদের অজ্ঞাত পদার্থের সমষ্টিমাত্র। যেমন অসীম বিশ্বের অসীম শূন্যের তুলনায় সৌরজগৎ অতি ক্ষুদ্র (infinitely small) প্রত্যেক পদার্থের অন্তরস্থ শূন্যের তুলনায় প্রত্যেক অণু, প্রত্যেক অণুর মধ্যস্থ শূন্যের তুলনায় পরমাণু, প্রত্যেক পরমাণুর অন্তরস্থ শূন্যের তুলনায় প্রত্যেক ion ও আবার তেমনি ক্ষুদ্র (infinitismal)! একটি জলন্ত যষ্টিকে জোরে ঘুরাইলে একটি জলন্ত বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া সম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়, বায়স্কোপের বিভিন্ন চিত্রের মিলন হইতে যেমন আমাদের চক্ষে একটি সচল চিত্রের ধারণা আনে, half-tone চিত্রের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু সমূহ একত্রিত হইয়া আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ চিত্রের ধারণা আনে, সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সমূহের গতি দ্বারা আমাদের চক্ষে প্রতিফলিত সমুদয় পদার্থেরই ধারণা আনিয়া থাকে। যেমন

জ্বলন্ত বৃত্তের মূল একটি জ্বলন্ত যষ্টির অগ্রভাগ মাত্র, সম্ভবতঃ সেইরূপ আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তাহারও মূল অতি অল্প বা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক পরমাণু। লর্ড কেলভিনের কল্পিত পরমাণুর আকার হইতেও পরমাণুর আকার ক্ষুদ্র হইতে পারে! কিন্তু ion এর আকার তাহা অপেক্ষা আরও কত ক্ষুদ্র! আর যাহা হইতে ion সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আকার? যেমন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া শত শত Asteroid এর সৃষ্টি করিয়াছে সেইরূপ Atom সকলের ধ্বংসের সহিত আরও কত নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে!

লর্ড হার্সেল পরমাণুর বিষয়ে বলিয়াছিলেন, একই বস্তুর সকল পরমাণু ঠিক একই রকমের; দুইটী উদজন বা দুইটী লৌহ পরমাণুর আপনা আপনির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। (Absolutely no difference exists.) এতদিন সকলেই ইহা ধ্রুব সত্য বলিতেন। এখন আর তাহা বলা হয় না। এখন বলা হইয়া থাকে, যেমন একজন কন্‌ট্রাক্টর একটা সুড়ঙ্গ কাটার সময় যদি দেখে যে, যে পথে তাহার সুড়ঙ্গ যাইবে তাহার সমুদয়টারই প্রতি ঘন গজে প্রায় একই রূপ উপাদান আছে, তাহা হইলে সে খরচের হিসাবের সময় সমুদয়টাই ঠিক একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত বলিয়া ধরেন; কিন্তু সেই স্থানে সুড়ঙ্গ কাটিতে উদ্যত একটা কেঁচোর নিকট ঐ স্থান একান্তই অসমান পদার্থে নির্ম্মিত। যেমন একটি অশ্বথ গাছের সমুদয় পাতা অশ্বথ পাতা হইলেও প্রত্যেক পাতাই ভিন্ন ভিন্ন আকারের, সেইরূপ একটা পদার্থের বিষয় বলিবার সময় মোটামুটি তাহার সমুদয় পরমাণু এক প্রকারের বলা হইলেও পরমাণু লইয়া বিচারের সময় তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য অস্বীকার করা অসম্ভব। Sir William Crookes একস্থানে বলিয়াছেন, In defining an element let us not take an external boundary but an internal type. Let us say, e. g. the smallest ponderable quan-

tity of gold, is an assemblage of ultimate atoms almost nfinitely more like each other than they are to the atoms of any other approximating element. It does not necessarily follow that the atoms shall all be absolutely alike among themselves. The atomic weight which we ascribe to gold therefore merely represents a mean value around which the actual weights of the individual atoms of the element range within certain limits. But if my conjecture is tenable, would we separate atom from atom, we should find them varying within narrow limits of the mean.

সুতরাং এখনকার পরমাণুবাদের বিশেষত্ব এই যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক্ষণে আপনাকে পরমাণুবাদ হইতে বিমুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। পরমাণুর সৃষ্টি যেরূপেই হইয়া থাকুক না, পরমাণু এক্ষণে যে অবস্থায় আছে, বিজ্ঞান কেবল তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়।

সপ্রতিভ।

১

আমায় তুমি ভালবাসবে খুব,—
　　　　এমন কথা বলছি না'ক ঠিক!
তা, যতই কেন মান করনা, সখি,
　　　　যতই কেন তাকাও দিক্‌বিদিক!

কথা আমার বুঝতে যদি চাও
বলছি ঠিক, এবার মেনে নাও,
বাড়ানো তার নয়কো একটাও—
　　　　কিম্বা আগাগোড়াই তার অলীক!

২

বলছি কি,—চাঁদের আলোয় যবে
　　　　কাননখানি হাসবে মৃদু-মধু
ডাক্‌বে দোয়েল, ছাদের 'পরে বসি'
　　　　চাঁদের পানে তাকিয়ে রবে, বধূ—

মৃদু চরণ-শব্দ পাশে শুনে
অবগুণ্ঠন দিয়োনাকো টেনে,
মধুর হাসি লুকিয়ে ঠোঁটের কোণে,
　　　　পাশে, ঈষৎ চেয়ে দেখো শুধু!

৩

বলছি কি,—তরুণ উষার আলো
পূবে যখন উঠবে ফুটে ধীরে—
অলকগুচ্ছ অসংবদ্ধ শিরে
বসবে এসে বাতায়নের ধারে,—

পথিক যদি চাহে সে দিক পানে
উঠে যেন যেওনা সেইক্ষণে,
ঈষৎ বাঁকা কটাক্ষ-ঈক্ষণে
চেয়ে দেখো পথিক সে কি করে!

৪

ভাল তুমি বাসবে আমায় খুব,
এমন কথা আমি বলছি না'ক!
তা,—যতই আঁখি রোষে রাঙা হোক্,
পরিহাসটা যতই কর না'ক!

বলছি আমি, দ্বিপ্রহরের কালে,
কপোত যখন ডাকবে অশথ-ডালে,
কৃষ্ণ আঁখি বারেক তবে তুলে
ইঙ্গিতটা দিতে ভুলোনা'ক!

৫

তার পরেতে সন্ধ্যা হয়ে এলে
বসবে যখন দীঘির ধারে গিয়ে

—যেন সন্ধ্যারাণী মন্দাকিনীর কূলে
　　　পিঠের 'পরে বেণী এলিয়ে দিয়ে—

সে সময় যখন পাশে এসে
কাণে কাণে বলব কথা হেসে,—
লুব্ধ ওষ্ঠ-অসংযমের দোষে,
　　　রোষ করো গো, ঋণটি শুধে দিয়ে !

৬

যখন আবার বিদায় নিয়ে যাব—
　　　মিনতিটি রেখো আমার, সখি,
মলিন মুখে দাঁড়িয়ে তরুতলে
　　　আমার 'পরে রেখো করুণ আঁখি !

আমার নয়ন হবে ছল-ছল,
তোমার চোখে ভরে আসবে জল—
আসব ফিরে, তখন ঢলঢল
　　　নয়ন ছুটি আঁচোলে ফেলো ঢাকি !

৭

তাহার পরে আবেগভরে ছুটি'
　　　আলিঙ্গনে যাতনা করো দূর—
দোঁহার হিয়া মিলিবে মহাসুখে
　　　ব্যবধানটা হয়ে যাবে চুর !

এ'র বেশী ত কি[illegible]
তবু বলছ,—ভাল[illegible]
—ঘুরিয়ে নাকি আস[illegible]
চাইছি[illegible]ছন্দ সুর!

৮

দোহাই তোমার—সরল মানুষ [illegible]
অপবাদটা হচ্ছে [illegible]
তুমি আমায় ভালবাসবে খুব,
এ কথাটা বলেছে [illegible]

আমি চাই কি তোমার ছোট্ট মনে,
মিলনের এক নিবিড় আবরণে
রাখ মোরে,—সত্যি ; হৃদয়-বনে
কোন কথা নাইকো জেনো গূঢ়!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।